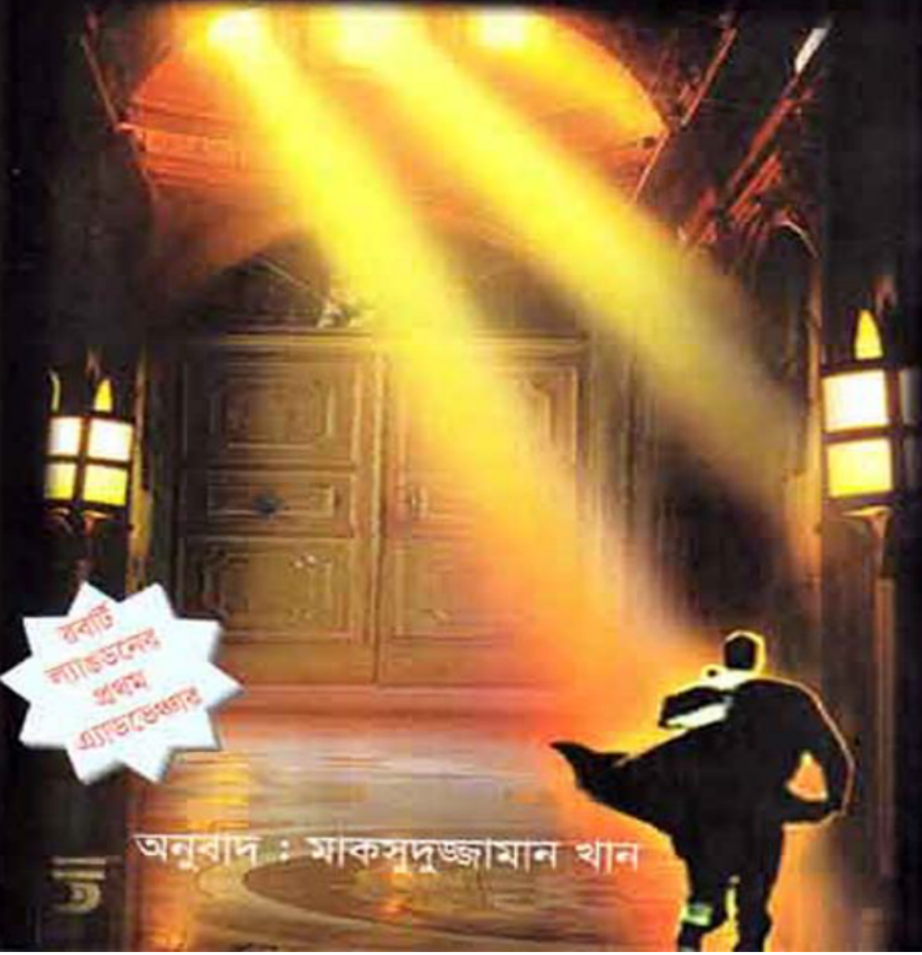
নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলিং লেখক

ড্যান ব্রাউন

এঞ্জেলস এন্ড ডেমনস

Angels And Demons



অনুবাদ : মাকসুদুজ্জামান খান

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় থাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের(২০২৩ এর আগের ভার্সানে দৈনিক ১০০ পাতা OCR করতে দেয়) সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

এ্যাঞ্জেলস এ্যান্ড ডেমনস্
ড্যান ব্রাউন
অনুবাদঃ- মাকসুদুজ্জামান খান

চতুর্থ মুদ্রণঃ এপ্রিল ২০১২
তৃতীয় মুদ্রণঃ মার্চ ২০০৯
দ্বিতীয় মুদ্রণঃ মার্চ ২০০৮
প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০০৫

প্রকাশক
মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন
অণ্বেষা প্রকাশন
লিয়াকৎ প্লাজা
৯ বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
শাহাদাত হোসেন বেলাল

গ্রাফিক্স
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

অক্ষর বিন্যাস
মারুফ হোসেন শ্রাবণ

মুদ্রণ
পানিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর ঢাকা

প্রিয় পাঠক,

দ্য দা ভিঞ্চি কোডকে এত বড় বেস্ট সেলার বানানোর জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। আপনার হাতে যে বইটা এখন আছে, এটা দ্য দা ভিঞ্চি কোডের আগের পর্ব। লুভর মিউজিয়ামে তোলপাড় করা রবার্ট ল্যাঙডনের অভিযানের এক বছর আগের কাহিনী এটা। এখানে সে অভিযান চালায় ভ্যাটিকান সিটিতে আর তামাম রোম মহানগরীতে।

এ্যাঞ্জেলস এ্যান্ড ডেমনস্ই হল আমার উপন্যাস যেখানে আমি জন্ম দিয়েছি শিল্পপ্রিয়, সিম্বলজি, কোড, গুপ্তসংঘ আর ভাল-মন্দের মাঝামাঝি বিচরণ করা চরিত্র রবার্ট ল্যাঙডনকে। দা ভিঞ্চির পেইন্টিংয়ের কাহিনী আপনারা যে উত্তেজনা আর আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন সেটা এখানেও পাবেন বলেই আমার বিশ্বাস। আপনার শিল্পানুরাগ থাক আর নাই থাক, শিল্পের অনেক অজানা অধ্যায়ের খোঁজ পাবেন এখানে, পাবেন নানা ধাঁধা, পুরনো দিনের না জানা কথা, সর্বোপরি-অযাচিত মোড়।

আমি আন্তরিকভাবেই আশা করি আপনি আমার প্রথম রবার্ট ল্যাঙডন ততটা মজা নিয়ে পড়বেন যতটা নিয়ে আমি লিখেছি।

উষ্ণ আহ্বান এবং ধন্যবাদ সহ
ড্যান ব্রাউন

তথ্য

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সায়েন্টিফিক রিসার্চ ফেসিলিটি সুইজারল্যান্ডের কনসিল ইউরোপিন পুর লা রিসার্চে নিউক্লিয়ারে (সার্ন) সম্প্রতি এন্টিম্যাটারের প্রথম কণা তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। সাধারণ বস্তুর সাথে প্রতিবস্তুর একটাই পার্থক্য, উভয়ে সব দিক দিয়ে এক রকম, শুধু এদের গড়ন বিপরীত। মানবজাতির জানা সবচেয়ে শক্তিমান এনার্জি সোর্স এই এন্টিম্যাটার। এটা একশোভাগ কাজে লাগে যেখানে পারমাণবিক ফিশনে কাজের হার মাত্র ১.৫% এবং জ্বালানী তেলের ক্ষেত্রে সেটা আরো অনেক অনেক কম।

প্রতিবস্তুর নেই কোন দূষণ, নেই তেজস্ক্রিয়তা আর এর মাত্র একটা ফোঁটা নিউ ইয়র্ক সিটির সারাদিনের বিদ্যুৎ চাহিদা মিটাতে পারে।

এখানে, যাই হোক, একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে...

এন্টিম্যাটার চরম অস্থিতিশীল। এটা বিস্ফোরিত হয় যে কোন বস্তুর এমনকি বাতাসের সংস্পর্শে এলেও। এক গ্রাম এন্টিম্যাটার পুরো বিশ কিলোটন পারমাণবিক বোমার সমান কাজ করে–হিরোশিমায় ফেলা বোমার মত।

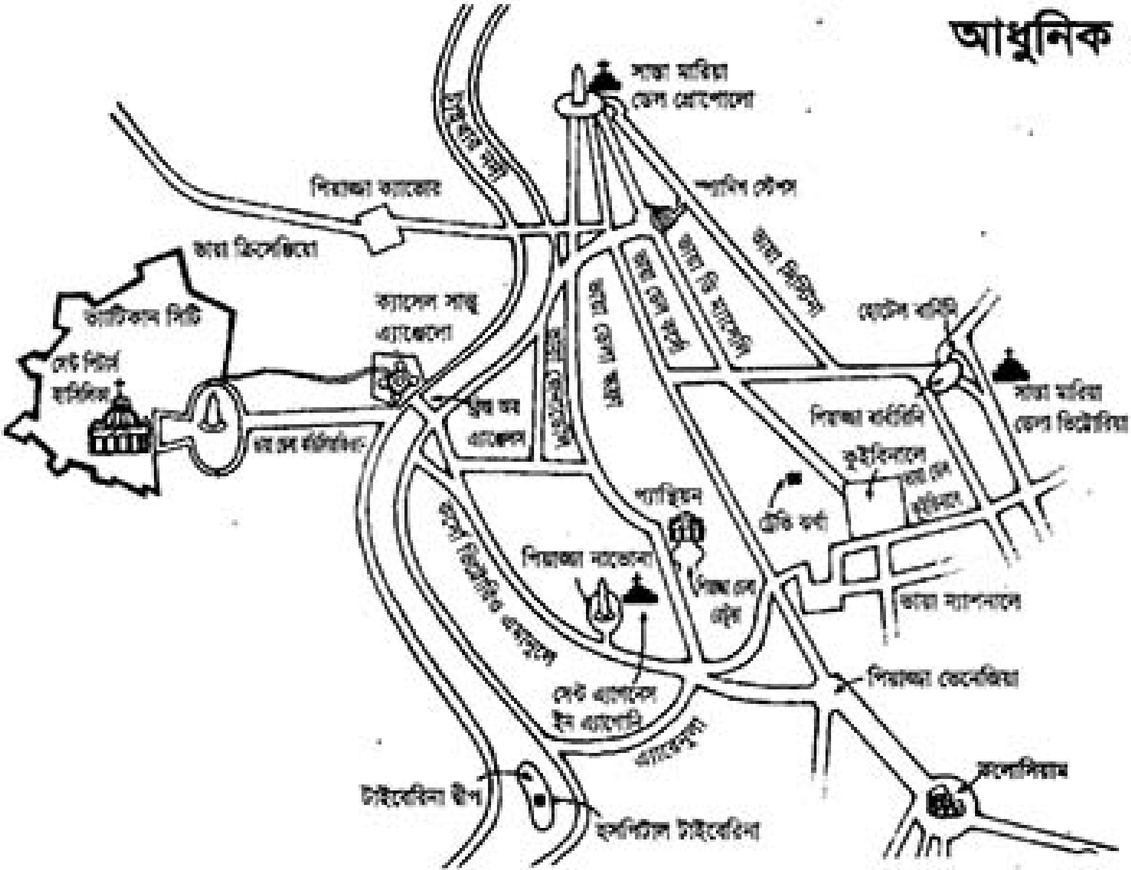
এখন পর্যন্ত প্রতিবস্তু খুব কম পরিমাণে তৈরি করা গেছে। একত্রে কয়েকটা পরমাণুর বেশি নয়। কিন্তু সার্ন দেয়াল ভেঙে দিয়েছে। তাদের সুবিশাল এন্টিপ্রোটন ডিসিলারেটর আরো বেশি পরিমাণে এটা তৈরিতে সহায়তা করবে।

একটা প্রশ্ন সবাইকে জ্বালাতন করে অহর্নিশি–এই নতুন ক্ষমতার উৎস কি সারা পৃথিবীতে মঙ্গলবার্তা বয়ে আনবে? নাকি ঘটাবে কুরুক্ষেত্র?

অথরস নোট

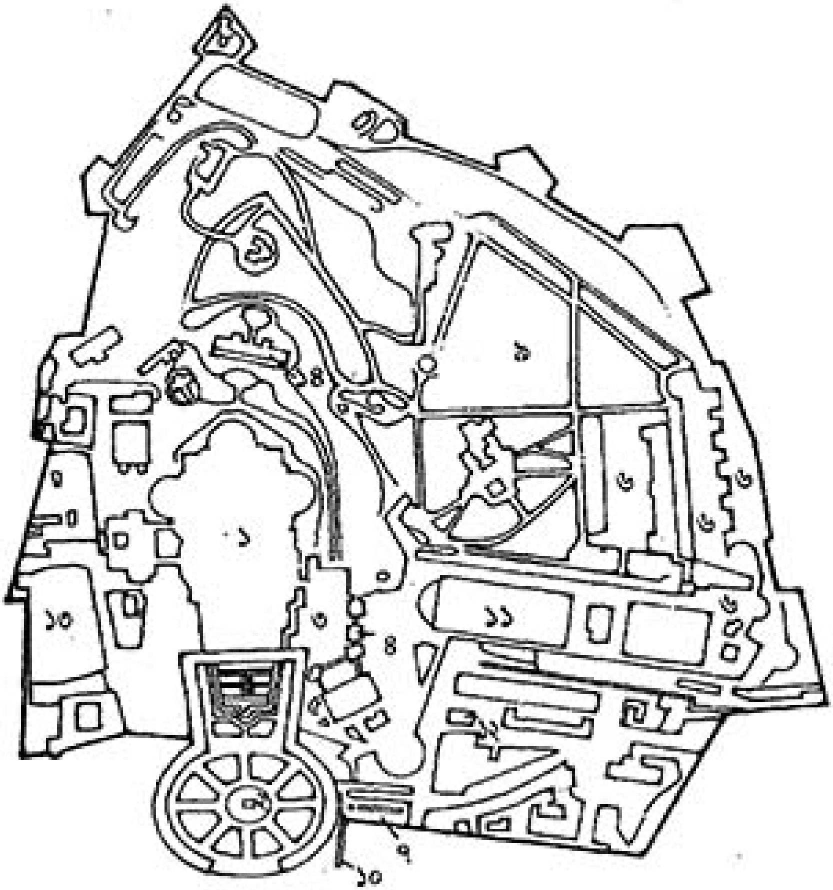
এখানে দেখানো সব শিল্পকর্ম, কবরখানা, সুড়ঙ্গ আর রোমের স্থাপত্যকলার বিবরণ একেবারে বাস্তব। (যেমন বাস্তব তাদের অবস্থিতি।) আজও হয়ত তাদের দেখা পাওয়া যাবে। ইলুমিনেটির গোপন ব্রাদারহুডের কথাও সত্যি।

আধুনিক রোম



সান্তা মারিয়া দেল পোপোলো
পিয়াজ্জা কাভোর
স্প্যানিশ স্টেপস
ভাটিকান সিটি
সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা
ক্যাসেল সান্ত এঞ্জেলো
হোটেল বার্নিনি
সান্তা মারিয়া দেল ভিত্তোরিয়া
পিয়াজ্জা বার্বেরিনি
কুইরিনালে
প্যান্থিয়ন
পিয়াজ্জা নাভোনা
ভায়া ন্যাশনালে
পিয়াজ্জা ভেনেজিয়া
কলোসিয়াম
টাইবেরিনা দ্বীপ

ভ্যাটিকান সিটি



১. সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা
২. সেন্ট পিটার্স স্কয়ার
৩. সিস্টিন চ্যাপেল
৪. বর্জিয়া কার্টিইয়ার্ড
৫. পোপের অফিস
৬. ভ্যাটিকান জাদুঘর
৭. সুইস গার্ডের অফিস
৮. হেলিপোর্ট
৯. বাগান
১০. প্যাসেটো
১১. বেলভেড্রের উঠান
১২. কেন্দ্রিয় পোস্ট অফিস
১৩. পাপাল অডিয়েন্স হল
১৪. সরকারি প্রাসাদ

Angels & Demons

ড্যান ব্রাউন

অনুবাদঃ মাকসুদুজ্জামান খান

অন্বেষা প্রকাশন

পূর্বকথা

জ্বলন্ত মাংসের ঝলসানো গন্ধ ঠিক ঠিক টের পায় পদার্থবিদ লিওনার্দো ভেট্রা। সে জানে, এটা তারই দেহের মাংস। সে আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে তাকায় উপরে ঝুঁকে আসা কালো অবয়বের দিকে,- কী চাও তুমি?

লা চিয়াভে, বলল খসখসে, অস্পষ্ট সুরে কালো লোকটা, দ্য পাসওয়ার্ড।

কিন্তু... আমি—

লোকটা আরো চেপে ধরল সাদাটে ধাতব গড়নটা। আরো পুড়ে গেল লিওনার্দোর শরীরের মাংস, বুকের মাংস। জান্তব ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে। ফুটন্ত মাংসের পুড়ে যাবার শব্দ শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট।

আবার যাতনায় বীভৎস চিৎকার করে উঠল ভেট্রা। কোন পাসওয়ার্ড নেই! বলল সে, টের পেল, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে সচেতনতার একেবারে শেষপ্রান্তে চলে যাচ্ছে সে।

একনজর তাকাল তার দিকে লোকটা। নে এ্যাভেতো পিউরা। আমি সে ভয়ই পাচ্ছিলাম।

জ্ঞান ধরে রাখার জন্য যুঝছে ভেট্রা; কিন্তু এগিয়ে আসছে অন্ধকার। তার একমাত্র সান্তনা এই যে, হামলাকারী কখনোই তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে না। কখনোই পাবে না জিনিসটা।

টের পেল সে, ঝুঁকে আসছে লোকটা। হাতের ভঙ্গি অনেক বেশি ভয়াবহ।

শিউরে উঠল প্রবীণ বিজ্ঞানী।

ফর দ্য লাভ অব গড! গলা ফাটানো চিৎকার জুড়ে দিল সে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে।

১

গিজার বিশাল পিরামিডের উপরের ধাপে উঠে গিয়ে এক তরুণী তাকে ডাকে, নিচের দিকে তাকিয়ে। তাড়াতাড়ি কর, রবার্ট! আমি জানতাম, আরো কম বয়েসি কাউকে বিয়ে করা উচিৎ ছিল। হাসিতে তার জাদু ঝরে।

শ্রাগ করে সে, গতি বাড়াতে চায়। কিন্তু পা যেন গেঁথে গেছে পাথরের মত। সবুর কর! বলে সে, মিনতি করে, প্লিজ...।

যত উপরে উঠছে ততই আচ্ছন্ন হয়ে আসছে দৃষ্টি। কানে বজ্রপাতের শব্দ। আমাকে অবশ্যই মেয়েটার কাছে পৌঁছতে হবে। কিন্তু আবার যখন সে উপরে তাকায়, স্রেফ ভোজবাজির মত উবে যায় মেয়েটা। তার জায়গায় দাড়িয়ে আছে দন্তহীন এক বুড়ো। লোকটা তাকিয়ে আছে নিচের দিকে, ঠোঁট ভাঁজ করে। সাথে সাথে চিৎকার করে ওঠে ল্যাংডন, নিরব মরুর বুকে সেই আওয়াজের প্রতিধ্বণি বাজে।

দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল রবার্ট ল্যাংডন। বিছানার পাশের ফোন কর্কশ কন্ঠে চেঁচামেচি করছে। মোহাবিষ্ট হয়ে রিসিভারটা তুলে নেয় সে।

হ্যালো?

আমি রবার্ট ল্যাংডনের খোঁজ করছিলাম, এক লোকের কণ্ঠ বলল।

খালি বিছানায় উঠে বসল ল্যাংডন, চেষ্টা করল মনটাকে পরিষ্কার করার। দিস... ইজ রবার্ট ল্যাংডন। তাকাল সে ঘড়ির দিকে। ডিজিটাল ঘড়িটায় সকাল পাঁচটা আঠারো উঠে আছে।

আপনার সাথে জরুরি ভিত্তিতে দেখা হওয়া দরকার।

কে বলছেন?

আমার নাম ম্যাক্সিমিলিয়ান কোহলার। আমি ডিসক্রিট পার্টিকল ফিজিসিস্ট।

আপনি... কী? কথা কি বুঝতে পারছে না ল্যাংডন? আপনি কি নিশ্চিত যে ল্যাংডনের খোঁজ করছেন আপনি আমিই সেই লোক?

আপনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রিলিজিয়াস আইকোনলজির প্রফেসর। আপনি সিম্বলজির উপর বই লিখেছেন এবং—

আপনি কি জানেন কটা বাজে এখন?

ক্ষমা চাচ্ছি। আমার কাছে এমন কিছু আছে যেটা আপনি দেখতে চাইতে পারেন। কথাটা ফোনে বলা সম্ভব নয়।

একটা বাঁকা হাসি উঠে এল ল্যাংডনের ঠোঁটে। এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে। কিছুদিন আগেও তার লেখা বইয়ের এক পাঠক তাদের দলের পক্ষ থেকে ফোন করেছিল, ঈশ্বর তাদের কাছে যে প্রমাণ পাঠিয়েছেন সেটা দেখানোর জন্য। আরেক মেয়েলোক তাকে ওকলাহোমা থেকে ফোন করে সেরা সেক্স অফার করেছিল যদি সে দয়া করে উড়ে গিয়ে সেখানে তার বেডশিটের উপরে লেখা ওঠা দৈবাবণী দেখে।

আমার নাম্বার পেলেন কোত্থেকে? এই সময়টাতেও ল্যাংডন চেষ্টা করল একটু নরম হয়ে কথা বলার।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে। আপনার বইয়ের ওয়েবসাইটে।

এবার গুঙিয়ে উঠল ল্যাংডন। সে নিশ্চিত, তার ওয়েবসাইটে আর যাই থাক বাড়ির ফোন নাম্বার থাকবে না কশ্মিনকালেও। লোকটা অবশ্যই মিথ্যা কথা বলছে।

আপনার সাথে দেখা হওয়া দরকার, চাপ দিল কলার, আমি আপনাকে যথেষ্ট পে করব।

এবার পাগল হবার দশা ল্যাংডনের, দুঃখিত। কিন্তু আমি আসলেই বুঝে উঠতে পারছি না...

এখনি যদি আপনি রওনা দেন তাহলে এখানে পৌঁছতে পারবেন।

কোথাও যাচ্ছি না আমি। এখন সকাল পাঁচটা বাজে! তুলে রাখল রিসিভারটা ল্যাংডন, ফিরে গেল বিছানায়। বন্ধ করল চোখ, চেষ্টা করল আবার ঘুমের রাজ্যে ফিরে যেতে। কোন

কাজে লাগল না চেষ্টাটা। স্বপ্নটা মনে গাঁথা হয়ে গেছে। না পেরে অবশেষে সে রোবটা চাপাল গায়ে, তারপর নেমে গেল নিচে।

রবার্ট ল্যাঙডন খালিপায়ে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল তার ম্যাসাচুসেটস ভিক্টোরিয়ান বাসায়। এখন ইনসমনিয়া থেকে বেঁচে যাবার আশায় এক মগ ধূমায়িত কফি হাতে তুলে নিল। এপ্রিলের চাঁদ বাইরে থেকে আলো পাঠাচ্ছে, ওরিয়েন্টাল কার্পেটের উপর আকা হচ্ছে বিচিত্র সব নকশা। কলিগরা প্রায়ই ঠাট্টা করে, তার বাসা নাকি বসতবাড়ি নয়, একটা পুরাকীর্তির আখড়া, জাদুঘর। তার বাসা আসলেই ঠাসা হয়ে আছে নানা জায়গা থেকে আসা ধর্মীয় আর্টিফ্যাক্টে। ঘানা থেকে একটা ইকুয়াবা, স্বর্ণের তৈরি ক্রস এসেছে স্পেন থেকে এমনকি বোনিওর একটা বোক্কাসও আছে, একজন তরুণ যোদ্ধার চির তারুণ্যের প্রতীক।

মহাঋষির চেয়ারে বসে সে চকলেটের স্বাদ নিতে নিতে টের পেল বাইরের বে উইন্ডো দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ইমেজটা ম্লান... যেন কোন ভূত। বয়েসি কোন ভূত, ভাবল সে। সাথে সাথে মনে পড়ে গেল, আসলে তার এই তারুণ্য আর বেশিদিন থাকছে না। এই শরীরটা একটা বাসা বৈ তো কিছু নয়।

যদিও এই চল্লিশ বছর বয়সে সে একেবারে ওভার স্মার্ট নয়, তবু তার মহিলা সহকর্মীরা তাকে আড়ালে আবডালে প্রাচীণ এ্যাপিল যুক্ত বলে থাকে–তার ধূসর, ঢেউ খেলানো চুল, তীক্ষ্ণ নীল চোখ, দৃষ্টি কেড়ে নেয়া গভীর কণ্ঠস্বর এবং শক্তিমান, বেপরোয়া মুচকি হাসি যে কারো মনোযোগ আকৃষ্ট করবে, কোন সন্দেহ নেই। স্কুল, আর কলেজ থেকেই ডাইভার হিসাবে সুনাম কুড়িয়ে আসছে আর এই বয়সে শত কাজের মাঝেও অভ্যাসটা ধরে রেখেছে ঠিক ঠিক। তাই শরীর এখনো নিখুঁত, এখনো, সাঁতারুর চিহ্ন সারা গায়ে, এখনো অবিরাম পঞ্চাশ ল্যাপ করে সাঁতরায় সে ইউনিভার্সিটির সুইমিং পুলে।

ল্যাঙডন তার বন্ধুদের কাছে সব সময় বিবেচিত হয় একটা কিংবদন্তী হিসাবে। এমন এক লোক যে শতাব্দিগুলোর মাঝে ধরা পড়ে গেছে। উইকএন্ডে তাকে নীল জিন্স পরা অবস্থায় দেখা যাবে ঠিকই, কাজ করছে সে, কম্পিউটার গ্রাফিক্সের সাথে সাথে লেকচার দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে, রিলিজিয়াস আর্টের বিষয়ে। কিন্তু আর সব সময় দেখা যাবে হ্যারিস টুইড আর ভেস্ট পরা অবস্থায়। ছবি আসে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়, যেখানে সেই বিখ্যাত পোশাক আর সেই সাথে কোন জাদুঘরের উদ্বোধনে বক্তৃতা দিচ্ছে পটু কণ্ঠে।

একজন কঠিন শিক্ষক আর কড়া শৃঙ্খলার লোক হলেও ছাত্রমহলে তুমুল জনপ্রিয়তা আছে তার। দ্য লস্ট আর্ট অব গুড ক্লিন ফান এর ব্যাপারে সব সময় সে কঠিন। ক্যাম্পাসে তার ডাকনাম দ্য ডলফিন এটা শুধু সাঁতারে অবিশ্বাস্য দক্ষতার জন্য আসেনি, এসেছে ওয়াটার পোলো খেলায় প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করার কারণেও।

একা একা বসে আছে ল্যাঙডন, রাতের নিস্তব্ধতা ভাঙছে না মোটেও। এবার গোল বাঁধাল তার ফ্যাক্স মেশিনের রিংটোন। বিরক্ত হতে গিয়েও হল না সে। হাসল কোনক্রমে।

ঈশ্বরের লোকজন! ভাবল সে, দু হাজার বছর ধরে মেসিয়াহর জন্য প্রতীক্ষা! কিন্তু আজও তাদের আশা ফুরায় না।

ওক প্যানেলের স্টাড়ির দিকে সে আলসে ভঙ্গিতে এগিয়ে যায়, হাতের খালি মগটা রেখে। ফ্যাক্সের ছবিটা পড়ে আছে ট্রে তে।

সাথে সাথে একটা ধাক্কা খেল সে।

এখানে একটা নগ্ন লাশের ছবি দেখা যাচ্ছে। লোকটার ঘাড় পুরোপুরি পিছনে ফিরানো। তার বুকে একটা চিহ্ন আকা। লোকটার বুকের এই ব্র্যান্ডটা... একটা মাত্র শব্দ। এই শব্দটাকে ল্যাঙডন জানে, ভাল করেই জানে। অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকে সে লেখাটার দিকে কিছুক্ষণ।



ইলুমিনেটি, বলল সে জোরে জোরে। ধ্বক ধ্বক করছে বুক। এ হতে পারে না...

ফ্যাক্সটাকে ভয়ে ভয়ে সে একশো আশি ডিগ্রি ঘোরায়। দেখল পাতাটার উপর দিক নিচে চলে এসেছে।

ঠিক সে মুহূর্তে, চলে গেল শ্বাস প্রশ্বাস। আবার সে অবিশ্বাস নিয়ে ঘুরিয়ে যায় পাতাটাকে।

ইলুমিনেটি! ফিসফিস করে সে।

উপর এবং নিচ থেকে একই লেখা দেখা যাচ্ছে। স্থাণুর মত পড়ে গেল ল্যাঙডন চেয়ারের উপরে। তারপর ফ্যাক্স মেশিনের জ্বলতে নিভতে থাকা লাইটের দিকে চোখ যায়। যে পত্রটা পাঠিয়েছে,সে এখনো অপেক্ষা করছে ফোন লাইনে।

ল্যাঙডন তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ, তারপর রিসিভার তুলল।

২

আমরা এবার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছি কি? লাইনের জবাব দেয়ার সাথে সাথে লোকটার কণ্ঠ শোনা গেল।

ইয়েস, স্যার। আপনি খুব ভাল করেই পেরেছেন। নিজের কথা ব্যাখ্যা করতে চান নাকি?

আগেই আপনাকে বলার চেষ্টা করেছিলাম। আমি একজন ফিজিসিস্ট। একটা রিসার্চ ফ্যাসিলিটি চালাই। একটা খুন হয়েছে এখানে। মরদেহটা ভাল করেই দেখেছেন বোধ করি।

কী করে আমাকে পেলেন?

এরিমধ্যে বলেছি আপনাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব। দ্য আর্ট অব দ্য ইলুমিনেটি বইটার সাইটে।

ভাল করেই জানে সে, সাহিত্যের মূল ধারায় তার বইটা কল্কে পায়নি ঠিক, কিন্তু মোটামুটি সাড়া জাগাতে পেরেছে। কিন্তু তাতেও ব্যাপারটা স্পষ্ট হচ্ছে না। পেজে কোন কন্টাক্ট নাম্বার ছিল না। আমি নিশ্চিত।

ওয়েব থেকে তথ্য নিয়ে চমকে দেয়া লোজনের কোন অভাব নেই আমার ল্যাবগুলোয়।

মনে হচ্ছে আপনার ল্যাবগুলো ওয়েবের ব্যাপারে অনেক বেশি জানে?

আমাদের জানা উচিৎ, বলল লোকটা, কারণ এটা আমাদেরই আবিষ্কার।

লোকটার কন্ঠে এমন কিছু ছিল যাতে ঠিক ঠিক বোঝা যায় সে–আর যাই করুক ঠাট্টা করছে না।

আপনার সাথে এক্ষুণি দেখা হওয়া দরকার। মিনতি ঝরে পড়ল লোকটার কণ্ঠে, বোস্টন থেকে ল্যাবের দূরত্ব বেশি নয়, এক ঘণ্টার পথ।

তাকিয়ে আছে ল্যাঙডন একাধারে, হাতের ফ্যাক্সটার দিকে। খুব জরুরি, চাপ দিল লাইনে থাকা কণ্ঠ।

ইলুমিনেটি! তাকিয়ে আছে সে একদৃষ্টে। প্রাচীণ চিহ্ন আর প্রতীক নিয়েই তার কাজকারবার। আর বিশেষ করে ইলুমিনেটি নিয়ে। কিন্তু যে কোন ভূতত্ত্ববিদ যদি জলজ্যান্ত ডায়নোসরের সামনাসামনি হয় তাহলে যেমন ভড়কে যাবে তেমনি ভড়কাচ্ছে সে আজকের দিনে ইলুমিনেটির ছাপ দেখে।

আমি আপনাকে না-জানিয়েই একটা প্লেন পাঠিয়ে দিয়েছি। আর বিশ মিনিটের মধ্যে সেটা বোস্টনের মাটি কামড়ে ধরবে।

ল্যাঙডন এখনো যেন স্বপ্ন দেখছে। কোথায় হতে পারে? উড়ে যেতে এক ঘন্টালাগবে…

আমার ধৃষ্টতা ক্ষমার চোখে দেখবেন প্লিজ, বলছে কণ্ঠটা, আর কোন উপায় ছিল না। আপনাকে এখানে চাই-ই চাই।

একবার তাকাল ল্যাঙডন হাতের ফ্যাক্সটার দিকে। তাকাল বাইরের কোমল প্রকৃতির দিকে। না, আর দেরি করা যায় না। তার প্রাচীণ সাধনার নূতন নমুনা দেখা দিয়েছে।

আপনিই জিতলেন, বলল সে, বলুন কোথায় আপনার প্লেনের সাথে দেখা করতে হবে।

৩

হাজার হাজার মাইল দূরে, দুজন মানুষ দেখা করছিল। চেম্বারটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, পুরনোদিনের, মধ্যযুগীয়।

বেনভেনিউটো, দায়িত্বে থাকা লোকটা বলল, দেখা যাচ্ছে না তাকে। ইচ্ছা করেই সে আড়ালে থাকছে। তোমার কাজ কি ভালমত শেষ হয়েছে?

সি, বলল অপরজন, পারফেট্টামেন্টে। কণ্ঠ তার পাথরের মতই নিখাদ।

আর কোন সন্দেহ থাকবে না কে দায়ী সে বিষয়ে?

না।

সুপার্ব। তোমার কাছে কি আমার চাওয়ার জিনিসটা আছে?

খুনির চোখ চকচক করে উঠল। তেলের মত কালো। একটা ভারি ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস সে টেনে তুলল। তারপর রেখে দিল টেবিলের উপরে, সশব্দে।

ছায়ার লোকটাকে যেন তুষ্ট মনে হল, ভাল কাজ করেছ।

ব্রাদারহুডের কাজে লাগা এক সম্মান বৈ কিছু নয়। বলল খুনি।

পরের ধাপ শুরু হতে যাচ্ছে অচিরেই। একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও। আজ রাতে আমরা দুনিয়ার খোল নলচে পাল্টে দিতে যাচ্ছি।

৪

রবার্ট ল্যাঙডনের সাব নাইন হান্ড্রেড এস কালাহান সুড়ঙ্গ থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এল। বোস্টন হারবার সামনেই, তার পরই লোগান এয়ারপোর্ট। তিনশ গজ সামনে যেতেই একটা আলোকিত হ্যাঙ্গার পাওয়া গেল। একটা বিশাল চার জ্বলজ্বল করছে এটার উপর। বেরিয়ে এল সে।

ভবনের পিছন থেকে গোলগাল চেহারার এক লোক এগিয়ে এল। পরনে তার নীল ইউনিফর্ম।

রবার্ট ল্যাঙডন?

দ্যাটস মি, বন্ধুসুলভ কণ্ঠের জবাবে বলল সে গাড়িটার চাবি লাগাতে লাগাতে।

পারফেক্ট টাইমিং, বলল পাইলট, আমার পিছনে পিছনে আসুন, প্লিজ।

বিল্ডিং পেরিয়ে যেতে যেতে একটু দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠে ল্যাঙডন। এমন সব ব্যাপারের সাথে সে মোটেও পরিচিত নয়। একজোড়া চিনো, একটা টার্টলনেক আর হ্যারিস টুইডের স্যুট জ্যাকেট নিয়ে সে ঘর ছেড়েছে, কোথায় যেতে হবে তা না জেনেই। পকেটের ছবিটার ব্যাপার এখনো ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

ল্যাঙডন যে একটু অস্থির সেটা টের পেল পাইলট, ওড়াটা আপনার জন্য কোন সমস্যা নয়, তাই না স্যার?

আসলেই। বলল সে, ব্র্যান্ড বসানো মরদেহ আমার জন্য সমস্যা। উড়ে চলা? সেটাকে ঠিক সামলে নিতে পারব।

লোকটা হ্যাঙ্গারের কোণা ঘুরে গিয়ে একটা রানওয়ের দিতে তাকাল।

আবার স্থবির হয়ে গেল ল্যাঙডন , সামনের দৃশ্য দেখে, আমরা ঐ জিনিসটায় চেপে বসতে যাচ্ছি?

একটা আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিল লোকটা, পছন্দ হয়?

পছন্দ হয়? কোনচুলো থেকে উঠে এসেছে এটা?

তাদের সামনের ক্র্যাফটটা আকারে আকৃতিতে বিশালবপু। দেখে এক পলে মনে পড়ে যায় যে, কোন স্পেস শাটলের কথা। শুধু পার্থক্য একটাই, সামনের দিকটা চেছে দেয়া হয়েছে, করা হয়েছে সমান।

ল্যাঙডন প্রথমেই যা ভাবল, নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে সে। যানটাকে বরং বুইক বলে ভুল হয়। কোন আকাশ রথ নয়। অবশ্য ফিউজিলাজের গোড়ায় দুটো ছোট ছোট ডানা দেখা যাচ্ছে। ঐ পর্যন্তই। বাকিটার পুরোটাই খোলস। পিছনের জায়গা থেকে একেবারে সামনে পর্যন্ত নিরেট খোলস। কোন জানালা নেই, নেই কোন চিহ্ন।

আড়াই লাখ কিলো পুরোপুরি ভরা আছে, বলল পাইলট, যেমন করে কোন বাবা, তার নতুন জন্মানো শিশুর জন্য মায়া নিয়ে কথা বলে, স্ল্যাস হাইড্রোজেনে চলে। সিলিকন কার্বাইড ফাইবারে মোড়া, বিশ অনুপাত এক হল এটার থ্রাস্ট-ওয়েট রেশিও। বেশিরভাগ জেটই চলে সাত অনুপাত একে। ডিরেক্টর নিশ্চয়ই আপনাকে দেখার জন্য প্রাণপাত করছে। প্রয়োজন বিশেষ না হলে কখনো বিগ বয়কে বাইরে পাঠানো হয় না।

এই জিনিসটা উড়ে চলতে জানে? এখনো বিস্ময় কাটেনি ল্যাঙডনের।

হাসল পাইলট, ওহ্ ইয়া! দেখতে একটু জবুথবু, কিন্তু আপনার জেনে রাখা ভাল, যত তাড়াতাড়ি এতে অভ্যস্ত হবেন ততই মঙ্গল। আজ থেকে পাঁচ বছর পর আপনি যত বিমান দেখবেন তার সবই এ রকম। এইচ এস সি টি–হাই স্পিড সিভিল ট্রান্সপোর্ট। আমাদের ল্যাব এ জিনিস কিনেছে একেবারে প্রথমবারেই।

নিশ্চয়ই নরক গুলজার করা ল্যাব তাদেরটা! ভাবল ল্যাঙডন।

এ হল বোয়িং এক্স থার্টি থ্রির প্রোটোটাইপ। বলেই যাচ্ছে পাইলট, কিন্তু এমন, আরো ডজন ডজন আছে এরিমধ্যে, দ্য ন্যাশনাল এ্যারো স্পেস প্লেন, রাশিয়ানদের আছে স্ক্যাম জেট, ব্রিটিশদের আছে হোটেল। এখানেই গুমরে মরছে ভবিষ্যত। শুধু পাবলিক সেক্টরে

আসার আগে একটু স্বস্তিতে দিন গুজরান করছে এই বিভিন্ন মডেলের প্লেনগুলো। এগুলোর জাত আলাদা হলেও তাল ঠিক। প্রচলিত জেটগুলোকে আপনি বিনা দ্বিধায় বিদায় চুম্বন দিতে পারেন অনায়াসে।

আমার মনে হয় প্রচলিত জেটগুলোতেই অনেক বেশি স্বস্তি বোধ করব।

এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পাইলট, এদিক দিয়ে, মিস্টার ল্যাংডন, সাবধানে পা ফেলুন, প্লিজ।

কয়েক মিনিট বাদে, খালি কেবিনের ভিতরে জেকে বসেছে ল্যাংডন। পাইলট তাকে সামনের দিকের একটা সিটে অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়ে সামনের দিকে উধাও হয়ে গেল।

ভিতরের সমস্ত দৃশ্য প্রচলিত বাণিজ্যিক এয়ারলাইনের মত, শুধু পার্থক্য এক জায়গায়, এখানে কোন জানালা নেই। ভাবনাটা মোটেও স্বস্তি দিল না ল্যাংডনকে। একটু ক্ল্যাভেট্রাফোবিয়া তার সারা জীবন ধরে তাড়িয়ে ফিরছে। বাল্যকালের অযাচিত এক ঘটনার পর থেকে কোন পরিস্থিতিতেই সে আবদ্ধ জায়গায় থাকতে পারে না।

আবদ্ধ জায়গা থেকে দূরে থাকার জন্য যথাসম্ভব করে সে, বদ্ধ জায়গার খেলাগুলোকে এড়িয়ে চলে, যখন তখন খোলা জায়গার জন্য আইঢাই করে তার প্রাণ। এমনকি এই বিশাল ভিক্টোরিয়ান বাসাটাও সেজন্যেই এত খোলামেলা।

ইঞ্জিন গর্জে উঠছে তার নিচে। জ্যান্ত হয়ে উঠছে তাবৎ প্লেন। সে কোনমতে গলাধঃকরণ করল ব্যাপারটাকে। সে ঠিক ঠিক টের পেল, ট্যাক্সিইং করে এগিয়ে যাচ্ছে আজব প্লেনটা। উপরে হালকা কান্ট্রি মিউজিক বাজছে।

সিটের পাশের একটা ফোন বিপবিপ করে উঠল। হাত বাড়াল ল্যাংডন।

হ্যালো?

আরামদায়ক, মিস্টার ল্যাংডন?

মোটেও নয়।

রিলাক্স করুন। এক ঘণ্টার মধ্যে জায়গামত পৌঁছে যাচ্ছি।

আরে সেখানটা কোথায়? কোথায় যাচ্ছে তার বিন্দুবিসর্গ জানা নেই দেখে আশ্চর্যান্বিত হল সে।

জেনেভা। ইঞ্জিন চালু করতে করতে জবাব দিল পাইলট, ল্যাবটা জেনেভায়।

জেনেভা! একটু যেন স্বস্তি পেল ল্যাংডন, নিউ ইয়র্কের উপরদিকটায়? সেনেকা লেকের কাছে আমার পরিবার আছে। জানতাম নাতো জেনেভায় একটা ফিজিক্স ল্যাব আছে!

হাসল পাইলট, নিউ ইয়র্কের জেনেভা নয়, মিস্টার ল্যাংডন, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

কথাটা কানে প্রবেশ করতে যেন অনেকটা সময় নিল।

সুইজারল্যান্ড? মনে হয় যেন আপনি বলেছিলেন জায়গাটা মাত্র এক ঘণ্টার দূরত্বে।

ঠিক তাই, মিস্টার ল্যাংডন, মুচকে হাসছে পাইলট, এই প্লেন ম্যাক ফিফটিনে চলে। শব্দের থেকে পনেরগুণ বেশী গতিতে।

৫

ব্যস্ত ইউরোপিয়ান পথে, খুনি, সাপের মত একেবেকে এগিয়ে যায় হাজার মানুষের ভিতর দিয়ে। সে শক্তিশালী, কালো এবং নিষ্ঠুর। এখনো তার মাংসপেশী আড়ষ্ট হয়ে আছে সেই দেখা হবার পর থেকেই।

ভালভাবেই এগিয়ে গেল ব্যাপারটা, সে আপন মনে ভাবল, যদিও কখনো তার চাকরিদাতা মুখ উন্মোচিত করেনি, তবু খুনি মনে মনে আহ্লাদে আটখানা হয় তার উপস্থিতির কথা ভেবে, মাত্র পনেরদিন ধরে কি তার চাকরিদাতা তার সাথে যোগাযোগ করছে?

সেই কলের প্রত্যেকটা কথা তার এখনো অক্ষরে অক্ষরে মনে পড়ে...

আমার নাম জ্যানাস, বলেছিল কলার, আমরা একই পথের পথিক। আমাদের দুজনেরই অভিন্ন এক শত্রু আছে। শুনেছি তোমার দক্ষতা ভাড়া করা যায়।

নির্ভর করে আপনি কার পক্ষ থেকে কথা বলছেন তার উপর, সাথে সাথে চট করে জবাব দেয় সে।

জবাব দেয় কলারও।

আমি ঠাট্টা তামাশা তেমন পছন্দ করি না।

তুমি আমাদের নাম শুনেছ, আমি খুশি। বলল কলার।

অবশ্যই, ভাতৃসংঘ এক ঐতিহাসিক ব্যাপার।

আর এখনো তুমি নিশ্চিত হতে পারছ না আমি সত্যি বলছি নাকি মিথ্যা।

সবাই জানে যে ব্রাদাররা ধূলোয় মিশে গেছে।

একটা চাতুরি। অজানা শত্রুই সবচেয়ে বড় শত্রু।

একটা ছোটমত ধাক্কা খেল খুনি, এখনো টিকে আছে ব্রাদারহুড?

চিরকালের চেয়ে অনেক বেশি গোপনে। যা তুমি দেখতে পাও, তার সবখানেই আমাদের মূল প্রবেশ করেছে সংগোপনে... এমনকি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রুর অজেয় কেল্লাতেও।

অসম্ভব। তাদের কোন ছিদ্র নেই।

আমাদের হাত অনেক লম্বা।

কারো হাত এত লম্বা নয়।

খুব দ্রুত তুমি বিশ্বাস করবে। ব্রাদারহুডের অপ্রতিরোধ্য এক মহড়া খুব দ্রুত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এমন এক মহড়া যাতে সারা দুনিয়ার লোক কেঁপে উঠবে, সত্যিটা জানতে পারলে।

কী করেছেন আপনারা?

বলল সে।

বড় বড় হয়ে গেল খুনির চোখ। অসম্ভব!

পরদিন সারা দুনিয়ার সংবাদপত্রে একই খবর বেরুল।

বিশ্বাস করল খুনি।

আর এখন, পনেরদিন পর, তার বিশ্বাসের ভিত্তিমূল প্রোথিত হয়ে আছে অনেক অনেক গভীরে। ভাতৃসঙ্ঘ এখনো টিকে আছে, ভাবে সে। আজ রাতে তারা মাথা উঁচু করে তাদের লক্ষ্য সম্পূর্ণ করবে।

সে গর্বিত বোধ করে, তারা তাকে নির্বাচিত করে। একই সাথে এ-ও জানে, সে ছাড়া নির্বাচিত করার মত দক্ষ লোক খুব কমই আছে।

এ পর্যন্ত ঠিক ঠিক সব কাজ করেছে সে। খুন করেছে, জ্যানাসের হাতে তুলে দিয়েছে জিনিসটা। এখন জায়গামত বসানো বাকি।

জায়গামত...

কিন্তু কীভাবে? ভিতরে খুব শক্ত সমর্থন থাকতে হবে। আসলেই, ব্রাদারহুডের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত।

খুনি ভাবে, জ্যানাস একটা কোড নেম।

সে জানে, রোমান এই দুই মুখের দেবতার নাম নিয়ে ভুল করেনি তার চাকরিদাতা। নাকি শনির চাঁদের নামে নাম নিয়েছে? যে জন্যই নামটা নেয়া হোক না কেন, তাতে আর কোন পার্থক্য নেই। লোকটার ক্ষমতা যে অসীম তা ঠিক ঠিক বোঝা হয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে খুনি তার পূর্বপুরুষদের কথা কল্পনা করল। তারা নিশ্চয়ই তার প্রতি স্নেহাশীষ পাঠাচ্ছে। আজ সে তাদের যুদ্ধে নেমেছে। সেই একাদশ শতাব্দি থেকে। একটা শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ আর ঘৃণা পুষে রেখেছে তারা... যখন থেকে ক্রুসেডাররা তাদের ভূমিতে পা রাখে, খুন আর ধর্ষণের বন্যা বইয়ে দেয়, তাদের অপবিত্র ঘোষণা করে, বিলুপ্ত করে দেয় তাদের মন্দির আর ঈশ্বরের চিহ্ন, তখন থেকে।

নিজেদের রক্ষার জন্য তার পূর্বপুরুষরা একটা ছোট কিন্তু ভয়ানক বাহিনী গড়ে তোলে। সারা ভূমি জুড়ে তাদের নাম ছিল রক্ষক–তারা থাকত গোপনে। সংগোপনে। কিন্তু খুন করতে দ্বিধা করত না মোটেও। সামনে যে শত্রুই পড়ুক, খুন হয়ে যেতে বিন্দুমাত্র সময় নিত না। হত্যাকান্ডের জন্যই তারা শুধু বিখ্যাত ছিল না, খ্যাতনামা ছিল অবসর সময় কাটানোর পদ্ধতির জন্যও। তাদের ড্রাগটা ছিল অনেক বেশি বিষাক্ত, নাম ছিল তার হাসিস।

আস্তে আস্তে তাদের বিস্তৃতি যখন ঘটে, নামটাও মুখে মুখে রটে যায়–হ্যাসাসিন।–হাসিসের অনুসরণকারী। আস্তে আস্তে হ্যাসাসিনের সাথে মৃত্যুর একটা যোগসূত্র তৈরি হয়। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটা ভাষায় হ্যাসাসিন মৃত্যুর অপর নাম। এ নামটা আজো পৃথিবীতে প্রচলিত, এমনকি আধুনিক ইংরেজিতেও... কিন্তু খুনের পদ্ধতির সাথে সাথে নামটাও পাল্টে গেছে অনেকটা।

এখন সেটাকে বলা হয় এ্যাসাসিন।

৬

চৌষট্টি মিনিট পরে সূর্যের আলোয় বিধৌত রানওয়ের উপর আছড়ে পড়ে জেটটা। বাইরের খোলা আবহাওয়া একেবারে লা-জবাব। চারপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ আর কালচে পাহাড়, মাথায় তাদের শুভ্র বরফের টোপর।

স্বপ্ন দেখছি আমি, বলল রবার্ট ল্যাঙডন নিজেকে শুনিয়ে, যে কোন মুহূর্তে জেগে উঠব।

সুইজারল্যান্ডে স্বাগতম, বলল পাইলট।

হাতের ঘড়ি দেখে নিল ল্যাঙডন, এখানে সাতটা সাত দেখাচ্ছে।

আপনি ছটা টাইম জোন পেরিয়ে এসেছেন। এখানে এখন মাত্র একটা বেজেছে। দুপুর একটা।

সাথে সাথে ঘড়ি রিসেট করল ল্যাঙডন।

কেমন বোধ করছেন আপনি?

পাকস্থলি চেপে ধরল ল্যাঙডন, যেন আমি এইমাত্র এত্তোগুলো স্টিরোফোম খেয়ে উঠেছি।

নড করল পাইলট, উচ্চতা-অসুখ। আমরা ষাট হাজার ফিট উপরে ছিলাম। সেখানে ওজন কমে যায় ত্রিশভাগ। কপাল ভাল, আমরা কম দূরত্ব পেরিয়ে এসেছি। : যদি টোকিওতে যেতে হত তাহলে আর কোন কথাই নেই। শত মাইল উপরে উঠতে হত।

একটা উষ্ণ নড করে ল্যাঙডন নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করল টোকিও না যেতে হওয়ায়। টেক অফের সময় হাড়ভাঙা ত্বরণের কথা বাদ দিলে এ যাত্রা, যাত্রাটা খারাপ হয়নি। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না সে, এগারো হাজার মাইল প্রতি ঘণ্টা বেগে ঘুরে এসেছে তারা এইমাত্র।

এক্স থার্টি থ্রির যত্ন আত্তি করার জন্য কয়েকজন এগিয়ে গেল রানওয়ের দিকে। পার্কিঙয়ে রাখা একটা কালো পিউগট সিডানে নিয়ে গেল পাইলট তাকে। ভ্যালির ভিতর দিয়ে একটা আঁকাবাকা পথে চলে গেল তারা। মাঝে মধ্যে দু একটা বিল্ডিং দেখা যায়, বাকিটা সবুজ ঘাসে মোড়া।

অবিশ্বাসের সাথে সে দেখল, পাইলট বিনা দ্বিধায় গাড়ির গতি ঘণ্টায় একশো সত্তোর কিলোমিটার তুলে ফেলল।

এই লোকটার সাথে গতির কী সম্বন্ধ? ভেবে পায় না সে।

ল্যাব থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে আছি। সেখানে নিয়ে যাব আপনাকে দু মিনিটের মধ্যে।

সাথে সাথে সিটবেল্টে নিজেকে আরো শক্ত করে গুটিয়ে নেয় সে।

কেন, সময়টাকে তিন মিনিট বানিয়ে নিয়ে আমাদের দুজনকেই সেখানে জ্যান্ত পৌঁছানো যায় না?

গতি বাড়িয়েই চলল গাড়িটা।

টেপ ডেকে একটা ক্যাসেট ঢোকাতে ঢোকাতে জিজ্ঞাসা করল পাইলট, আপনি কি রেবা পছন্দ করেন?

এক মহিলা গাওয়া শুরু করল, এ হল একা থাকার ভয়...

এখানে কোন ভয় নেই, অন্যমনস্কভাবে ভাবে ল্যাঙডন, তার মেয়ে সহকর্মীরা নিশ্চিন্তে বলে বেড়ায় যে,বাড়ীর সারাটা জায়গাকে একেবারে জাদুঘর বানিয়ে রাখাটা, আসলে একটা ছলনা। যেন খালি খালি না লাগে, সেই চেষ্টা।

হেসে উড়িয়ে দিত ল্যাঙডন সেসব কথা। তার জীবনে এরই মধ্যে তিনটা ভালবাসা দানা বেঁধেছে, সিম্বলজি, ওয়াটারপোলো আর কৌমার্য।

তার জীবনে ফিরে এসেছে আনন্দ, সে চাইলেই দুনিয়া চষে বেড়াতে পারে, করতে পারে যা খুশি। রাতের নিস্তব্ধতায় চাওয়া মাত্র একটা বই হাতে নিয়ে এক গ্লাস ব্র্যান্ডি তুলে নিতে পারে বিনা দ্বিধায়।

আমরা আসলে একটা ছোটখাট মহানগরী, বলল পাইলট, শুধু ল্যাব নয়, আমাদের আছে সুপারমার্কেট, একটা হাসপাতাল এমনকি পুরোদস্তুর একটা সিনেমা।

নড করল ল্যাঙডন। তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

সত্যি বলতে গেলে, আমাদের হাতে আছে এ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় যন্ত্র।

তাই নাকি?

ঠিক তাই। এটা মাটির নিচে, ছতলা নিচে বসানো।

কোন কথা না বলে তাকিয়ে রইল ল্যাঙডন এবারো।

হঠাৎ ঘ্যাচ করে থামিয়ে দিল পাইলট গাড়িটাকে। সামনে লেখা, সিকুরিটে, এ্যারেন্টেজ। এবার হঠাৎ করে সে টের পায় কোথায় আছে এখন।

মাই গড! আমি পাসপোর্ট আনিনি!

পাসপোর্ট একটা বাহুল্য। আমাদের সাথে সুইস সরকারের একটা সমঝোতা আছে।

দেখল ল্যাঙডন, একটা কার্ড এগিয়ে দিল পাইলট। সেন্ট্রি সেটাকে নিয়ে ঢোকায় অথোরাইজেশন ডিভাইসের ভিতর। জ্বলে উঠল সবুজ বাতি।

যাত্রীর নাম?

রবার্ট ল্যাঙডন। বলল পাইলট।

কার অতিথি?

ডিরেক্টরের।

ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে গেল সেন্ট্রির। সে তাকাল সামনের দিকে, একবার তাকাল হাতের লিস্টে, আরেকবার কম্পিউটার স্ক্রিনে। তারপর এগিয়ে এল জানালার কাছে, এঞ্জয় ইউর স্টে, মিস্টার ল্যাঙডন।

এগিয়ে গেল গাড়ি আরো দুশ গজ। সামনে একটা চতুষ্কোণ, অতি আধুনিক স্থাপত্য চোখে পড়ে, কাচ আর স্টিল দিয়ে গড়া। ভবনটার অসাধারণ স্বচ্ছতাদেখে সে যার পর নাই আমোদিত হল। সব সময় ল্যাঙডন স্থাপত্যশৈলির সমঝদার।

দ্য গ্লাস ক্যাথেড্রাল, বলল লোকটা।

গির্জা?

আরে না! এখানে একটা জিনিসই নেই। গির্জা। এখানকার ধর্মের নাম ফিজিক্স। পদার্থবিদ্যাই এখানকার চালিকা শক্তি। যত খুশি ঈশ্বর নাম মুখে আনুন, শুধু কোয়ার্ক আর মেসন সম্পর্কে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখালেই হল।

কোয়ার্ক আর মেসন? কোন বর্ডার সিকিউরিটি নেই? ম্যাক ফিফটিক জেট? কোন নরক থেকে উঠে এসেছে এই লোকগুলো?

সামনের একটা বিশাল কাচের ভবন। সেখানে থেমে জবাব পেয়ে গেল সে।

(সার্ন)

কাউন্সেল ইউরোপিন পুর লা

রিসার্চে নিউক্লিয়ারে

নিউক্লিয়ার রিসার্চ? পুরোপুরি নিশ্চিত সে, অনুবাদ ঠিক ঠিক হয়েছে।

কোন জবাব দিল না ড্রাইভার। এখানেই নামতে হচ্ছে আপনাকে। ডিরেক্টর এখানেই দেখা করছেন।

একজন লোককে হুইল চেয়ারে বসে বেরিয়ে আসতে দেখল ল্যাঙডন। লোকটা এগিয়ে আসছে, চোখে মুখে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ, বয়স হবে ষাটের কোঠার প্রথমদিকে। এখনো শক্ত চোয়াল। এত দূর থেকেও তার চোখ দুটোকে একেবারে নিপ্রাণ বলে মনে হয়। যেন পাথরের টুকরা।

তিনিই সেই লোক?

যাক, আমিও একদিন হব। বলল পাইলট, নির্মল একটা হাসি দিয়ে, শয়তানের কথা আরকী!

এগিয়ে গেল সে লোকটার দিকে। বাড়িয়ে দিল লোকটা কৃশ একটা হাত।
মিস্টার ল্যাংডন? আমি ম্যাক্সিমিলিয়ান কোহলার। ফোনে কথা হয়েছে আমাদের।

ম্যাক্সিমিলিয়ান কোহলার, ডিরেক্টর জেনারেল অব সার্ন, পিছন থেকে তাকে ডাকা হয় কোনিং-কিং। একটা হুইল চেয়ারের সিংহাসনে থেকে সে শক্ত হাতে চালায় সার্নকে।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত লোকটার সান্নিধ্যে থেকেও ঠিক ঠিক বুঝতে পারছে ল্যাঙডন, দূরত্ব বজায় রাখতে ওস্তাদ এই প্রবীণ বিজ্ঞানী।

হুইল চেয়ারের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে রীতিমত ঘেমে নেয়ে উঠতে হচ্ছে ল্যাঙডনকে। এমন চেয়ার সে কস্মিনকালেও দেখেনি। হাজারটা বিদঘুটে যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। একটা মাল্টি লাইন ফোন সেট আছে, আছে পেজিং সিস্টেম, কম্পিউটার স্ক্রিন, এমনকি একটা ছোট, ডিটাচেবল ভিডিও ক্যামেরা।

এ হল কিং কোহলারের মোবাইল কমান্ড সেন্টার।

সার্নের বিরাটাকায় মূল লবিতে প্রবেশ করল ল্যাঙডন একটা যান্ত্রিক দরজা পেরিয়ে।

দ্য গ্লাস ক্যাথেড্রাল, মনে মনে আউড়ে গেল সে, উপরের দিকে তাকিয়ে।

উপর থেকে নীলচে কাচে পড়ছে পড়ন্ত সূর্যের রশ্মি, এগিয়ে আছে একটা অনির্বচনীয় আবহ। বাতাসে পরিচ্ছন্নতার গন্ধ, কয়েকজন বিজ্ঞানী এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের পদশব্দ পাওয়া যায় সব সময়।

এ পথে, প্লিজ, মিস্টার ল্যাঙডন। বলল কোহলারের কণ্ঠস্বর। একেবারে কম্পিউটারাইজড। দ্রুত করুন প্লিজ, মরা চোখ তুলে তাকাল সে ল্যাঙডনের দিকে।

মূল আর্টিয়াম থেকে অযুত হলওয়ে চলে গেছে চারদিকে। প্রতিটায় জীবনের উৎসব।

যে-ই দেখছে কোহলারকে, থমকে যাচ্ছে। তারপর চোখ তুলে তাকাচ্ছে ল্যাঙডনের দিকে। কে লোকটা, যে ডিরেক্টরকে খাচা থেকে বের করে আনল!

আমি বলতে লজ্জা পাচ্ছি যে কখনো সার্নের নামটা পর্যন্ত শুনিনি।

স্বাভাবিক। বেশিরভাগ আমেরিকান মনে করে বিজ্ঞানের আধুনিক সূতিকাগার তাদের দেশ। ইউরোপ নয়। তারা আমাদের এলাকাকে শুধু মাত্র একটা শপিং ডিস্ট্রিক্ট মনে করে। তারা ভুলেই যায়, এখানেই জন্মেছিলেন আইনস্টাইন, গ্যালিলিও, নিউটন।

পকেট থেকে ছবিটা বের করে কাজের কথায় চলে এল ল্যাঙডন, ছবির লোকটা, আপনি কি-

প্লিজ। এখানে নয়। আমি আপনাকে তার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি। হাত বাড়াল সে, মনে হয় জিনিসটা হাতে নিয়ে নেয়াই ভাল।

বিনা বাক্যব্যায়ে ল্যাঙডন তার হাতের ছবিটা তুলে দিল ডিরেক্টরের হাতে।

হঠাৎ বাঁয়ে মোড় নিয়ে কোহলার একটা চওড়া হলওয়েতে ঢুকল যেটা ছেয়ে আছে নানা আকার আর প্রকারের বিচিত্র সব এ্যাওয়ার্ডে। বড় একটার সামনে দিয়ে যেতে যেতে লেখাটা পড়ল ল্যাঙডন।

আর্স ইলেক্ট্রনিকা এ্যাওয়ার্ড
ডিজিটাল যুগে কালচারাল আবিষ্কারের জন্য
পুরস্কারটা যাচ্ছে টিম বার্নার্ড লি এবং সার্নের কাছে
ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব
আবিষ্কারের কারণে

সব সময় ল্যাঙডন ভেবে এসেছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আমেরিকার কীর্তি।

ওয়েবটা, বলছে কোহলার, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে একটু কেশে নিয়ে, এখানে প্রথম তৈরি করা হয় ভিতরের কম্পিউটারের যোগাযোগ যন্ত্র হিসাবে। যাতে যে কোন বিজ্ঞানী সার্নের যে কোন তথ্য পেতে পারে সহজেই। কিন্তু দুনিয়া মনে করে এটা আমেরিকার আবিষ্কার।

কেন সঠিক তথ্যটা জানানো হয় না?

সাধারণ একটা ভুল শোধারাবার গরজ সার্নের নেই। কম্পিউটারের পৃথিবীব্যাপি

কানেকশনের তুলনায় সার্ন অনেক বেশি বড়। আমাদের বিজ্ঞানীরা প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন জাদু দেখায়।

জাদু?

আপনাকে অন্যরকম মনে হচ্ছে। আমার ধারণা ছিল আপনি রিলিজিয়াস সিম্বলজিস্ট। আপনি কি জাদুমন্ত্রে বিশ্বাস করেন না? অলৌকিকে?

আমি অলৌকিকে ঠিক ভরসা রাখি না। এ ব্যাপারে কোন স্থির বিশ্বাস নেই আমার।

সম্ভবত অলৌকিক ভুল শব্দ। আমি আপনার ভাষায় কথা বলতে চাইছিলাম।

আমার ভাষায়? একটু তেতে উঠল ল্যাঙডন, আপনাকে দুঃখ দেয়ার জন্য বলছি, স্যার। আমি রিলিজিয়াস সিম্বলজি স্টাডিকরি-আমি একজন এ্যাকাডেমিক, কোন যাজক নই।

একটু যেন লজ্জা পেল সার্নের ডিরেক্টর, অবশ্যই, কী বোকা আমি! ক্যান্সারের লক্ষণ বিচারের জন্য ডাক্তারের ক্যান্সার রোগি হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

এত স্পষ্টভাবে আগে ভাবেনি ল্যাঙডন ব্যাপারটা নিয়ে।

এগিয়ে যেতে যেতে একটা হলওয়ে ধরে কোহলার বলল, আশা করি আমি আর আপনি পরস্পরকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারব।

কেন যেন কথাটা সত্যি বলে মনে হল না ল্যাঙডনের।

এগিয়ে যেতে যেতে সে টের পেল, সামনে থেকে তাদের পায়ের প্রতিধ্বনি উঠছে। বুঝতে পারল, টানেলের শেষ মাথায় চলে এল। তারপর এমন কিছু দেখল যেটার সাথেঅভিজ্ঞতা খাপ খায় না।

এটা আবার কী?

ফ্রি ফল টিউব। মুক্ত পতন টিউব। এটুকুই বলল কোহলার। যেন আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

আর কোন আগ্রহ দেখাল না ল্যাঙডন। কিন্তু মনে মনে একটু তেতে উঠল। কোহলার লোকটা আর যে পুরষ্কারই পাক না কেন, আতিথেয়তার জন্য কোন উপহার সে পাবে না।

আমার কী! ভাবে সে। আমি এখানে এসেছি অন্য কোন কারণে। ইলুমিনেটি।

এখানেই কোথাও একটা খুন হয়ে যাওয়া দেহ পড়ে আছে। এটা চোখের নজরে দেখার জন্য সে পেরিয়ে এসেছে তিন হাজার মাইল।

প্রফেসর রবার্ট ল্যাঙডন এক জীবনে কম বস্তু দেখেনি। কম বিস্মিত হয়নি। কিন্তু এখন যা দেখতে পেল তার কোন ব্যাখ্যা আপাতত নেই। একটা কাচের ঘরের চারধারে দর্শকদের সারি। ভিতরে কয়েকজন লোক ওজনশূণ্যভাবে ভেসে আছে। তিনজন। একজন হাত নাড়ল ভিতর থেকে।

মাই গড! ভাবে সে, আমি রূপকথার রাজ্যে চলে এসেছি।

রুমের ফ্লোরটা একেবারে নিখুঁত। সেখানে পাতলা একটা আবরণ আছে যেন পড়লেও খুব বেশি আঘাত না পায় লোকে। তার নিচে আছে একটা দানবীয় প্রোপেলার।

ফ্রি ফল টিউব, বলল কোহলার আবার। ইনডোর স্কাই ডাইভিং। ক্লান্তির হাত থেকে বেঁচে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার জন্য ব্যবস্থাটা করা হয়েছে। নিচে আছে কৃত্রিম উইন্ড টানেল।

একজন মহিলা ভিতর থেকে হাসি দিল। এগিয়ে আনল তার বুড়ো আঙুল। দেখাল সেটা। ভেবে পায় না ল্যাঙডন, এই মহিলা কি জানে এ প্রতীক ছিল আসলে প্রাচীণ ফ্যালিক ঐতিহ্যে এবং এ দিয়ে পুরুষের কদর্যতা প্রকাশ করা হয়।

মহিলাটি একটু মোটাসোটা। তাই ঘরের আর সবাই প্যারাস্যুট ছাড়াই ভাসলেও সে একটা বেবি স্যুট পরে আছে। বোঝাই যায় মোটা মানুষের জন্য এগুলো দরকার ফ্রি ফল ডাইভে।

ব্যাপারটা যে এই রাতেই, শত শত কিলোমিটার দূরের কোন এক দেশে তার জীবন রক্ষা করবে তা সে এখন বুঝতেও পারছে না।

যখন কোহলার সার্নের মূল কমপ্লেক্সের পিছন দিয়ে বেরিয়ে এল, তাদের চোখে আঘাত করল সুইজারল্যান্ডের সূর্যের আলো। চারধারে সবুজ ঘাসের ভিতর দিয়ে পায়চলা পথ। সুন্দর সুন্দর লন। দুজন হিপ্পি ফ্রিসবি ছোড়াছুড়ি করছিল একে অপরের দিকে। শুনছিল মাহলারের ফোর্থ সিম্ফনি।

এখানে চারটে রেসিডেন্সিয়াল ডর্ম আছে, এগিয়ে যেতে যেতে বলল কোহলার, এখানে তিন হাজারেরও বেশি ফিজিসিস্ট আছেন। সার্ন একাই পৃথিবীর বেশিরভাগ পার্টিকেল ফিজিসিস্টকে চাকরি দেয়। পৃথিবীর বুকের সবচেয়ে মেধাবী মুখগুলোকে–জার্মান, জাজল, ইতালিয়, ডাচ, নানা ভাষার, নানা দেশের মানুষ পাঁচশতাধিক ইউনিভার্সিটি আর ষাটটার উপর দেশ থেকে আমাদের পদার্থবিদরা এসেছেন।

আপনারা সবাই যোগাযোগ করেন কী করে?

ইংরেজি, অবশ্যই, বিজ্ঞানের সর্বগামি ভাষা।

ল্যাঙডন জানত গণিত হল বিজ্ঞানের সর্বগামি ভাষা। কিন্তু যুক্তি দেখানোর মত এনার্জি নেই তার। এগিয়ে গেল সে ডিরেক্টরের পিছন পিছন।

নিচে একটি লোক জগিং করছিল। তার গেঞ্জিতে লেখা, নো গ্যাট, নো গ্লোরি।

গ্যাট?

জি ইউ টি। জেনারেল ইউনিফাইড থিওরি। জাগতিক, এবং অজাগতিক সব ব্যাপারকে এক সূত্রে গাঁথার তত্ত্ব।

আই সি! সবজান্তার ভাব নিল ল্যাঙডন, বুঝল না কিছুই।

আপনি কি পার্টিকেল ফিজিক্স সম্পর্কে জানেন, মিস্টার ল্যাঙডন?

আমি জেনারেল ফিজিক্স সম্পর্কে একটু একটু জানি। পড়ন্ত বস্তু আরও কী সব যেন... সে সব সময় জলে হাই জাম্প করে। গতি বাড়ার হার বা তৃরণ দেখে দেখে। সে পদার্থবিদ্যাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। কণা-পদার্থবিদ্যা হল আণবিক বিদ্যা, তাই নয় কি?

মাথা নাড়াল কোহলার, আমরা যা নিয়ে কাজ কারবার করি তার কাছে একটা পরমাণু হল একেবারে গ্রহের সমান। আমাদের আগ্রহ পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ব্যাপারে। কেন্দ্রবিন্দু। পুরো পরমাণুর দশ হাজার ভাগের একভাগ এলাকা। সার্নের হাজার হাজার মেধাবী মুখ এখানে একত্র হয়েছে সেই প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য,যার পিছনে ছুটছে তারা অনন্তকাল ধরে। যে রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে মানুষ নিয়েছে নানা সংস্কার আর ধর্মের আশ্রয়। আমরা কী দিয়ে গড়া?

এই সব প্রশ্নের উত্তর একটা পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণাগারে পাওয়া যাবে?

মনে হয় অবাক হলেন?

আমিও তাই হয়েছি। উত্তরটা আত্মিক নয় কি?

মিস্টার ল্যাঙডন, এককালে সব প্রশ্নের উত্তরই ছিল আধ্যাত্মিক। বিজ্ঞান যেটাকে বুঝতে পারেনি,সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি সে প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য এগিয়ে এসেছে ধর্ম, আদ্যিকাল থেকে। সূর্য আর চন্দ্রের ওঠানামা এককালে দেবতা হেলিওসের অগ্নিরথের সাথে যুক্ত ছিল। পোসাইডনের জন্যই হত ভূমিকম্প আর জলোচ্ছ্বাস। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, সেসব ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। আস্তে আস্তে প্রমাণিত হবে কোন ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব কোনকালে ছিল না। বিজ্ঞান এর মধ্যে মানুষের করার মত প্রতিটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে বসেছে। আর মাত্র কয়েকটা প্রশ্ন বাকি। এবং এগুলোই সবচেয়ে বেশি অবাক করা। কোত্থেকে এলাম আমরা? কী করছি এখানে? জীবন আর এ সৃষ্টিজগতের মানে কী?

বিস্ময় লুকানোর চেষ্টা করল না ল্যাঙডন, আর এসব প্রশ্নের জবাব-ই দেয়ার চেষ্টা করছে সার্ন?

ঠিক করে নিতে হবে কথাটা। চেষ্টা করছি না শুধু, জবাব দিচ্ছিও।

এগিয়ে যেতে যেতে দুজন লোককে ফ্রিসবি খেলতে দেখল তারা। তাদের একজন

ফ্রিসবি ছুড়ে মারলে সেটা সোজা এসে পড়ে তাদের সামনে। কোহলার না দেখার ভাণ করল।

আওয়াজ উঠল সেদিক থেকে, সিল ভৌস প্লেট!

তাকাল ল্যাঙডন সেদিকে। একজন শুভ্র কেশের বুড়ো লোক পরে আছে সোয়েট শার্ট, হাত নাড়ছে তার দিকে। ছুড়ে মারল সে ফ্রিসবিটা। কৃতজ্ঞতায় আঙুল দেখাল লোকটা। চিৎকার করে বলল, মার্সি!

অভিনন্দন! বলল কোহলার, আপনি এইমাত্র একজন নোবেল বিজয়ীর দেখা পেলেন। জর্জ চারপ্যাক। তিনি মাল্টিওয়্যার প্রোপোর্সনাল চেম্বারের আবিষ্কারক।

নড করল ল্যাঙডন। আজ দিনটাই আমার জন্য শুভ।

জায়গামত পৌঁছতে আরো তিন মিনিট লেগে গেল। সেখানে একটা বিলাসবহুল ডর্মিটরি দেখা যাচ্ছে। আর অন্য গুলোর তুলনায় সুন্দর। লেখা, বিল্ডিং সি।

এর স্থাপত্য রক্ষণশীল এবং কঠিন।

একজোড়া মার্বেলের কলামের পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা দেখতে পায় কেউ একজন লিখেছে কী যেন।

এই কলামগুলো আয়নিক

আমি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত যে বড় বড় মেধাবী ফিজিসিস্টরাও ভুল করে।

কী বলতে চান আপনি?

এই নোটটা যেই লিখে থাক না কেন, একটা ছোট্ট ভুল করে ফেলেছে। এ কলামটা আয়নিক নয়। আয়নিক কলামগুলোর আকৃতি একেবারে এক রকম। এটা ডোরিক–গ্রিক ঐতিহ্য। এ ভুলটা অনেকেই করে।

হাসল না কোহলার, কথাটা ঠাট্টা করে লিখেছে যেই লিখে থাকুক। আয়নিক মানে আয়ন সম্পন্ন। বেশিরভাগ পদার্থেই আয়ন থাকে। ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আয়ন থাকতেই পারে।

সাথে সাথে পিছনের কলামটার দিকে চোখ তুলে আরেকবার তাকাশ ল্যাঙডন।

***

একটা লিফট বেয়ে উঠে পায়চলা পথে এসেও, সে মনে মনে নিজেকে বেকুব ঠাউরে রেখেছে। সামনের সাজসজ্জা চমকে দিল তাকে। ফ্রান্সের কলোনিয়াল যুগের আদল। একটা ফ্লাওয়ার ভাস আছে, আছে চেরি ডিভান।

আমরা আমাদের বিজ্ঞানীদের একটু আরামে রাখতে ভালবাসি। ব্যাখ্যা করল কোহলার।

তার মানে ছবির লোকটা এখানেই থাকে? আপনার আপার লেভেল এমপ্লয়ি?

অনেকটাই। আজ সকালে আমার সাথে একটা মিটিং ছিল, সেটাকে মিস করে সে। তারপর আমার পেজেরও কোন জবাব দেয় না। আমি নিজে উঠে আসি এখানে, তারপর তার লিভিঙরুমে মরদেহ দেখতে পাই।

একটা লাশ দেখবে ভেবেই ভিতরে পাক দিয়ে উঠল ল্যাঙডনের। কী করে যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি লাশ কাটাছেঁড়া করে, তারপর মানুষের দেহ আঁকত,খোদায় মালুম।

এগিয়ে গেল তারা, তারপর দেখতে পেল একটা লেখা!

লিওনার্দো ভেট্রা

লিওনার্দো ভেট্রা! বলল কোহলার, আগামি সপ্তাহে তার আটান্ন হবার কথা ছিল। আমাদের কালের সবচেয়ে মেধাবী বিজ্ঞানীদের অন্যতম ছিলেন তিনি। তার মৃত্যু বিজ্ঞানের জন্য এক অপুরণীয় ক্ষতি।

এক মুহূর্তের জন্য মনে হল কোহলারের মুখাবয়বে ব্যাথার একটা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। যত দ্রুত ব্যাপারটা এসেছিল তত দ্রুতই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বড় চাবির রিঙ বের করল লোকটা।

একটা চিন্তা হঠাৎ পাক খেয়ে উঠল ল্যাঙডনের মনে। এ বিল্ডিংটায় আর কেউ নেই।

কোথায় গেল সবাই?

ল্যাবে।

আমি বলছি, পুলিশ... তারা কি এরমধ্যেই চলে গেছে?

পুলিশ?

অবশ্যই, পুলিশ। আপনি আমাকে একটা হত্যাকান্ডের ছবি পাঠিয়েছেন। অবশ্যই পুলিশকে ডাকার কথা।

আমি অবশ্য তেমন কিছুই করিনি।

কী?

কোহলারের ধূসর চোখ একটু সূক্ষ্ম হয়ে উঠল, পরিস্থিতি অনেক জটিল, মিস্টার ল্যাঙডন।

কিন্তু অবশ্যই কেউ না কেউ এ ব্যাপারটা সম্পর্কে জানে...

জানে, লিওনার্দোর পালক কন্যা। সেও সার্নের একজন পদার্থবিজ্ঞানী। সে আর তার বাবা একটা ল্যাব শেয়ার করে। তারা পার্টনার। ফিল্ড রিসার্চের জন্য মিস ভেট্রা এ সপ্তাহে বাইরে আছে। আমি তার বাবার মৃত্যুসংবাদ দিয়েছি। আসছে সে যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি। কথা বলতে বলতেই এসে হাজির হবে।

কিন্তু একজন মানুষ খুন হয়ে–

একটা ফরমাল ইনভেস্টিগেশন ঠিকই করা হবে। আর একই সঙ্গে লিওনার্দো আর তার মেয়ের ল্যাবে যাব আমরা। এই একটা ব্যাপারকে সবার থেকে আলাদা করে রেখেছে তারা। এজন্যই মিস ভেট্রা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি।

কোহলার চাবি ঘোরাল।

ল্যাঙডনের মুখে সাথে সাথে একটা বরফ শীতল বাতাস লাগল।সে যেন ফিরে গেছে। সারা ঘর ছেয়ে আছে থিকথিকে কুয়াশায়। আর কী ঠান্ডা!

কী ব্যাপার... বলতে পারল না বাকি কথাটা ল্যাঙডন।

ফ্রিয়ন কুলিং সিস্টেম। জবাব দিল কোহলার, মৃতদেহটা রক্ষা করার জন্য পুরো ঘরকে শীতল করতে হয়েছে।

কী ধাঁধায় পড়লাম আমি! ভেবে পায় না ল্যাঙডন।

৯

নীলচে কালো হয়ে আছে লিওনার্দো ভিট্রার মরদেহ। সারা গায়ে কোন আবরণ নেই। মাথাটা একেবারে পিছনদিকে ফিরানো। নিজের জমে যাওয়া প্রস্রাবের মধ্যে পড়ে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক বিজ্ঞানী। তার যৌনাঙ্গের রোমগুলো পর্যন্ত শক্ত হয়ে আছে।

বিভ্রান্ত হয়ে ল্যাংডন দৃষ্টি দেয় লোকটার বুকের দিকে। যদিও কয়েক ডজন বার সে ছবিটা দেখেছে, তবুও বুকের পোড়া চিহ্নটা দেখে ল্যাংডনের মনকেমন যেন করে উঠল। তার বুকে একটা নিখুত সিম্বল জুড়ে আছে।



চারপাশে একবার ঘুরে এল ল্যাংডন। না, অন্যদিক থেকেও লেখাটা একই রকম।

মিস্টার ল্যাংডন?

শুনতে পায়নি ল্যাংডন। অন্য কোন এক জগতে চলে গেছে সে... তার জগৎ...তার ভুবন, যেখানে ইতিহাস, মিথ, পুরাণ, আর সত্যি মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

মিস্টার ল্যাংডন?

এবারও চোখ তুলে তাকাল না সে। আপনারা কতটুকু জানতে পারলেন এ পর্যন্ত।

আপনার ওয়েবসাইট পড়ে যেটুকু জানতে পারলাম, ব্যস, এটুকুই। ইলুমিনেটি শব্দের মানে আলোকিত ব্যাক্তি। এটা কোন এক প্রাচীণ ব্রাদারহুডের নাম।

আপনি কি আগে নামটা শুনেছেন?

মিস্টার ভেট্রার বুকে দেখার আগে নয়।

তার মানে আপনি এর উপর একটা ওয়েব সার্চ চালালেন?

হ্যাঁ।

সাথে সাথে শব্দটার শত শত রেফারেন্স চলে এল, তাই না?

হাজার হাজার।বলল কোহলার, আপনারটায় হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড আর পরিচিত প্রিন্টারের নাম ছিল। আপনারটাই সবচেয়ে বেশি তথ্যবহুল বলে মনে হল।

এখনো ল্যাংডন চোখ ফিরাতে পারছে না মৃতদেহটা থেকে।

এরচেয়ে বেশি কিছুই বলল না কোহলার। যেন অপেক্ষা করছে ল্যাংডন আরো কিছু বলে এর উপর। একটা সুরাহা হবে রহস্যের।

কোন উষ্ণতর জায়গায় বসে এ নিয়ে কথা বললে কেমন হয়? জিজ্ঞাসা করল ল্যাংডন।

এ ঘরটা তো মন্দ নয়। এখানেই কথা বলছি আমরা।

ভেবে পায় না সে, কোথা থেকে শুরু করে। ইলুমিনেটির কাহিনী সরল নয়। এতে হাজারটা বাঁক আছে, আছে অনেক মোড়। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি ঘেমে নেয়ে উঠব।

ইলুমিনেটির সেই বিখ্যাত সিম্বলের কথা সব সিম্বলজিস্ট জানলেও, কেউ আসলে স্বচক্ষে দেখেনি এটাকে। আদ্যিকালের বইগুলোয় এটাকে এ্যাম্বিগ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এ্যাম্বি মানে উভয়, বোঝা যায়, এটাকে উপর নিচ দু দিক দিয়ে একই ভাবে পড়া যাবে।

স্বস্তিকা, য়িন ইয়াঙ, ইহুদিদের তারকা, সরল ক্রস–সবই এক একটা এ্যাম্বিগ্রাম। আধুনিক কালের সিম্বলজিস্টরা এই ইলুমিনেটি শব্দটাকে এ্যাম্বিগ্রামে বসাতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়েছে।

কেউ পারেনি। ফলে আধুনিক সিম্বলজিস্টরা মনে করে এটা আসলে একটা মিথ।

তাহলে? ইলুমিনেটি কারা?

তাইতো! কারা?

শুরু করল ল্যাংডন তার গল্প।

ইতিহাসের শুরু থেকে, ব্যাখ্যা করছে ল্যাংডন, বিজ্ঞান আর ধর্মের মধ্যে একটা গভীর রেষারেষি ছিল। কোপার্নিকাসের মত বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা–

খুন হয়ে গিয়েছিলেন। নাক গলাল কোহলার, সায়েন্টিফিক ট্রুথ উদ্ধারের দায়ে চার্চের কোপানলে পড়েছিলেন। ধর্ম সব সময় বিজ্ঞানের পিছু ধাওয়া করে চলে।

ঠিক তাই। কিন্তু যোড়শ শতকে একদল লোক গির্জার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়। ইতালির সবচেয়ে আলোকিত লোকগুলো–পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ, এ্যাভেট্রানোমার সবাই একত্রে গোপনে দেখা করতে শুরু করেন। চার্চের একমাত্র সত্যি সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানকে অবলীলায় পদদলিত করছে। বিজ্ঞান সত্যিকার সত্যিকে তুলে আনতে পারছিল না। তারা পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানমনস্ক ব্যাক্তি, যা একত্র হয়, নাম নেয় আলোকিত।

দ্য ইলুমিনেটি।

তাই। ইউরোপের সবচেয়ে জ্ঞানী গুণী লোকগুলো... একত্র হয় বৈজ্ঞানিক সূত্র রক্ষার কাজে, বিজ্ঞানকে ধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে।

একেবারে চুপ মেরে গেল কোহলার।

অবশ্যই, হন্যে হয়ে তাদের খুঁজে বেড়ায় চার্চ। যেখানে যেভাবে পায়, হত্যা করে। অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে বিজ্ঞানীরা নিজেদের রক্ষা করে। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ইলুমিনেটি। ইউরোপ তার সূতিকাগার। সেখানকার সবচেয়ে ডাকসাইটে জ্ঞানী লোকগুলো একত্র হয়। এক অতি গোপনীয় এলাকায় তারা একত্র হয়। রোমের কোথাও। নাম তার চার্চ অব ইলুমিনেশন।

এখনো চুপ করে আছে ডিরেক্টর।

ইলুমিনেটির বেশিরভাগ লোক চায় গির্জার বিরুদ্ধে লড়তে। কিন্তু তারা ছিল মধ্যমপন্থী। আর তাদের বাধা দেয় একজন। বিশ্বের সবচেয়ে দামি মানুষগুলোর একজন।

ল্যাংডন আশা করে এবার নামটা না বলতেই বুঝে ফেলবে কোহলার। এ এমন এক মানুষ, যাকে নিয়ে মিথের অন্ত নেই, যার আবিষ্কারের কোন তুলনা নেই। যিনি বড়াই করে ভোলা মনে প্রথমবার বলতে পেরেছিলেন, পৃথিবী নয়, আমাদের চেনা সৃষ্টি জগতের কেন্দ্র সূর্য। যদিও তিনি সোজা বলে দিতে পারতেন, তবু একটু ঘুরিয়ে বলেন। বলেন, ঈশ্বর তার সৃষ্টি জগতের কেন্দ্রে না রেখে মানুষকে একটু দূরে স্থাপন করেছেন।

নাম তার গ্যালিলিও গ্যালিলি। বলল ল্যাংডন অবশেষে।

চোখ তুলে তাকাল কোহলার, গ্যালিলিও?

হুঁ। গ্যালিলিও ছিলেন একজন ইলুমিনেটাস। বলা ভাল ইলুমিনেটির জ্ঞানগুরু। তিনি একই সাথে ছিলেন একজন নেবেদিতপ্রাণ ক্যাথলিক। তিনি বিজ্ঞানের উপর থেকে ধর্মের, বিশেষ করে খ্রিস্টবাদের রোষ কষায়িত দৃষ্টি সরানোর জন্য বললেন, বিজ্ঞান ঈশ্বরের উপস্থিতি অস্বীকার করে না।

এমনকি সবার মনকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য বলেছেন, টেলিস্কোপে করে বিভিন্ন গ্রহ দেখার সময় শুনতে পেয়েছেন ঈশ্বরের জয়গান। বলতেন, বিজ্ঞান আর ধর্ম শত্রু নয়, বরং পরস্পরের বন্ধু। বিজ্ঞান আর ধর্ম একই কথা দু পথে বলে। সমতার গল্প...

স্বর্গ আর নরক, রাত আর দিন, উষ্ণতা আর শীতলতা, ঈশ্বর আর শয়তান। বিজ্ঞান আর ধর্ম একই কথার জয়জয়কার করে যায়, ঈশ্বর আর খারাপের পার্থক্য, আলো আর আঁধারের পার্থক্য...

হুইল চেয়ারে বসে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে কোহলার।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, চার্চ কখনো চায়নি ধর্মের সাথে বিজ্ঞান মিশে যাক।

অবশ্যই নয়, এবার বলে উঠল কোহলার, তা হয়নি বলে কল্যাণ হয়েছে। বিজ্ঞান ধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছে। এর সাথে খ্রিস্টবাদ মিলে যেতে পারেনি। কিন্তু তেতে উঠল চার্চ। গ্যালিলিওকে বিচারের সম্মুখীন করল, সাব্যস্ত করল দোষী, বন্দি করে রাখল বাসায়। সায়েন্টিফিক হিস্টোরি সম্পর্কে ভালই জানি, মিস্টার ল্যাঙডন। কিন্তু এ সবই মধ্যযুগের কথা। কয়েক শতাব্দি আগের কথা। এর সাথে লিওনার্দো ভেট্রার কী সম্বন্ধ?

মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন।

গ্যালিলিওর আটকে থাকাতে তেতে উঠল ইলুমিনেটি। ছোট কোন ভুল করে বসল। চার্চ পেয়ে গেল চার ইলুমিনেটি বিজ্ঞানীকে। ধরে আনল তাদের, করল জিজ্ঞাসাবাদ। এমনকি সেই চারজন কোন কথাই বলল না–সয়ে গেল নরক যন্ত্রণা।

নরক যন্ত্রণা?

নড করল ল্যাঙডন, জীবিত অবস্থায় তাদের বুকে ছাপ মেরে দেয়া হয়। একটা ক্রুসের সিম্বল।

বড় বড় হয়ে গেল কোহলারের চোখ।

তারপর সে বিজ্ঞানীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। তাদের মৃতদেহ ফেলে রাখা হয় রোমের পথে পথে। যারা ইলুমিনেটিতে যোগ দিতে চায় তাদের সামনে পরিবেশন করা হয় হুমকি। চার্চের অব্যাহত চাপের মুখে ইতালি থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় ইলুমিনেটি।

ইলুমিনেটি চলে যায় একেবারে আন্ডারগ্রাউন্ডে। ক্যাথলিকদের হাতে হেনস্থা হওয়া অন্য গ্রুপগুলোর সাথে তাদের মিশে যাবার প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন থেকেই। মিস্টিক, এ্যালকেমিস্ট, অকাল্টিস্ট, মুসলিম, ইহুদি। বছরের পর বছর ধরে ইলুমিনেটি দল ভারি হতে থাকে।

এক নূতন ইলুমিনেটির উদয় হয়। অন্ধ ইলুমিনেটি। এক গভীর, হিংস্র ইলুমিনেটি, খ্রিস্টবাদ বিরোধী ইলুমিনেটি। তারা অপেক্ষা করতে থাকে, শক্তি জড়ো করতে থাকে, এগিয়ে যাবার প্রেরণা একত্র করতে থাকে, ক্যাথলিক চার্চের উপর প্রতিশোধ নেয়ার বাসনা তাদের অন্তরে। একদিন উঠে আসবে তারা। তাদের শক্তি এত বেড়ে যায় যে গির্জা তাদেরকে পৃথিবীর একক, সর্ববৃহৎ এন্টি-ক্রিশ্চিয়ান দল হিসাবে বিবেচনা করতে শুরু করে। ভ্যাটিকান এবার ঘোষণা করে ইলুমিনেটিতে একটা শাইত্বোয়ান হিসাবে।

শাইত্বোয়ান?

শব্দটা ইসলামি। এর মানে শত্রু। ঈশ্বরের শত্রু। চার্চ অমান্যকারী ইসলামকেই বেছে নিল কারণ এ ধর্মের ভাষা আর সব ব্যাপারকেই তারা চরম নোংরা বলে মনে করত। শাইত্বোয়ান হল ইংরেজি শব্দ স্যাটানের মূল।

কোহলারের চেহারায় ফুটে উঠল অস্বস্তি।

আরো বেড়ে যাচ্ছে ল্যাঙনের কণ্ঠের তেজ, মিস্টার কোহলার, আমি জানি না কী করে এই চিহ্ন এ লোকের বুকে এল। কিম্বা কেন এল। কিন্তু আপনি তাকিয়ে আছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর ক্ষমতাবান আন্ডারগ্রাউন্ড শয়তানি সংঘের প্রতীকের দিকে।

১০.

গলিটা একদম সরু, জনশূণ্য। দাঁড়িয়ে আছে হ্যাসাসিন। তার কালো চোখ চকচক করছে কী এক অজানা লালসায়। সে জায়গা মত এগুনোর সাথে সাথে জ্যানাসের শেষ কথাগুলো কানে বেজে ওঠে। পরের ধাপ শুরু হতে যাচ্ছে। একটু আয়েশ করে নাও।

ঘুমের অভাব আছে হ্যাসাসিনের চোখে। কিন্তু তার পূর্বপুরুষরা একবার কোন যুদ্ধে নেমে পড়লে ঘুম কাকে বলে বুঝত না। এ যুদ্ধ ঠিক ঠিক শুরু হয়ে গেছে। আর সে প্রথম রক্তপাতের কাজটা করতে পারছে। এখন কাজে ফিরে যাবার আগে, মৌজ করার মতহাতে দু ঘণ্টা সময় আছে।

ঘুম? রিল্যাক্স করার আরো ভাল কত পথ যে আছে...

হাসিস? না। পূর্বপুরুষের মত কোন ড্রাগ নেবে না সে। তারচেয়ে অনেক আনন্দদায়ক উৎস আছে আশপাশে। নিজের শরীর নিয়ে গর্বিত সে। গর্বিত খুন করার ক্ষমতা নিয়ে।

গলির পথ ধরে একটা দরজায় হাজির হয় সে। সেখানে ডোরবেল বাজিয়ে ভিতরে ঢোকে।

স্বাগতম! সুন্দর পোশাক পরা রমণী তাকে অভ্যর্থনা জানায়।

একটা ছবির এ্যালবাম তুলে দেয় আধো আলো ছায়াতে। মহিলা বলে, মন স্থির হলে আমাকে রিঙ করলেই চলবে।

হাসল হ্যাসাসিন।

যদিও জানি,তারা ক্রিসমাস উপভোগ করে না। কিন্তু সে আশা করে, এখানে কোন এক খ্রিস্টান বালিকা অপেক্ষা করবে তার জন্য। ভিতরের ছবিগুলো দেখতে দেখতে তার শরীর জেগে ওঠে। এ জীবন উপভোগ করার মত ছবি ভেসে ওঠে সামনে।

মারিসা, ইতালিয় দেবী।

ফিয়েরি, তরুণী সোফিয়া লরেন।

সাকহিকো, জাজল পুতুল।

লিথ, কোন সন্দেহ নেই, পাকা।

কানারা, সুন্দর, পেশীবহুল, আদিরসাত্বক।

দুবার পুরো এ্যালবাম চষে দেখল সে। তারপর টেবিলের পাশের বোতামে চাপ দিল। এগিয়ে এল সেই মহিলা, বলল, ফলো মি।

এগিয়ে গেল সে। চাহিদা মত সব ব্যাপার ঠিকঠাক করতে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হল তাকে। তারপর এগিয়ে গেল সামনের দিকে। একটা সুন্দর হলওয়ে।

শেষের সোনালি দরজা। তোমার স্বাদ দামি।

ঠিক।

একটা চিতা যেভাবে বুভুক্ষু থেকে থেকে অবশেষে শিকারের সন্ধান পায়, যেভাবে এগিয়ে যায়, সেভাবে এগোয় সে।

দরজায় ধাক্কা দেয়। খুলে যায় সেটা।

যখন সে তার সিলেকশন দেখতে পায়, চোখের সামনে খুলে যায় চিন্তার ভাঁজ।, ভুল হয়নি। তার অনুরোধ মত সাজানো আছে মেয়েটা... নগ্ন, উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, পুরু ভেলভেটের কর্ড দিয়ে স্ট্যান্ডের সাথে বাঁধা দু হাত।

ঘরটা কোনক্রমে পেরিয়ে যায় সে। তারপর হাত রাখে নগ্ন, উত্তেজক নিম্নাঙ্গে, পিছন থেকে। আমি কাল রাতে খুন করেছি একটা। আর তুমি আমার পুরস্কার।

শয়তানি? ভেবে পায় না কোহলার কী বলবে, এটা কোন শয়তানি সংঘের প্রতীক?

এতক্ষণে ঘরটাকে একটু উষ্ণ মনে হয় ল্যাংডনের। ইলুমিনেটি শয়তানি সংঘ ছিল ঠিকই। কিন্তু এখনকার বিবেচনায় নয়, আমরা শয়তানি সংঘ বলতে যা বুঝি তেমন নয়।

মানুষ শয়তানি সংঘ বলতে বোঝে কিম্ভুত সাজ-পোশাকের কিছু মানুষকে যারা শয়তানের পূজা করে আর বিচিত্র জীবন যাপন করে। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন নয়। চার্চ যাকে শয়তানি সংঘ বলে ঘোষণা করে তা তেমন হবে এমন কথা নেই। এ সম্পর্কে একটা ভীতি জুড়ে দেয়াই গির্জার আসল উদ্দেশ্য। শাইত্বোয়ান।

শয়তানি সংঘগুলো শয়তানের পূজা করে, আরাধনা করে, পশু বলি দেয়, রক্তপান করে, নেশা করে, ব্ল্যাক ম্যাজিক করে, পেন্টাগ্রাম ধারণ করে, এসবই চার্চের প্রচারণা। কিছু সত্যি যে নেই তা নয়। কিন্তু এসব খাটে না ইলুমিনেটির ব্যাপারে।

মানুষ চার্চের কথা আস্তে আস্তে বিশ্বাস করতে থাকে। ত্যাগ করতে থাকে ইলুমিনেটিকে এবং এমন সব সংঘকে। সফল হয় চার্চের উদ্দেশ্য।

এ সবই পুরনো কাহিনী। আমি জানতে চাই এখানে কী করে এই সিম্বলটা এল!

একটা গভীর শ্বাস নিল ল্যাংডন, গ্যালিলিও সমতা ভালবাসতেন। যে কোন ক্ষেত্রে। তার সেই অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েই ইলুমিনেটির কোন এক অজানা কিন্তু বিখ্যাত শিল্পী এই প্রতীকটা আবিষ্কার করেন। এই ডিজাইনটাকে ইলুমিনেটি গুপ্ত রেখেছে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে। তাদের একটা আশা ছিল, একদিন তারা শক্তি অর্জন করবে, সেদিন সগর্জনে বেরিয়ে আসবে। সেদিনই প্রথম দেখা যাবে তাদের সিম্বল। অর্জন করবে ফাইনাল গোল।

তার মানে, এই প্রতীকটা বলছে যে ইলুমিনেটি ব্রাদারহুড এবার বেরিয়ে আসবে?

ব্যাপারটা এক কথায় অসম্ভব। ইলুমিনেটির আরো একটা অধ্যায় থেকে যাচ্ছে যার ব্যাখ্যা আমি করিনি।

আলোকিত করুন আমাকে।

হাতের তালু একত্র করল ল্যাংডন, মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছে, যা লিখেছে এবং যা জানে, একত্র করছে সে, ইলুমিনেটি টিকে গিয়েছিল, রোমের বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে তারা সারা ইউরোপ চষে বেরিয়েছে। একটা নিরাপদ স্থানের খোঁজে। কালক্রমে তারা আরো একটা সিক্রেট সোসাইটির সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। নাম তার ফ্রি-মেসন।

দ্য মেসনস?

মেসনদের সদস্য আধকোটিরও বেশি সারা পৃথিবীতে। অর্ধেক আছে আমেরিকায়, আর এক মিলিয়ন ইউরোপে।

মেসনরা আর যাই হোক, শয়তানি সংঘ নয়। বলল কোহলার।

অবশ্যই নয়। তাদের দলে বিজ্ঞানীদের যুক্ত করে নিয়ে মেসনরা একটা ছদ্ম আবরণ এনে দিল ইলুমিনেটির জন্য। এটাই প্রয়োজন ছিল। আস্তে আস্তে পরজীবীর মত একে একে এর বড় বড় পোস্টগুলো দখল করে নেয় ইলুমিনেটি। সবার অজান্তে। সেই সতেরশ সাল থেকে। একটা সোসাইটির ভিতরে গজিয়ে ওঠে অন্য সিক্রেট সোসাইটি। মূল আদর্শে তারা একই রকম। শুধু ইলুমিনেটির লক্ষ্য ধ্বংস বয়ে আনা। তাদের আদর্শ আস্তে আস্তে ভর করে মেসনের উপর।

আস্তে আস্তে মেসনকে বোঝানো হয়, চার্চ যে খড়্গহস্ত হয়ে আছে সেটা সবার জন্য খারাপ। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি থেমে যাবে, থমকে যাবে মানবজাতির পথচলা। পিছিয়ে পড়বে একটা অবৈজ্ঞানিক পথে! শুরু হবে ধর্মযুদ্ধ।

ঠিক যেমনটা আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি।

মানল ল্যাংডন। কথা সত্যি, আজো ক্রুসেড হচ্ছে। আজো সেই আদর্শ বয়ে চলছে ধর্ম থেকে ধর্মে। আমার ঈশ্বর তোমারটার চেয়ে বড়।

বলে যান। বলল কোহলার।

ভাবনাগুলোকে আবার গুছিয়ে নিল ল্যাঙডন, ইলুমিনেটি আস্তে আস্তে ইউরোপে বিস্তৃত হয়ে ওঠে। তারপর দৃষ্টি দেয় আমেরিকার উপর। এমন এক দেশ, যেখানে অনেক হর্তাকর্তারাই ছিল মেসনিক–জর্জ ওয়াশিংটন, বেন ফ্র্যাঙ্কলিন। সৎ, ধর্মভীরু মানুষগুলো, যারা জানে না মেসনদের উপর ছায়া পড়েছে ইলুমিনেটির। শেষ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য জাঁকিয়ে বসে ইলুমিনেটি। সামরিক পথে নয়, ব্যাঙ্ক, ইউনিভার্সিটি, ইন্ডাস্ট্রি দখলের মাধ্যমে। তাদের লক্ষ্য একটাই, এক, অভিন্ন দুনিয়া সৃষ্টি করা। এক ভুবন, এক রাষ্ট্র, এক আদর্শ, ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মহীন পৃথিবী। এ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার।

নড়ছে না কোহলার।

এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা, যার পিছনে আলো দেবে একটা মাত্র ব্যাপার। বিজ্ঞান। তারা তাদের লুসিফারিয় আদর্শে, লুসিফারিয়ান ডকট্রিনে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। গির্জা বলে, লুসিফার শয়তানের নাম। কিন্তু ইলুমিনেটি গোড়ার দিকে তাকায়। লুসিফার মানে শয়তান নয়, লুসিফার মানে আলোক আনয়নকারী। দ্য ইলুমিনেটর।

শ্বাস গোপন করল না কোহলার। মিস্টার ল্যাঙডন, প্লিজ সিট ডাউন।

পাতলা তুষারের পরত দেয়া চেয়ারে বসে পড়ে ল্যাঙডন।

আমি নিশ্চিত নই আপনার বলা প্রতিটা কথা বুঝতে পারছি কিনা। কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি। লিওনার্দো ভেট্রা ছিলেন সার্নের সবচেয়ে মূল্যবান লোকদের একজন। তিনি আমার এক বন্ধুও ছিলেন। আমি চাই আপনি ইলুমিনেটিকে খুঁজে বের করার কাজে আমাকে সহায়তা করবেন।

ইলুমিনেটিকে খুঁজে বের করা?

বাচ্চাদের মত কথা বলছে নাকি লোকটা?

আমি দুঃখিত স্যার। এ কাজটা করা একেবারে অসম্ভব।

ভাঁজ পড়ল কোহলারের ভ্রুতে, কী বলতে চান আপনি? আপনি নিশ্চয়ই ....

মিস্টার কোহলার, ভেবে পায় না সে কী করে যা ভাবছে তা বলবে, আমার কাহিনী এখনো শেষ হয়নি। এখানে, এ লোকটার বুকে একটা চিহ্ন আছে। এই তো? গত আধ শতাব্দি ধরে ইলুমিনেটির মাথার টিকিটারও খোঁজ নেই। আর বেশিরভাগ স্কলার একমত যে ইলুমিনেটি অনেক বছর আগেই অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

কী করে আপনি এ কথা বলেন? যেখানে এই লোকটার বুকে তাদের দেয়া পোড়া ছাপ মারা আছে!

এই একই প্রশ্ন ল্যাঙডনকেও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে গত ঘণ্টাখানেক ধরে।

সিম্বল থাকলেই বোঝা সম্ভব নয় যে তাদের আসল স্রষ্টারা এখনো টিকে আছে।

এ কথার মানে কী?

আমি বলতে চাই, যদি ইলুমিনেটির তরী ডুবে গিয়েও থাকে, তাদের প্রতীকটা ঠিকই থাকবে... অন্য গ্রুপগুলো সেটা তুলে নিতে পারবে সহজেই। এর নাম ট্রান্সফারেন্স। সিম্বলজিতে এমন নজিরের কোন অভাব নেই। নাজিরা স্বস্তিকা নিয়েছে হিন্দুদের কাছ থেকে। খ্রিস্টানরা ক্রুসিফর্ম নিয়েছে মিশরিয়দের কাছ খেকে আর–

এই সকালে, আজ, আমি যখন ইলুমিনেটি টাইপ করছিলাম, বর্তমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত হাজার হাজার ব্যাপারের সাথে এটার যোগসূত্র পাওয়া যায়। অনেক মানুষ মনে করে এই গ্রুপটা আজো বিদ্যমান।

ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা।

মানুষ এখনো আশায় আছে, এখনো ভয়ে আছে, একদিন ঠিক ঠিক ইলুমিনেটি উঠে আসবে। ঝাঁপিয়ে পড়বে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার উপর। তৈরি করবে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার।

কিছুদিন আগেও নিউ ইয়র্ক টাইমস অনেক বিখ্যাত মেসনিক দিকপালের কথা বলেছে– স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, ডিউক অব কেন্ট, পিটার সেলার্স, আরভিউ বার্লিন, প্রিন্স

ফিলিপ, লুইস আর্মস্ট্রঙ! সেই সাথে আছে আধুনিক লোকজন। ব্যাঙ্কার, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।

তাকাল কোহলার মরদেহটার দিকে, তারপর একটু দম নিয়ে বলল, এ প্রতীক দেখে আমার মনে হচ্ছে ষড়যন্ত্রের কথা ভুল নয়।

আমি বুঝতেই পারছি ব্যাপারটা কীভাবে আসছে আপনার কাছে, যথা সম্ভব কূটনৈতিকভাবে বলল কথাটা, তবু এ কথাটাও ফেলে দেয়া যায় না যে অন্য কোন সংস্থা ইলুমিনেটির দখল নিয়ে নিয়েছে এবং তাদের মত করে ব্যাপারটাকে ব্যবহার করছে।

কোন লক্ষ্যে? এই খুনটার কারন কী মনে হয়?

ভাল প্রশ্ন।

চারশো বছর আগের সংস্থা কী করে একজন বিজ্ঞানীকে বিজ্ঞানের নাম নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলবে সেটা ভেবে পাচ্ছে না ল্যাঙডনও।

আমি আপনাকে একটা কথা বলতে পারি, ইলুমিনেটি যদি আজো সক্রিয় থাকে, আমি যা মনে করি, তারা সক্রিয় নেই। তবু, যদি থাকে, তারা কখনোই লিওনার্দো ভিট্রার খুনের সাথে জড়িত হবে না।

না?

না। ইলুমিনেটি ক্রিশ্চিয়ানিটির বিলুপ্তিতে বিশ্বাস করলেও তাদের ক্ষমতা বেড়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর শিক্ষাগত দিকে, সামরিক দিক দিয়ে নয়। তার উপর, ইলুমিনেটির কঠিন একটা আদর্শ ছিল, কী করে তারা শত্রুদের দেখবে সে সম্পর্কিত একটা আদর্শ ছিল। তাদের কাছে ম্যান অব সায়েন্স হল সবচেয়ে উঁচু পদ। লিওনার্দো ভেট্রার মত একজন বিজ্ঞানীকে খুন করার কোন উপায় নেই তাদের হাতে।

কোহলারের চোখ বন্ধ হয়ে গেল। একটু থেমে সে বলল, আমাকে হয়ত আরো একটা ব্যাপার দেখাতে হবে আপনাকে।

মিস্টার কোহলার, আমি মানি, লিওনার্দো ভেট্রার নানামুখী দক্ষতা থাকতে পারে, কিন্তু কখনোইইলুমিনেটি তাকে খুন করবে না।

কোনরকম আভাস না দিয়েই কোহলার হুইলচেয়ার ঘুরিয়ে ঝট করে বেরিয়ে গেল লিভিঙরুম থেকে। এগিয়ে গেল একটা হলওয়ে ধরে।

ফর দ্য লাভ অফ গড, ভাবল ল্যাঙডন। হলওয়ের শেষ প্রান্তে তার জন্য অপেক্ষা করছিল কোহলার।

এ হল লিওনার্দোর স্টাডি। বলল ডিরেক্টর। আপনি ভিতরটা দেখার পর পরিস্থিতি সম্পর্কে ভিন্নভাবে ভাববেন।

এগিয়ে গেল ল্যাঙডন। তারপর ভিতরটা দেখেই পাক খেয়ে উঠল তার ভিতর। হোলি মাদার অব জেসাস! বলল সে আপন মনে।

১২

এক অন্য জায়গায়, এক তরুণ গার্ড বসে আছে ঘরভর্তি মনিটরের সামনে। ভেসে যাচ্ছে ইমেজ, তাকিয়ে আছে সেদিকে নিশ্চিন্তে। বিচিত্র আর জটিল ভবনগুলোর ভিতরে রাখা শত শত ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে সে। অশেষ মহড়া চালাচ্ছে ছবিগুলো।

এক হলওয়ে।

একটা অফিস ঘর।

বিশালবপু কিচেন।

ছবিগুলো চলে যাচ্ছে। কোনক্রমে দিবানিদ্রা ঠেকিয়ে রেখেছে গার্ড ধৈর্য ধরে। শিফট শেষ হবার সময়টাতেও বসে আছে সে। এখানে কাজ করতে পারাই এক প্রকার সম্মানের ব্যাপার। একদিন এজন্য সে পুরস্কার পাবে। অনেক দামি পুরস্কার।

একটা ছবির সামনে তার চোখ ঠেকে গেল। আর ঠেকে যাবার সাথে সাথে লাফিয়ে উঠল সে। চাপ দিল একটা বাটনে। ছবিটা স্থির হল সাথে সাথে। ধ্বক ধ্বক করে উঠল তার ভিতরটা। ঝুঁকে এল সামনে। সামনের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরা নাম্বার ছিয়াশি থেকে আসছে সেটা। এটার কোন এক হলওয়ের উপর নজর রাখার কথা।

কিন্তু সামনে যে ছবি ভেসে উঠেছে সেটা আর যেখানকারই হোক না কেন, কোন হলওয়ের নয়।

১৩

সামনের স্টাডির দিকে বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে আছে ল্যাঙডন।এ আবার কেমন জায়গা!

কোন জবাব দিল না কোহলার।

ঘরের দিকে বিমূঢ় দৃষ্টি ফেলে লাঙডন। মুখে কিছুই বলে না। এখানে তার জীবনে দেখা সবচেয়ে বিচিত্র আর্টিফ্যাক্ট ঠাসা। সামনে, বিশাল কাঠের কুসিফর্ম, দেখেই তার অভিজ্ঞ চোখ বলে দেয় জিনিসটা প্রাচীণ স্প্যানিশ। চতুর্দশ শতকের। কুসিফর্মের উপরে ছাদ থেকে ঝুলছে একটা বিশাল মডেল। সৌর জগতের মডেল। ডানে কিশোরিমেরির অয়েল পেইন্টিং।

অন্যপ্রান্তে দুটো ক্রুশ ঝুলছে, মাঝখানে আইনস্টাইনের ছবি, ছবির নিচে সেই বিখ্যাত উক্তি, ঈশ্বর সৃষ্টি জগৎ নিয়ে ছেলেখেলা খেলেন না।

ঘরের ভিতরে চলে এল সে। তাকাল চারধারে, সবিস্ময়ে। ডেস্কের উপর চামড়ায় মোড়া মূল্যবান একটা বাইবেল, বাইবেলের পাশে বোরের পরমাণু মডেলের প্লাস্টিক সংস্করণ এবং সেইসাথে মাইকেলেঞ্জেলোর সেই বিখ্যাত কীর্তির রেপ্লিকা। মোজেস। মুসা।

ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠল সে ঘরের উষ্ণতা থাকা সত্ত্বেও। এ কী! দিক-দর্শনের দু বিপরীত মেরু এক হয়ে গেছে লোকটার ঘরে। বুকসেলফের বইয়ের নামের দিকে চোখ ফেরাল সে।

দ্য গড পার্টিকেল
দ্য টাও অব ফিজিক্স
গড, দ্য এভিডেন্স

এক জায়গায় বইয়ের তালিকার সাথে লেখা:

সত্যিকার বিজ্ঞান ঈশ্বরকে আবিষ্কার করে
যিনি প্রতিটা দরজার পিছনে অপেক্ষা করছেন
—পোপ দ্বাদশ পিউস

লিওনার্দো একজন ক্যাথলিক যাজক ছিল... বলল কোহলার।

সাথে সাথে চমকে গেল ল্যাঙডন, বলল, একজন যাজক? আমার মনে হয় আপনি বলছিলেন তিনি একজন পদার্থবিদ।

সে দুটোই ছিল। ইতিহাসে বিজ্ঞান আর ধর্মের লোক অনেক পাওয়া যায়। লিওনার্দো তাদের একজন। সে পদার্থবিজ্ঞানকে ঈশ্বরের প্রাকৃতিক আইন বলে মনে করত। সব সময় একটা কথা বলত সে, আমাদের চারপাশের প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের হাতের লেখা পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে সে ঈশ্বরের উপস্থিতির কথা শতমুখে প্রচার করতে চাইত। এখানে থেকে তার অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করতে চাইত। নিজেকে মনে করত একজন থিয়ো-ফিজিসিস্ট।

পার্টিকেল ফিজিক্সের ভূমিতে, বলছে কোহলার, সম্প্রতি কিছু চমকে দেয়া আবিষ্কার এসেছে। এমন সব আবিষ্কার যা পিলে চমকে দেয়। মানুষকে ধর্মের সামনে নতজানু করে তোলে। তেমন অনেক আবিষ্কারের দায় ছিল লিওনার্দোর।

স্পিরিচুয়ালিটি আর ফিজিক্স? জানে ল্যাঙডন, এরই নাম তেল আর জল। কখনো একে অন্যের সাথে মিশে যাবে না। কস্মিন কালেও না।

পার্টিকেল ফিজিক্সের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল ভেট্রা। ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে মেলবন্ধন গড়তে যাচ্ছিল আর একটু হলেই। একেবারে অপ্রত্যাশিত পথে এ দু জগৎ একে অন্যকে জাপ্টে ধরে আছে, সেটাই দেখাতে চাচ্ছিল সে। এই ক্ষেত্রকে ডাকত নিউ ফিজিক্স।

একটা বই বের করল কোহলার। এগিয়ে দিল ল্যাঙডনের দিকে। গড, মিরাকল এ্যান্ড নিউ ফিজিক্স-লিওনার্দো ভেট্রা।

ফিল্ডটা এখানে তেমন বাড়েনি। বলল কোহলার, কিন্তু এর মধ্যে এমন কিছু আছে, যার উত্তর আমরা খুঁজে চলেছি প্রথম থেকেই। সৃষ্টিজগতের শুরু আর আমাদের সবাইকে এক করে রাখা শক্তির ব্যাপারে এখানে পিলে চমকে দেয়া কয়েকটা তথ্য আছে। লাখ লাখ লোককে ধর্মের দিকে নিয়ে আসবে তার আবিষ্কার, এমনি বিশ্বাস ছিল, লিওনার্দো ভেট্রার। গত বছরই সে এমন এক আবিষ্কার করে যা বলছে, যে একটা অচেনা শক্তি আছে যা আমাদের সবাইকে ধরে রাখে। রাখে একত্র করে... আপনারশরীরের পরমাণুগুলো আমার শরীরের অণু-পরমাণুর সাথে যুক্ত... ফলে, একটা অবিচ্ছিন্ন শক্তি বয়ে চলছে আমাদের সবার ভিতরে।

চমকে উঠল কথাটা শুনে ল্যাঙডন, আর ঈশ্বরের শক্তিই আমাদের সবাইকে একত্র করবে! মিস্টার ভেট্রা প্রমাণ করতে যাচ্ছিলেন যে আমাদের সবাই, সব বস্তু একে অন্যের সাথে জড়িত?

প্রমাণ সহ। সায়েন্টিফিক আমেরিকানের এক নতুন সংখ্যায় নিউ ফিজিক্সকে আখ্যায়িত করা হয় ধর্মের পথে নয়, ঈশ্বরের পথে পথচলা হিসাবে।

থেমে গেল কোহলার। থমকে গেল ল্যাঙডন। আর ধর্মবিরুদ্ধ ইলুমিনেটি এমন কিছু ঘটতে দেবে না। এই স্বাভাবিক। কিন্তু অতি চিন্তা হয়ে যাচ্ছে কি? ইলুমিনেটি এখানে হাত লাগাবে! সম্ভব! ইলুমিনেটির স্থান এখন শুধুই বই পত্রে। এর কোন অস্তিত্ব নেই মোটেও। সব এ্যাকাডেমিকই তা জানে!

বৈজ্ঞানিক জগতে ভেট্রার শত্রুর কোন অভাব নেই। বলল কোহলার, অনেক বিশুদ্ধতাবাদী বৈজ্ঞানিক, তাকে উপড়ে ফেলতে চায়। এমনকি এই সার্নেও। এ্যানালিটিক্যাল ফিজিক্সকে ব্যবহার করে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানকে মিশিয়ে ফেলার বিরোধী তারা।

কিন্তু আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা কি চার্চ থেকে অনেক বেশি প্রভাবমুক্ত নয়? তারা কি আর ধর্মের ব্যাপারগুলোকে ভয় করে?

কেন পাব আমরা? এখন আর চার্চ বিজ্ঞানীদের জ্যান্ত ধরে ধরে পোড়ায় না ঠিক, কিন্তু বিজ্ঞানের ভিতরে হাত ঢোকানের চেষ্টায় তাদের কোন অন্ত নেই। বলুনতো দেখি, আপনার দেশের অর্ধেক বিদ্যালয়ে কেন আজো বিবর্তনবাদ পড়ানো নিষেধ? কেন আপনাদের দেশের ক্যাথলিক লবি পৃথিবীতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে থমকে দেয়? বিজ্ঞান আর ধর্মের মধ্যে যুদ্ধ এখনো চলছে পুরোদমে, মিস্টার ল্যাঙডন। এখন আর এসব নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র বেঁধে যায় না, বেঁধে যায় না কুরুক্ষেত্র, কিন্তু তা এখনো চলছে।

টের পেল ল্যাঙডন, লোকটার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে কেন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং চলছে তা জানার জন্য এই সেদিনও যুক্তরাষ্ট্রে হাভার্ড স্কুল অব ডিভাইনিটি থেকে বায়োলজি বিল্ডিংয়ের দিকে মিছিল ছুটে গিয়েছিল। বায়ো ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান বিখ্যাত অর্নিথোলজিস্ট রিচার্ড এ্যারোনিয়ান তার ঘরের ভিতর থেকে একটা বিশাল ব্যানার ঝুলিয়ে দেন আমেরিকান লাঙফিস যেভাবে মাটিতে উঠে এসেছে, যেভাবে তার পা গজিয়েছে, তেমন একটা ছবি। সেইসাথে সেখানে জিসাস না উল্লেখ থেকে লেখা ছিল ডারউইন।

একটা তীক্ষ্ণ বিপবিপ শব্দে কান ঝালাপালা হবার আগেই মেসেজটা পড়তে শুরু করুল কোহলার।

ভাল। আসছে লিওনার্দো ভেট্রার মেয়ে। এখনি সে হেলিপ্যাডে ল্যান্ড করবে। সেখানেই তার সাথে দেখা করব আমরা। এটাই ভাল হল। এখানে উঠে এসে তার বাবাকে এ অবস্থায় দেখার চেয়ে অনেক ভাল হল।

রাজি হল ল্যাঙডন। এ এমন এক আঘাত যা কোন মেয়ের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব।

আমি মিস ভেট্রাকে চাপ দেব সে আর তার বাবা মিলে কী প্রজেক্ট করছিল সেটা খুলে

বলার জন্য। হয়ত খুনের ব্যাপারটার উপর একটু আলোকপাত হবে।

আপনি কি মনে করেন কাজের জন্য ভেট্রা খুন হয়েছেন?

অবশ্যই। লিওনার্দো বলেছিল যে সে কাজ করছে দুনিয়া কাঁপানো একটা ব্যাপারে। এরচেয়ে বেশি কিছু তার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। প্রজেক্টের ব্যাপারে কাক পক্ষীকেও জানতে দিতে নারাজ সে। সে একটা প্রাইভেট ল্যাব আর সিকিউরিটি ব্যবস্থা। চেয়েছিল। আমি খুশি মনেই তা দিয়েছি তার মেধার কথা মাথায়রেখে। শেষের দিকে তার কাজে অনেক অনেক ইলেক্ট্রিক পাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু আমি ভুলেও জিজ্ঞাসা করিনি কী করছে সে এত পাওয়ার দিয়ে। স্টাভিডোরের দিকে এগিয়ে গেল কোহলার। এখানে আরো একটা ব্যাপার আছে যা আপনার জানা প্রয়োজন।

আর কী শুনতে হবে ভেবে পায় না ল্যাংডন।

ভেট্রা মারা যাবার পর একটা জিনিস চুরি গেছে।

একটা জিনিস?

ফলো মি।

কুয়াশায় মোড়া আবার লিভিঙরুমে ঢুকল কোহলার হুইলচেয়ার নিয়ে। পিছনে পিছনে আড়ষ্ট হয়ে ওঠা ল্যাংডন। আর কী দেখতে হবে একদিনে! ভেট্রার শরীরের কাছাকাছি এসে সে থামল। সামনে আসবে ল্যাংডন, এমন প্রত্যাশা দেখা গেল তার চোখেমুখে। প্রত্যাশা পূরণ করল সে। খুন হয়ে যাওয়া বিজ্ঞানীর কাছে ঝুঁকে এলে, জমে যাওয়া ইউরিনের গন্ধ পেল ল্যাংডন।

তার চেহারার দিকে চোখ তুলে তাকান। বলল কোহলার।

তার চেহারার দিকে তাকান? বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল ল্যাংডন। আমার মনে হয় আপনি বলছিলেন যে কিছু একটা চুরি গেছে!

একটু ইতস্তত করে হাটু গেড়ে বসল ল্যাংডন। চেষ্টা করল লিওনার্দো ভেট্রার চেহারা দেখার, কিন্তু সেটা একেবারে একশো আশি ডিগ্রি ঘোরানো ও কার্পেটের দিকে ফিরানো।

শারীরিকভাবে অক্ষম কোহলার কষ্ট করে এগিয়ে এল সামনে। তারপর ঘোরাল ভেট্রার মাথা। শব্দ করে লাশটার মাথা ঘুরে এল সামনে। এক মুহূর্ত ধরে রাখল সে মাথাটাকে। তারপর ছেড়ে দিল।

ওহ্ জিসাস! চিৎকার করে উঠল ল্যাংডন, আতঙ্কে। ভেট্রার সারা মুখ ভরে গেছে রক্তে। একটা চোখ তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। অন্য চোখটার কোটর পুরোপুরি শূণ্য।

তারা লোকটার চোখ চুরি করে নিয়ে গেছে?

লাঙডন বিল্ডিং সি থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল খোলা বাতাসে। মনের ভিতরে বসত করা খালি চোখের মর্মান্তিক দৃশ্য চলে যাচ্ছে খোলা সূর্যের রশ্মিতে।

এ পথে, প্লিজ। বলল কোহলার, এগিয়ে যেতে যেতে, মিস ভেট্রা যে কোন সময় চলে আসতে পারে।

গতি ধরে রাখার জন্য তারাহুড়া করতে হল ল্যাঙডনকে।

তাহলে? বলল কোহলার, এখনো আপনার মনে কোন সন্দেহ আছে যে এটার সাথে ইলুমিনেটি যুক্ত?

চুপ করে থেকে আবার ইলুমিনেটির কথা ভাবল সে। আমার মনে হয়, এখনো মনে হয়, ইলুমিনেটি এর সাথে যুক্ত নয়। খোয়া যাওয়া চোখই তার প্রমাণ।

কী?

অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি, বলল সে কোনক্রমে, ইলুমিনেটির স্বভাব নয়। সত্যিকার শয়তানি সংঘগুলো এসব করতে পারে, কিন্তু ইলুমিনেটির মত একটা দল এমন পৈশাচিকতা করতে পারবে না।

পৈশাচিকতা? একটা লোকের চোখ তুলে নেয়ার চেয়ে বড় পৈশাচিকতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে?

এ দিয়ে একটা ব্যাপারই বলা চলে। কোন বিকৃত মনের মানুষ এ কাজ করেছে। ইলুমিনেটির মত সংস্থা নয়।

কোহলারের হুইলচেয়ার পাহাড়ের উপরে উঠে থামল। মিস্টার ল্যাঙডন, বিশ্বাস করুন, সেই হারানো চোখটা আরো বড় একটা লক্ষ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেক বড়।

দুজন এগিয়ে গেছে হেলিপ্যাডের দিকে। এগিয়ে আসছে একটা চপার দূর থেকে। উপত্যকাটাকে চিরে দিয়ে।

নামার সাথে সাথে বেরিয়ে এল পাইলট। শুরু করল আনলোডিং গিয়ার। অনেক কিছু বেরিয়ে আসছে ভিতর থেকে। স্কুবা ডাইভিঙয়ের সাজ সরঞ্জাম এবং সমুদ্র সম্পর্কিত আরো অনেক যন্ত্রপাতি। দেখে মনে হয় হাইটেক ডাইভিং ইকুইপমেন্ট।

বিভ্রান্ত দেখাল এবারো ল্যাঙডনকে। এগুলো কি মিস ভেট্রার জিনিসপত্র।

সে ব্যালিয়ারিক সিতে বায়োলজিক্যাল রিসার্চ চালাচ্ছিল।

আপনি বলেছিলেন যে সে একজন ফিজিসিস্ট!

সে ঠিক তাই-ই। সে একজন বায়ো এন্টাঙ্গলমেন্ট ফিজিসিস্ট। লাইফ সিস্টেমের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে রিসার্চ করছিল। এ কাজের সাথে তার বাবার পার্টিকেল ফিজিক্সের কাজ ওতপ্রেতভাবে জড়িত। টুনা ফিসের একটা ঝাঁকের উপর কাজ করে সে সম্প্রতি আইনস্টাইনের একটা ফান্ডামেন্টাল থিওরিকে ভুল প্রমাণিত করেছে।

ঠাট্টা করছে কিনা লোকটা তা বোঝার চেষ্টা করছে ল্যাঙডন। আইনস্টাইনের সাথে টুনা মাছ? ভেবে পায় না সে, এক্স থার্টি থ্রি প্লেন তাকে ভুল করে অন্য কোন দুনিয়ায় নামিয়ে দিয়ে যায়নিতো?

ফিউজিলাজ থেকে এক মুহূর্ত পরে বেরিয়ে এল ভিট্রোরিয়া! ল্যাঙডন বুঝতে শুরু করল আজকের দিনটা হাজার সারপ্রাইজ নিয়ে আসবে। সাদা স্লিভলেস টপ আর ছোট খাকি শর্টস পরে নেমে আসছে মেয়েটা। যেমন বইপোকা চশমা পরা ফিজিসিস্টের কথা তার মনে পড়ে, তার সাথে এ মেয়ের কোন মিল নেই। চেস্টনাটের মত গায়ের রঙ আর চুলের রঙ একেবারে কালো। সেগুলো উড়ছে পিছনে পিছনে রোটোরের বাতাসে। কোন ভুল নেই, তার চেহারা একেবারে ইতালিয়। কোন বাড়তি চটক নেই, কিন্তু শতভাগ সৌন্দর্য উপচে পড়ছে। কেমন একটা খাঁটি, কাচা সৌন্দর্য, তার সাথে বন্যতা মিশে আছে ওতপ্রোতভাবে। বাতাসের প্রভাবে তার শরীরের সমস্ত পোশাক নডছিল, দেখা যাচ্ছিল সরু কোমর, ছোট স্তন।

মিস ভেট্রার শক্তির কোন শেষ নেই। ভয়ানক বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে মাসের পর মাস ধারে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারে সে। পারে যে কোন কাজে পড়ে থাকতে। একই সাথে সে সার্নের আবাসিক গুরু। হট্ যোগব্যায়ামের গুরু। নিরামিষাশী।

হট্ যোগ? ভেবে পায় না ল্যাঙডন। একজন ক্যাথলিক যাজকের মেয়ে, পদার্থবিদ, কাজ করছে সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র নিয়ে, সার্নে থাকার সময় সে হয়ে যায় প্রাচীণ বৌদ্ধদের ব্যায়ামের শিক্ষক!

রোদে পোড়া চামড়া মেয়েটার। চোখগুলো ফোলা ফোলা। এখনো কাঁদছে সে।

ভিট্টোরিয়া, মেয়েটা এগিয়ে এলে বলল কোহলার, আমার গভীরতম বেদনা... এখানে, সার্নের ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে পুরো পৃথিবীর বিজ্ঞানের... আমি...

নড করল মেয়েটা। তারপর যখন কথা বলল, ব্যক্তিত্ব আর শক্তিমত্তা ফুটে উঠল তার কণ্ঠে, কে দায়ী তা কি জানা গেছে?

এখনো এ নিয়ে কাজ করছি।

ফিরল সে ল্যাঙডনের দিকে, আমার নাম ভিট্টোরিয়া ভেট্রা, হাত বাড়িয়ে দিল, মনে হয় আপনি ইন্টারপোল থেকে এসেছেন?

হাতটা তুলে নিল সে হাতে। বলল, রবার্ট ল্যাঙডন। আর কী বলবে ভেবে পেল না।

মিস্টার ল্যাঙডন অথরিটির সাথে যুক্ত নন, বলল কোহলার, ব্যাখ্যা করল, তিনি আমেরিকা থেকে আসছেন। একজন স্পেশালিস্ট। কে দায়ী সে ব্যাপারে সাহায্য করবেন তিনি আমাদের।

আর পুলিশ?

চুপ করে থাকল কোহলার।

বডিকোথায়? দাবি করল মেয়েটা।

কাজ চলছে। বলল কোহলার।

সাদা নির্জলা মিথ্যা শুনে ভড়কে গেল ল্যাঙডন।

আমি তাকে দেখতে চাই, সোজা দাবি করল মেয়েটা আবারো।

ভিট্টোরিয়া, অবশেষে কোহলারবলল, তোমার বাবা নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। যেমন স্মৃতি তোমার মনে আছে তেমনটা মনে রাখাই ভাল।

কথা শুরু করল ডিট্টোরিয়া কিন্তু তা থেমে গেল একটা শব্দে।

হেই! ভিট্টোরিয়া! দূর থেকে একজন বলে উঠল, ওয়েলকাম হোম!

হেলিপ্যাডের কাছ দিয়ে যেতে থাকা একদল বিজ্ঞানী উৎফুল্লভাবে হাত নাড়ল।

আইনস্টাইনের আর কোন তত্ত্বকে উড়িয়ে দিয়ে এলে নাকি? বলল একজন।

আরেক জন কথা বলে উঠল সাথে সাথে, তোমার ড্যাড অনেক খুশি হবেন। গর্বিত হবেন তিনি।

কোনমতে একটু হাসির মত দিতে পারল ভিট্টোরিয়া লোকটার দিকে তাকিয়ে। অনেক কষ্টে। তারপর ফিরল ডিরেক্টরের দিকে। এখনো কেউ জানে না?

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা এখনি না জানানো ভাল।

আপনি স্টাফদের জানাননি যে আমার বাবা খুন হয়ে গেছেন?

হয়ত ভুলে যাচ্ছ মিস ভেট্রা, আমি যখনি তোমার বাবার খুনের ব্যাপারে একটা ঘোষণা করব, সাথে সাথে সার্নে একটা তদন্ত হবে। তার ল্যাবের ব্যাপারটাও বাদ পড়বে না। তোমার বাবার প্রাইভেসির ব্যাপারটায় আমি সব সময় প্রাধান্য দিয়েছি। তোমাদের বর্তমান প্রজেক্ট নিয়ে তিনি আমাকে মাত্র দুটো ব্যাপার জানিয়েছেন। এক, এর এত গুরুত্ব আছে যে সার্ন অসম্ভব পরিমাণের আর্থিক লাভের সম্মুখীন হবে। পরের দশকে এর টাকা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবতে হবে না। আর দুই, তিনি সেটাকে সবার সামনে প্রকাশ করতে চান না কারণ প্রযুক্তিটা এখনো অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এ দুটো ব্যাপার নিয়ে আমি ভাবছি। ভাবছি, যদি লোকজন তার ল্যাবের ভিতরে ঘোরে আর কিছু সরিয়ে ফেলে অথবা অসাবধানে চুন থেকে পান খসে

যায় তাহলে সার্ন দায়ী থাকবে। মারাও পড়তে পারে তারা। আমি কি ভুল কিছু বলছি? পরিষ্কার করতে পারছি নিজেকে তোমার সামনে?

কিছু বলল না ভিট্টোরিয়া। ল্যাঙডনও মনে মনে তারিফ করল কোহলারের যুক্তির।

কোন অথরিটির কাছে ধর্ণা দেয়ার আগে আমি জানতে চাই তোমরা দুজন কী নিয়ে কাজ করছিলে। যেতে চাই তোমাদের ল্যাবে।

ল্যাবের সাথে এর সম্পর্ক থাকার কথা নয়। আমি আর বাবা মিলে কী করছিলাম সেটার খবর আর কেউ জানে না।

যা প্রমাণ, তাতে অন্য কথা মনে হয়।

প্রমাণ? কী প্রমাণ?

একই কথা গুমরে মরছে ল্যাঙডনের ভিতরেও।

তোমার, আমাকে শুধু বিশ্বাস করতে হবে। কথা বলার প্রয়োজন নেই।

ভিট্টোরিয়ার চোখের দৃষ্টি দেখে ঠিক ঠিক বোঝা যায় এখন সে কাউকে বিশ্বাস করে না।

১৫

ল্যাঙডন চুপচাপ তাদের দুজনের পিছনে পিছনে যাচ্ছে। মেয়েটা আশ্চর্য শান্ত। যোগব্যায়ামের ফল কিনা কে জানে! কিন্তু একটু পর পর ফোঁপানোর শব্দ যে আসছে না তা নয়।

কিছু একটা বলতে চায় ল্যাঙডন মেয়েটাকে, একটু সহানুভূতি। বাবা বা মাকে হারানো কতটা বেদনার সেটা সে ঠিক ঠিক জানে।

তার বারোতম জন্মদিনের দুদিন পরে। মনে পড়ে শেষকৃত্যানুষ্ঠানটার কথা। বৃষ্টি পড়ছে। চারদিক ধূসর। এসেছিল অনেকেই। আন্তরিক ভঙ্গিতে তার হাত ঝাঁকিয়ে দিচ্ছিল। কার্ডিয়াক, স্ট্রেস ধরনের কয়েকটা কথা বারবার তারা বলছিল। তার মা তাকিয়ে ছিল অশ্রুতে ভরা চোখ নিয়ে।

একবার, যখন তার বাবা জীবিত ছিল, মাকে বলতে শুনেছিল, থামো, আর গোলাপের সুগন্ধ নাও।

এক ক্রিসমাসে সে বাবার জন্য একটা গোলাপ কিনে আনে। বাবা চুমু দেয় তার কপালে, তারপর সেটাকে রেখে দেয় ঘরের অন্ধকারতম কোণায়, ধূলোভরা একটা শেলফে। দুদিন পরে সে কৃত্রিম গোলাপটাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসে স্টোরে। টের পায়নি বাবা কখনো।

একটা লিফটের সামনে এসে বাস্তবে ফিরে এল ল্যাঙডন। ভিতরে চলে গেছে কোহলার আর ভিট্টোরিয়া। বাইরে ইতস্তত করছে সে।

কোন সমস্যা? প্রশ্ন করল কোহলার। এমনি ভাব যে, সে সমস্যার কথা জানতে চায় না।

নট এট অল। বলল সে অবশেষে, ছোট খুপরিটার দিকে নিজেকে ঠেলে দিতে দিতে। পারতপক্ষেসে কখনো যায় না লিফটের দিকে। তারচেয়ে বরং খোলা প্রশস্ত সিঁড়িই ভাল।

ডক্টর ভেট্রার ল্যাব মাটির নিচে। বলল কোহলার।

ভিতরে আসতে আসতে মনে মনে ভাবল ল্যাঙডন, চমৎকার। ঢোকার সাথে সাথে লিফ্টটা নামতে শুরু করল নিচে।

ছতলা।

দেখল এলিভেটরের মার্কারে দিকে। সেখানে মাত্র দুটো তলার কথা লেখা আছে। গ্রাউন্ড লেভেল আর এল এইচ সি।

এল এইচ সি কী?

লার্জ হ্যাড্রন কলিডার বলল কোহলার, একটা পার্টিকেল এ্যাক্সিলারেটর।

পার্টিকেল এ্যাক্সিলারেটর? এ শব্দটার সাথে খুব একটা পরিচিত নয় ল্যাঙডন। এক রাতে তার এক ফিজিসিস্ট বন্ধু তাদের পার্টিতে এসেছিল।

বেজন্মার দল ব্যাপারটা ক্যানসেল করে দিল। গাল ঝাড়ছিল ব্রাউনওয়েল।

ক্যানসেল করল কী? জিজ্ঞেস করল তারা।

এস এস সি।

কী?

সুপারকন্ডাক্টিং সুপার কলিডার।

একজন শ্রাগ করল। আমি জানতামই না যে হার্ভার্ড এমন কিছু বানাচ্ছে।

হার্ভার্ড নয়! বলল সে তেতে উঠে, আমেরিকা। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পার্টিকেল এ্যাক্সিলারেটর হতে পারত! দেশের সবচেয়ে বড় সায়েন্টিফিক প্রজেক্ট। দু বিলিয়ন ডলার নিয়ে বসে ছিল তারা, এমন সময় সিনেট বাতিল করে দিল। মরার বাইবেল-বেল্ট লবিয়িস্টদের কাজ।

শান্ত হয়ে আসার পর ব্রাউনওয়েল আস্তে আস্তে বলে, যে পার্টিকেল এ্যাক্সিলারেটর হল এমন এক যন্ত্র যেটা গোলাকার, একেবারে সুবিশাল। এর ভিতর দিয়ে পরমাণুর একেবারে ক্ষুদ্রতম কণাগুলো ছুটে চলে অকল্পনীয় গতিতে। কয়েলের চারদিকের চুম্বকগুলো এই গতি বাড়ায়। বাড়তে বাড়তে সেকেন্ডে এক লক্ষ আশি হাজার মাইলে চলে যায়।

এ গতিতো আলোর গতির কাছাকাছি! বলল এক প্রফেসর।

ড্যাম রাইট! ব্রাউনওয়েল বলল সাথে সাথে। ব্যাখ্যা করল, কী করে দুটো পার্টিকেলকে দুদিকে ঘোরানো হয়। ঘোরানো চলতে চলতে গতি বাড়ে। চরম গতিতে তাদের সংঘর্ষ করানো হয়। তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে জানা যাবে সৃষ্টির গূঢ় রহস্য।

পার্টিকেল এ্যাক্সিলারেটরগুলো, বলেছিল ব্রাউনওয়েল, বিজ্ঞানের আগামী নির্দেশ করে। এ থেকেই ইউনিভার্সের বিল্ডিং ব্লকের খোঁজ পাওয়া যাবে।

হার্ভার্ডের পয়েট ইন রেসিডেন্স, শান্ত লোক, নাম তার চার্লস ভ্যাট, খুব বেশি উৎফুল্ল মনে হল না তাকে, এটা আমার কাছে বিদঘুটে লাগে, বলেছিল সে, বিজ্ঞানের পথে এগিয়ে আসার চেয়ে প্রাচীণযুগে ফিরে যাবার মত... ঘড়িগুলোকে একটার সাথে আরেকটাকে ঠুকে দিয়ে ভেঙে, তারপর সেটার ভিতরের কলকজা দেখে বোঝার চেষ্টা করা সময় কী করে চলে।

ব্রাউনওয়েল সাথে সাথে তার কাঁটাচামচ ফেলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

তার মানে সার্নের একটা পার্টিকেল এক্সিলারেটর আছে? ভাবল ল্যাঙডন, বস্তুকণা গুড়িয়ে দেয়ার মত গোলাকার একটা যন্ত্র! ভেবে পায় না সে কী কারণে তারা সেটাকে একেবারে মাটির নিচে কবর দিল।

যখন লিফটটা নামছে, পায়ের নিচে একটা কম্পন টের পেল সে। তারপর আবার তলায় গিয়ে হতাশ হয় সে। আবারো দাড়িয়ে আছে একটা একেবারে অচেনা এলাকায়। অচেনা দুনিয়ায়।

ডানে-বামে অসীম হয়ে মিশে গেছে করিডোরটা। এটা একেবারে নিখুঁত সিমেন্টের পথ। এখানে একটা আঠারো চাকার যান বিনা দ্বিধায় চলতে পারবে, এতটাই প্রশস্ত। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তারা, সে জায়গাটা ভালভাবেই আলোকিত। তারপর দুদিকে শেষ বিন্দুতে একেবারে পিচকালো অন্ধকার। একটা বদ্ধ বাতাস মনে করিয়ে দেয় তাদের, যে তারা এখন মাটির নিচে। মাথার উপরে নিশ্চয়ই মাটির অনেক পরত আছে। আছে নুড়ি আর পাথর। হঠাৎ করেই সে আবার ফিরে গেল ন বছর বয়সে। চারধারে ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার... অন্ধকারে থাকার সেই পাঁচটা ঘণ্টার কথা এখনো তার ভিতরে গুমরে মরে।

এগিয়ে গেল ভিট্টোরিয়া তাদের ছেড়ে। সামনের দিকে। যত এগিয়ে গেল সে, তত আলোকিত হয়ে উঠল টানেল। তারপর নিভে গেল মাঝখানের বাতিগুলো। ল্যাঙডনের মনে হল সুড়ঙ্গটা জীবিত।

পার্টিকেল এ্যাক্সিলারেটর, আমতা আমতা করে বলল ল্যাঙডন, এটা কি নিচে, এই সুড়ঙ্গ ধরে কোথাও?

এটাই পার্টিকেল এ্যাক্সিলারেটর। দেখাল কোহলার পিছনদিকে। ভিতরদিকের দেয়ালে।

ল্যাঙডনের চোখ কুঁচকে উঠল। দেয়ালের দিকে দেখাচ্ছে কেন লোকটা! এটাই এ্যাক্সিলারেটর? অবাক হয়ে দুদিকে তাকাল সে, আমি মনে করেছিলাম জিনিসটা গোলাকার।

এই এ্যাক্সিলারেটরও গোলাকার। বলল কোহলার, দেখতে সোজা। কিন্তু একেই বলে চোখের ধাঁধা। মোটেও সোজা নয়। এর গোলাকৃতিটা এত কম মাত্রায় বেড়েছে, যে তা দেখে গোল হবার কথাটা মনে পড়ে না। অনেকটা পৃথিবীর মত।

এটা এক বৃত্ত! কী বলে! কত বড় হবার কথা, এই সোজা লাইন যদি একটা বৃত্ত হয়...

এল এইচ সি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মেশিন।

সার্ন ড্রাইভার বলেছিল যে মাটির নিচে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মেশিনটা লুকানো আছে, কিন্তু—

ব্যাসে এটা আট মাইল। আর পরিধিতে সাতাশ কিলোমিটার।

কী! সাতাশ কিলোমিটার? এই টানেলটা সাতাশ কিলোমিটার লম্বা? এতো... এতো ষোল

মাইলের চেয়েও বেশি!

নড করল কোহলার। একে একেবার নিখুঁত বৃত্তাকারে খোড়া হয়েছিল। এখানে ফিরে আসার আগে ফ্রান্সের সীমান্তে ঢু মারে এটা। একত্র হয়ে যাবার আগে, পরিপূর্ণ গতিপ্রাপ্ত পার্টিকেল সেকেন্ডে দশ হাজার বারেরও বেশিবার ঘুরবে এটাকে কেন্দ্র করে।

আপনি বলছেন যে সার্ন কোটি টন মাটি খুড়েছে শুধু ছোট্ট পার্টিকেল গুঁড়া করার জন্য?

কখনো কখনো সত্যি বের করার জন্য মানুষকে পাহাড় ডিঙাতে হয়।

শত শত মাইল দূরে, একজন ওয়াকিটকিতে বলল, ওকে ... আমি হলওয়েতে।
অন্য প্রান্ত থেকেটেকনিশিয়ান বলল, আপনি ক্যামেরা নম্বর ছিয়াশির খোঁজে গিয়েছেন। এটা শেষ প্রান্তে থাকার কথা।
রেডিও অনেকক্ষণ নিরব থাকল। ঘাম মুছল টেকনিশিয়ান। কেন যেন দরদর করে ঘামছে সে। তারপর সচল হল তার রেডিও।
ক্যামেরা এখানে নেই। বলল লোকটা, যেখানে আটকানো ছিল সে জায়গাটা দেখা যায়। কেউ না কেউ জিনিসটাকে সরিয়ে নিয়েছে।
বড় করে শ্বাস নিল টেকনিশিয়ান, ভাল, এক সেকেন্ড থাকুন।
সামনের স্ক্রিনের দঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আবার ঘামতে শুরু করল লোকটা। এর আগেও ক্যামেরা খোয়া গেছে। বিচিত্র কিছু নয়। পাওয়াওযায় অহরহ। কিন্তু এবার কিছু একটা অমঙ্গলের ব্যাপার টের পাওয়া যায় এখানে। যখনি ক্যামেরাটা কমপ্লেক্স ছেড়ে বেরুবে, চলে যাবে রেঞ্জের বাইরে, সাথে সাথে সেই স্ক্রিনটা কালো হয়ে যাবে। মনিটরের দিকে আরো একবার তাকায় টেকনিশিয়ান। ক্যামেরা নং ছিয়াশি থেকে এখনো ছবি আসছে স্পষ্ট।
বোঝাই যাচ্ছে, ক্যামেরাটা কমপ্লেক্সের ভিতরেই আছে। এবং কেউ একজন সেটাকে চুরি করে হাপিস হয়ে গেছে। কে? এবং কেন?
সিঁড়ির কাছে কি কোন অন্ধকার কোণ আছে? কোন খুপরি বা এমন কোন জায়গা যেখানটায় একটা ক্যামেরা লুকানো সম্ভব?
না। কেন?
নেভার মাইন্ড। সহায়তার জন্য ধন্যবাদ।
বন্ধ করে দিল সে ওয়াকিটকি। তারপর চেপে ধরল ঠোঁট।
এই সুরক্ষিত এলাকার ভিতরেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে ক্যামেরাটা। এখানেই কোথাও। নিশ্চিত। আধমাইল ব্যাসের বিশাল এলাকার বত্রিশটা ভুবনের কোথাও। একটা মাত্র ক্লু আছে, ক্যামেরাটা এমন কোথাও বসানো আলো যায় না যেখানে। এই কমপ্লেক্সে অন্ধকার এলাকার কোন অভাব নেই। মেইনটেন্যান্স ক্লজেট, হিটিং ডাক্ট, গার্ডেনিং শেড, বেডরুম ওয়ার্ডরোব, আর আছে মাটির নিচের সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা। কয়েক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে ক্যামেরা নাম্বার ছিয়াশি বের করতে।
কিন্তু এটা আমার মাথাব্যাথা নয়। ভাবল সে।
এখনো হারানো ক্যামেরাটা ট্রান্সমিট করছে। তাকাল সে সেদিকে। একটা আধুনিক গড়নের কিছু দেখা যাচ্ছে সেখানে, যেটার সাথে মোটেও পরিচিত নয় টেকনিশিয়ান। এবং এ ব্যাপারটাই ঘামাচ্ছে তাকে। এর গোড়ায় বসানো ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে দেখল সে।
যদিও গার্ডরা তাকে চরম মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রাখার নানা কৌশল শিখিয়েছে, তবু, দরদর করে ঘামছে সে। নিজেকে শান্ত থাকতে বলল সে। কোন না কোন ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে। জিনিসটা এত বড় নয় যে তা নিয়ে ঘাবড়াতে হবে। তবু, কমপ্লেক্সের ভিতর এটার অস্তিত্ব ঠিক ঠিক সমস্যায় ফেলে দেয় তাকে। খুব সমস্যায়, অবশ্যই।
সব বাদ দিয়ে আজকের দিনে... ভাবে সে।
তার চাকরিদাতার কাছে সিকিউরিটিই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। কিন্তু আজকের দিনে...। গত বারো বছরের যে কোন দিন থেকে আজকের দিনটা গুরুত্বপূর্ণ। আজ এখানকার নিরাপত্তাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। আবার তাকাল সে জিনিসটার দিকে। দেখতে নিরীহ। কিন্তু, কোথায় বসানো আছে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করতে পারে।
সিদ্ধান্ত নিল সে, ডাকবে উপরের কাউকে।

খুব বেশি বাচ্চা মনে করতে পারবে না যে, সে কখন প্রথম তার বাবার সাথে দেখা করেছিল। কিন্তু ভিট্টোরিয়া ভেট্রা ঠিকঠিক মনে করতে পারে।

বয়স ছিল আট বছর। ছিল সে সেখানেই, যেখানে সব সময় ছিল। অরফ্যানোট্রোফিও ভিসিয়েনা। ফ্লোরেন্সের কাছে একটা ক্যাথলিক অরফানেজে। মা বাবা তাকে ছেড়ে গিয়েছিল কিনা সে জানে না। মা-বাবা আছে কিনা জানত না তাও।

সেদিন বৃষ্টি ছিল সেখানে। নার্স দুবার তাকে ডেকেছে খাবার খেয়ে যেতে। কিন্তু বরাবরের মত শুনেও না শোনার ভাণ করেছে সে। বসে আছে বাইরে... বৃষ্টির ফেঁটাগুলোকে পড়তে দিচ্ছে গায়ে... চেষ্টা করছে পরের ফোঁটাটা কোথায় পড়বে তা বোঝার।

আবার ডাকল নার্স। বারবার বলছিল, প্রকৃতি নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় যে বাচ্চারা, বৃষ্টিতে ভেজে, তাদের কপালে নিউমোনিয়ার দুঃখ আছে।

তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না... ভাবল ভিট্টোরিয়া।

তখন তরুন প্রিস্ট তার জন্য এসেছিল, ভিজে একসা হয়ে গিয়েছিল সে। চেনে না লোকটাকে। নতুন এসেছে এখানে। ভিট্টোরিয়া অপেক্ষা করল। কখন লোকটা ধৈর্য হারিয়ে তাকে খপ করে ধরবে, তারপর হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে ভিতরে, কিন্তু এমন কিছুই করল না লোকটা। অবাক করে দিয়ে সেও শুয়ে পড়ল মেয়েটার পাশে। তার রোব ছড়িয়ে আছে ঘাসের উপর।

তারা বলল তুমি নাকি প্রশ্ন করতে করতে তাদের নাস্তানাবুদ করে দাও? বলল লোকটা, খাতির জমানোর মত করে।

সাথে সাথে ফুঁসে উঠল ভিট্টোরিয়া, প্রশ্ন করা কি দোষের?

হাসল লোকটা সাথে সাথে। প্রাণখোলা হাসি। মন উজাড় করা হাসি। মনে হয়। তাদের কথাই ঠিক।

কী করছ তুমি এখানে, বৃষ্টির মধ্যে?

যা তুমি করছ... ভাবছি, ভেবে মরছি বৃষ্টি কেন পড়ে!

আমি এ কথা চিন্তা করছি না। আমি জানি ঠিক ঠিক কীজন্যে বৃষ্টি পড়ে।

সাথে সাথে অবাক চোখে তার দিকে তাকাল প্রিস্ট, তুমি জান?

সিস্টার এ্যাঞ্জেলিনা বলে বৃষ্টির ফোঁটা হল ফেরেশতাদের কান্না। আমাদের পাপধুয়ে মুছে দেয়ার জন্য নামে।

ওয়াও! এই তাহলে ব্যাখ্যা?

না, এতে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না! বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে কারণ সবই পড়ে। সব পড়ে শুধু বৃষ্টির ফোঁটা নয়!

জান, ইয়ং লেডি, তোমার কথাই ঠিক। সব পড়ে। এরই নাম গ্রাভিটি।

এরই নাম কী?

তুমি মাধ্যাকর্ষণের কথা শোননি?

না।

খুব খারাপ কথা। গ্রাভিটি অনেক প্রশ্নের জবাব দেয়।

সাথে সাথে আগ্রহে অত্যুজ্বল হয়ে উঠল ভিট্টোরিয়ার চোখমুখ, গ্রাভিটি কী? বোঝাও আমাকে!

যাই জিজ্ঞেস কর না কেন, সব প্রশ্নের জবাব দেব ডিনারের পর।

তরুণ প্রিস্টের নাম লিওনার্দো ভেট্রা। নানদের নিঃসঙ্গ ভুবনে মেয়েটা আকড়ে ধরে তাকে। লিওনার্দোকে হাসায় ভিট্টোরিয়ার উজ্জ্বলতা, ভিট্টোরিয়াকে সে জানায় নানা রহস্য। রামধনুর রহস্য, নদী আর ঝর্ণার রহস্য।

আলো, গ্রহ, তারকারাজি, আকাশ, সবকিছুর ব্যাখ্যা দেয় সে ঐশ্বরিক আবহে, বৈজ্ঞানিক

ভাবধারায়।

আনন্দিত ভিট্টোরিয়াও। বাবা থাকার কী যে মজা তা সে আগে জানত না। তারপর তার সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন চলে এল। যাবার সময় হয়েছে লিওনার্দোর।

সুইজারল্যান্ডে যাচ্ছি। জেনেভা ইউনিভার্সিটি থেকে একটা স্টাইপেন্ড পেয়েছি। ফিজিক্স পড়ব।

ফিজিক্স? আমি মনে করেছিলাম তুমি ঈশ্বরকে ভালবাস!

অবশ্যই! তাইত তার স্বর্গীয় আইনগুলো জানতে চাই।

থামল সে। মুষড়ে পড়েছে ভিট্টোরিয়া!

আমি তোমাকে পালিত কন্যা হিসাবে নিলে তুমি খুশি হবেতো?

পালিত মানে কী?

বলল ফাদার লিওনার্দো।

কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরল তাকে ছোট্ট মেয়েটা, ওহ্! ইয়েস! ইয়েস!

জেনেভায় চলে গেল তারা। ছমাস আগে গেছে লিওনার্দো এবার গেল ভিট্টোরিয়াও। সেখানে জেনেভা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে যোগ দিল। রাতে শিখতে লাগল বাবার কাছ থেকে।

তিন বছর পরেই লিওনার্দো ভেট্রাকে সার্ন নিয়ে নেয়।

ব্যালেরিক আইল্যান্ডে কাজ করছিল ভিট্টোরিয়া! এমন সময় মেসেজ এল।

তোমার বাবা খুন হয়েছেন। তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

ডাইভ বোটের ডেকে বসে বসে তরঙ্গের দোলায় একেবারে কাঠ হয়ে বসে থাকল ভিট্টোরিয়া।

বাড়ি ফিরে এল সে। কিন্তু এখানে আর বাড়ি বাড়ি ভাব নেই। যে লোকটার জন্য ফিরে আসা সেই নেই।

কে তার বাবাকে খুন করেছে? কেন? আর কে এই আমেরিকান স্পেশালিস্ট? সব বাদ দিয়েল্যাব দেখার জন্য পীড়াপীড়ি করছে কেন কোহলার?

কোন্ প্রমাণ আছে? কেউ জানত না কী কাজ করছি আমরা। আর কেউ যদি জেনেও ফেলে, তাকে খুন করার মত কী হল?

এগিয়ে যাচ্ছে ভিট্টোরিয়া। তার বাবার সবচেয়ে বড় কীর্তি উন্মোচিত করতে। যে কাজটা বাবাকে নিয়ে করার কথা ছিল তার। সাথে থাকত ডাকসাইটে সব বিজ্ঞানী। বিস্ময়ে ঝুলে পড়ত তাদের চোয়াল।

এখন, মানুষের সামনে তাদের কীর্তি ঠিক ঠিক প্রকাশিত হচ্ছে যখন তার বাবা নেই।

সাথে আছে ম্যাক্সিমিলিয়ান কোহলার। ডের কোনিং। আর আছে একজন অপরিচিত আমেরিকান।

কোহলারকে একেবারে শুরু থেকেই দুচোখে দেখতে পারে না সে। আস্তে আস্তে বুঝতে শিখে যায় যে লোকটা কাজের। কিন্তু তার শীতল চোখের সামনে লিওনার্দো ভেট্রার উষ্ণতা, তার নিছক গাণিতিক বিজ্ঞানের সামনে বাবার আত্মিকতারকোন তুলনা নেই।

এগিয়ে গেল তারা একটা টাইল বাধানো পথের দিকে। সেখানে সারা দেয়াল জুড়ে বিচিত্র সব ছবি আটকানো। কোনটারই কোন মানে বোঝা যাচ্ছে না। মডার্ন আর্ট? হতে পারে।

স্ক্যাটার প্লট, বলল ভিট্টোরিয়া, পার্টিকেলের সংঘর্ষের ছবি। কম্পিউটারের। এটা জেড পার্টিকেল। পাঁচ বছর আগে বাবা এটাকে আবিষ্কার করেন। পিওর এনার্জি। কোন ভর নেই।

বস্তু এনার্জি?

বিষম খেল ল্যাঙডন।

ভিট্টোরিয়া, বলছে কোহলার, আমার বলা দরকার যে তোমার বাবার খোঁজে এসেছিলাম আজ সকালে।

এসেছিলেন?

আর তারপর আমার বিস্ময়ের কথাটা একবার ভাব। তিনি সার্নের স্ট্যান্ডার্ড কিপ্যাড সিকিউরিটি সিস্টেম বাদ দিয়ে অন্য কাজ করেছেন।

আমি ক্ষমা চাইছি। আপনি ভাল করেই জানেন নিরাপত্তার ব্যাপারে বাবা কত খুতখুতে। তিনি আমাদের দুজন ছাড়া আর কাউকে ভিতরে ঢুকতে দিতে চাননি।

ভাল। দরজা খোল।

এরপর কী হবে সে ব্যাপারে ল্যাংডনের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

এগিয়ে গেল ভিট্রোরিয়া।

একটা টেলিস্কোপের দৃষ্টি দেয়ার অংশের মত জায়গায় সে ডান চোখ রাখল। তারপর চেপে দিল একটা বাটন। ফটোকপি মেশিনের মত আলো উপর নিচ, উপর নিচ করে স্ক্যান করে নিল তার রেটিনা।

এটা রেটিনা স্ক্যান। আমার আর বাবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সাথে সাথে জমে গেল রবার্ট ল্যাংডন। সব পরিষ্কার হয়ে গেল মুহূর্তে।

তাকাল সে সাদা টাইলের উপর। দেখতে পেল একটা জমাট বিন্দু। রক্ত।

ভাগ্য ভাল, ভিট্রোরিয়া দেখেনি।

খুলে গেল দরজা। ভিতরে যাবার সময় বোঝা গেল, কোহলারের দৃষ্টিতে, সে যেন বলছে -

যা বলেছিলাম... হারানো চোখের আরো বড় উদ্দেশ্য আছে।

মেয়েটার হাত বাঁধা। তার মেহগনি রঙা চামড়া দেখে মনে আগুন ধরে যায় হ্যাসাসিনের।

সে কিছুই কেয়ার করে না। পাপ-পুণ্যের কথা ভাবার সময় নেই। তাকায় সে।

তার দেশে, মহিলারা সম্পদ। দুর্বল। ভোগের বস্তু। কিন্তু এখানে, ইউরোপে, মেয়েরা তেজস্বী। ব্যাপারটা তাকে আনন্দ দেয়।

আজ রাতে হ্যাসাসিন খুন করেছে। আর তার বদলে উপভোগ করবে তার পুরস্কার।

অনেকক্ষণ পরে! শুয়ে আছে হ্যাসাসিন তার পুরষ্কারের কাছে। হাত চালাচ্ছে। ঘুমন্ত মেয়েটার গলায়। মেরে ফেললে কী? ও তো একটা উপমানব ভোগের বস্তু। অসাড়।

আরো অনেক কাজ পড়ে আছে। তার নিজের কামনার চেয়ে বড় ব্যাপার নিয়ে কাজ করতে হবে।

বিছানায় উঠে বসে সে। তারপর ভেবে পায় না, সেই জ্যাসার্ন লোকটার প্রভাব কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। বুঝতে পারে না কী করে ইলুমিনেটি তার খোঁজ পেল। যতই ভাবে সে, ততই সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। তাদের মূল অনেক অনেক গভীরে প্রোথিত!

এখন, তারা তাকে নির্বাচিত করেছে। সেই তাদের কণ্ঠ, তাদের হাত। এ এক অনির্বচনীয় সুসংবাদ। সম্মান। তাদের লোক এ প্রতিনিধিকে বলে মালাক-আল-হক। দ্য এ্যাঞ্জেল অব ট্রুথ।

ভেট্রার ল্যাব একেবারেই ভবিষ্যৎমুখী।

কম্পিউটার আর অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। দেখতে অনেকটা অপারেশন রুমের মত। এখানে কী এমন থাকতে পারে যার জন্য একজন মানুষের চোখ তুলে ফেলতে হবে।

একটু থমকে গেল কোহলার। তাকাল চারপাশে। ভিট্টোরিয়ার চলনও অনেক ধীর। যেন বাবাকে ছাড়া এখানে এসে, সে বিরাট কোন পাপ করে ফেলেছে।

ঘরের মধ্যখানে চলে গেল ল্যাঙডনের চোখ। একদল ছোট পিলার উঠেছে মেঝে থেকে। একটা ছোট স্টোনহেঞ্জের ডজনখানেক পালিশ করা কলাম উঠে গেছে উপরে। ফুট তিনেক লম্বা। প্রতিটায় একটা করে লম্বা ক্যানিস্টার বসানো আছে। টেনিসবল ক্যানের মত। ভিতরটা খালি।

সন্দেহপ্রবণ দৃষ্টি দিল কোহলার, চুরি যায়নিতো কিছু?

চুরি যাবে কী করে? বলল ভিট্টোরিয়া, এখানে ঢুকতে হলে রেটিনা স্ক্যান করতে হবে।

একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নাও।

সবই ঠিক মনে হচ্ছে। ঠিক যেভাবে বাবা রেখে যেত।

ভাবিত হল কোহলার। যেন ভাবছে কতটা বলবে ভিট্টোরিয়াকে। তারপর যেন ছেড়ে দিল হাল।

চলে এল সে ঘরের ভিতরে।

গোপনীয়তা, বলছে ডিরেক্টর, এমন এক বিলাস যা করা আমাদের আর সাজে না।

নড করল ভিট্টোরিয়া। যেন আবার কেঁদে ফেলবে।

এক মিনিট সময় দাও মেয়েটাকে! ভাবছে ল্যাঙডন।

যেন কী শুনবে সে কথা ভাবতে না পেরে চোখ বুঝল ভিট্টোরিয়া। শ্বাস নিল পরপর।

ঠিক আছে তো মেয়েটা?

তাকাল ল্যাঙডন কোহলারের দিকে। ডিরেক্টর নির্ভাবনার অভয় দিল চোখের ইশারায়।

তারপর, ঝাড়া দশ সেকেন্ড বন্ধ রেখে, সেচোখখুলল।

যে ভিট্টোরিয়া ভেট্রাকে সে দেখল, তাতে বিষম খেতে হল ল্যাঙডনের। এক নতুন মানুষ। শরীরের প্রতিটা পেশীকে ভবিতব্য বলে মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছে।

কোত্থেকে শুরু করব... বলল মেয়েটা।

প্রথমে তোমার বাবার পরীক্ষা সম্পর্কে বল।

বিজ্ঞানকে ধর্মের আলোয় অত্যুজ্জ্বল করা আমার বাবার সারা জীবনের স্বপ্ন। তিনি সব সময় প্রমাণ করতে চাইতেন যে ধর্ম আর বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক। আর সম্প্রতি... তিনি তা প্রমাণ করার একটা উপায় খুঁজে পেয়েছেন।

কিছুই বলল না কোহলার।

তিনি এমন এক এক্সপেরিমেন্ট করেছেন যেটা থেকে বিজ্ঞান আর ধর্মকে একত্রিত করা সম্ভব। ইতিহাসে প্রথমবারের মত।

কোন কোন প্রতিদ্বন্দ্বীতার সুরাহা করে? নিজেকেই প্রশ্ন করে ল্যাঙডন।

ক্রিয়েশনিজম! কীভাবে সৃষ্টি জগৎ তৈরি হল সে রহস্যের দুয়ারে করাঘাত করেন।

ও! সেই বিতর্ক!

বাইবেল বলে, ঈশ্বর এই ইউনিভার্সকে তুলে এনেছেন মহা শূণ্যতা থেকে। বলেছেন, লেট দেয়ার বি লাইট। দুঃখজনক হলেও সত্যি, পদার্থবিদ্যা বলে, বস্তু কখনোই একেবারে শূণ্য থেকে উঠে আসতে পারে না।

একেবারে শূণ্যতা থেকে উঠে আসা সমর্থন করে না বিজ্ঞান।

মিস্টার ল্যাঙডন, বলছে ভিট্টোরিয়া, মনে হয় আপনি বিগ ব্যাঙ থিওরির সাথে পরিচিত।

মোটামুটি।

ল্যাঙডন জানে, বিগ ব্যাঙ হল এই ইউনিভার্সের সৃষ্টির তত্ত্ব। কোন এক ঘনবিন্দুতে

সন্নিবিষ্ট হওয়া শক্তির বিস্ফোরণ। বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে সেটা। এই হল ইউনিভার্সের গল্প।

বলে চলেছে ভিট্টোরিয়া, ক্যাথলিক উনিশো সাতাশে প্রথম বিগব্যাঙ থিওরি প্রস্তাব করে।

আই এ্যাম স্যরি! বলল ল্যাঙডন, আপনি বলছেন যে বিগ ব্যাঙ থিওরি ক্যাথলিক চার্চের অবদান!

অবশ্যই। একজন ক্যাথলিক, জর্জ লেমিত্রে, উনিশো সাতাশে।

কিন্তু আমি মনে করেছিলাম... বিগ ব্যাঙ তত্ত্বটা কি হার্ভার্ডের এডউইন হাবলের প্রস্তাবনা নয়?

কোহলার এবার কথা বলে উঠল। আবারো, আমেরিকানদের ভুল ধারণা। হাবলের প্রস্তাবনাটা ওঠে উনিশো উনত্রিশে। লেমিত্রের দু বছর পর।

কিন্তু এর নাম হাবল টেলিস্কোপ। আমি কোন লেমিত্রে টেলিস্কোপের কথা শুনিনি কষ্মিন কালেও!

মিস্টার কোহলারের কথাই সত্যি। প্রস্তাব করেছিলেন লেমিত্রে। হাবল পরে প্রমাণ সংগ্রহ করেন।

ওহ।

ভেবে পায় না ল্যাঙডন, হার্ভার্ডের হাবল-পাগলা লেকচারাররা কি কখনো ভুলেও লেমিত্রের কথা তুলেছে?

লেমিত্রে যখন প্রথম বিগ ব্যাঙ থিওরির কথা প্রকাশ করলেন, বলছে ভিট্টোরিয়া, তখন সমস্বরে ভেঙচি কাটলেন বিজ্ঞানীরা। বস্তু, বললেন তারা, কখনোই তৈরি হতে পারে না শূণ্যতা থেকে। তারপর যখন প্রমাণ হাজির করলেন হাবল, শতকণ্ঠে গির্জা বিজয় দাবি করল। প্রমাণিত হয়ে গেল বাইবেলের কথা বৈজ্ঞানিক।

নড করল ল্যাঙডন, ব্যাপারটার উপর এতোক্ষণে তার নজর পড়ল।

অবশ্যই, বিজ্ঞানীরা তাদের আবিষ্কারকে ধর্ম প্রচারের ঝান্ডা হিসাবে ব্যবহার করতে দিতে চাইলেন না। সুতরাং তারা সাথে সাথে বিগ ব্যাঙ থিওরিকে গাণিতিক রূপ দিলেন। এখনো, সেই গাণিতিক হিসাবের পরও, চার্চ উপরে আছে একটা দিক দিয়ে।

মাথা নাড়ল কোহলারও, দ্য সিঙ্গুলারিটি।

ইয়েস, দ্য সিঙ্গুলারিটি। বলছে ভিট্টোরিয়া, টাইম জিরো। সে সময়টাকে ব্যাখ্যা করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল বিজ্ঞানীদের জন্য। গণিত এগিয়ে যায় টাইম জিরো পর্যন্ত। তার পরই খেই হারিয়ে পড়ে।

ঠিক, বলল কোহলার, সেখানে একটা প্রভাবকের প্রয়োজন পড়ে।

বিগ ব্যাঙের সাথে ঈশ্বরের সম্পৃক্ততার কথা বলেন আমার বাবা। বিজ্ঞান আজ বোঝ না সে মুহূর্তটাকে। একদিন বুঝতে পারবে, এটাই তার আশা ছিল।

মেসেজটা পড়ল ল্যাঙডন :

বিজ্ঞান আর ধর্ম বিপবীত নয়।
বিজ্ঞান এত নবীন যে সে বুঝতে পারে না।

বাবা বিজ্ঞানকে আরো উচ্চতর একটা স্তরে পৌঁছে দিতে চান, যেখানে বিজ্ঞান মেনে নেবে ঈশ্বরকে। তিনি সে প্রমাণ আনার জন্য এমন এক পথ বেছে নিলেন যেটার কথা কোন বিজ্ঞানী ভাবেনি। নেই তাদের সেই টেকনোলজি। তিনি এমন এক পরীক্ষা করার কথা ভাবলেন যা মানুষকে জানাবে যে জেনেসিস সম্ভব।

জেনেসিস প্রমাণ করা? লেট দেয়ার বি লাইট, শূণ্য থেকে বস্তু?

ঘরের উপর অলস দৃষ্টি পড়ল কোহলারের, মাফ করবে!

আমার বাবা একটা সৃষ্টি জগত তৈরি করেছেন... শূণ্যতা থেকে।

কী!

বলা ভাল, তিনি বিগ ব্যাঙ তৈরি করেছিলেন। অবশ্য একেবারে ছোট পরিমাণে... পদ্ধতিটা একেবারেই সরল। এ্যাক্সিলারেটর টিউবের ভিতর থেকে পার্টিকেলের দুটো অতি পাতলা প্রবাহ বইয়ে দিলেন। তারা একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অবিশ্বাস্য গতিতে। তাদের সমস্ত ক্ষমতা একত্র করল একটা মাত্র বিন্দুতে। সেখানে অত্যন্ত শক্তিশালী এ্যানার্জি তৈরি হল।

ফলাফল খুব বেশি বিস্ময়কর নয়। তার কাছে। কিন্তু যখন সেটা প্রকাশিত হবে, কেঁপে যাবে আধুনিক ফিজিক্সের ভিত্তিমূল। এ অবস্থায়, বস্তুর কণা জন্মাতে শুরু করল শূণ্য থেকে।

বলল না কিছু কোহলার। তাকিয়ে থাকল ফাঁকা দৃষ্টিতে।

বস্তু প্রস্ফুটিত হল একেবারে শূণ্য থেকে। সাব এটমিক ফুলঝুরির এক অসাধারণ প্রদর্শনী। শুধু তাই নয়, তিনি প্রমাণ করলেন, এই সবই ঘটেছে এক অবিশ্বাস্য শক্তির সান্নিধ্যে।

তার মানে ঈশ্বর? দাবি করল কোহলার।

গড, ঈশ্বর, বুদ্ধ, দ্য ফোর্স, ইয়াহওয়েহ, দ্য সিঙ্গুলারিটি, একীভুত বিন্দু—যে নামেই ডাকুন না কেন, ফলাফল একই—বিজ্ঞান আর ধর্ম একই কথা বলে, পিওর এনার্জিই সৃষ্টির মূল।

প্রমাণ?

এই ক্যানিস্টারগুলো। সেগুলোর স্পেসিমেন তিনিই তৈরি করেছেন।

কীভাবে প্রমাণ করবে? যে কোন স্থান থেকে সেগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব?

সম্ভব নয়। এই পার্টিকেলগুলো ইউনিক। তারা এমন এক বস্তু, যা পৃথিবীর বুকে কোথাও পাওয়া যায় না।

কোহলার বলল, ভিট্টোরিয়া, কী করে তুমি বল যে বিশেষ ধরনের পদার্থ? পদার্থ তো সবই—

আপনি এর মধ্যেই এ বিষয়ে কথা বলে ফেলেছেন, ডিরেক্টর। সৃষ্টি জগতে দু ধরনের পদার্থ আছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য।

মিস্টার ল্যাংডন, বাইবেল, সৃষ্টির ব্যাপারে কী বলে?

বলে... ঈশ্বর তৈরি করলেন আলো এবং অন্ধকার, স্বর্গ এবং নরক।

ঠিক তাই। তিনি সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করলেন।

ডিরেক্টর, বিজ্ঞানও একই কথা বলে, এই ইউনিভার্সেরও বৈপরীত্য আছে...

বস্তুর ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য... ফিসফিস করল কোহলার।

ঠিক তাই। বাবা তার পরীক্ষা চালানোর সাথে সাথে, দু প্রকারের বস্তু তৈরি হল।

যে বস্তুর কথা তুমি বলছ সেটা ইউনিভার্সের অন্য কোন প্রান্তে আছে। নেই আমাদের সৌর জগতে। সম্ভবত আমাদের গ্যালাক্সিতেও নেই।

তাতেই প্রমান হয়ে যাচ্ছে যে, ঐ ক্যানিস্টারের জিনিসগুলো আনা হয়েছে শূণ্য থেকে।

তুমি নিশ্চয়ই বলবে না যে ঐ স্পেসিমেনগুলো—

তাই বলব, ডিরেক্টর! আপনি পৃথিবীর প্রথম এন্টিম্যাটার স্পেসিমেনের দিতে তাকিয়ে আছেন।

২০

অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়েদ্বিতীয় ধাপ ভাবল হ্যাসাসিন।

তার হাতের মশালটা নিভু নিভু হয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে সময়। ভয়, তার আজীবনের সঙ্গী, পিছু ছাড়ছে না। যে কোন যুদ্ধে ভয় এগিয়ে থাকবে সব সময়।

সামনের আয়নাটা জানাচ্ছে তাকে যে, সে একেবারে নিখুঁত। ছদ্মবেশে কোন ভুল নেই। রোব আকড়ে ধরল সে।

দু সপ্তাহ আগে হলেও বলা যেত, এর অপর নাম মরণ। বলা যেতে পারেখালি হাতে সিংহের খাঁচায় ঢোকা আর এখানে আসা সমান।

কিন্তু সব ব্যাপারটাকে পাল্টে দিয়েছে জ্যানাস।

এখন একটা চিন্তাই তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, জ্যানাসের কথামত তারা শান্ত থাকবে তো? নিশ্চিন্তে সারা যাবে তো কাজ?

যাবে।

ভিতর থেকে সাহায্য আসছে, বলেছিল জ্যানাস।

ভিতর থেকে? অসম্ভব। অবিশ্বাস্য।

যত ভিতরে যাচ্ছে, ততই বুঝতে পারছে, এ যেন ছেলেখেলা।

ওয়াহাদ... তিস্তাইন... সালাসা... আরবাআ... শেষপ্রান্তে চলে যাবার আগে আরবিতে বলল।

এক... দুই... তিন... চার...

মনে হয় আপনি এন্টিম্যাটারের কথা আগে থেকেই জানেন, তাই না মিস্টারল্যাঙডন? জিজ্ঞাসা করল ভিট্টোরিয়া।

জানতাম... একটুএকটু।

আপনি স্টার ট্রেক দেখেন, তাই না?

আমার ছাত্র ছাত্রীরা দেখে। ইউ এস এস এন্টারপ্রাইজকে চালায় না এন্টিম্যাটার?

ভাল সায়েন্স ফিকশন, ভাল সায়েন্সের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়।

তাহলে এন্টিম্যাটারের কাহিনী সত্যি?

প্রকৃতির গূঢ় ব্যাপার। সব কিছুর বিপরীত ব্যাপার আছে। প্রোটনের বিপরীত ইলেক্ট্রন, আপ কোয়ার্কের ক্ষেত্রে ডাউন কোয়ার্ক। প্রতিবস্তু সব হিসাবের মধ্যে একটা পূর্ণতা এনে দেয়।

এখনো বিশ্বাস হতে চায় না ব্যাপারটা।

উনিশো আঠারো থেকেই বিজ্ঞানীরা জানে যে সব ব্যাপারের বিপরীত আছে। বিগ ব্যাঙে এন্টিম্যাটার তৈরি হয়েছিল।

এক ধরনের বস্তু আমরা। আমাদের পৃথিবী, শরীর, বৃক্ষ, সব। আর এর বিপরীতের সব একই রকম, শুধু এর চার্জের ক্ষেত্রটা উল্টো।

কোহলারের ঝালিয়ে নেয়ার সময় এসেছে, কিন্তু এ কাজের পথে বিরাট বাঁধা আছে। স্টোর করবে কী করে? আলাদা করে রাখবে কীভাবে?

প্রতিবস্তুর পজিট্রনগুলো আসার সাথে সাথে সেগুলোকে আকৃষ্ট করে আলাদা করার ব্যবস্থা করেছিলেন বাবা।

ভ্যাকুয়াম?

হ্যাঁ।

কিন্তু ভ্যাকুয়াম, ম্যাটার আর এন্টিম্যাটার দুটোকেই শুষে নেবে।

বাবা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করলেন। ফলে, চুম্বকের প্রভাবে, ম্যাটার চলে গেল বামে আর এন্টিম্যাটার চলে গেল ডানে। বেঁকে গেল তারা বিপরীত দিকে।

এত যুক্তির ভিতরে একটু একটু করে প্রবেশ করছে কোহলার। অ... বিশ্বাস্য! বলল সে, এখনো হার মেনে নেয়নি, তাহলে সেটাকে স্টোর করবে কী করে? এই ক্যানিস্টার ভ্যাকুয়াম থাকে, কিন্তু এগুলো তো ম্যাটারের তৈরি। বস্তুর সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে প্রতিবস্তু-

স্পেসিমেন কখনোই ক্যানিস্টারের গায়ে লেগে যাবে না, বলছে ভিট্টোরিয়া, এ ক্যানিস্টারগুলোর নাম দিয়েছি এন্টিম্যাটার ট্র্যাপ। স্পেসিমেটুকু আর যাই করুক, ক্যানিস্টারের গায়ে লাগবে না কস্মিনকালেও।

কীভাবে?

দুটো ভিন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণে। এদিকে, তাকান।

তাকাল কোহলার একটা কালো, বন্দুকের মত নলের ভিতর দিয়ে।

তোমরা দেখার মত এ্যামাউন্ট তৈরি করেছ?

দেখা যাচ্ছে টলটলে একটা তরল বিন্দুকে। ভাসছে।

পাঁচ হাজার ন্যানোগ্রাম। মিলিয়ন পজিট্রনের একটা লিকুইড প্লাজমা।

লক্ষ লক্ষ!!! কিন্তু কেউ কখনো একত্রে মাত্র কয়েকটার বেশি এন্টিম্যাটার তৈরি করতে পারেনি।

তিনি জেননকে কাজে লাগিয়েছিলেন। জেননের জেটে পার্টিকেল বিম প্রবাহিত করেন। এগুলো ইলেক্ট্রন থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। কাঁচা ইলেক্ট্রনও কাজে লাগে এক্সিলারেটরে।

ল্যাঙডন ভেবে পায় না এখনো তারা ইংরেজিতে কথা বলছে কিনা।

টেকনিক্যালি, তা থেকে—

ঠিক তাই! অনেক অনেক পাওয়া যাবে।

আবার তাকাল কোহলার আইপিস দিয়ে। তাকিয়েই থাকল। তারপর চোখ তুলে, কপালের রেখাকে গভীরতর করে বলল, মাই গড... তোমরা সত্যি সত্যি কাজটা করেছ!

আমার বাবা করেছেন।

কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

ল্যাওডনের দিকে তাকাল ভিট্রোরিয়া, আপনি একবার চোখ রাখবেন?

চোখ রাখল সে।

এবং দেখতে পেল।

তার প্রত্যাশা অনুযায়ী জিনিসটাকে ক্যানিস্টারের তলায় পাওয়া গেল না। পারদের মত চকচকে একটা তরল ভেসে আছে উপরে। এর উপরিতলে সর্বক্ষণ কাঁপন উঠে আসছে। একবার শূণ্যতায় জলের ফোঁটার কাজ দেখেছিল সে। এ ব্যাপারটাও তেমনি।

এটা... ভাসছে এটা!

এমন থাকাই তার সাজে, বলল ভিট্রোরিয়া, এন্টিম্যাটার চরম অস্থিতিশীল। এন্টিম্যাটার আর ম্যাটার যদি একত্র হয় তাহলে তুলকালাম কান্ড ঘটে যাবে। বাতাসের সংস্পর্শ এলেও ফুঁসে উঠবে তারা।

আবার হতবাক হয়ে যায় ল্যাঙডন।

ভ্যাকুয়ামে কাজ করার কথা বলছে!

এন্টিম্যাটার ট্র্যাপগুলোও কি....তোমার বাবার কাজ?বলল কোহলার।

আসলে,.. সেটার ভার আমার।

চোখ তুলে তাকাল কোহলার।

আমিই তাকে পথ বাৎলে দিই। বলি এমন একটা পথ বের করার কথা।

তাকিয়ে থাকল ল্যাঙডন। কোহলারের কথাই সত্যি। এ অসাধারণ।

চুম্বকের পাওয়ার সোর্স কোনটা?

ট্র্যাপের নিচের একটা পিলার। অবাক হলেও সত্যি, ফাঁদের ব্যাপারটা অসম্ভব ভাল।

সে ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু যদি কারেন্ট চলে গেল?

হতেই পারে। বোতলের এ অংশটায় তরল নিয়ে এসে, আমরা একটা বিস্ফোরণ ঘটাব। দেখব এ্যানিহিলেশস।

এ্যানিহিলেশন? ভেবে পায় না এ কথার মানে।

যদি একবার এখানে, আমাদের কাছাকাছি, পৃথিবীর বুকে একটা প্রতিবস্তুর কণা পড়ে, বিলুপ্ত হয়ে যাব আমরা। এন্টিম্যাটার আর ম্যাটার মিললে এ পরিণতি হবেই।

ওহ!

এটা একেবারে সহজ। একটা বস্তু আর প্রতিবস্তু পরস্পরের সাথে মিলিত হলে নতুন একটা কণা বেরোয়। ফোটন। আলোর কণা।

ল্যাঙডন ফোটনের কথা পড়েছে। বলা চলে আলোর একক। শক্তির প্যাকেট। ক্লিঙ্গনদের বিরুদ্ধে ক্যাপ্টেন কার্ক কীভাবে ফোটন ব্যবহার করে তা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেয় সে। তার মানে, এন্টিম্যাটার পড়লে আমরা আলোর একটা ছোট্ট রেখা দেখতে পাব?

শ্রাগ করল ভিট্রোরিয়া, নির্ভর করছে কোনটাকে আপনি ছোট্ট বলেন। এখানে, আমাকে দেখাতে দিন।

একটা ক্যানিস্টারকে প্রস্তুত করল সে।

সাথে সাথে যেন পাগল হয়ে গেল কোহলার।

ভিট্রোরিয়া! পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি?

কোহলার, অবিশ্বাস্যভাবে, তার দু পায়ের উপর, কাঠির মত দু পায়ের উপর ভর দেয়। তার চেহারা কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আতঙ্কে। ডিরেক্টরের হঠাৎ আসা আতঙ্কের কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না ল্যাঙডন।

পাঁচশ ন্যানোগ্রাম! তুমি যদি চৌম্বক ক্ষেত্রটা ভাঙ...।

ডিরেক্টর! এটা একেবারে নিরাপদ। প্রত্যেকটা ট্র্যাপের ফেইল সেফ আছে। রিচার্জার থেকে সরিয়ে আনলে একটা ব্যাটারি তাকে ব্যাক আপ দেবে। ভয় নেই।

ব্যাটারিগুলো অটোম্যাটিক এ্যাকটিভেটেড হয়। চব্বিশ ঘণ্টা। লাগাতার।

প্রতিবস্তুর একটা বিচিত্র ব্যবহার আছে, মিস্টার ল্যাঙডন। একটা দশ মিলিগ্রামের প্রতিবস্তু, বালির কণার সমান যার আয়তন, দুশ মেট্রিকটন প্রচলিত রকেট ফুয়েলের চেয়েও বেশি কাজ করে।

আবার চক্কর দিতে শুরু করল ল্যাঙডনের মাথা।

এটাই আগামী দিনের শক্তির উৎস। নিউক্লিয়ার এ্যানার্জির চেয়ে হাজার গুণ বেশি ক্ষমতাবান। একশোভাগ কর্মক্ষম। কোন বাই প্রোডাক্ট নেই। নেই তেজস্ক্রিয়তা। নেই দূষণ। মাত্র কয়েক গ্রাম বেশ কয়েকদিনের জন্য একটা বড় মহানগরীর চাহিদা মিটাতে পারবে।

গ্রাম?

দুঃখ পাবেন না। আমাদের পরীক্ষার পরিমাণ লাখ লাখ ভাগের এক ভাগ, সেই ভরের। অনেক কম ক্ষতিকর।

তুলে ফেলল ভিট্রোরিয়া একটা ক্যানিস্টার। সেখানে লেডের আলো কাউন্ট ডাউন শুরু করে দিয়েছে।

২৪:০০:০০...

২৩:৫৯:৫৯...

২৩:৫৯:৫৮...

এতো টাইম বোমা!

ব্যাটারিটা, ব্যাখ্যা করছে ভিট্রোরিয়া, মরে যাবার আগে পুরোদস্তুর চব্বিশ ঘণ্টা জুড়ে কাজ করবে। আবার পোডিয়ামে ফিরিয়ে দিলে চার্জ হতে থাকবে। যেন বহন করা যায়, সেজন্যেই এ ব্যবস্থা।

পরিবহন? আৎকে উঠল কোহলার, তুমি এ জিনিসকে বাইরে নেয়ার মতলব আঁটছ?

অবশ্যই না। কিন্তু এতে করে আমরা কাজ আরো ভাল করে করতে পারি।

একটা দরজা খুলল ভিট্রোরিয়া। তার পিছনে আগাগোড়া ধাতুতে মোড়া একটা ঘর। মনে পড়ে গেল ল্যাঙডনের, হেনতাই কীর্তি দেখার জন্য পাপুয়া নিউ গিনিতে গিয়ে এমন ব্যাপারটা দেখেছিল সে।

এটা এ্যানিহিলেশন ট্যাঙ্ক। ঘোষণা করল ভিট্রোরিয়া।

চোখ তুলে তাকাল কোহলার, তোমরা সত্যি সত্যি এ্যানিহিলেশন কর?

বাবা। বলল ছোট্ট করে ভিট্রোরিয়া, একটা ধাতব ড্রয়ার টেনে বের করতে করতে। সাথে সাথে ট্রাপটা চলে গেল ঘরের মাঝামাঝি। ...

একটা শক্ত হাসি দিল ভিট্রোরিয়া, আপনারা এখন প্রথম দেখতে পাবেন ম্যাটার আর এন্টিম্যাটারের সংঘর্ষ। অতি কম। এক গ্রামের লাখ লাখ ভাগের এক ভাগ।

বাকি দুজন বোকাটে দৃষ্টি নিয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকা ক্যানিস্টারটার দিকে তাকাল।

সাধারণত চব্বিশ ঘণ্টা প্রতীক্ষা করার কথা। কিন্তু এই চেম্বারটার ভিতরে, নিচে আরো শক্তিশালী ক্ষেত্র আছে। সেটা পরাস্ত করবে ক্যানিস্টারের শক্তিকে। আপনারা দেখতে পাবেন...।

এ্যানিহিলেশন? বলল কোহলার।

আরো একটা ব্যাপার। এন্টিম্যাটার একেবারে খাঁটি শক্তি নির্গত করে। ভরকে শতভাগ

ফোটনে রূপান্তরিত করে। তাই সরাসরি স্যাম্পলের দিকে তাকাবেন না। শিল্ড ইউর আইস।

বেশি বেশি করছে কি ভিট্রোরিয়া? ত্রিশগজ দূরে তারা। বিশেষ কাঁচের জানালা দিয়ে আলো আসবে। ভিতরের এন্টিম্যাটারটা দেখা যাবে না।

বাটন চাপল ভিট্রোরিয়া।

একটা আলোর বিন্দু বেরিয়ে এল।

ছড়িয়ে গেল সারা এলাকায়। আলোর শকওয়েভ ঠিক ঠিক টের পেল. তারা। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল চোখ কোটর ছেড়ে।

একটা মুহূর্ত, মুহূর্তেরও ভগ্নাংশ।

তারপর আলোটা ফিরে গেল আগের উৎসতে। তারপর থেমে গেল। একটা বিন্দুতে একটু জ্বলে থেকে গেল নিভে।

চোখ পিটপিট করল ল্যাঙডন…

গ… গড!

ঠিক এ কথাটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন আমার বাবা।

কোহলার আরো বেশি বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে চেম্বারের দিকে।

আমি আমার বাবাকে এবার দেখতে চাই। ল্যাব দেখিয়েছি, এবার দেখতে চাই বাবাকে।

এত দেরি কেন করলে, ভিট্রোরিয়া? তোমার আর তোমার বাবার উচিৎ ছিল এ প্রজেক্ট সম্পর্কে আগেভাগে আমাকে জানানো।

কত কারণ চাও তুমি?

ডিরেক্টর, এ নিয়ে বচসা করার অনেক সময় হাতে পাব আমরা। ঠিক এখন, আমি আমার বাবাকে দেখতে চাই।

তুমি কি জান এ টেকনোলজির কত মূল্য?

শিওর, সার্নের জন্য টাকা। অসীম টাকা। এবার আমি বাবাকে দেখতে চাই।

কেন তোমরা লুকিয়ে রাখলে? আমি রেজিস্টার করে ফেলব এ ভয়ে? শুধু টাকা নয় ভিট্রোরিয়া, বিজ্ঞান একেবারে আনকোরা নূতন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। মানবজাতি পৌঁছে যেতে চলেছিল সৃষ্টি জগতের প্রান্তে প্রান্তে। সব সায়েন্স ফিকশনের কল্পনাও চলে যাচ্ছিল পুরনো হয়ে।

এটাকে লাইসেন্সড করাও প্রয়োজন। বলল ভিট্রোরিয়া, এর গুরুত্ব আমরা ভাল করেই জানতাম। জানতাম, এ নিয়ে বিপদের সম্ভাবনাও কম নয়। আমরা সময় নিচ্ছিলাম একে আরো আরো নিরাপদ করার কাজের জন্য।

অন্য কথায়, তোমরা বোর্ড অব ডিরেক্টরসকে তোয়াক্কা করনি।

আরো কারণ আছে। বাবা এন্টিম্যাটারকে আরো আলোকিত অবস্থায় সবার সামনে উপস্থাপন করার কাজ করছিলেন।

মানে?

জেনেসিস। ঈশ্বরের উপস্থিতি।

তার মানে তিনি চাচ্ছিলেন না কেউ নাক গলাক?

অনেকটা তাই।

এবং তিনি বাণিজ্যিকতায় যেতে চাচ্ছিলেন না শুরুতেই?

অনেকটা তাই।

আর তুমি?

নিশ্চুপ ভিট্রোরিয়া। এ প্রযুক্তির জন্য দিনরাত ঘুম হারাম করেছিল তারা। প্লাস্টিকের আধার বানিয়েছে। প্লাস্টিকের ব্যাটারি বানিয়েছে। নিরাপদ করেছে আরো আরো।

আমার আগ্রহ, বলল ভিট্রোরিয়া, বিজ্ঞান আর ধর্মকে এক করে দেয়ার চেয়ে বেশি ছিল অন্য এক ব্যাপারের উপর।

পরিবেশ?

এ প্রযুক্তি পুরো দুনিয়াকে বাঁচিয়ে তুলতে পারত। এক ধাক্কায় গোটা পৃথিবীকে তুলে আনতে পারত প্রথম বিশ্বের সারিতে।

অথবা এটাকে ধ্বসিয়ে দেয়া। কে ব্যবহার করছে তার উপর নির্ভর করবে অনেক কিছু।

অন্য কেউ না। বলেছি আমি সেকথা।

তাহলে কী কারণে তোমার বাবা খুন হলেন?

কোন ধারণাই নেই। সার্নে তার শত্রুর কোন অভাব ছিল না। কিন্তু এর সাথে এন্টিম্যাটারের কোন গোল নেই। আর কাউকে বলব না, এ প্রতিশ্রুতি ছিল আমাদের মধ্যে।

তোমাদের প্রস্তুতি শেষ হওয়া পর্যন্ত?

হ্যাঁ।

আর তুমি নিশ্চিত বাবা সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন?

এরচেয়ে অনেক বড় বড় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন তিনি!

আর তুমিও বলনি কাউকে?

অবশ্যই বলিনি!

ধরে নেয়া যাক, স্রেফ ধরে নেয়া যাক, কেউ জানতে পারল, বা কেউ আসতে পারল, কী মনে হয়, কীসের খোঁজ করবে সে? এখানে তোমার বাবার কোন নোট কি আছে? ডকুমেন্ট?

ডিরেক্টর, অনেক ধৈর্য ধরেছি। এবার কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে আমাকেও। আপনি বারবার এখানে প্রবেশের কথা বলছেন–

কথার জবাব দাও। কী খোয়া যেতে পারে?

আমার কোন ধারণা নেই। আসেনি কেউ। সবই ঠিকঠাক গোছানো আছে উপরে।

উপরে?

হ্যাঁ, এখানে, আপার ল্যাবে।

তোমরা লোয়ার ল্যাবটাও কাজে লাগাচ্ছ?

স্টোর হিসাবে।

তোমরা হাজ-মাত চেম্বার ব্যবহার করছ? কীসের স্টোর হিসাবে?

আর কীসের!

উত্তেজনায় বিষম খেল কোহলার। আরো স্পেসিমেন আছে? আগে বলনি কেন?

আমি কোন সুযোগ পাইনি বলার।

আমাদের সেসব চেক করতে হবে। এখনি!

সেটা, সিঙ্গুলার। আর কেউ সেটার টিকিটারও খোঁজ পাবে না।

মাত্র একটা? উপরে নেই কেন?

বাবা জিনিসটাকে নিরাপত্তার খাতিরে নিচে রেখেছেন। এটা আর সবগুলোর চেয়ে বড়।

তোমরা পাঁচশ ন্যানোগ্রামের চেয়ে বড় স্পেসিমেন তৈরি করেছ?

প্রয়োজনে। আমাদের প্রমাণ করতে হত যে ইনপুট করার সময় বেশি পরিমাণ নিলেও ভয় নেই।

তেলের ট্যাঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান জ্বালানিটাকে তারা উপরে না রেখে নিচে রেখেছে শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল নাকি ভয়ে কুকড়ে গেল সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

বাবা চাননি বড় স্পেসিমেন তৈরি করতে। ভিট্টোরিয়াই চাপ দিত সব সময়। দুটো ব্যাপার প্রমাণ করতে হত তাদের। আরো দুটো ব্যাপার। প্রথমত, বিশাল পরিমাণে সেগুলো জমানো যায়। দ্বিতীয়ত, সেগুলো স্টোর করা যায় নিরাপদে।

হাজ-মাতে, গ্রানাইটের একটা ছোট্ট খুপরিতে, আরো পঁচাত্তর ফুট নিচে, বসানো ছিল সেটা।

সেখানেও, শুধু তারা দুজনে যেতে পারবে।

ভিট্টোরিয়া! এবার মিনতি ঝরে পড়ল কোহলারের কণ্ঠে, কত বড় স্পেসিমেন তুমি আর তোমার বাবা মিলে তৈরি করেছ?

অবিশ্বাস্য বিস্ময় দেখা দেবে এখন গ্রেট ম্যাক্সিমিলিয়ান কোহলারে চোখে। ভেবে তৃপ্ত হয় ভিট্টোরিয়া।

এক গ্রামের পুরো চার ভাগের একভাগ।

কোহলারের চোখমুখ থেকে সরে গেল সমস্ত রক্ত, কী! একগ্রামের চার ভাগের এক ভাগ? এর শক্তি... প্রায় পাঁচ কিলোটনের সমান!

কিলোটন! শব্দটাকে ঘৃণা করে ভিট্টোরিয়া। এক কিলোটন হল এক হাজার মেট্রিকটন টি এন টির সমতুল্য।

এটা বিস্ফোরকের হিসাব। অকল্যাণের হিসাব।

সে আর বাবা মিলে সব সময় ইলেক্ট্রন-ভোল্টে মাপত শক্তিটাকে। নয়ত জোল্টে।

এই পরিমাণ বিস্ফোরক আধমাইল ব্যাসের জায়গাকে ধূলার সাথে মিশিয়ে দেবে এক পলকে!

যদি পুরোটাকে একেবারে জ্বালানো হয়। কেউ তা করতে পারবে না।

যদি কেউ ভুল করে বসে... যদি তোমার পাওয়ার সোর্স নষ্ট হয়ে যায়... –

সেজন্যেই বাবা সেটাকে হাজ-মাতে, নিরাপদ দূরত্বে, ফেইল সেফ সহ- বসিয়ে রেখেছেন।

হাজ-মাতেও তোমাদের বাড়তি নিরাপত্তা আছে?

দ্বিতীয় রেটিনা স্ক্যান।

নিচের দিকে! এখনি!

ফ্রাইট এলিভেটর একটা পাথরের মত পড়ে গেল।

আরো পঁচাত্তর ফুট নিচে।

দুজনের চোখে কেন ভয় দেখতে পাচ্ছে ভেবে পায় না ভিট্টোরিয়া।

একেবারে তলায় পৌঁছে গেল তারা।

একটা করিডোর। তার শেষ প্রান্তে লোহার গেটে লেখা, হাজ-মাত। স্ক্যান করাল সে নিজের চোখ।

চোখ তুলে ফেলল সে সাথে সাথে। সেখানে কিছু একটা আছে... রক্ত?

ফিরল সে দুজনের দিকে। তাদের মুখও ফ্যাকাশে। তাকিয়ে আছে ভিট্টোরিয়ার পায়ের দিকে।

ভিট্টোরিয়া তাদের চোখকে অনুসরণ করে তাকাল নিচে।

না! দৌড়ে গেল ল্যাঙডন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

মেঝেয় পড়ে থাকা জিনিসটার দিকে আটকে গেল তার চোখ। এটা একই সাথে একেবারে অপরিচিত এবং সুপরিচিত।

একটা মাত্র পল লাগল।

বুঝল সে ঠিক ঠিক। চিনতে ভুল হল না চোখের গোলকটাকে।

২৪

সিকিউরিটি টেকনিশিয়ান তার কাঁধে কমান্ডারের শ্বাস টের পায়। তাকিয়ে আছে সে শক্ত ঘাড়ে, স্ক্রিনের দিকে।

কমান্ডারের নিরবতার কারণ আছে। বোঝায় সে নিজেকে। তিনি একজন প্রটোকল মানা লোক। তিনি কখনোই আগে বলে এবং পরে চিন্তা করে কিছু করেন না। পৃথিবীর সবচেয়ে এলিট বাহিনীগুলো সেসব নিয়ম মানে।

কিন্তু সে কী ভাবছে?

একটা স্বচ্ছ ক্যানিস্টারের দিকে তাদের চোখ।

কীভাবে যেন সেটার ভিতরে একটা ফোঁটা ভেসে আছে।

সেইসাখে আছে রোবোটিক ব্লিঙ্ক। লেডের লাল আলোয় কাউন্ট ডাউন।

ক্যানিস্টারকে আরো একটু আলো দেয়া কি সম্ভব? জিজ্ঞেস করল কমান্ডার।

চেষ্টা চরিত্র করল টেকনিশিয়ান লোকটা। একটু আলো এল।

সামনের দিকে ঝুঁকে এল কমান্ডার। কন্টেইনারের একেবারে ভিত্তিতে একটা কিছু দেখা যাচ্ছে।

টেকনিশিয়ানের দৃষ্টি তার কমান্ডারকে অনুসরণ করুল। চারটে বড় হাতের অক্ষর আছে সেখানে।

এখানেই থাক, বলল কমান্ডার, কিছু বলোনা। আমি পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছি।

হাজ-মাত।

ভিট্টোরিয়া ভেট্রা পড়ে যাচ্ছে জ্ঞান হারাতে হারাতে। রবার্ট ল্যাঙডন এগিয়ে এল। তারা চোখ উপড়ে নিয়েছে!

দুমড়ে মুচড়ে গেল তার পৃথিবী। যেন এ এক স্বপ্ন। চোখ খুললেই সব মিথ্যা সরে যাবে।

খুলে গেল দরজা।

ভিতরে ঢুকতে ঢুকতেই সে প্রস্তুতি নিল, যে কোন কিছু দেখার জন্য এবং তার আশঙ্কাই সত্যি বলে প্রমাণিত হল।

ক্যানিস্টারটা নেই।

কেউ একজন এটাকে তুলে নিয়েছে। আর কল্যাণের অগ্রদূত পরিণত হয়েছে সবচেয়ে বীভৎস অস্ত্রে। নিয়ে নেয়ার সাথে সাথেই।

মারা গেছে বাবা। তার মেধার জন্যই।

আরো একটা আবেগ এগিয়ে এল। নিজেকে দোষী ভাবার আবেগ। এ কাজটা সেই করতে বলেছিল। বলেছিল বড় একটা স্পেসিমেন গড়তে। তৈরি করেছিল ব্যাক আপ সিস্টেম এবং ব্যাটারি।

এক গ্রামের এক চতুর্থাংশ...

আর সব টেকনোলজির মতই- আগুন, গান পাউডার, কমবাশন ইঞ্জিন এবং ভুল হাতে পড়লে এন্টিম্যাটারও, হতে পারে প্রাণঘাতী।

আর সময়টা বয়ে গেলে...

একটা অন্ধ করে দেয়া আলো। বজ্রপাতের শব্দ। একটা বিস্ফোরণ, শুধু আলোর একটা ঝলক। বিশাল, খালি একটা জ্বালামুখ তৈরি হয়ে যাবে। এক বিশাল, খালি জ্বালামুখ।

এর কোন ধাতব আবরণ নেই যে মেটাল ডিটেক্টরে ধরা পড়বে। নেই কোন কেমিক্যাল যে কুকুর ধরে ফেলবে। এটাকে বসানোর মত কোন চার্জারও নেই যে চার্জ করবে তারা।

ভিট্টোরিয়া তাকিয়ে আছে বোবার মত। স্থাণুর মত। তার চোখ থেকে আড়াল করার জন্য ল্যাঙডন তাকায় নিচে। রুমাল দিয়ে ঢেকে দেয় অক্ষিগোলকটাকে।

মিস্টার ল্যাঙডন! আপনি স্পেশালিস্ট, বলল কোহলার, আমি জানতে চাই এই ইলুমিনেটি বাস্টার্ডরা কী করবে ক্যানিস্টারটা দিয়ে।

ইলুমিনেটির কথা আমার এখনো অপ্রযোজ্য মনে হচ্ছে, মিস্টার কোহলার। হয়ত সার্নের ভিতর থেকেই কেউ স্যাবোটাজ করছে। কে, জানি না। কিন্তু ইলুমিনেটি বলতে এখনো কোন সংস্থার অস্তিত্ব আছে তা মনে হয় না।

এখনো আপনার কাছে অস্পষ্ট লাগছে মিস্টার ল্যাঙডন? যারাই খুনটা করে থাক না কেন- করেছে এই ক্যানিস্টারটা চুরি করার উদ্দেশ্যে। আর এ নিয়ে তাদের পরিকল্পনা আছে। নিশ্চিত।

সন্ত্রাসবাদ?

সোজা।

কিন্তু ইলুমিনেটি সন্ত্রাসী নয়।

কথাটা লিওনার্দো ভেট্রাকে বলুন।

ধাক্কা খেল ল্যাঙডন এবার। ইলুমিনেটির অপ্রকাশিত সিম্বল আকা আছে তার বাবার বুকে। কোন না কোন ব্যাখ্যা থাকবেই।

আবার ভাবে সে।

ইলুমিনেটি যদি এখনো টিকে থাকে, কী করবে তারা এন্টিম্যাটারটা নিয়ে? তাদের টার্গেট কী হতে পারে?

না। মিলছে না। ইলুমিনেটির এক শত্রু আছে ঠিকই। সেটা এখনো টিকে আছে। তাই

বলে এত বছর পর, সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে, মাস ডেস্ট্রাকশনের মাধ্যমে সে লক্ষ্য হাসিল করবে তার এমন কোন সম্ভাবনা নেই।

এখনো, সন্ত্রাসবাদের চেয়ে বড় কোন ব্যাখ্যা আছে...

কোহলার তাকাল। অপেক্ষা করছে।

বলা হয় ইলুমিনেটি ক্ষমতা চায়। কিন্তু সেটা অন্য কোন ক্ষেত্র থেকে। আর্থিক ক্ষেত্র, শিক্ষা ক্ষেত্র। তাদের হাতে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জিনিস, দ্য ইলুমিনেটি ডায়মন্ড, আছে সোনার খনি।

টাকা। বলল সে অবশেষে, টাকার জন্য কেউ এটাকে নিয়ে থাকতে পারে।

আর্থিক সুবিধা? কোথায় তারা এই এক ফোঁটা এন্টিম্যাটার বেচবে?

স্পেসিমেন নয়, বলল সে, টেকনোলজিটা। হয়ত কেউ চুরি করেছে প্রযুক্তিটা বোঝার জন্য।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ? কিন্তু এর ঘড়ি টিক টিক করে চলছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এর রফা দফা হয়ে যাবে।

তারা রিচার্জ করতে পারে। এমন একটা চার্জার তৈরি করতে পারে।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে? তারা যদি এটাকে নিয়ে গিয়ে সার্চে বসে যায় তবু চার্জার বানাতে ইঞ্জিনিয়ারদের গলদঘর্ম হতে হবে মাসের পর মাস ধরে। কয়েক ঘণ্টায়? অসম্ভব।

মৃদু কণ্ঠ শোনা গেল ভিট্টোরিয়ার দিক থেকে, তার কথা ঠিক।

দুজনেই তাকাল তার দিকে।

তার কথা ঠিক। ফ্লাক্স ফিল্টার, সার্ভো কয়েল, পাওয়ার কন্ডিশনিং এ্যালয়, এসব ঠিক করতে করতে অনেক সময় পেরিয়ে যাবে।

বুঝল ল্যাঙডনও, একটা সকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে সেটাকে চার্জ করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

একটা অস্বস্তি ঝুলেই রইল বাতাসে।

আমাদের ইন্টারপোলকে ডাকতে হবে, বিড়বিড় করল আঘাত পাওয়া ভিট্টোরিয়া,সময়মত ডাকতে হবে সঠিক অথরিটিকে।

কোহলার তাকাল তার দিকে, এ্যাবসোলিউটলি নট!

না? কী বলতে চান আপনি?

তুমি আর তোমার বাবা মিলে আমাকে একটা গোলক ধাঁধায় ফেলে দিয়েছ।

ডিরেক্টর, আমাদের সহায়তা প্রয়োজন! সময় মত ক্যানিস্টারটাকে ফিরে পেয়ে রিচার্জ করতে হবে। নাহলে.....

নাহলে আমাদের চিন্তা করতে হবে। এই পরিস্থিতি সার্নের জন্য কতটা মারাত্মকহতে পারে একবার ভেবেছ?

আপনি সার্নের সুনাম নিয়ে চিন্তিত? একটা শহুরে এলাকায় সেই ক্যানিস্টার কী করতে পারে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা আছে আপনার? এর ব্লাস্ট রেডিয়াস আধ মাইলের। নয়টা সিটি ব্লকের সমান!

হয়ত বানানোর সময় কথাটা মাথায় রাখা উচিৎ ছিল তোমাদের।

কিন্তু আমরা সব ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করেছি।

দেখাই যাচ্ছে, কাজ হয়নি তাতে!

কিন্তু কেউ জানেনি এ সম্পর্কে।

আর হাওয়া থেকে, না জেনে, কেউ এসে এটাকে নিয়ে গেছে।

ভিট্টোরিয়া কাউকে বলেনি। ঘুণাক্ষরেও না। তার বাবা কি বলেছে? তাও কি সম্ভব? আর যদি বলেও থাকে, তা আর জানার কোন উপায় নেই। তিনি এখন মৃত।

শর্টস এর পকেট থেকে একটা সেলফোন বের করল ভিট্টোরিয়া।

কোহলার ফেটে পড়ল রাগে, কাকে ফোন করছ?

সার্নের সুইচবোর্ডে। তারা আমাদেরকে ইন্টারপোলের সাথে যুক্ত করবে।

ভাব! তুমি কি এতই বোকা? ক্যানিস্টারটা এতক্ষণে দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে থাকতে পারে। কোন ইন্টেলিজেন্স তা পাবে না সময়মত।

আর তাই আমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব?

আমরা তাই করব, যা স্মার্ট। না ভেবে সার্নের সুনাম ভূলুণ্ঠিত করতে পারি না।

কোহলারের কন্ঠে যুক্তি আছে। আবার মানুষের জীবন রক্ষার শেষ চেষ্টা করাটাও সবচেয়ে বড় যুক্তির কাজ।

তুমি কাজটা করতে পার না। সাবধান করে দিল ভিট্টোরিয়াকে কোহলার।

শুধু চেষ্টা করুন আমাকে থামানোর।

নড়ল না কোহলার।

এক মুহূর্ত পরেই টের পেল ভিট্টোরিয়া, কেন। সেলফোনে ডায়াল টোন নেই মাটির এত নিচে।

সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিল ভিট্টোরিয়া।

শুরু করল ছোটা।

২৬

পাথুরে সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে হ্যাসাসিন। টানেলের বদ্ধ বাতাসে তার নিভু নিভু লণ্ঠন থেকে কালো ধোঁয়া মিশে গিয়ে আরো সমস্যা সৃষ্টি করছে। সামনের লোহার দরজা দেখতে এই টানেলের মতই পুরনো, এবং শক্ত।

চলে এসেছে সময়।

ভিতর থেকে কেউ একজন সহায়তা করবে। কেউ একজন ভিতর থেকে বিশ্বাস ভাঙবে। সারা রাত সে দাড়িয়ে থাকতে পারে এমন একটা প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করার সুবাদে।

কয়েক মিনিট পরে, একেবারে সময়মত একে একে ভারি চাবি দিয়ে দরজার তালাগুলো খোলার শব্দ উঠল। বোঝাই যায়, এটাকে অনেক কাল ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

তারপর নিরবতা।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে হ্যাসাসিন। পাঁচ মিনিট। ঠিক যেমন তাকে বলা হয়েছিল। তারপর, শক্ত হাতে সে ধাক্কা দেয়। খুলে যায় বিখ্যাত দরজায় পাল্লা।

ভিট্টোরিয়া! আমি এ কাজ অনুমোদন করব না!
এখন কেন যেন এ জায়গাটাকে অচেনা মনে হয়। কেন যেন গলার কাছে দলা পাকিয়ে ওঠে কান্না।
একটা ফোনের কাছে চলে যাও...
রবার্ট ল্যাঙডন এখনো চুপ করে আছে।
কীসের স্পেশালিস্ট সে? কীভাবে সহায়তা করবে? তারা দুজনেই কিছু না কিছু লুকাচ্ছে তার কাছ থেকে। কী সেটা?
সার্নের ডিরেক্টর হিসাবে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ, সার্নের ভবিতব্যের কথা আমাকে ভাবতে হয়–
বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ? আপনি কি সোজা নির্জলা মিথ্যা বলবেন? কাউকে জানাবেন না যে সেটা সার্ন থেকে খোয়া গেছে? আপনি কি বিনা দ্বিধায় এত মানুষের জীবনসংশয় নিয়ে ছেলেখেলা করবেন?
আমি না, তোমরা। তুমি আর তোমার বাবা।
দূরে তাকাল ভিট্টোরিয়া।
আর যতই জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলব আমরা, বলল কোহলার, এবার একটু নিচু লয়ে, জীবন হল এমন এক ব্যাপার যা নিয়ে এখন কথা বলা যায়। কিন্তু মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সার্নের মত প্রতিষ্ঠানের উপর। তুমি আর তোমার বাবার মত বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সমস্যা মিটানোর জন্য এখানে অহর্নিশি কাজ করছে।
থামল সে। তারপর আবার বলতে শুরু করল, বিজ্ঞান এই পৃথিবীর অর্ধেক সমস্যা এনেছে। আর স্পেস প্রোগ্রাম, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিসিন–সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জয় জয়কারের সাথে সাথে তার ভুলগুলোকেও শুধরে নেয়ার সময় এসেছে।
ভিট্টোরিয়া সাথে সাথে বলল, আপনি মনে করেন সার্ন পৃথিবীর ভবিষ্যতের সাথে এমন জটিলভাবে সম্পর্কিত যে আমাদের নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকেও দূরে থাকতে হবে?
আমার সাথে নৈতিকতা নিয়ে যুক্তি দেখাবে না। স্পেসিমেনটা তৈরির সময়ই নৈতিকতার দ্বার পেরিয়ে গেছ তোমরা। আমি শুধু এখানটার তিন হাজার বিজ্ঞানীর চাকরি রক্ষার চেষ্টা করছি না। চেষ্টা করছি তোমার বাবার সুনামও অক্ষুন্ন রাখতে। ব্যাপক বিদ্ধংসী অস্ত্রের আবিষ্কর্তা হিসাবে তার নাম জড়িয়ে যাওয়া কোন দিক দিয়েই ভাল নয়।
আমিই বাবাকে স্পেসিমেন তৈরি করতে বলেছি। যা ভুল সব আমার।

যখন দরজা খুলে গেল, তখনও কথা বলছিল কোহলার। থামল ভিট্টোরিয়া, তারপর আবার খুলল ফোন।
এখনো নেটওয়ার্ক নেই। ড্যাম! সে দরজার দিকে যেতে শুরু করল।
ভিট্টোরিয়া! থাম! কথা বলতে হবে আমাদের।
বাস্তা ভিপার্লারে!
বাবার কথা ভাব! কী করতেন তিনি?
চলে যাচ্ছে মেয়েটা।
ভিট্টোরিয়া! তোমাকে সব বলা হয়নি।
এবার টের পেল ভিট্টোরিয়া, তার পা স্থবির হয়ে আসছে।
জানি না কী ভাবছিলাম আমি। শুধু তোমাকে রক্ষার কথাই ভাবছিলাম। শুধু বল আমাকে, কী চাও তুমি। একত্রে কাজ করতে হবে আমাদের।
আমি শুধু এন্টিম্যাটারটা পেতে চাই। আর জানতে চাই কে আমার বাবাকে খুন করল।
ভিট্টোরিয়া, এরমধ্যেই আমরা জানি কে তোমার বাবাকে খুন করেছে। আই এ্যাম স্যরি।
কী?

ব্যাপারটা জটিল—

আপনি আগে থেকেই জানেন কে আমার বাবাকে খুন করেছে?

একটা স্পষ্ট ধারণা আছে। খুনি চিহ্ন রেখে গেছে। এজন্যই আমি মিস্টার ল্যাঙডনকে ডাকি।গ্রুপটা .....

গ্রুপ? টেররিস্ট গ্রুপ?

ভিট্টোরিয়া, তারা এক কোয়ার্টার গ্রাম এন্টিম্যাটার চুরি করেছে।

নতুন করে ভাবতে শুরু করল ভিট্টোরিয়া। তাকাল আমেরিকান লোকটার দিকে।

মিস্টার ল্যাঙডন, আমি জানতে চাই কে বাবাকে খুন করেছে। আর আপনার এজেন্সির সহায়তাও চাই।

আমার এজেন্সি?

আপনি ইউ এস ইন্টেলিজেন্সের সাথে যুক্ত, তাই না?

আসলে... না!

কোহলার নাক গলাল, মিস্টার ল্যাঙডন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর। আর্ট হিস্টোরির প্রফেসর।

একজন আর্ট টিচার?

তিনি কাল্ট সিম্বলজির বিশেষজ্ঞ। ভিট্টোরিয়া, আমরা মনে করছি তোমার বাবা কোন শয়তানি সংঘের কারণে নিহত হয়েছেন।

শয়তানি সংঘ?

দায়িত্ব স্বীকার করা গ্রুপের নাম ইলুমিনেটি।

ইলুমিনেটি? দ্য ব্যাভারিয়ান ইলুমিনেটি?

তাদের কথা জানতে?

স্টিভ জ্যাকসনের কম্পিউটার গেম আছে এর উপর। ব্যাভারিয়ান ইলুমিনেটিঃ দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার। ইন্টারনেটেই বেশিরভাগ লোক খেলে। কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারছি না...

ল্যাঙডনের দিকে একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কোহলার।

নড করল ল্যাঙডন, জনপ্রিয় গেম। প্রাচীণ ব্রাদারহুড পৃথিবীর দখল নিয়ে নেয়। আধা-ঐতিহাসিক। আমি জানতাম না এটা ইউরোপেও আছে।

কী বলছেন আপনি? দ্য ইলুমিনেটি? এ এক কম্পিউটার গেম।

ভিট্টোরিয়া, বলল কোহলার, তারাই তোমার বাবার হত্যার কথা স্বীকার করছে।

পুরো পরিস্থিতিটার উপর একবার নজর বুলিয়ে তীক্ষ্ণধী ভিট্টোরিয়া বুঝে ফেলল, সে একেবারে একা। এগিয়ে যেতে গেল ভিট্টোরিয়া, থামাল তাকে কোহলার। তারপর একটা ফ্যাক্স বের করল পকেট থেকে।

তারা তাকে ব্র্যান্ডেড করেছে, বলল সে, ব্র্যান্ডেড করেছে বুকে।

এখন সিলভিয়া বডেলক চূড়ান্ত আতঙ্কিত। তাকাল সে ডিরেক্টরের খালি অফিসে।কোন চুলোয় গেল? এখন আমিকী করি?

আজকের দিনটাই গোলমেলে। অবশ্যই, কোহলারের সাথে যে কোন দিনই গুজরান করা কষ্টকর। কিন্তু আজ তার মাথার টিকিটারও দেখা পাওয়া ভার।

আমাকে লিওনার্দো ভেট্রার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দাও। বলেছিল সে আজ সকালে।

পেজ করল সিলভিয়া। ফোন করল, তারপর পাঠাল ই-মেইল।

চুপচাপ, কোনো উত্তর নেই।

তার পরই বেরিয়ে গেল সে। কয়েক ঘণ্টা পরে যখন ফিরে এল, একেবারে অসুস্থ দেখাচ্ছিল তাকে... তার পরই মডেমে ঢোকা। ফোন। ফ্যাক্স। কম্পিউটার ঘাঁটাঘাঁটি।

এরপরেইবেরিয়ে গেল সে, এখনো ফেরেনি।

এটাকেও কোহলারের নাটকীয়তা বলে ধরে নিয়েছিল সে। কিন্তু যখন ইঞ্জেকশন নিতেও ফিরে এল না, চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়ল প্রাইভেট সেক্রেটারি। মাঝে মাঝে সিলভিয়ার মনে হয় ডিরেক্টরের মনে আত্নহত্যার চেষ্টা লুকিয়ে আছে।

গত সপ্তাহে যখন ভিজিটিং বিজ্ঞানীর দল তার পায়ের কথা তুলে আফসোস করছিল তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে একটা পেপার ক্লিপবোর্ড ছুড়ে মেরেছিল তাদের একজনের মাথা লক্ষ্য করে।

এখন ডিরেক্টরের স্বাস্থ্য বাদ দিয়ে অন্য চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। মিনিট পাঁচেক আগে সার্নে একটা বিদেশি ফোন আসে।

অপারেটর জানাল, কে কল করেছে।

আপনি ঠাট্টা করছেন, তাইতো? আর আপনার কলার আইভিবলছে যে--আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি কি জিজ্ঞেস করতে পারবেন, কেন.... না ঠিক আছে। হোল্ড করতে বলুন। এখনি ডিরেক্টরের সাথে যোগাযোগ করছি। হু। বুঝলাম। আমি দ্রুত করব।

কিন্তু পেল না সিলভিয়া তাকে।

যে মোবাইল কাস্টমারকে চাইছেন, তিনি রেঞ্জের বাইরে।

রেঞ্জের বাইরে? কতদূর যেতে পারে সে?

এবার সে চেষ্টা করল বিপারে, দুবার। কোন জবাব নেই। নেই সাড়া। ইমেইল করল মোবাইল, কম্পিউটারে।

যেন লোকটা হাওয়া হয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে!

এবার কী করব আমি?

একটা লম্বা শ্বাস নিল সে। শেষ চেষ্টা। কী ভাববেডিরেক্টর, তা আর ভাবার অবকাশ নেই।

মাইক্রোফোনটা তুলে নিল সিলভিয়া।

২৯

এই সময় ভিট্টোরিয়াবুঝতে পারল, তার বাবার কথা মনে আসছে। উঠে এসেছে তারা উপরের এলিভেটরে। কখন তা বলতে পারবে না।

পাপা!

মনে পড়ছে তার বাবার কথা। চট করে চলে গেল ভিট্টোরিয়া ন বছর বয়সে।

পাপা! পাপা!

কী, এ্যাঞ্জেল?

পাপা জিজ্ঞেস কর হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার?

কিন্তু তোমাকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে, মিষ্টি মেয়ে! কেন তোমাকে জিঞ্জেস করব হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার?

জিজ্ঞেস কর না!

শ্রাগ করল ভেট্রা, হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার?

এভরিথিং ইজ দ্য ম্যাটার। পাথর! গাছ! পরমাণু! সবই ম্যাটার।

হাসল লিওনার্দো, কথাটা কি নিজে নিজে বের করেছ?

স্মার্ট না?

আমার ছোট্ট আইনস্টাইন!

তার চুলের কোন ছিরি নেই। আমি ছবি দেখেছি।

কিন্তু তার মাথার শ্রী আছে। কী প্রমাণ করেছেন তিনি বলেছি না তোমাকে?

ড্যাড! না! তুমি প্রমিজ করেছিলে!

ই ইজ ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার! বলল লিওনার্দো হাসতে হাসতে, ই ইজ ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার!

কোন ম্যাথ নয়। আমি বলেছি না তোমাকে? ঘৃণা করি।

আমি খুশি হয়েছি যে তুমি অঙ্ক ঘৃণা কর। মেয়েদের অঙ্ক কষা নিষেধ।

তাই?

হ্যাঁ। সবাই জানে। মেয়েরা পুতুলের সাথে খেলবে। ছেলেরা করবে গণিত। মেয়েদের জন্য অঙ্ক নয়। আমি ছোট মেয়েদের সাথে অঙ্ক নিয়ে কথা বলার অনুমতি পাইনি!

কেন! কিন্তু এতো অন্যায়!

নিয়ম নিয়মই। বাচ্চা মেয়েদের জন্য গণিত নয়।

কিন্তু পুতুল নিয়ে খেলা বিরক্তিকর।

স্যরি। আমি তোমার কাছে অঙ্কের অনেক মজার মজার কথা বলতাম কি.. একবার যদি ধরা পড়ে যাই... তাকাল সে দুর্বলচিত্তে। চারপাশে।

ওকে! আমাকে আস্তে আস্তে বল!

***

চোখ খুলল ভিট্টোরিয়া। এলিভেটরের দৃশ্য তাকে বাস্তবে টেনে আনল। চলে গেছেন তিনি।

রাজ্যের চিন্তা এসে ভর করল তার মনের কুঠুরিতে।

কোথায় এন্টিম্যাটার?

কোত্থেকে যেন সুড়সুড় করে এগিয়ে এল একটা আতঙ্কের অনুভূতি।

মাক্সিমিলিয়ান কোহলার, দয়া করে আপনার অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন! মাথার উপর থেকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়া আওয়াজ হাওয়াতে মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে চিৎকার জুড়ে দিল কোলারের সব যোগাযোগ যন্ত্র। তার পেজার। ফোন। ই-মেইল।

ডিরেক্টর কোহলার, দয়া করে অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন!

তাকাল সে উপরে। এবং তারপর জমে গেল তারা সবাই।

হাতলের উপর থাকা সেলফোনটা তুলে নিল কোহলার।

দিস ইজ... ডিরেক্টর কোহলার। ইয়েস? আমি মাটির নিচে ছিলাম। কে? ইয়েস, পুট ইট থ্রু...হ্যালো? দিস ইজ ম্যাক্সিমিলিয়ান কোহলার। আমিই সার্নের ডিরেক্টর। কার সাথে কথা বলছি?

ভিট্টোরিয়া আর ল্যাঙডন তাকিয়ে আছে তার দিকে।

কাজটা ঠিক হবে না। বলল সে অবশেষে, ফোনে কথা বলাটা ঠিক হবে না। চলে আসছি দ্রুত। কাশছে আবার কোহলার, ক্যানিস্টারের লোকেশন বের করুন। দ্রুত। আসছি আমি। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে আমার সাথে দেখা করুন।

কথাটা বাজল দুজনের কানেই।

সব পরিষ্কার হয়ে এল ল্যাঙডনের সামনে। এম্বিগ্রাম, খুন হয়ে যাওয়া যাজক বিজ্ঞানী এবং এবার, টার্গেটটা...

পাঁচ কিলোটন! লেট দেয়ার বি লাইট।

দুজন প্যারামেডিক এগিয়ে এল। তুলে দিল অক্সিজেন মাস্ক কোহলারের মুখে।

মাস্কের মধ্যে মুখ দিয়ে বার দুয়েক দম নিয়ে তাকাল কোহলার তাদের দিকে। মুখোশটাকে সরিয়ে নিয়ে।

রোম!

রোম? আতঁকেউঠলো ভিট্টোরিয়া, এন্টিম্যাটার রোমে চলে গেছে? কে ফোন করেছিল?

সুইস...

আর বলতে পারল না কোহলার। ঢলে পড়ল। সে প্রচন্ড অসুস্থ এবং সময় মত ইঞ্জেকশন নেয়নি।

নড করল ল্যাঙডন। বুঝতে পারছে কী বলে ডিরেক্টর।

যান... মাস্কের নিচে খাবি খাচ্ছে ডিরেক্টর, যান... গিয়ে আমাকে কল করুন।

তাকাল ভিট্টোরিয়া, রোম? কিন্তু সুইস আবার কী?

সুইস গার্ড। বলল ল্যাঙডন, দ্য সুইস গার্ড। ভ্যাটিকান সিটির অতন্দ্র প্রহরী।

৩১

এক্স থার্টি থ্রি আবার উঠে এল। রোমের আকাশে।

গত পনের মিনিট ধরে পরিস্থিতি ব্যাখ্য করে এসেছে ল্যাঙডন ভিট্টোরিয়ার কাছে।

কী করছি আমি? একই সাথে ভাবে সে, সুযোগ পাবার সাথে সাথে তো আমার ঘরে ফিরে যাবার কথা।

কিন্তু একই সাথে টের পায়, কাজটা আদৌ সম্ভব নয়। অজান্তেই জড়িয়ে গেছে সে। বোস্টনে ফিরে যাবার চেষ্টা এখন পুরোদস্তুর স্বার্থপরতা। ইলুমিনেটির কাজের ধারা বোঝা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, পাশে বসা মেয়েটার সঙ্গ দরকার। এ পরিস্থিতিতেতাকে দরকার।

আরো একটা ব্যাপার তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। ভ্যাটিকান সিটিতে এন্টিম্যাটারের উপস্থিতি শুধু মানুষের জন্য ক্ষতি বয়ে আনবে না। ধ্বংস করে দেবে পৃথিবীর মূল্যবান কিছু জিনিসকে।

আর্ট।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর্ট কালেকশন এখন এক বিধ্বংসী টাইম বোমার উপর বসে আছে। ভ্যাটিকান মিউজিয়ামে ষাট হাজারেরও বেশি শিল্পকর্ম আছে। আছে এক হাজার চারশো সাতটা রুমে।

মাইকেলেঞ্জেলো, দা ভিঞ্চি, বার্নিনি, বত্তিচেল্লি।

বারবার তার মনে একটা ব্যাপার ব্যাথা দিচ্ছে। প্রয়োজনে সবটাকে কি বের করে আনা সম্ভব? অসম্ভব।

তার উপর দেয়ালকর্মও কম নেই পুরো ভ্যাটিকান জুড়ে। সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা, সিস্টিন চ্যাপেল, মাইকেলেঞ্জেলোর ফ্রেম করা কাজ, মুসিয়ো ভ্যাটিকানো...

মানুষের সৃষ্টিশীলতার নিদর্শন। বহুমূল্য নয়, অমূল্য।

আসার জন্যে ধন্যবাদ। বলল ভিট্টোরিয়া।

দিবানিদ্রা ভেঙে গেল ল্যাঙডনের। তাকাল সে সুন্দর মেয়েটার দিকে। গভীরভাবে শ্বাস নিচ্ছে, আবেগ থামিয়ে রাখার চেষ্টা হিসাবে। মেয়ের ভালবাসা দেখা যাচ্ছে তার চোখে।

শর্টস বদলানোর কোন সুযোগ ছিল না ভিট্টোরিয়ার। এখনো পরে আছে স্লিভলেস টপ। শীতে কাঁপছে মেয়েটা।

সাথে সাথে জ্যাকেট খুলে এগিয়ে দিল ল্যাঙডন।

আমেরিকান ভদ্রতা? বলল কটাক্ষ করে ভিট্টোরিয়া, তার চোখে ধন্যবাদ।

ঝাঁকি খেল প্লেন, সাথে সাথে ল্যাঙডন কল্পনা করার চেষ্টা করল, কোন বদ্ধ কেবিনে নেই সে। আছে খোলা মাঠে।

যখন ব্যাপারটা ঘটে, সে ঠিকই খোলা মাঠে ছিল। তারপর অন্ধকার... প্রাচীণত্ব...

আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, মিস্টার ল্যাঙডন?

আমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি?

বেকায়দায় ফেলে দিল মেয়েটা প্রশ্ন করে।

বছরের পর বছর ধরে ধর্ম নিয়ে ইতিউতি কাজ করেও ল্যাঙডন কোন ধার্মিকে পরিণত হতে পারেনি।

আমি বিশ্বাস করতে চাই।

তাহলে, কেন নয়?

এবার হাসল ল্যাঙডন, মুচকে, আসলে ব্যাপারটা তত সরল নয়। বিশ্বাসের সাথে আরো বেশ কিছু ব্যাপার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মিরাকল, স্বর্গ, নরক, অদৃষ্টবাদ, ভাগ্য... বাইবেল, কোরান, বৌদ্ধ গ্রন্থগুলো... সবগুলোতেই একই কথা, একই সুর প্রতিভাত হয়। সবখানে বলা আছে, না মানলে আমার কপালে নরক যন্ত্রণা। এমনভাবে শাসন করা যে, কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আসে না আমার।

এমন নির্লজ্জভাবে নিশ্চয়ই ছাত্রদেরও বলেন না আপনি?

কী?

মিস্টার ল্যাঙডন, আমি সাধারণ মানুষ। ঈশ্বর বলতে যা বোঝায়,সেই বিশ্বাসের কথা বলছি না। আপনি আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে অপার্থিবকে দেখতে পান কি? অনুভব করেন কি, তার সাথে আছেন আপনি?

অনেকক্ষণ ধরে বুঝল ব্যাপারটা ল্যাঙডন।

আমি সীমা ছাড়িয়ে গেছি। বলল ভিট্টোরিয়া।

না। আমি আসলে...

ক্লাসে নিশ্চয়ই আপনি বিশ্বাস নিয়ে শোরগোল পাকান?

অশেষ।

আর আপনি সেখানে শয়তানের ঝান্ডা বহন করেন। যদ্দূর মনে হয়।

হাসল ল্যাঙডন, আপনিও নিশ্চয়ই একজন শিক্ষক!

না। কিন্তু আমি একজন শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছি। মুক্ত মানুষ।

হাসল ল্যাঙডন আবারো। একটা প্রশ্ন করতে পারি, মিস ভেট্রা?

ভিট্টোরিয়া ডাকুন আমাকে। মিসেস ভেট্রা বুড়ি বুড়ি শোনায়।

ভিট্টোরিয়া, আমি রবার্ট।

তোমার একটা প্রশ্ন ছিল।

হ্যাঁ।

একজন সায়েন্টিস্ট আর প্রিস্টের কন্যা হিসাবে ধর্ম সম্পর্কে তোমার মনোভাব কী?

ধর্মটা ভাষা বা পোশাকের মত। মূল ব্যাপার হল, যেখান থেকে জন্মেছি, সেই জড়তেই ফিরে যাব আমরা। শুধু যিনি সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।

তুমি বলতে চাও যে খ্রিস্টান হও আর মুসলিম, কোথায় জন্মাচ্ছ তার উপর নির্ভর করছে?

এটাই কি হবার কথা নয়? পৃথিবীর দিতে তাকাও।

তারমানে বিশ্বাস একটা গড পড়তা ব্যাপার?

মোটামুটি। বিশ্বাস সার্বজনীন। আমাদের কেউ কেউ যিশুর কাছে প্রার্থনা করে, কেউ যায় মক্কায়, কেউ কেউ স্টাভিকেরে সাব এটমিক পার্টিকেল। সবশেষে দেখা যায় আমাদের সবাই একটা ব্যাপারের জন্য ঘুরে ফিরছি। বিশ্বাস। সত্য।

বিষম খেল ল্যাঙডন এত সুন্দরভাবে সে কেন নিজেকে উপস্থাপিত করতে পারল না?

আর ঈশ্বর? তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?

বিজ্ঞান বলে ঈশ্বর অবশ্যই আছেন। আমার মন বলে আমি ঈশ্বরকে বুঝতে পারি। আর হৃদয় বলে, এসব ভাবার কথা নয়।

তার মানে তুমি বিশ্বাস কর ঈশ্বর বাস্তব, কিন্তু তাকে, সেই পুরুষকে, আমরা কখনো বুঝতে পারব না?

সেই মহিলাকে, হেসে বলল ভিট্টোরিয়া, তোমাদের নেটিভ আমেরিকানরা তাই মনে করে।

মাদার আর্থ!

যাঃ বাবা। পুরো গ্রহটা এক জ্যান্ত প্রাণী। আর আমরা সবাই আলাদা আলাদা কাজে লাগা কোষ। আর তার পরও, আমরা একে অপরের সাথে যুক্ত। সেবা করছি পুরোটার।

যে পরিশুদ্ধতা দেখতে পাচ্ছে ল্যাঙডন তা বলার নয়।

মিস্টার ল্যাঙডন, আরো একটা প্রশ্ন করতে দাও...

রবার্ট।মিস্টার ল্যাঙডন বুড়োটে শোনায়। আমি বুড়ো?

যদি কিছু মনে না কর, রবার্ট, কী করে তুমি ইলুমিনেটির ব্যাপারে আকৃষ্ট হলে?

আসলে, টাকা।

টাকা? কনসাল্টিং?

না। টাকা। আমি প্রথম কাল্টের ব্যাপারে উৎসুক হয়ে উঠি এ কথা জানতে পারার পর যে

আমেরিকান ডলারে এই ভাতৃসংঘের প্রতীক আছে।

ঠাট্টা করছে নাতো লোকটা?

একটা এক ডলারের নোট বের করল ল্যাঙডন। পিছনে তাকাও। বামের গ্রেট সিলটা দেখতে পাচ্ছ? পিরামিডটা?

পিরামিড। তুমি কি জান, আমেরিকান ইতিহাসের সাথে পিরামিডের কী সম্পর্ক?

শ্রাগ করল ভিট্টোরিয়া।কোন সম্পর্ক নেই।

তাহলে আপনাদের গ্রেট সিলের কেন্দ্রে এটাকেন?

এর সাথে ইলুমিনেটির সম্পর্ক আছে। পিরামিড চূড়ায় পৌঁছানোর প্রতীক। আর এর উপরের চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছ কি?

একটা ত্রিকোণের ভিতরে রাখা চোখ।

এর নাম ট্রিক্রিয়া। আর কোথাও এই ত্রিকোণাবৃত চোখ দেখেছ তুমি?

আসলে... হ্যাঁ। কিন্তু আমি মনে করতে পারছি না...

সারা দুনিয়ার মেসনিক প্রতীক এটা।

সিম্বলটা মেসনিক?

আসলে, না। এটা ইলুমিনেটির। একে তারা দৈব ডেল্টা নামে ডাকে। এই ত্রিকোণটা আলোময়তার প্রতিনিধিত্ব করছে। আর এই ত্রিকোণটা গ্রিক অক্ষর ডেল্টা যা প্রতিনিধিত্ব করে–

পরিবর্তনের।

হাসল ল্যাঙডন, ভুলেই গিয়েছিলাম, কথা বলছি একজন বিজ্ঞানীর সাথে।

জিজ্ঞাসা করল ভিট্টোরিয়া, তার মানে তুমি বলতে চাও যে যুক্তরাষ্ট্রের সিলটা আসলে সর্বব্যাপী আলোকিত করার আহ্বান?

একে কেউ কেউ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার নামে অভিহিত করে।

পিরামিডের নিচে লেখা আছে... নোভাস অর্ডো...

নোভাস অর্ডো সেক্লোরাম। বলল ল্যাঙডন, এর মানে নূতন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা।

ধর্মনিরপেক্ষ মানে ধর্মহীনতা?

অধার্মিক। এতে ইলুমিনেটির অবজেকটিভ শুধু প্রকাশিত হয় না। একই সাথে এর ভিতরের লেখাটাকে সন্দেহে ফেলে দেয়।

ইন গড উই ট্রাস্ট?

ঠিক সেটাই।

কিন্তু এই সিম্বলজি কী করে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী টাকার উপর অঙ্কিত হল?

ভাইস প্রেসিডেন্ট হেনরি ওয়ালেসের কারসাজি মনে করে বেশিরভাগ মানুষ। তিনি মেসনের উপরের ধাপের লোক ছিলেন। কোন সন্দেহ নেই, ইলুমিনেটির সাথেও ছিল তার দহরম মহরম। কীভাবে প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছেছিল তাও একটা রহস্য।

কী করে? কেন প্রেসিডেন্ট–

প্রেসিডেন্টের নাম ছিল ফ্র্যাঙ্কলিন ভিরুজভেল্ট। ওয়ালেস তাকে বলেছিলেন যে নোভাস অর্ডো সেক্লোরাম মানে নতুন কাজ।

আর রুজভেল্ট কাউকে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে বলেননি?

কোন প্রয়োজন নেই। সে আর ওয়ালেস যেন ভাই ভাই।

ভাই ভাই?

হিস্টোরির বই দেখ। ফ্র্যাঙ্কলিন ভিরুজভেল্ট ছিল পুরোদস্তুর একজন মেসন।

রোমের বাতাসে যখন শীষ কেটে নেমে আসছে এক্স থার্টি থ্রি, শ্বাস বন্ধ করল ল্যাঙডন। ক্র্যাফট নামল নিচে। ট্যাক্সিইং করে চলে গেল একটা প্রাইভেট হ্যাঙ্গারে।
ধীর ফ্লাইটের জন্য দুঃখিত। বলল পাইলট, জনবহুল এলাকাগুলোর উপর দিয়ে আস্তে আস্তেউড়ে যেতে হয়।
মাত্র তেত্রিশ মিনিট তারা আকাশে ছিল।
হাতের কাগজ রাখল পাইলট, কেউ কি আমাকে বলবে কী হচ্ছে এখানে?
কেউ জবাব দিল না।
ফাইন। আমি ককপিটে মিউজিক নিয়ে বসে থাকব।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বড় করে শ্বাস নিল ভিট্টোরিয়া।
ঘামতে ঘামতে ভাবল ল্যাঙডন, মেডিটেরানিয়ান্স!
কার্টুনের তুলনায় একটু বেশি বয়স হয়ে গেছে, তাই না? জিজ্ঞেস করল ভিট্রেরিয়া।
মানে?
তোমার রিস্টওয়াচ। প্লেনে দেখছিলাম।
কালেক্টরস এডিশন মিকি মাউসের ঘড়িটা সে পেয়েছিল ছেলেবেলায়। ঘড়িটা আর নষ্ট হয়নি। তারও গরজ হয়নি এটাকে ছেড়ে দেয়ার। ওয়াটারপ্রুফ, অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। আর কী চাই!
ছটা বাজে। বলল ল্যাঙডন।
মাথা নাড়ল ভিট্টোরিয়া। বলল, আমাদের নিতে এসে গেছে।
ঠিকই, দূরে দেখা যাচ্চে হেলিকপ্টার। পাপাল হেলিকপ্টার। সাদা। ভ্যাটিকানের সিল লাগানো। তারা মনে করেছিল ভ্যাটিকান, একটা কার পাঠাবে।
তা নয়।
সোজা মাথার উপর একটু ভেসে থেকে, পাপাল ক্রাউনের সিল সহ নেমে এল চপার তাদের সামনে।
হোলি চপার!
ভাবল ল্যাঙডন।
পোপের যাতায়তের জন্য একটা চপার তাদের আছে, আগে জানত না ল্যাঙডন। না থাকাই অস্বাভাবিক। একটা গাড়ি হলেই বরং ভাল লাগত তার।
এবার ধাক্কা খাবার পালা ভিট্টোরিয়ার, এই আমাদের পাইলট?
উদ্বেগটা শেয়ার করে নিল ল্যাঙডনও, উড়ব কি উড়ব না ভাবতে হবে এখনি।
যেন শেক্সপিয়রিয় নাটকের জন্য পোশাক পরেছে পাইলট। অত্যুজ্জ্বল নীল আর সোনালি দিয়ে স্ট্রাইপ করা তার পোশাক। তার সাথে আছে ম্যাট করা প্যান্টলুন। সবার উপরে, একটা কালো ফেল্ট ব্যারেট লাগিয়েছে সে মাথায়।
সুইস গার্ডের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, বলল ল্যাঙডন। ডিজাইন করেছিলেন স্বয়ং মাইকেলেঞ্জেলো। আমি মনে করি এটা মাইকেলেঞ্জেলোর কীর্তিগুলোর মধ্যে জায়গা পাবার যোগ্যতা রাখে না।
ইউ এস মেরিনের মত চালে এবং কায়দায় এগিয়ে আসছে সুইস গার্ড পাইলট। এলিট সুইস গার্ড হবার জন্য যে কষ্টকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় সেটার কথা অনেকবার পড়েছে ল্যাঙডন। সুইজারল্যান্ডের চার ক্যাথলিক ক্যান্টনের কাছে সুইস গার্ড হবার জন্য প্রার্থীকে অবশ্যই উনিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সী পুরুষ হতে হবে। কমপক্ষে পাঁচফুট ছ ইঞ্চি। সুইস আর্মির সবচেয়ে সাবধানী পরীক্ষায় উতরে যেতে হবে। নিতে হবে কঠিন প্রশিক্ষণ। সারা দুনিয়ার তাবৎ এলিট বাহিনী এই দলটাকে হিংসা করে।
আপনারা সার্ন থেকে এসেছেন? পাথুরে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল গার্ড।

ইয়েস, স্যার। বলল ল্যাঙডন।

আপনারা অনেক আগে চলে এসেছেন, এক্স থার্টি থ্রির দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকাল সে। যেন এমন যান সব সময় দেখে আসছে।

ম্যাম, আপনার আর কোন পোষাক নেই?

বেগ ইউর পারডন?

ভ্যাটিকান সিটির ভিতরে শর্ট প্যান্ট অনুমোদিত নয়।

এই আছে আমার। আমরা সময় পাইনি পোশাক বদলে নেয়ার।

আপনারা কোন অস্ত্র বহন করছেন কি?

অস্ত্র? বিষম খেল ল্যাঙডন। এই একটা জিনিস সে মোটেও পছন্দ করে না।

না।

এগিয়ে এল অফিসার। নির্লিপ্ত তার চোখ। পা থেকে শুরু করল সার্চ। মোজা, প্যান্ট, কুঁচকি, পেট, বুক, পিঠ, কাঁধ।

ফিরল সে ভিট্টোরিয়ার দিকে।

একথা কল্পনাও করবেন না। বলল সে।

তাকিয়ে থাকল গার্ড। তার কোন ইচ্ছা নেই এ মহিলাকে সার্চ করার।

তাক করল আঙুল ভিট্টোরিয়ার প্যান্টের পকেট। কী ওটা?

সেলফোন।

বের করতে হল জিনিসটাকে। তারপর দেখা হলে আবার পাথুরে কণ্ঠ বলে উঠল, ঘুরে দাঁড়ান, প্লিজ।

গার্ড তারপর ভাল করে দেখল।

থ্যাঙ্ক ইউ। এপথে, প্লিজ!

প্রথমে উঠল ভিট্টোরিয়া। ল্যাঙডনের দেরি হয় একটু।

একটা গাড়ি পাবার কোন সুযোগ নেই? জোরেহাঁকল ল্যাঙডন।

জবাব দেয় না পাইলট।

রোমের ম্যানিয়াকরা যেভাবে পথে পথে গাড়ি হাঁকায় তাতে আকাশপথে ভ্রমণ করা অনেক ভাল মনে করে ল্যাঙডন উঠে বসল চপারে।

আপনারা কি ক্যানিস্টারটাকে চিহ্নিত করেছেন?

কী চিহ্নিত করব?

ক্যানিস্টার। আপনারা সার্নকে একটা ক্যানিস্টারের জন্য কল করেছেন না?

জানি না কী বলছেন আপনি। আজকে আমরা মহাব্যস্ত। কমান্ডার আপনাদের তুলে আনতে বলেছে। হুকুম তামিল করছি আমি। ব্যস।

একটু বীতশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল ভিট্টোরিয়া ল্যাঙডনের দিকে।

বাকল আপ প্লিজ। বলল পাইলট।

নিচে রোম। মোহময়ী রোম। রোম ইজ নট বিল্ড ইন এ ডে। একদিনে রোম তৈরি হয়নি। কত উত্থান, কত পতন! আধুনিক যে সভ্যতা বয়ে চলেছে সারা দুনিয়ায়, তার সূতিকাগার এই রোম। এককালে সিজার এখানে দাবড়ে বেরিয়েছে। এখানেই যিশুর বড় সহচর সেন্ট পিটারকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। আর এর গভীরে, একটা বোমা টিকটিক করছে।

আকাশ থেকে রোম দেখতে একেবারে অকল্পনীয় গোলকধাঁধা। পুরনো রোমের গলি ঘুপচি, ছোটবড় বিল্ডিং, সব উপর থেকে বিচিত্র দেখা যায়।

নিচে তাকিয়ে আছে ল্যাঙডন, চপারটা নিচু হয়ে উড়ে যাবার সময়। সেখানে সাইটসিয়িং এরিয়া, বড় বড় চত্বর, তাতে প্রাচীণ রোমান দেবদেবীর মূর্তি, খ্রিস্টবাদের কীর্তি, ভিড়, ফিয়াট-সেডানের চারদিকে ছুটে চলা।

সাম্য থেকে জীবন।

কিছু বলল না ভিট্টোরিয়া।

জোরে ঝাঁকি খেল উড়ন্ত ঘাসফড়িঙটা।

সামনে দেখা যাচ্ছে রোমান কলোসিয়াম। দ্য কলোসিয়াম। যেটা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় একটা নিদর্শন বলা চলে। মানব সভ্যতার দোলনা এই এলাকা, আর এর কেন্দ্রবিন্দু এ স্টেডিয়াম! কিন্তু এখানে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে মানুষ ক্রুর আর অসভ্য কাজগুলো করেছে। হয়েছে বীভৎসভাবে মানুষ খুন।

উত্তরের পথ ধরার পর তারা রোমান ফোরাম দেখতে পেল। খ্রিস্টপূর্ব রোমের প্রাণকেন্দ্র। ক্ষয়ে যেতে থাকা কলামগুলো পুরনোদিনের ঐতিহ্যকে সগর্বে প্রকাশ করে।

পশ্চিমে টাইবার নদীর চওড়া বেসিন দেখা যায়। দেখা যায় তার কাকচক্ষু জল। বুঝতে পারে ল্যাঙডন, এর গভীরতা ভয় দেখিয়ে দেয়ার মত।

সরাসরি সামনে। চপার নিয়ে উঠে আসতে আসতে বলল পাইলট।

সাথে সাথে তাকাল ভিট্টোরিয়া আর ল্যাঙডন। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়া পর্বতের মত হঠাৎ করে উদিত হল সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার শ্বেত শুভ্র, অনিন্দ্যসুন্দর, কাপন তোলা, ঐতিহাসিক গম্বুজ। এখানে, ইতিহাস ঝলসে ওঠে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতকে আকড়ে ধরে।

এখন এটা, বলল ল্যাঙডন ভিট্টোরিয়ার দিকে ফিরে, হল এমন এক কাজ, যার জন্য মাইকেলেঞ্জেলোকে স্মরণ করা যায়।

সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকাকে আকাশ থেকে কখনো দেখেনি ল্যাঙডন। বিকালের পড়ন্ত আলোয় ঝলসে উঠছে তার গা। দুটো ফুটবল মাঠের মত চওড়া এবং ছটার মত লম্বা এই বিশাল ভবনে একশো চল্লিশজন প্রেরিতপুরুষ, এ্যাঞ্জেল, শহীদের মূর্তি আছে। আছে ষাট হাজারেরও অধিক প্রার্থনাকারীর জন্য স্থান। ভ্যাটিকান সিটির মোট জনসংখ্যার একশো গুণ।

এগিয়ে আসছে ভ্যাটিকান সিটি, পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট রাষ্ট্র।

সামনে আছে সেন্ট পিটার্স স্কোয়ার। ব্যাসিলিকার চেয়েও বড় এলাকা। ভোলা। সেখানে, বিশালত্বের মধ্যে শতাধিক উঁচু উঁচুস্তম্ভ এক অনির্বচনীয় উচ্চতার অনুভূতি এনে দেয়।

এখন যদি মাথা নিচের দিকে আর পা উপরের দিকে দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করে মারা সেন্ট পিটার এই বিশালত্ব দেখতে পেতেন, কী ভাবতেন তিনি? এই ডোমের ঠিক নিচে, এই জায়গাতেই, ভ্যাটিকান হিলে, তিনি ক্রুশবিদ্ধ হন। আর এখানেই, মাটির পাঁচতলা নিচে, পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল আর রহস্যময়, গোপনীয় গোলকধাঁধায় ভরা কবরখানায় তার সমাধি রয়ে গেছে।

ভ্যাটিকান সিটি। খুব একটা উষ্ণতা ঝরল না পাইলটের কণ্ঠে।

ক্ষমতা আর রহস্যে আবৃত এক প্রাচীণ নগরী দেখতে দেখতে বিভোর ল্যাঙডন।

দেখ! বলল ভিট্টোরিয়া।

তাকাল ল্যাঙডন নিচে।

এদিকে! বলল মেয়েটা।

তাকাল ল্যাঙডন। কিন্তু বুঝে উঠতে পারল না। সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের একপাশে, ছায়াতে অনেকগুলো ভ্যান। সম্ভবত মিডিয়াভ্যান। ছাদে তাদের লেখা:

টেলিভিজরইউরোপিয়া

ভিডিও ইতালিয়া
বিবিসি
ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল

সাথে সাথে বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল ল্যাংডন। এখনি খবরটা চাউর করে দিয়ে ভাল করল কি ভ্যাটিকান?

প্রেস এখানে কেন? কী হচ্ছে?

কী হচ্ছে? আপনারা জানেন না কী হচ্ছে?

না।

এল কনক্লেভ। এক ঘণ্টার মধ্যে সারা দুনিয়া দেখবে, বন্ধ হয়ে যারে কনক্লেভের দুয়ার।

***

এল কনক্লেভ

কথাটা অনেকক্ষণ ল্যাংডনের পেটের ভিতর পাক খেল।

এল কনক্লেভ! দ্য ভ্যাটিকান কনক্লেভ।

কীভাবে সে ভুলে গেল? এতো সাম্প্রতিক ঘটনা।

পনের দিন আগে, পোপ, অসম্ভব জনপ্রিয়তার বারো বছর কাটিয়ে, মারা গেছেন। এক রাতে, হঠাৎ করে ঘুমের মধ্যেই প্রচন্ড স্ট্রোকে তিনি মারা যান। ব্যাপারটাকে কেউ কেউ সন্দেহের চোখেও দেখে। সারা পৃথিবীর সংবাদপত্রে সেদিন একই হেডলাইন এসেছিল।

এখন ঐতিহ্য অনুযায়ী, পোপের মৃত্যুর পনেরদিন পরে, ভ্যাটিকান সিটিতে এল কনক্লেভ বসছে। সারা পৃথিবীর একশো পয়ষট্টিজন কার্ডিনাল গোপন সভায় বসবেন। তাবৎ দুনিয়ার খ্রিস্টবাদের লোকগুলো তাদের গোপন শলা পরামর্শ আর ভোটাভুটির পর নির্বাচিত করবেন নতুন পোপ।

এখন এখানে সারা পৃথিবীর সব কার্ডিনালরা আছেন... ভাবল ল্যাংডন; আর তারা বেরুতে পারবেন না নতুন পোপ নির্বাচিত করার আগে। বাইরে থেকে তাদের তালা দিয়ে দেয়া হবে। শুধু ভ্যাটিকান সিটি নয়, পুরো রোমান ক্যাথলিক চার্চ, বসে আছে একটা টাইম বোমার উপর।

কার্ডিনালমর্টাটি, সিস্টিন চ্যাপেলের ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চারদিক থেকে আসা কার্ডিনালদের গুঞ্জনে ভরে আছে ভিতরটা। কথা বলছেন তারা ইংরেজিতে, ইতালিয়ানে, স্প্যানিশে।

তাকাল মর্টাটি ছাদের দিকে। সেখানে মাইকেলেঞ্জেলোর ফ্রেস্কো শোভা পাচ্ছে।

সিস্টিন চ্যাপেলের ভিতরে স্বর্গীয় আবহে আসে আলো। যেন স্বর্গ থেকেই আসে পাটে বসতে যাওয়া সূর্যের বাঁকা রশ্মি। সিস্টিনের উঁচু ঘরের কাচঘেরা ছিদ্রগুলো দিয়ে।

কিন্তু আজ তেমন কিছু হচ্ছে না।

নিয়মানুযায়ী, কালো ভেলভেট দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে সব জানালা। কেউ যেন, বাইরে থেকে ভিতরে উঁকি দিতে না পারে। যেন ভিতর থেকেও বাইরে তাকাতে না পারে।

আলো আসছে ভিতর থেকেই। মোমের নরম আলো।

আশি বছরের বেশি বয়সী কার্ডিনালরা এখানে আসতে পারেন না তাদের বার্ধক্যের সীমার জন্য। এখানটায় মর্টাটিই সবচেয়ে প্রবীণ। উনআশি বছর বয়স তার।

সন্ধ্যা সাতটার আলাপচরিতা শেষ করে কনক্লেভের দু ঘণ্টা আগেই এখানে হাজির হয় কার্ডিনালরা।

মৃত পোপের চ্যাম্বারলেইন এখানে আসবে। প্রার্থনা করবে। উদ্বোধিত হবে কনক্লেভ। তারপর সারা চ্যাপেলের সব দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেবে সুইস গার্ড। প্রহরায় থাকবে। কার্ডিনালরা একটা সিদ্ধান্তে আসার আগ পর্যন্ত এখানেই থাকবে। সবাই।

কনক্লেভ আসলে এসেছে কন ক্লেভ থেকে। এর অর্থ চাবির ভিতরে আটকানো। ফোনকল আসতে পারবে না। পারবে না মেসেজ আসতে। দরজায় দাড়িয়ে কেউ ফিসফিস করতে পারবে না। তাদের চোখের সামনে থাকবেন কেবল মহান স্রষ্টা।

সারা দুনিয়ার একশো কোটিরও বেশি রোমান ক্যাথলিকের নেতা নির্বাচিত হবেন একেবারে গোপনীয়তায়। এই দেয়ালের ভিতরের কাহিনী সব সময় মহিমান্বিত হয় না। কখনো কখনো বচসা বেঁধে যায়। এমনকি হত্যাকান্ডও ঘটে এখানে!!

এসবই পুরনোদিনের কাহিনী। এ কনক্লেভ হবে শান্ত, আশীর্বাদপ্রাপ্ত, নির্বিঘ্ন। অনেককাল ধরে এমনটাই হয়ে আসছে।

এখনো একটা চিন্তা পীড়া দিচ্ছে কার্ডিনাল মর্টাটিকে। চারজন কার্ডিনাল এখানে গরহাজির। কিন্তু আর এক ঘণ্টাও নেই শুরু হতে। তারা এসে পড়বে। হয়ত কোন কাজে আটকে পড়েছে। বাইরে যাবার উপায় নেই। ভ্যাটিকান সুরক্ষিত।

তাদের ছাড়া কনক্লেভ হতেও পারবে না। তারা সেই কার্ডিনাল।

দ্য চুজেন ফোর।

কার্ডিনালদের অনুপস্থিতির কথা মর্টাটি পৌঁছে দিয়েছেন সুইস গার্ডের কাছে। এরই মধ্যে একটু কানাকানি শোনা যাচ্ছে। অস্থির হয়ে পড়েছে কার্ডিনালরা। তাদের ছাড়া কনক্লেভ শুরুও হবে না। আবার দেরিও করা যাবে না।

কী করবে বুঝতে পারছে না মর্টাটি।

৩৫

ভ্যাটিকানের হেলিপ্যাড।

টেরা ফার্মা। বলল পাইলট।

ল্যাঙডন নেমে এল। নেমে এল ভিট্টোরিয়া।

বিশালাকায় এক কার্ট আছে হেলিপ্যাডের পাশে। আর তার পাশেই এক পঞ্চাশ ফুট উঁচু, ট্যাঙ্কের আঘাত সয়ে যাবার মত শক্ত দেয়াল। এটাই ঘিরে রেখেছে ভ্যাটিকানকে।

পঞ্চাশ মিটার দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন করে সুইস গার্ড। একেবারে সাবধান, এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে।

কার্ট চলতে শুরু করল।

চারপাশে নানা দিক নির্দেশক।

পালাজ্জো গভরেন্টারাটো
কলেজ্জো ইথিওপিয়ানা
ব্যালিসিকা স্যান পিয়েত্রো
চ্যাপেলা সিস্টিনা

রেডিও ভ্যাটিকানা লেখা ভবনের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে তাদের গতি বেড়ে গেল। এখানেই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শোনা রেডিও স্টেশনটা। রেডিও ভ্যাটিকানা।

এ্যাটেঞ্জিয়োনে বলে একটা তীক্ষ্ণ বাক নিল তাদের পাইলট। গাড়িটা চলে এল জিয়ার্দিনি ভ্যাটিকানিতে। ভ্যাটিকান সিটির হৃদপিন্ড। সোজা সামনে উদিত হল সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার পশ্চাৎপট। এ দৃশ্য সাধারণ মানুষ দেখতে পায় না। বামে আছে প্যালেস অব দ্য ট্রিবুনাল। আছে বিশালবপু গভর্নমেন্ট বিল্ডিং। সামনে আছে ভ্যাটিকান মিউজিয়ামের চারকোণা অবয়ব। এ যাত্রা মিউজিয়ামে যে যাওয়া যাবে না তা ল্যাঙডন ভাল করেই জানে।

কোথায় সবাই? অবশেষে জিজ্ঞেস করল ভিট্টোরিয়া।

একটা মিলিটারি সুলভ দৃষ্টি হানল পাইলট। বিরক্ত।

কার্ডিনালদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে সিস্টিন চ্যাপেলে। এক ঘণ্টাও বাকি নেই কনক্লেভের।

তার আগে কার্ডিনালরা তাদের পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা করে। মেতে ওঠে আড়ায়। মত বিনিময় করে।

কিন্তু রেসিডেন্টরা?

নিরাপত্তার জন্য সরিয়ে নেয়া হয়েছে। কনক্লেভ শেষ হলে তারা ফিরবে।

কখন শেষ হবে?

একমাত্র ঈশ্বর জানেন।

সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার ঠিক পিছনে থামল কার্ট। ত্রিকোণ একটা কান্ট্রিইয়ার্ড পেরিয়ে তারা এগিয়ে গেল। ভায়া বেলভেড্রে পেরিয়ে ঘন সন্নিবিষ্ট ইমারতগুলোর কাছে গেল তারা। এখানেই আছে ভ্যাটিকান প্রিন্টিং অফিস, ট্যাপেস্ট্রি স্টোরেশন ল্যাব, পোস্ট অফিস, চার্চ অব সেন্ট এ্যান।

তারা আরো একটা মোড় ঘুরল। তারপর হাজির হল গন্তব্যে।

সুইস গার্ডের অফিসের সামনে।

পাথুরে ভবনটার সামনে পাথুরে মুখ করে পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে দুজন গার্ড।

কোনক্রমে নিজেকে বোঝাল ল্যাঙডন, তাদের হাস্যকর দেখাচ্ছে না। হাতে তাদের ঐতিহ্যবাহী লঙ সোর্ড। যে বর্শা দিয়ে অনেক অনেক মুসলিম ধর্মযোদ্ধার প্রাণনাশ করা হয়েছিল ক্রুসেডের সময়।

কোথায় যাবেন?

কমান্ডান্টের অতিথি।

সরে দাঁড়াল গার্ডরা। থেমে গেল পাইলট সেখানেই।

ভিতরের বাতাস শীতল। এটা দেখতে কোন বাহিনীর অফিসের মত নয়। ভিতরে অনেক অনেক পেইন্টিং শোভা পাচ্ছে। দেয়ালে দেয়ালে। যে কোন মিউজিয়াম এগুলোকে পেলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবে।

নেমে গেল তারা নিচে।

সামনে অনেক অনেক মূর্তি। পাথরে কুঁদে দেয়া। অথবা শুধু পাথুরে। সব মূর্তির লজ্জাস্থান একটা করে পাতায় মোড়া। পাতাগুলো একই রঙের হলেও বোঝা যায়, কৃত্রিম।

আঠারোশ সাতান্নতে পোপ পিউস নাইন সিদ্ধান্ত নেন, ভ্যাটিকানের মত পবিত্র জায়গায় কোন নগ্ন দেহ থাকবে না। দেখা যাবে না যৌনাঙ্গ। সুতরাং, ভেঙে ফেলা হল হাজার মূর্তির লিঙ্গ।সরিয়ে দেয়া হল চোখের সামনে থেকে। তারপর একই রঙের পাতা দিয়ে ঢেকে দেয়া হল।

এ ভ্যাটিকানের কোন না কোন কোণায় লিঙ্গের একটা স্তুপ পাওয়া যাবে। জানে ল্যাংডন।

মাইকেলেঞ্জেলো, ব্রামান্তে আর বার্নিনির মত যুগশ্রেষ্ঠ, সর্বকালের মেধাবী শিল্পীদের কর্ম নষ্ট হয়ে গেল।

এখানে। বলল সাথে আসা গার্ড।

একটা কোড ঢোকায় গার্ড। তারপর খুলে যায় সামনের লোহার দরজা।

ভিতরে পুরো অন্য জগত।

সুইস গার্ডের অফিস।
এখানে প্রাচীণত্ব আর নূতনত্ব একত্র হয়ে গেছে। শেলফ ভর্তি বই, ওরিয়েন্টাল কার্পেট, দেয়ালচিত্র, হাইটেক গিয়ার, কম্পিউটার, টেলিভিশন সেট, আছে সবই।
এখানে অপেক্ষা করুন। বলল গার্ড।
গভীর নীল সামরিক ইউনিফর্ম পরা একজন অনেক লম্বা লোকের দেখা পেল তারা ভিতরে। সেলফোনে কথা বলতে বলতে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে ফিরে।
এগিয়ে গেল গার্ড। বলল কিছু। ফিরল লোকটা। তারপর একটা নড করেই আবার ফিরে গেল আগের অবস্থানে। কথায়।
এক মিনিটের মধ্যেই কমান্ডার ওলিভেট্টি আপনাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন। থ্যাঙ্ক ইউ। ফিরে গেল গার্ড তার আগের জায়গায়। সিঁড়ির ধাপে।
সারা ঘরে একটা সাজ সাজ রব। ইউনিফর্ম পরা লোকজন চিৎকার করে আদেশ দিচ্ছে। কাজ চলছে কম্পিউটারে।
লক্ষ্য করল ল্যাঙডন কমান্ডার ওলিভেট্টিকে। এ লোক একটা দেশের সামরিক বাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ।
কথা চলছে সারা ঘরে।
কন্টিনিউয়া এ সার্চে!
হা প্রোভোতে হাল মিউসো?
খুব বেশি ইতালিয় জানতে হয় না, এখান থেকে যে একটা সার্চ চালানো হচ্ছে তা বোঝার জন্য। বুঝল ল্যাঙডন। একটু তৃপ্ত হল সে।
তুমি ঠিক আছতো? জিজ্ঞাসা করল সে ভিট্টোরিয়াকে।
শ্রাগ করল ভিট্টোরিয়া। চেষ্টা করল একটা কষ্টার্জিত হাসি দেয়ার।
এগিয়ে আসছে কমান্ডার ওলিভেট্টি ফোনকল শেষ করে। প্রতি ধাপে তাকে আরো আরো উঁচু মনে হয়। চেহারা তার কঠিন। চোয়াল শক্ত। বছরের পর বছর ধরে সামরিক কায়দায় চলতে চলতে এমনই হাল হয় লোকেদের।
চমৎকার ইংরেজিতে তাদের সম্ভাষণ জানাল কমান্ডার।
গুড আফটারনুন। আমি কমান্ডার ওলিভেট্টি-সুইস গার্ডের কমান্ডান্টে প্রিন্সিপালে। আপনাদের ডিরেক্টরকে আমিই ফোন করেছিলাম।
ভিট্টোরিয়া ধন্যবাদ জানাল, থ্যাঙ্ক ইউ ফর সিয়িং আস, স্যার।
এগিয়ে গেল সে তাদের সঙ্গে নিয়ে। একটা কাচের দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে বলল, ঢুকুন।
একটা অন্ধকার রুমে প্রবেশ করল তারা যেখানে সাদাকালো ক্যামেরায় সারা ভ্যাটিকানের চারদিক দেখা যাচ্ছে। অনেক স্ক্রিন।
ফিউরি! বলল কমান্ডার গার্ডের দিকে তাকিয়ে।
গার্ড গুছিয়ে নিয়ে উঠে গেল।
এ ছবিটা, দেখাল সে একটা চিত্র, ভ্যাটিকানের কোন এক গোপন ক্যামেরা থেকে আসছে। রিমোট ক্যামেরা থেকে। আমি একটা ব্যাখ্যা চাই।
কোন সন্দেহ নেই সার্নের ক্যানিস্টার। এর এলইভিদেখাচ্ছে কাউন্ট ডাউন। সার্ন লেখা ক্যানিস্টারটার গায়ে। আর স্ক্রিনে লেখা: লাইভ ফিড-ক্যামেরা নাম্বার ছিয়াশি।
তাকাল ভিট্টোরিয়া ক্যামেরার দিকে, ছ ঘণ্টাও নেই!
হিসাব কষল ল্যাঙডন, তার মানে আমাদের হাতে সময় আছে—
মাঝরাত পর্যন্ত।
ওলিভেট্টির কথা ফুটল, এ ক্যানিস্টার কি আপনাদের ফ্যাসিলিটির?
নড করল ভিট্টোরিয়া, অস্থির হয়ে আছে সে, হ্যাঁ। চুরি গেছে। এর ভিতরে এক অত্যন্ত

বিস্ফোরণোন্মুখ পদার্থ আছে। নাম প্রতিবস্তু।

আমি বিস্ফোরকের ব্যাপারে ভাল করেই জানি, মিস ভেট্রা, কিন্তু কখনো এন্টিম্যাটারের নাম শুনিনি।

টেকনোলজিটা নূতন। এটাকে তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করে ভ্যাটিকান সিটিকে খালি করতে হবে আমাদের। যত দ্রুত সম্ভব।

খালি করা? আপনার কি কোন ধারণা আছে আজ রাতে কী হচ্ছে এখানে?

ইয়েস, স্যার। আর আপনাদের কার্ডিনালরা প্রচন্ড হুমকির মুখে বসেআছে।

হাতে ছ ঘণ্টা সময়ও নেই। ক্যানিস্টারের লোকেশনের জন্য কোন কিছু কি করেছেন। আপনি?

খোঁজা শুরু করিনি।

কী? আমরা তো শুনলাম আপনার গার্ডরা সার্চ করছে—

সার্চ করছে, সত্যি। আপনাদের ক্যানিস্টারের জন্য নয়। আমরা অন্য কিছুর খোঁজ করছি। আপনার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

আপনারা এখনো ক্যানিস্টারের খোঁজ শুরু করেননি!

অনেক ভাল ব্যবহার করেছে ওলিভেট্টি, তাই নাকি, মিস ভেট্রা? একটা ব্যাপার ব্যাখ্যা করতে দিন। আপনাদের ডিরেক্টর ফোনে কোন কথা বলেননি। শুধু বলেছেন যে এটাকে খুঁজে বের করতে হবে খুব দ্রুত। আর আমরা ব্যস্ত। আপনাদের সাথে ভালমত কথা না বলে কাজে নামিয়ে দিতে পারি না, সেই বিলাসের সুযোগ নেই আমার কাছে।

হাতে ছ ঘণ্টাও সময় নেই। এ ক্যানিস্টারটা পুরো কমপ্লেক্সকে বাষ্পের মত উড়িয়ে দেবে।

মিস ভেট্রা, আপনাকে জানানোর মত কিছু ব্যাপার আছে। ভ্যাটিকান সিটিতে, প্রতিটা প্রবেশপথে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে, প্রত্যেককে চেক করে ঢোকানো হয়েছে। যে কোন বিস্ফোরককে আমরা মুহূর্তে চিনে ফেলব। রেডিও এ্যাকটিভ আইসোটোপ স্ক্যানার আছে, অলফ্যাক্টরি ফিল্টার আছে, কেমিক্যালের বিন্দুমাত্র ছোয়া বুঝে ফেলার যন্ত্র আছে, আছে সর্বাধুনিক মেটাল ডিটেক্টর, আছে এক্স রে স্ক্যানার।

খুব ভাল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বলতে হয়, প্রতিবস্তুর তেজস্ক্রিয়তা নেই, নেই কেমিক্যাল পরিচয়, ভিতরে যা আছে তা খাঁটি হাইড্রোজেনের প্রতিনিধিত্ব করে। উল্টো। ক্যানিস্টারটা প্লাস্টিকের। আপনার কোন ডিভাইস সেটাকে ধরতে পারবে না।

কিন্তু ডিভাইসের একটা এনার্জি সোর্স আছে। নিকেল-ক্যাডমিয়ামের ক্ষীণতর চিহ্ন—

ব্যাটারিগুলোও প্লাস্টিকের।

প্লাস্টিক ব্যাটারি?

পলিমার জেল ইলেক্ট্রোলাইট উইথ টেফলন।

সিনরা, ভ্যাটিকান প্রতি মাসে কয়েক ডজন বোমা হামলার হুমকি পায়। ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রত্যেক সুইস গার্ডকে অত্যাধুনিক বিস্ফোরকের ব্যাপারে ট্রেনিং দিই। আমি ভাল করেই জানি যে পৃথিবীতে এমন কোন পাওয়ার নেই যা আপনি বলছেন তা করার মত। যে পর্যন্ত না একটা বেসবলের সমান ওয়্যারহেড সহ নিউক্লিয়ার বোম্ব থাকছে।

প্রকৃতির এখনো অনেক অজানা রহস্য রয়ে গেছে।

আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি আপনি সার্নে কোন পজিশনে আছেন?

আমি রিসার্চ স্টাফের একজন সিনিয়র মেম্বার। এবং ভ্যাটিকানে এই ক্রাইসিস মোকাবিলা করার জন্য পাঠানো প্রতিনিধি।

কঠিন হওয়ায় আমাকে ক্ষমা করবেন। যদি সত্যি সত্যি এটা ক্রাইসিস হয়, আমি কেন আপনার ডিরেক্টরের সাথে কথা বলছি না? আর আপনি কী করে ভ্যাটিকান সিটিতে একটা শর্ট প্যান্ট পরে আসার মত ধৃষ্টতা দেখান?

কমান্ডার ওলিভেট্টি, আমি রবার্ট ল্যাঙডন। আমি আমেরিকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের

রিলিজিয়াস স্টাডির অধ্যাপক। আমি এন্টিম্যাটার এক্সপ্লোশন দেখেছি। এবং মিস ভেট্রা যা বলছেন, তা যে সত্যি, তা দাবি করছি। আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট—কারণ আছে যে, বোমাটা কোন এক গুপ্ত সংস্থা ভ্যাটিকানকে গুড়িয়ে দেয়ার জন্য কনক্লেভের সময়ে এখানে স্থাপন করেছে।

আমার সামনে শর্ট প্যান্ট পরা এক মহিলা বলছেন যে এক ফোঁটা বস্তু পুরো ভ্যাটিকান সিটিকে উড়িয়ে দেবে। আর একজন আমেরিকান প্রফেসরকে পেয়েছি, যিনি বলছেন যে কোন এক ধর্মদ্বেষী সংস্থা ভ্যাটিকানকে শেষ করে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

ক্যানিস্টারটা খুঁজে বের করুন। ধৈর্য হারিয়েবলল ভিট্টোরিয়া, এখুনি।

অসম্ভব! জিনিসটা যে কোন জায়গায় থাকতে পারে। ভ্যাটিকান সিটি কোন খুপরি নয়।

আপনাদের ক্যামেরায় জিপিএস লোকেটর নেই?

সাধারণত তারা চুরি যায় না। এই হারানো ক্যামেরা খুঁজে বের করতে কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে যাবে।

আমাদের হাতে দিনের হিসাবে সময় নেই। বলছে ভিট্টোরিয়া, আছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

কী হবে কয়েক ঘণ্টায়, মিস ভেট্রা? উচ্চ থেকে উচ্চগ্রামে উঠে গেল হঠাৎ ওলিভেট্টির কণ্ঠ, এই এলইভিকাউন্ট ডাউন শেষ হতে? ভ্যাটিকান সিটি হাওয়ায় উবে যেতে? বিশ্বাস করুন, আমার সিকিউরিটি সিস্টেমের উপর একহাত নেয়া লোকদের ভাল চোখে দেখি না কখনো। আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়াটাই আমার কাজ। কিন্তু যা আপনি বলছেন, মেনে নেয়া দুষ্কর।

ল্যাঙডন কথা বলে উঠল, আপনি কি কখনো ইলুমিনেটির নাম শুনেছেন?

এসব বাজে বকার সময় আমার হাতে নেই, সতর্ক করে দিচ্ছি আপনাদের।

তার মানে আপনি ইলুমিনেটির কথা জানেন?

আমি ক্যাথলিক চার্চের একজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রক্ষক। দ্য ইলুমিনেটির কথা আমি ভাল ভাবেই শুনেছি। অনেক দশক ধরে তাদের মাথার টিকিটারও সন্ধান নেই।

লিওনার্দো ভেট্রার সেই ছবিটা চলে গেল ওলিভেট্টির হাতে।

আমি একজন ইলুমিনেটি স্কলার। তারা এখনো টিকে আছে, কথাটা মেনে নিতে আমার কম কষ্ট হয়নি। কিন্তু এই পরিস্থিতি দেখে বিশ্বাস না করে পারছি না।

কম্পিউটারে করা কারসাজি।

কারসাজি? একবার মিলের দিকে তাকিয়ে দেখুন। দেখুন এর এ্যাম্বিগ্রামটার উপর, চোখ বুলিয়ে নিন।

হয়ত মিস ভেট্রা বলেননি আপনাকে, কিন্তু সার্ন বছরের পর বছর ধরে ভ্যাটিকানের নাক নিয়ে টানাটানি করছে। মনে হয় কী? গ্যালিলিও আর কোপার্নিকাসের জন্য চার্চকে তিতিবিরক্ত করে ছাড়ছে তারা। এখন এ চাল চেলেছে, পাঠিয়েছে প্রথমে একটা ক্যানিস্টার। তারপর আপনাদের।

ঐ ছবিটা আমার বাবার। আমার খুন হয়ে যাওয়া বাবার। কী মনে হয়, আমি তাকে নিয়ে তামাশা করছি আপনার সাথে?

আমি জানি না মিস ভেট্রা। শুধু এটুকু জানি, আগে আমার হাতে শক্ত প্রমাণ আসতে হবে। এটুকু দেখে আমার পক্ষে কোন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব নয়। এখানকার ধর্মীয় কাজগুলো যেন ঠিকমত হয় সেটা জানাই আমার কাজ। সেটা দেখাই আমার কাজ।

ল্যাঙডনের কথায় এবার মিনতি ঝরে পড়ল, অন্তত ব্যাপারটা নিয়ে ভাবুন। বিবেচনায় নিন!

বিবেচনায় নেয়া? কনক্লেভ মোটেও আমেরিকান বেসবল খেলা নয় যে চাইলেই বৃষ্টির ছুতোয় বন্ধ করে দেয়া যাবে। এর কঠিন নিয়ম কানুন আছে। এক বিলিয়ন ক্যাথলিক তাদের নতুন নেতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই প্রটোকল পবিত্র। অপরিবর্তনীয়। এগারোশো উনআশি থেকে কনক্লেভ টিকে গেছে ভূমিকম্প, আগুন এমনকি প্লেগের হাত থেকেও। বিশ্বাস করুন,

একজন খুন হয়ে যাওয়া বিজ্ঞানী আর একটা ফোঁটা। ঈশ্বর জানে কী-র জন্য কখনোই কনক্লেভ বন্ধ করা যাবে না।

ইন চার্জে যিনি আছেন তার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে। বলল ভিট্টোরিয়া।

আপনি এরই মধ্যে তাকে পেয়ে গেছেন।

না। যাজকদের একজন।

যাজক চলে গেছেন। সুইস গার্ড ব্যতীত ভ্যাটিকানে আছেন শুধু কার্ডিনালরা। আর কলেজ অব কার্ডিনাল চলে গেছেন কনক্লেভে। সিস্টিন চ্যাপেলে।

চ্যাম্বারলেইনের ব্যাপারে কী বলবেন? জিজ্ঞাসা করল ল্যাংডন।

কে?

বিগত পোপের চ্যাম্বারলেইন। আশা করছে ল্যাংডন, তার জানা ভুল নয়। পোপের মৃত্যুর পর তার চ্যাম্বারলেইন সমস্ত দায়িত্ব পায়। পোপের ব্যক্তিগত সহকারি চালায় ভ্যাটিকানকে, তার মৃত্যুর পর। আমার বিশ্বাস চ্যাম্বারলেইন এখানকার দায়িত্বে আছেন।

এল ক্যামারলেনগো? ক্যামারলেনগো এখানে একজন প্রিস্ট। সামান্য প্রিস্ট। সে পোপের হাতের কাছের সার্ভেন্ট।

কিন্তু সে এখানে আছে। আর আপনি তার কাছেই জবাবদিহি করেন।

কথা সত্যি, মিস্টার ল্যাংডন, পোপের মৃত্যুর পর ভ্যাটিকানের কনক্লেভের দায়িত্ব তার ক্যামারলেনগার হাতেই বর্তায়। ব্যাপারটা এমন, আপনাদের প্রেসিডেন্ট অক্কা পেলেন আর তার ব্যক্তিগত সহকারি ওভাল অফিস জুড়ে বসল। ক্যামারলেনগো তরুণ, আর সিকিউরিটি বা অন্য যে কোন ব্যাপারে তার জ্ঞান একেবারে সামান্য। এ ব্যাপারে, এখানে আমিই ইন চার্জ।

তার কাছে নিয়ে চলুন আমাদের। বলল জেদের সুরে ভিট্টোরিয়া।

অসম্ভব। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে কনক্লেভ শুরু হতে যাচ্ছে। পোপের অফিসে প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্যামারলেনগো। নিরাপত্তার ব্যাপারে তার মনোযোগ আকর্ষণ করার কোন ইচ্ছা নেই আমার।

কিছু বলার জন্য মুখ খুলছিল ভিট্টোরিয়া এমন সময় একজন প্রহরী এগিয়ে এল।

ইলোরা, কমান্টে!

হাতের ঘড়ি চেক করল ওলিভেট্টি। নড করল।

আমার সাথে সাথে আসুন... এটা আমার অফিস... আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি, ততক্ষণে আপনারা সিদ্ধান্ত নিন কীভাবে কী করবেন।

চরকির মত ঘুরল ভিট্টোরিয়া, আপনি চলে যেতে পারেন না! ক্যানিস্টারটা....

আমার হাতে কথা বলার মত সময় নেই। কনক্লেভ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা এখানেই থাকছেন। তারপর কথা বলব।

সিনর! যুক্তি দেখাল গার্ড, স্প্যাজ্জারে লা ক্যাপেলা।

আপনি চ্যাপেল ঝাড়ু দিতে যাচ্ছেন? তেতে উঠল ভিট্টোরিয়া।

আমরা ঝাড়ু দেই ইলেক্ট্রনিক বাগের আশায়। ব্যাপারটা আপনি বুঝবেন না মিস ভেট্রা।

মোটা কাচের দরজার ওপাশে চলে গেল সে। লাগিয়ে দিল তালা।

আবার চিৎকার করল ভিট্টোরিয়া, ইডিয়ট! আপনি আমাদের এখানে বন্দি করে রাখতে পারবেন না।

কিছু একটা বলল ওলিভেট্টি গার্ডকে।

নড করল গার্ড। তারপর তাদের দিকে ফিরে দাঁড়াল। বুকে হাত দুট ক্রস করা। পা ফাঁক করে দাঁড়ানো।

পারফেক্ট! ভাবল ল্যাংডন, একেবারে পারফেক্ট!

একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে গার্ড। তার পরনে সুইস গার্ডের ঐতিহ্যবাহী পোশাক।

পাজামা পরা এক লোকের হাতে বন্দুক দিয়ে আটকে রাখা! ভাল!

ভাবল ভিট্টোরিয়া।

ল্যাঙডন একেবারে চুপসে গেছে। আর ভিট্টোরিয়া আশা করছে তার হার্ভার্ড ব্রেন দিয়ে এখান থেকে বেরুনোর কোন না কোন উপায় বের হবে।

কিন্তু বেচারার চোখের দৃষ্টি দেখে করুণা হল তার। আহারে! বেচারাকে শুধু শুধু এখানে আনা হল টেনে।

প্রথমেই মনে হল সেলফোন বের করে সবটা জানায় কোহলারকে। তাতে লাভের লাভ কিছু হবে না। গার্ড সোজা ভিতরে ঢুকে ফোনটা কেড়ে নিতে পারে। আর যদি তা নাও করে, কোহলারের অসুস্থতা কাটেনি, কাটার কথা নয় এত দ্রুত।

ভেবে বের কর! এ নরক থেকে বেরুনোর পথ ভেবে বের কর!

বৌদ্ধ ফিলোসফারদের পদ্ধতি হল এই ভেবে বের করাটা। সে ধর্মে ভাবা হয়, প্রত্যেকে সব জানে। সুতরাং সেটাকে ভেবে বের কারাটাই বাকি থাকে।

ফল হল না বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায়।

তার এখন কাউকে জানাতে হবে। এখানকার দায়িত্বে থাকা কাউকে। কীভাবে? কাকে? ক্যামারলেনগো পদের মানুষটাকে? কীভাবে? তারা এখন একটা গ্লাসবক্সে আটকে আছে যেখান থেকে কোন মুক্তি নেই।

যন্ত্রপাতি! ভাবল সে, সব সময় আশপাশ যন্ত্রপাতি থাকে। এখানেও আছে। খুঁজে বের কর।

চোখ বন্ধ করল সে। ঝুলিয়ে দিল কাঁধ। মাথা থেকে সমস্ত চিন্তাকে সরিয়ে দিল। এখানে কিছু না কিছু পজিটিভ আছেই! কী সেটা?

আরো মনোনেবেশ করল সে। আরো। তারপর টের পেল কী করতে পারে।

আমি একটা ফোনকল করছি।

আমি তোমাকে বলতাম কোহলারকে ফোন করার কথা। কিন্তু—

কোহলারকে না। অন্য কাউকে।

কাকে?

ক্যামারলেনগো।

তুমি চ্যাম্বারলেইনকে কল করবে? কীভাবে?

ওলিভেট্টি বলেছিল ক্যামারলেনগো পোপের অফিসে আছে।

ওকে। তুমি পোপের প্রাইভেট নাম্বার জান?

না। কিন্তু আমি আমার ফোন থেকে কল করছি না। সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা লোকটার নিশ্চয়ই পোপের সাথে সরাসরি কথা বলার একটা পথ আছে।

তার একজন ভারোত্তোলকও আছে, ছফিট, সামনে, হাতে গান।

আর আমরা ভিতরে ইদুরের মত বন্দি হয়ে আছি।

আমি ভাল করেই তা জানি।

আমি বলছি, গার্ড আসলে বাইরে তালাবদ্ধ হয়ে আছে। এটা ওলিভেট্টির প্রাইভেট অফিস। আর আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, অন্যদের হাতে আর একটা চাবি নাও থাকতে পারে।

এটা একেবারেই পাতলা গ্লাস। আর তার হাতে একেবারেই বড় একটা গান আছে।

কী করবে সে? ফোন ব্যবহার করার অপরাধে গুলি করে বসবে?

কে জানে? এ জায়গা বড়ই অদ্ভুত। আর পরিস্থিতি যা-

তাতে বোঝা যায় সব এভাবেই চলবে এবং আমি বাকি পাঁচ ঘণ্টা বেয়াল্লিশ মিনিট এখানে

তালাবদ্ধ হয়ে থাকব তোমার সাথে। যখন প্রতিবস্তু বিস্ফোরিত হবে, আমরা বসে থাকব সামনের সারিতে।

কিন্তু গার্ড তোমার ফোন তোলার সাথে সাথে ওলিভেট্টির সাথে যোগাযোগ করবে। সবগুলো ফোন নিয়ে চেষ্টা করবে তুমি?

নোপ! মাত্র একবার! বলল ভিট্টোরিয়া। তারপর তুলল ফোনটা। ডায়াল করল সবার উপরের বাটনটায়।

বাইরে উশখুশ করে উঠল গার্ড। তাকাল আগুন চোখে।

পরিস্থিতি সুবিধার মনে হচ্ছে না। ভাবল ল্যাংডন।

না! এতে রেকর্ডিং!

রেকর্ডিং? পোপের আনসারিং মেশিন আছে?

পোপের অফিস নয়। ভ্যাটিকান কমিশারির মেনু।

ল্যাংডন কোনক্রমে একটা ম্লান, মিইয়ে পড়া হাসি দিল যখন বাইরের গার্ড রাইফেল কক করেও সেটাকে নামিয়ে রেখে ওয়াকিটকি বের করে ওলিভেট্টির সাথে যোগাযোগ করল।

ভ্যাটিকান সুইচবোর্ড অবস্থিত উফিসিও ভিকমিউনিকেঞ্জিয়োতে। ভ্যাটিকান পোস্ট অফিসের পিছনে। একশো একচল্লিশটা সুইচবোর্ড বসানো এ ঘরটা তুলনামূলকভাবে ছোট। অফিসে দিনে দু হাজারের বেশি কল আসে। তার বেশিরভাগই রেকর্ড করা জবাব শুনতে পায়।

ক্যাফেইন সমৃদ্ধ এককাপ চা নিয়ে বসে ছিল কমিউনিকেশন্স অপারেটর। চুমুক দিচ্ছিল আয়েশ করে ধূমায়িত কাপে।

গত কয়েক বছর ধরে ভ্যাটিকানে আসা কলের মাত্রা অনেক কমে গেছে। এমনকি মিডিয়ার লোকজন আর ফ্যানরাও আগের মত এত জ্বালাতন করে না।

ভ্যাটিকানের প্রতি আগ্রহ কমে এসেছে দুনিয়ার। স্বাভাবিক। আধুনিক জীবনযাত্রা আস্তে আস্তে ধর্মীয় ভাব থেকে সরিয়ে আনছে মানুষকে। যদিও বাইরের স্কোয়ার মিডিয়া ভ্যানে পূর্ণ, সেখানে বেশিরভাগই ইতালিয়। খুব বেশি ইন্টারন্যাশনাল সংস্থা আসেনি কনক্লেভ কাভার করতে।

হাতের কাপটা নামিয়ে রেখে ভাবে অপারেটর, আর কতক্ষণ লাগবে আজ রাতটা পেরিয়ে যেতে।

কনক্লেভ আর আগের মত নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে না। আঠারোশো একত্রিশ সালের কনক্লেভ তিপ্পান্ন দিন ধরে চলেছিল। এবার আর তা হবার যো নেই।

মাত্র একটা ধোয়াশার মত কেটে যাবে কনক্লেভের সময়।

একটা বোর্ডে আলো দেখে অবাক হল সে।

ভিতরে থেকে, লাইন জিরো থেকে কে অপারেটরের সাহায্য চাইতে পারে? আজকের দিনে ভিতরে আছেইবা কে?

সিটা ডেল ভ্যাটিকানো, প্রেগো? তুলল অপারেটর ফোন।

দ্রুতলয়ে বলে গেল ওপাশের কণ্ঠ। ইতালিয়তে। এ আর যেই হোক, সুইস গার্ড নয়।

মহিলা কণ্ঠ শুনে ভড়কে গেল অপারেটর। তার চা ছলকে পড়ল সাথে সাথে।

ভিতর থেকে? এই রাতে? মহিলার কণ্ঠ?

মহিলা ঝড়ের গতিতে কথা বলে যাচ্ছে। অপারেটর কম সময় কাটায়নি এখানে। সে ভাল করেই জানে কারা ভুল করছে, ফাজলামি করছে, আর কারা সত্যি কথা বলছে। মহিলা উত্তেজিত, কিন্তু কণ্ঠে তার ছোয়া আছে সামান্য। কণ্ঠে ঝরে পড়ছে মিনতি।

এল ক্যামারলেনগো? আমি হয়ত পারব না লাইন দিতে... হ্যাঁ, আমি জানি তিনি পোপের অফিসে আছেন, কিন্তু... কে বলছিলেন? আবার বলুন প্লিজ... আর আপনি তাকে সাবধান করে দিতে চান... সে শুনল। আরো আরো মনোযোগ দিয়ে। সবাই বিপদে আছে... কীভাবে? আমার হয়ত সুইস গার্ডের সাথে... আপনি বললেন কোথায় আছেন? কোথায়?

শুনল অপারেটর। তারপর বলল, হোল্ড প্লিজ।

তুলল সে কমান্ডার ওলিভেট্টির নাম্বার।

ওপাশ থেকে সেই কণ্ঠই বলে উঠল, ঈশ্বরের নামে বলছি, প্লিজ, কলটা!

কমান্ডার ওলিভেট্রি আরো কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল। তাকাল ফোন ধরে রাখা মহিলার দিকে। সে কথা বলছে কমান্ডারের প্রাইভেট লাইনে।

এগিয়ে এল কমান্ডার।

কী করছেন আপনি?

হ্যাঁ... আর আমার আরো সতর্ক করে দিতে হচ্ছে যে...

কেড়ে নিল ওলিভেট্টি, কোন চুলো থেকে কে বলছে?

তারপর থেমে গেল সে। দমে গেল একদম। মিইয়ে গেল ভিজানো মুড়ির মত। ইয়েস, ক্যামারলেনগো, বলছে সে, সত্যি, সিনর, কিন্তু নিরাপত্তার ব্যাপারটা... অবশ্যই নয়... আমি

তাকে এখানে ধরে রেখেছি কারণ... অবশ্যই, কিন্তু... একটু অস্বস্তিতে পড়ল ওলিভেট্টি, ইয়েস, স্যার! বলল সে, আমি তাদের নিয়ে এখনি আসছি।

এ্যাপোস্টোলিক প্রাসাদ বিভিন্ন ভবনের জটলার মধ্যে, সিস্টিন চ্যাপেলের পিছনে। সেন্ট পিটার্স স্কোয়ার থেকে বেশ ভাল একটা ভিউ পাওয়া যায়। এ ইমারতেই পোপের অফিস আর এ্যাপার্টমেন্ট।

লম্বা রোকোকো করিডোর ধরে তাদের নিয়ে যাচ্ছে কমান্ডার ওলিভেট্টি। রাগে তার ঘাড়ের পেশিগুলো আড়ষ্ট হয়ে আছে। সিঁড়ির ধাপ পড়ল সামনে। তার পরই একটা হাল্কা আলোয় ভরা হলওয়ে। চওড়া।

দেয়ালের শিল্পকর্মগুলোর দিকে তাকিয়ে স্রেফ আঁৎকে উঠল ল্যাঙডন। লাখ লাখ ডলার মূল্য এগুলোর।

এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল কমান্ডার।

উফিসিও ডেল পাপা! ঘোষণা করল সে। তাকিয়ে রইল ভিট্টোরিয়ার দিকে। কটমট করে। পাত্তা দিল না ভিট্টোরিয়া মোটেও। দরজায় জোরে করাঘাত করল সে।

অফিস অব দ্য পোপ! আবার শিউরে উঠল ল্যাঙডন। বিশ্বের ধর্মগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমাতবান লোকটার কার্যালয়।

আভান্তি! ভিতর থেকে কেউ একজন বলে উঠল।

দরজা খুলে যাবার সাথে সাথে ল্যাঙডনের চোখ ঢেকে ফেলতে ইচ্ছা হল। সূর্যের আলো পড়ছে সরাসরি চোখে। আস্তে আস্তে তার সামনের ইমেজ স্পষ্ট হয়ে এল।

অফিসটা অফিসের মত লাগছে না। লাগছে বলরুমের মত। লাল মার্বেলের মেঝে, চারদেয়ালে বিচিত্র দেয়ালচিত্র। অসাধারণ। সামনে সূর্যের আলোয় ভেসে যাওয়া সেন্ট পিটার্স স্কোয়ার।

মাই গড! এ ঘরটায় জানালা আছে।

সামনের বিশাল ডেস্কের পিছনে একজন বসে আছে। আভান্তি! বলল সে। হাতের কলম নামিয়ে রেখে।

সামনে এগিয়ে গেল ওলিভেট্টি। তার হাবভাব সামরিক। সিনর, ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, নন হো পটেউটো।

লোকটা তার কথা মাঝপথে থামিয়ে দিল।

ভ্যাটিকানে ঘুরতে ঘুরতে যে রকম মানুষের কথা মনে আসে ল্যাঙডনের, ক্যামারলেনগো মোটেও তেমন নয়। তার গলায় কোন পেন্টেন্ট নেই। নেই বাড়তি কোন সাজসজ্জা। নেই রোব। একটা সাধারণ ক্যাসক তার পরনে। তা থেকেই ভিতরের মানুষটার পরিচয় পাওয়া যায়।

বয়স তার ত্রিশের কোটার শেষদিকে। ভ্যাটিকানের হিসাবে দুগ্ধপোষ্য শিশু। ধূসর চুল তার। মুখ অত্যন্ত সুন্দর। এগিয়ে যেতে যেতে তার মধ্যে ক্লান্তি দেখতে পায় ল্যাঙডন। পনের দিনের ঝড় শেষ হয়েছে তার। এখন বিশ্রামের সময় এগিয়ে আসবে।

আমি কার্লো ভেন্ট্রেস্কা। বলল সে, ইংরেজি একেবারে পাকা, বিগত পোপের ক্যামারলেনগো। তার কণ্ঠ দয়ার্দ্র।

ভিট্টোরিয়া ভেট্রা, এগিয়ে গেল মেয়েটা, বাড়িয়ে দিল হাত। আমাদের দেখা দেয়ায় আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

ক্যামারলেনগো হ্যান্ডশেক করাতে হতবাক হয়ে গেল ওলিভেট্টি।

ইনি রবার্ট ল্যাঙডন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রিলিজিয়াস হিস্টোরির প্রফেসর।

পাদ্রে! যথা সম্ভব ইতালিয় টানে বলার চেষ্টা করল ল্যাঙডন। হাত বাড়াল। বাড়িয়ে দেয়া হাতের সামনে নিচু করল মাথা।

না-না! বলল ক্যামারলেনগো, হিজ হোলিনেসের অফিস আমাকে পবিত্র করেনি। আমি সামান্য এক প্রিস্ট। একজন ক্যামারলেনগো যে সময় মত সার্ভিস দেয়।

দাঁড়িয়ে রইল ল্যাঙডন।

প্লিজ! বলল ক্যামারলেনগো, প্রত্যেকে বসুন। ডেস্কের সামনে কয়েকটা চেয়ার একত্র করার চেষ্টা করল।

ওলিভেট্টি দাঁড়িয়ে থাকাকেই শ্রেয় বলে মনে করল।

ক্যামারলেনগো বসল তার ডেস্কে। হাত ভাঁজ করল। ছোট্ট করে ফেলল একটা শ্বাস। তারপর তাকাল ভিজিটরদের দিকে।

সিনর! বলল ওলিভেট্টি, মহিলার ধৃষ্টতা আমার ভুল। আমি-

তার ধৃষ্টতা আমাকে ভাবিত করছে না। জবাব দিল ক্যামারলেনগো সাথে সাথে, যখন অপারেটর আমাকে কনক্লেভের আধঘণ্টা আগে ফোন করে জানায় যে একজন মহিলা আপনার অফিস থেকে ফোন করে আমাকে চাইছে, কোন এক বড় দুর্ঘটনার ব্যাপার জানাতে, যার কথা আমি জানি না, সেটাই আমাকে ভাবাচ্ছে।

একেবারে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল ওলিভেট্টি।

ক্যামারলেনগোর উপস্থিতিতে মোহাবিষ্ট অনুভব করল ল্যাঙডন। তরুণ, উদ্দীপিত, অনেকটা পুরাণের মহানায়কের মত।

সিনর! বলল অবশেষে ওলিভেট্টি, এখনো তার কণ্ঠে নম্রতা, সেই সাথে একটু ঔদ্ধত্য, সিকিউরিটির ব্যাপারে আপনাকে চিন্তিত না হলেও চলবে। অন্য অনেক কাজের চাপ আপনাকে সামলে নিতে হয়।

কাজের চাপ সম্পর্কে আমি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। আমি আরো জানি যে ডিরেট্রেরো ইন্টারমিডিয়ারো অনুসারে, আমার উপর কনক্লেভ যেন নিরাপদে ঘটে সেটা নিয়েও দায়িত্ব বর্তায়। কী হচ্ছে এখানে?

পরিস্থিতি আমার আয়ত্তে।

দেখাই যাচ্ছে, তা নয়।

ফাদার, এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল ওলিভেট্টির, প্লিজ!

এগিয়ে গেল ওলিভেট্টি, ফাদার। এ নিয়ে আপনি ভাববেন না। এসব ব্যাপার।

ক্যামারলেনগো ফ্যাক্সটা হাতে নিল। ওলিভেট্টিকে অনেক সময় ধরে অবজ্ঞা করে। সেখানে মৃত বিজ্ঞানীর ছবি। সেখানে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকে সে বলল, এ কী!

তিনি আমার বাবা। বলল আগ বাড়িয়ে ভিট্টোরিয়া, কষ্টে তার আবেগ, তিনি ছিলেন একজন প্রিস্ট। একই সাথে বিজ্ঞানের লোক। গত রাতে তিনি খুন হন।

সাথে সাথে নরম হয়ে গেল ক্যামারলেনগোর মুখাবয়ব। চোখ তুলে তাকাল সে মেয়েটার দিকে। মাই ডিয়ার চাইল্ড, আই এ্যাম সো স্যরি!

ক্রস করল নিজেকে ক্যামারলেনগো। তারপর তাকাল ফ্যাক্সের দিকে। তার চোখের কোণায় টলটল করছে অশ্রু। কে... আর তার বুকের এই পোড়া চিহ্ন...।

এখানে লেখা আছে ইলুমিনেটি, ব্যাখ্যা করল ল্যাঙডন, আপনি যে নামটা চেনেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একটা বিচিত্র ভাব খেলে গেল ক্যামারলেনগোর চোখে। কী যেন মিলছে না। আমি নামটার সাথে ভালভাবেই পরিচিত, কিন্তু...

ইলুমিনেটি লিওনার্দো ভেট্রাকে খুন করে কারণ তিনি এমন এক নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছিলেন যা ...

সিনর! বাধা দিল ওলিভেট্টি, এর কোন মানে হয় না। ইলুমিনেটি? তারা অনেক আগেই গায়েব হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে–

কথা শুনছে না ক্যামারলেনগো। তাকিয়ে রইল সে ফ্যাক্সের দিকে বেশ কিছুক্ষণ। মিস্টার ল্যাঙডন, আমি ক্যাথলিক চার্চের জন্য আমার সারা জীবন ব্যায় করেছি। ইলুমিনেটির ব্যাপারে আমি পুরোপুরি সজাগ। তাদের ব্র্যান্ডিং করার ঐতিহ্য সম্পর্কেও। কিন্তু আমি বর্তমান কালের লোক। ভূত ছাড়াও...খ্রিস্টবাদের অনেক বর্তমান শত্রু আছে।

এই চিহ্নটা একেবারে নিখুঁত। বলল সে। এগিয়ে গেল ফ্যাক্সটা ক্যামারলেনগোর হাত

থেকে নেয়ার জন্য।

ক্যামারলেনগো আবিষ্ট হয়ে গেল দ্বিমুখীতা দেখে।

এমনকি আধুনিক কম্পিউটারও, বলছে সে, এমন একটা এ্যাম্বিগ্রাম তৈরি করতে পারে না।

অনেকক্ষণ ধরে চুপ থাকল ক্যামারলেনগো। তারপর বলল, এখন ইলুমিনেটির কোন অস্তিত্ব নেই। অনেক আগেই তারা হাপিস হয়ে গেছে।

নড করল ল্যাঙডন, গতকালও আমি আপনার সাথে একমত হতাম।

গতকাল?

আজকের ঘটনাক্রমের আগে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইলুমিনেটি ফিরে এসেছে। তাদের অপূর্ণ স্বাদ পূর্ণ করার জন্য। পথ পূর্ণ করার জন্য।

মাফ করবেন। আমি ঠিক জানি না। কোন পথ?

ভ্যাটিকান সিটির ধ্বংস এর পথ।

ভ্যাটিকান সিটি ধ্বংস? ভয়েরচেয়ে বিস্ময় বেশি উঁকি দিচ্ছে ক্যামারলেনগোর কণ্ঠে। কিন্তু তা অসম্ভব।

মাথা নাড়ল, ভিট্টোরিয়া, আসলে আমাদের হাতে আরো বড় কিছু দুঃসংবাদ আছে।

এ কথা কি সত্যি? বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে ক্যামারলেনগো। তাকাচ্ছে ওলিভেট্টির দিকে।

সিনর, আশ্বস্ত করে ওলিভেট্টি, আমি মানছি যে এখানে ওই প্রকারের ডিভাইস আছে। সিকিউরিটি মনিটরে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মিস ভেট্রার দাবি অনুযায়ী, এর ক্ষমতা অকল্পনীয়, এমন কোন সম্ভাবনা....

এক মিনিট, তেতে উঠছে এবার ক্যামারলেনগো, আপনারা সেটাকে দেখতে পাচ্ছেন?

জ্বি, সিনর, ক্যামেরা নম্বর ছিয়াশিতে।

তাহলে সেটাকে উদ্ধার করেননি কেন? এবার ক্যামারলেনগোর কণ্ঠে ধরা দিল উত্তেজনা।

খুবই কঠিন, সিনর। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ওলিভেট্টি। বর্ণনা করল পরিস্থিতি।

ক্যামারলেনগো শুনল মন দিয়ে। তারপর তাকাল সবার দিকে। আপনারা কি নিশ্চিত এটা ভ্যাটিকানের ভিতরেই আছে? কেউ হয়ত সেটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে ট্রান্সমিট করছে।

অসম্ভব। বলল ওলিভেট্টি, আমাদের বাইরের দেয়ালগুলো ইলেক্ট্রিক্যালি প্রতিহত করে বাইরের সিগন্যাল, যেন ভিতরের সম্প্রচার বিষয়ক কোন ব্যাপারে অসুবিধা না হয়।

তাহলে আমার মনে হয় আপনি এখন মিসিং ক্যামেরাটার জন্য নেমে পড়েছেন?

মাথা নাড়ল ওলিভেট্টি, না, সিনর। সেটাকে বের করতে শত শত মানব-ঘণ্টা লেগে যাবে। আমাদের কাজ এখন সবচেয়ে বেশি। লোকবলের পুরোটাকেই নানা কাজে লাগিয়ে দিতে হয়েছে। আর মিস ভেট্রার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই জানাতে চাই সেই বিন্দুটা খুবই ছোট।

এবারও সতেজে বলল ভিট্টোরিয়া, সেই ফোঁটাই ভ্যাটিকানকে বাস্প করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। আমি যা বলছি তার প্রতি একবারও কি কান দিয়েছেন আপনি?

ম্যাম, বিস্ফোরকের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা অনেক।

এখানে আপনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে না। আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাব এটমিক রিসার্চ ফ্যাসিলিটির একজন সিনিয়র সদস্য। ব্যক্তিগতভাবে আমিই সেই জিনিটার ধারকের ডিজাইন করেছি। এমনকি অনেকবার অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ নিয়ে বিস্ফোরণের মহড়া দিয়েছি। সতর্ক করে দিচ্ছি আপনাকে, আগামী ছ ঘণ্টার মধ্যে সেটাকে বের করতে না পারলে অনর্থ ঘটে যাবে। আপনার গার্ডরা আর কিছুকেই রক্ষা করার জন্য পাহারা দেবে না। শুধু থাকবে মাটিতে একটা বড় গর্ত।

এবার রগচটা ওলিভেট্টি তাকাল ক্যামারলেনগোর দিকে- ঝট করে, সিনর, এই কথোপকথন আমি আর চালাতে চাচ্ছি না। আপনার সময় নষ্ট হচ্ছে পাঙ্কস্টারদের কারণে। ইলুমিনেটি? এমন একটা ফোঁটা যা আমাদের সবাইকে ধ্বসিয়ে দেবে?

বাস্তা! ঘোষণা করল ক্যামারলেনগো। সে স্পষ্ট শব্দটী উচ্চারণ করেছে এবং তা। ঘরের ভিতরে ধ্বণিত প্রতিধ্বণিত হচ্ছে। ধ্বংসাত্মক হোক আর না হোক, ইলুমিনেটি থাক আর না থাক... ব্যাপারটা ঘটছে ভ্যাটিকান সিটির ভিতরে। কনক্লেভের সময়। আমি এটাকে পাওয়া অবস্থায় দেখতে চাই। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পেতে চাই। খুব দ্রুত একটা সার্চের ব্যবস্থা করুন।

সিনর, আমরা যদি এখন আমাদের পুরো লোকবল দিয়েও সার্চ চালাই, তবু ক্যামেরাটা পেতে কয়েক দিন লেগে যাবে। মিস ভেট্রার কথা শোনার পর আমি আমাদের একজনকে এই এন্টিম্যাটার বিষয়ে আলোচনায় পাবার জন্য আমাদের সবচেয়েসিনিয়রকে ব্যালিস্টিক গাইড ঘাটতে পাঠিয়েছি। আমি কোথাও এর কোন বর্ণনা দেখিনি। কোথাও না।

বোকার হদ্দ! ভাবছে ভিট্টোরিয়া, ব্যালিস্টিক গাইড! তুমি কি কোন এনসাইক্লোপিডিয়া ঘেঁটেছ? এ শব্দের উপর?

কথা বলছিল ওলিভেট্টি, সিনর, যদি আপনি খোলা চোখে পুরো ভ্যাটিকান সিটি চষে

ফেলতে বলেন তাহলে আমাকে অবশ্যই সে কথার প্রতিবাদ করতে হবে।

কমান্ডার, তীক্ষ্ণতর হল এবার ক্যামারলেনগোর স্বর, একটা কথা কি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে যখন আপনি আমাকে এ্যাড্রেস করছেন, আপনি এ্যাড্রেস করছেন এই অফিসকে? আমি টের পাচ্ছি আপনি আমার পদটাকে ঠিকভাবে নিচ্ছেন না। আমি আছি ভ্যাটিকানের দায়িত্বে। আমার কোন ভুল না হয়ে থাকলে, কার্ডিনালরা এর মধ্যেই সিস্টিন চ্যাপেলে চলে গেছেন। আর কনক্লেভ ভাঙা পর্যন্ত আপনার নিরাপত্তা বলয়ের এলাকা অনেক কমে যাচ্ছে। ভেবে পাচ্ছি না আপনি কেন এই ডিভাইসটার খোঁজ করতে গড়িমসি করছেন। আমার ভুল না হয়ে থাকলে বলতে হয়, আপনি এ কনক্লেভকে আন্তর্জাতিক দুর্ঘটনার মুখে পতিত হতে দিচ্ছেন।

এবার যেন ফুলকি ছুটল ওলিভেট্টির মুখ দিয়ে, কত বড় সাহস তোমার! আমি তোমার পোপকে বারো বছর ধরে সেবা দিয়েছি। তার আগের পোপকে চৌদ্দ বছর! চৌদ্দশ আটত্রিশ থেকে সুইস গার্ড....

এমন সময় তার ওয়াকিটকি সজিব হয়ে উঠল, কমান্ডান্টে?

মুখের কাছে তুলল ওলিভেট্টি জিনিসটাকে, সোনো অকুপাটো! কোসা ভুওই!

স্কোসি, রেডিওর সুইস গার্ড বলল, কমিউনিকেশন্স হিয়ার। আমি মনে করেছি আপনি জানেন যে আমরা একটা বোমা হামলার হুমকির মুখে পড়েছি।

তাহলে ব্যাপারটাকে হ্যান্ডেল কর! স্বাভাবিক ট্রেস চালাও। সমূলে বের করে দাও ব্যাটাকে।

আমরা করেছি, স্যার। কিন্তু কলার... থামল গার্ড একটু, আমি আপনাকে বিরক্ত করব না বেশি কথা বলে। কলার যা বলল সেটা আপনার একটু আগে বলা শব্দ।

এন্টিম্যাটার!

সারা ঘরে নেমে এল পিনপতন নিরবতা। তাকিয়ে আছে সবাই।

সে কী বলেছে?

এন্টিম্যাটার, স্যার। কলের ট্রেস বের করার চেষ্টা যখন করছি আমরা তখন তার দাবির উপরে আরো কিছু কাজ করি আমি। এন্টিম্যাটার নিয়ে যে তথ্য আছে... সেটা... আসলেই খুব সমস্যার। বড় সমস্যার।

আমি মনে করেছি তুমি বলেছ যে ব্যালিস্টিক গাইডে সেটার নাম-নিশানাও নেই।

অন লাইনে পেয়েছি ব্যাপারটা।

এ্যালিলুইয়া! ভাবল ভিট্টোরিয়া।

জিনিসটা খুবই বিস্ফোরক। কথাটা কতটা সত্যি তা জানি না, তবে সেখানে লেখা আছে যে এন্টিম্যাটারের এক পাউন্ড পে লোড সে পরিমাণ পারমাণবিক ওয়্যারহেডের চেয়ে শতগুণ বেশি কর্মক্ষম!—থমকে গেল ওলিভেট্টি। যেন কোন পাহাড় দেখতে পাচ্ছে সে গোড়ায় বসে থেকে।

ক্যামারলেনগোর চেহারায় আতঙ্ক দেখে ভিট্টোরিয়ার উল্লাস হাপিস হয়ে গেল।

তুমি কি কলটা ট্রেস করেছ? জিজ্ঞাসা করল ওলিভেট্টি।

ভাগ্য মন্দ স্যার। ভারি এলাকা থেকে সেলুলারে কল এসেছে। স্যাট লাইনগুলো জ্যাম, একের উপর আরেকটা পড়ে যাচ্ছে। আই এফ সিগন্যাল এটুকু জানাচ্ছে যে, সে রোমেই কোথাও আছে। কিন্তু তাকে আবার পাবার কোন উপায় নেই।

সে কি কোন দাবি করেছে? শান্ত কণ্ঠে বলল ওলিভেট্টি।

না, স্যার। শুধু আমাদের জানিয়েছে যে কমপ্লেক্সের ভিতরে এন্টিম্যাটার লুকানো আছে। তাকে কেন যেন সারপ্রাইজড বলে মনে হল। জিজ্ঞাসা করল এখনো আমি সেটাকে দেখেছি কিনা। আপনি আমাতে এন্টিম্যাটার বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন, তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, সব জেনে তারপর আপনাকে জানাব।

ঠিক কাজই করেছ। নেমে আসছি এক মিনিটের মধ্যে। আবার কল করলে আমাকে

জানিও।

একটু সময় ধরে নিরবতা দেখা দিল লাইনে। সে এখনো লাইনে আছে, স্যার।

যেন ধাক্কা খেল ওলিভেট্টি, সে এখনো লাইনে আছে?

জি, স্যার। দশ মিনিট ধরে তাকে ট্রেস করার চেষ্টা করছি। সে জানে তাকে পাব না আমরা। তাই নাছোড়বান্দার মত ক্যামারলেনগোর সাথে কথা না বলা পর্যন্ত লাইন কাটতে রাজি হচ্ছে না।

পাঠিয়ে দাও তার লাইন! বলল ক্যামারলেনগো, এখনি।

ফাদার! না! ওলিভেট্টি বাধা দিল। ট্রেইন্ড সুইস গার্ড নেগোশিয়েটর অনেক বেশি দক্ষ, তাকে দিয়ে অনেক সুবিধা আদায় করা সম্ভব।

এখনি!

ওলিভেট্টি আদেশ দিল।

এক মুহূর্ত পরেই ক্যামারলেনগোর একটা ফোন বেজে উঠল। ক্যামারলেনগো আঙুল এগিয়ে দিল স্পিকার-ফোন বাটনে, ঈশ্বরের নামে জিজ্ঞেস করছি, নিজেকে কে মনে করছেন আপনি?

শব্দটা যান্ত্রিক এবং ঠান্ডা। ধাতব। রুমের প্রত্যেকে শুনছে।

উচ্চারণটা ধরার চেষ্টা করল ল্যাঙডন। মধ্যপ্রাচ্যের, তাই না?

আমি এক প্রাচীণ ব্রাদারহুডের প্রতিনিধি। অপরিচিত, অপার্থিব আত্মবিশ্বাস লোকটার সুরে, এমন এক ভাতৃসংঘ, যেটাকে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে আপনারা দমন করে এসেছেন। আমি দ্য ইলুমিনেটির একজন সংবাদবাহক।

ল্যাঙডনের মনে পড়ে গেল আজ সকালে প্রথম দেখা এ্যাম্বিগ্রামটার কথা।

কী চান আপনি? জিজ্ঞাসা করল ক্যামারলেনগা।

আমি বিজ্ঞানের লোকদের শ্রদ্ধা করি। মানুষ, যারা আপনাদের মতই সত্যের সন্ধানে আছে, কিন্তু আরো বেশি ভাল পদ্ধতিতে, আরো বিশুদ্ধ পথে। যারা মানুষের গন্তব্য, তার উদ্দেশ্য, তার স্রষ্টার বিষয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চায়।

আপনি যেই হন না কেন, বলছে ক্যামারলেনগো, আমি-

সাইলেঞ্জিও! আপনার কথাগুলো শুনে নেয়াই ভাল। দু হাজার বছর ধরে সত্যের সন্ধানে আপনার চার্চই অগ্রবর্তী ছিল। আপনারা বিনা দ্বিধায় আপনাদের শত্রুদের মূলোৎপাটিত করেছেন। আপনারা সত্যের আরাধনার নামে আখের গুছিয়েছেন। যারা অন্য পথে সত্যের সন্ধানে ছিল তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন বিনা দ্বিধায়। আপনারা কী করে অবাক হন এ কথা শুনে যে সারা পৃথিবীর আলোকিত মানুষের টার্গেট এখন আপনাদের ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান?

আলোকিত মানুষরা ব্ল্যাকমেইল করে না।

ব্ল্যাকমেইল? হাসল কলার, এটা কোন ব্ল্যাকমেইল নয়। আমাদের কোন দাবি নেই। ভ্যাটিকানের ধ্বংস অপ্রতিরোধ্য। আজকের দিনের জন্য আমরা শত শত বছর ধরে প্রতীক্ষা করেছি। মাঝরাতে আপনাদের মহানগরী গুঁড়িয়ে যাবে। আপনাদের করার কিছু নেই।

ফোনের কাছে এগিয়ে গেল ওলিভেট্টি, এ সিটিতে ঢোকা অসম্ভব! আপনাদের পক্ষে এখানে বোমা রাখা সম্ভব নয়!

আপনার কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে সুইস গার্ডের প্রতিনিধিত্ব করছেন। কোন অফিসার? আপনার জানার কথা যে বছরের পর বছর ধরে আমরা সারা পৃথিবীর সমস্ত এলিট বাহিনীর সাথে টক্কর দেয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছি। আপনি কি মনে করেন যে ভ্যাটিকান সিটি একেবারে নিরেট?

জিসাস! ভাবল ল্যাঙডন, তারা ভিতরের সাহায্য নিচ্ছে।

এতেই ইলুমিনেটির প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। তারা মেসনদের ভিতরে বেড়ে উঠেছে, দখল করেছে পৃথিবীর ব্যাঙ্কিং পাওয়ার, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। একবার চার্চিল বলেছিলেন যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস জানতে পেরেছে, পার্লামেন্টের ভিতরে নাজি আছে, আছে ইলুমিনেটি। একমাসে যুদ্ধ শেষ হয়ে যেতে পারত।

স্পষ্ট ধাপ্পা! আবার বলল ওলিভেট্টি, আপনাদের ক্ষমতা এতদূরে যেতে পারে না!

কেন? কারণ আপনাদের সুইস গার্ড অত্যন্ত ক্ষমতাবান? কারণ তারা আপনাদের প্রাইভেট ওয়ার্ল্ডের সব কোণা আর গলি-ঘুপচি রক্ষা করে? সুইস গার্ডের নিজেদের সম্পর্কে কী বলবেন? তারা কি মানুষ নয়? আপনি কি সত্যি সত্যি মনে করেন তারা সেই স্বপ্ন বুকে নিয়ে বিনা দ্বিধায় কাজ করছে যে কোন এক কালে কেউ একজন জলের উপর হেঁটেছিল? নিজেকেই প্রশ্ন করুন কীভাবে ভ্যাটিকান সিটির ভিতরে ক্যানিস্টারটা ঢুকল। বা কীভাবে আপনাদের সবচেয়ে দামি চার সম্পদ স্বয়ং ভ্যাটিকানের ভিতর থেকে উবে গেল?

আমাদের সম্পদ? অবাক হল ওলিভেট্টি, কী বলতে চান?

এক, দুই, তিন, চার। আপনারা এখনো তাদের হারানোর কথা জানেন না?

কোন চুলোর কথা বলছেন আপনি- থমকে গেল ওলিভেট্টি। কথা ফুঠছে না তার কণ্ঠে এবার।

আমি কি তাদের নাম বলব?

হচ্ছেটা কী? তাড়া দিল ক্যামারলেনগো।

হাসল কলার, আপনার অফিসার এখনো জানায়নি? কী পাপের কথা! অবাক হবার মত কিছু নয়। এতবড় গর্ব! আমি কল্পনা করতে পারি আসল সত্যিটা আপনাকে না জানানোর ব্যাপারটা... যে চার কার্ডিনালকে সে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেছিল তারা উধাও হয়ে গেছে...

এ তথ্য কোথায় পেলেন আপনি? ওলিভেট্টি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

ক্যামারলেনগো, বলল কলার একটু শান্ত কণ্ঠে, আপনার কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করুন সব কার্ডিনাল এর মধ্যে সিস্টিন চ্যাপেলে গেছে কিনা।

ওলিভেট্টির দিকে চকিতে তাকাল ক্যামারলেনগো, তার সবুজ চোখে ব্যাখ্য চাওয়ার ভাব।

সিনর, ওলিভেট্টি ফিসফিস করল ক্যামারলেনগোর কানে কানে, কথা সত্যি যে আমাদের চারজন কার্ডিনাল এখনো সিস্টিন চ্যাপেলে যাননি। কিন্তু সেজন্য সতর্কবাণীর কোন প্রয়োজন নেই। আজ সকালে সবাই রেসিডেন্ট হলে চেক ইন করেছেন। তাই আমরা ভাল করেই জানি যে তারা সবাই ভ্যাটিকান সিটির ভিতরে নিরাপদে আছেন। ঘণ্টাকয়েক আগে আপনি নিজে তাদের সাথে চা চক্রে যোগ দিয়েছেন। কনক্লেভের ফেলোশিপের জন্য তারা হয়ত কোন জায়গায় শলা পরামর্শ করছেন। আমাদের সার্চ চলছে পূর্ণ উদ্যমে। আমি নিশ্চিত তারা সময়ের কথা ভুলে গিয়ে ভ্যাটিকানের কোন না কোন অসাধারণ ব্যাপার উপভোগ করছেন। হয়ত বাগানে।

বাগানে উপভোগ করছেন? ক্যামারলেনগোর কণ্ঠ বরফ শীতল হয়ে গেল, চ্যাপেলে তাদের চলে যাবার কথা আরো ঘণ্টাখানেক আগেই।

ল্যাঙডন চকিতে দৃষ্টি ফেলল ভিট্টোরিয়ার উপর। কার্ডিনালরা হারিয়ে গেছে? তাহলে এর খোঁজেই তারা আশপাশ চষে ফেলছিল?

আমাদের কাজে আপনারা বেশ তুষ্ট হবেন। নামগুলো বলছি। কার্ডিনাল ল্যামাসে, প্যারিস থেকে; কার্ডিনাল গাইডেরা, বার্সিলোনা থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে কার্ডিনাল ইবনার...

প্রতিটা নাম পড়ার সাথে আরো আরো যেন কুঁকড়ে যাচ্ছিল ওলিভেট্টি।

আর ইতালি থেকে... কার্ডিনাল ব্যাজ্জিয়া।

যেন এইমাত্র ডুবে গেল ক্যামারলেনগোর ভরসার জাহাজ। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকল ফোনের দিকে। ইপ্রেফারিটি! ফিসফিস করল সে, চার ফেভারিট... ব্যাজ্জিয়া সহ... সর্বোচ্চ পদে আসীন হতে যাওয়া চার কার্ডিনাল... কী করে সম্ভব?

ল্যাঙডন আধুনিক পাপাল ইলেকশনের ব্যাপারে অনেক পড়েছে। নির্বাচনের আগে কয়েকজন কার্ডিনালের প্রস্তাব করা হয়। তাদের নিয়েই ভোট হবে। তাদের থেকেই একজন নির্বাচিত হবে পরবর্তী পোপ!

ক্যামারলেনগোর ভ্রূ থেকে টপটপ করে ঘাম ঝরে পড়ছে। তুমি এই লোকদের নিয়ে কী করবে?

আপনার কী মনে হয়, কী করব? আমি হ্যাসাসিনদের সরাসরি বংশধর।

একটা ধাক্কা খেল ল্যাঙডন। নামটাকে সে ভালভাবেই চেনে। চার্চ বছরের পর বছর ধরে একে একে অনেক শত্রুর জন্ম দিয়েছে হ্যাসাসিন, নাইট টেম্পলার, আরো নানা জাতের সৈন্যদল-যারা হয় গির্জার দ্বারা প্রতারিত হয়েছে, নাহয় তাদের দাবড়ে বেড়িয়েছে চার্চ। খুন করেছে নৃশংসভাবে।

ছেড়ে দাও কার্ডিনালদের, অবশেষে রা ফুটল ক্যামারলেনগোর ঠোঁটে, ঈশ্বরের মহানগরী ধ্বংসের হুমকিই কি যথেষ্ট নয়?

আপনাদের চার কার্ডিনালের কথা স্রেফ ভুলে যান। আপনাদের কাছে তাদের আর কোন নাম-নিশানা নেই। একটা ব্যাপার ঠিক ঠিক মনে রাখুন, তাদের মৃত্যু স্মরণীয় হয়ে থাকবে... লাখ লাখ লোকের কাছে। প্রত্যেক শহীদের মৃত্যুর মত। আমি তাদের মিডিয়া-খ্যাতি পাইয়ে

দেব ঠিক ঠাক, একের পর এক। মাঝরাতের মধ্যে ইলুমিনেটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কেন শুধু শুধু পৃথিবীকে বদলে দেয়া, যদি পৃথিবী না-ই জানল? লাখ লাখ লোকের কাছে আজো আতঙ্ক হয়ে আছেন আপনারা। অনেক, অনেক আগেই তার প্রমাণ দিয়েছেন... হত্যাকান্ড, নাইট টেম্পলারদের উপর করা অত্যাচার, ক্রুসেডার... একটু থামে সে, আর, অবশ্যই, লা পার্জা।

একেবারে নিরব হয়ে গেল ক্যামারলেগো।

আপনার কি আসলেই লা পার্জার কথা মনে নেই? শাসানোর ভঙ্গিতে জিগ্যেস করল কলার। অবশ্যই, মনে থাকার কথা নয়, আপনি একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু ছাড়া অন্য কিছুই নন। ঠুনকো একজন প্রিস্ট। প্রিস্টদের ইতিহাস জ্ঞান তথৈবচ। নাকি, এ ইতিহাস মনে রাখতে নেই কারণ এটা তাদের মনে লজ্জার কারণ হয়ে দেখা দেয়?

লা পার্জা। হঠাৎ টের পায় ল্যাঙডন, সে কথা বলছে, ষোলশো আটষট্টি, চার্চ চারজন ইলুমিনেটি বিজ্ঞানীকে হত্যা করে বুকে ক্রুসের আগুন-ছাপ বসিয়ে দেয়। তাদের পাপ স্খলনের জন্য।

কে কথা বলছে? কণ্ঠটা যেন দাবি করল, যেন সে প্রশ্ন করলে সব প্রশ্নের জবাব দিতে সবাই বাধ্য, একপায়ে খাড়া, এখানে আর কে কে আছে?

আবার একটু ধাক্কা খায় ল্যাঙডন, আমার নাম কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। বলল সে, চেষ্টা করল সে কণ্ঠ ঠিক রাখতে। ব্যাপারটা এখনো ঠিক স্বস্তিকর লাগছে না। একজন জীবন্ত ইলুমিনেটাসের সাথে সে কথা বলছে... ব্যাপারটা তার কছে জর্জ ওয়াশিংটনের সাথে কথা বলার সমতুল্য। আমি একজন এ্যাকাডেমিক যে আপনাদের ব্রাদারহুডের উপর গবেষণা করেছে।

চমৎকার! সাথে সাথে জবাব দেয় কণ্ঠটা, আমি ব্যাপারটা ভেবে অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছি যে, আমাদের সাথে করা তুলনাহীন অন্যায়ের ব্যাপারটা কেউ না কেউ মনে রেখেছে। আজো তা নিয়ে স্টাডিকরছে।

আমাদের বেশিরভাগই মনে করে আপনারা বিলুপ্ত।

এমন এক ভ্রান্তি যা অনেক কষ্টে চাউর করেছে ব্রাদারহুড। লা পার্জার ব্যাপারে আর কী জানেন আপনি?

একটু দ্বিধায় পড়ে যায় ল্যাঙডন। আর কী জানি আমি! এই পুরো পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোলাটে আর জটিল হয়ে উঠছে, ব্যস, এটুকুই জানি। চিহ্ন একে দেয়ার পর চার বিজ্ঞানীকে হত্যা করা হয়। তারপর রোমের জনবহুল এলাকাগুলোয় সেই লাশগুলো ফেলে রাখা হয়, যেন আর কোন বিজ্ঞানী ইলুমিনেটিতে যোগ না দেয়।

ঠিক তাই। আর সেজন্যেই আমরা ঐ একই কাজ করব। কুইড প্রো কিউ। একে ধরে নিন আমাদের ব্রাদারহুডের প্রতিশোধ। আমরা ঠিক তাই করব আপনাদের কার্ডিনালদের নিয়ে যা করা হয়েছিল আমাদের সাথে। আটটা থেকে পালা শুরু হবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় একে একে তারা মারা যাবে। মাঝরাতে ঘটনা চাউর হয়ে যাবে সারা দুনিয়ায়।

ল্যাঙডন ঝুঁকে এল ফোনের কাছে, আপনারা আসলেই সেই চারজনকে ইলুমিনেটির ছাপ দিয়ে রাস্তায় নিক্ষেপ করবেন?

হিস্টোরি রিপিটস ইটসেলফ, তাই নয় কি? অবশ্যই, গির্জা যতটা নিষ্ঠুর ছিল তারচেয়ে বেশি করব আমরা। তারা নির্জনে হত্যা করেছে, তারপর ফেলে দিয়েছে এমন সব সময়, যখন মানুষ দেখতে পাবে না। ব্যাপারটা কি কাপুরুষ কাপুরুষ নয়?

কী বলছেন আপনি? চিৎকার করে ওঠে ল্যাঙডন, আপনারা মানুষের সামনে তাদের ব্র্যান্ডেড করে হত্যা করবেন?

খুব ভাল। অবশ্য ব্যাপারটা এমন, আপনারা মানুষের সামনে বলতে কী বোঝেন তার উপর নির্ভর করছে। আমার যদ্দূর মনে হয় আজকাল খুব বেশি লোক গির্জায় যায় না।

সাথে সাথে প্রশ্ন করে ল্যাঙডন, আপনারা তাদের চার্চে খুন করবেন?

দয়া করে। তাদের আত্মা যেন স্বর্গে খুব সহজেই তুলে নিতে পারেন ঈশ্বর। ব্যাপারটা এখানেই। অবশ্যই, সংবাদপত্রের লোকজনও থাকবে সেখানে।

ব্লাফ দিচ্ছেন আপনি, ওলিভেট্টি বলল, তার সেই চির শীতল কণ্ঠস্বরে। আপনারা কোন চার্চে একজন মানুষকে হত্যা করে পাততাড়ি গুটাতে পারবেন না মোটেও।

ব্লাফ দিচ্ছি? আপনার সুইস গার্ডের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্ত প্রবাহের মত আমাদের চলাফেরা। আপনার মন থেকে দয়া করে ঐ চারজন কার্ডিনালকে সরিয়ে দিলাম, আপনাদের পবিত্রতম জায়গার হৃদপিন্ডে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বোমা পেতে দিলাম, আর আপনারা ব্যাপারটাকে ব্লাফ মনে করছেন? খুনটা হয়ে যাবার পর মিডিয়া যখন হামলে পড়বে তখন বুঝবেন ব্লাফ কাকে বলে। মাঝরাতের মধ্যে পুরো দুনিয়া জেনে যাবে ইলুমিনেটির কথা।

আর আমরা যদি প্রত্যেক চার্চে গার্ড বসাই? প্রশ্ন তুলল ওলিভেট্টি। হাসল কলার। আমি জানি আপনাদের মান্ধাতার আমলের ধর্ম-মন্দিরে এমন কিছু করার চেষ্টা আপনারা করবেন। আমি ভাল করেই ব্যাপারটা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। আপনি যখন কথাটা বলছেন তখন কি ভাল করে ভাবেননি? রোমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারশ গির্জা। ক্যাথলিক গির্জার সাথে সাথে আরো আছে ক্যাথেড্রাল, চ্যাপেল, ট্যাবারনেল, এ্যাবে, মনাস্টারি, কনভেন্ট, প্যারোসিয়াল স্কুল...।

আরো শক্ত হয়ে গেল ওলিভেট্রির চোয়াল।

নব্বই মিনিটের মধ্যে খেলা শুরু হয়ে যাবে। একটু যেন ব্যস্ত কলার, এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর। মরণের একটা গাণিতিক হার। এবার আমার যেতেই হচ্ছে।

দাঁড়ান! বলল ল্যাঙডন, আপনি তাদের গায়ে যে চিহ্ন একে দিতে চান সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

যেন বেশ মজা পেয়েছে লোকটা, মনে হচ্ছে আগেভাগেই ব্যাপারটা সম্পর্কে জেনে গেছেন আপনি! নাকি আপনি কোন স্কেপটিক? আর বেশি দেরি নেই, তাড়াতাড়িই দেখতে পাবেন সেগুলোকে। পুরনোদিনের কথাগুলো যে সত্যি তার প্রমাণ হিসেবেই দেখা যাবে সেগুলোকে।

মাথা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ল্যাঙডনের। সে ঠিক ঠিক জানে লোকটা কী বলতে চায়। লিওনার্দো ভেট্রার বুকের সেই চিহ্নটার কথা তার মনে পড়ে যায়। ইলুমিনেটির গল্পগাঁথায় পাঁচটা চিহ্ন একে দেয়ার কথা ছিল। আর চারটে ব্র্যান্ড বাকি, ভাবল সে, এবং চারজন কার্ডিনাল স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে।

আমার একটা প্রতিজ্ঞা ছিল, বলল ক্যামারলেনগো, প্রতিজ্ঞা ছিল ঈশ্বরের কাছে। আজ রাতেই আমি একজন নতুন পোপ আনব।

ক্যামারলেনগো, বলল কলার, দুনিয়ার নতুন একজন পোপের কোন প্রয়োজন নেই। আজ মাঝরাতের পর পৃথিবীর উপর ছড়ি ঘোরানোর মানুষগুলো থাকবে না। গুঁড়িয়ে মিশে যাবে ইট পাথরের সাথে। ক্যাথলিক চার্চ শেষ। পৃথিবীতে আপনাদের রাজত্বের অবসানহতে চলেছে। খুব তাড়াতাড়ি।

একটা নিরবতা ঝুলে আছে পুরো ঘর জুড়ে।

ক্যামারলেনগার চোখ একেবারে দ্বিধাবিভক্ত। আপনি ভ্রান্ত পথে আছেন। ভুল পথ দেখানো হয়েছে আপনাকে। একটা চার্চ শুধুই ইট পাথরের কোন গাঁথুনি নয়। আপনি দু হাজার বছরের বিশ্বাসকে এক লহমায় গুঁড়িয়ে দিতে পারেন না... কোন বিশ্বাসকেই নয়। কোন বিশ্বাসকে তার পার্থিব সম্পদ ধ্বংস করে শেষ করে দেয়া যায় না। ক্যাথলিক চার্চের ধারা চলতেই থাকবে। ভ্যাটিকান সিটি থাক আর নাই থাক।

কী মহৎ মিথ্যাচার! আমরা দুজনেই আসল সত্যিটা জানি। বলুন তো দেখি, ভ্যাটিকান দেয়ালঘেরা দুনিয়া কেন?

ঈশ্বরের মানুষেরা একটা ঝুঁকিপূর্ণ জগতে বসবাস করেন। চটপট বলল ক্যামারলেনগো।

আপনি কতটা তরুণ? ভ্যাটিকান সিটি একটা দেয়ালঘেরা বিশ্ব কারণ ক্যাথলিক গির্জার

অর্ধেক সম্পদ এর ভিতরে। দুর্লভ পেইন্টিং, স্কাল্পচার, দামি গহনা, দুর্লভ বই... আর ভ্যাটিকান ব্যাঙ্কের ভিতরে দুনিয়ার তাবৎ গির্জার কাগজপত্র আর সোনার ঢিবি পড়ে আছে। সাড়ে আটচল্লিশ বিলিয়ন ডলার মূল্যের জিনিসপত্র ঐ একটা ব্যাঙ্কে সাজানো আছে। আপনারা একটা ডিম্বাকার ঘরে বসে আছেন, নিরাপদে, নিরুপদ্রব। আর কালকে এই সমস্ত সম্পদ স্রেফ ধ্বংসস্তুপ... বলা ভাল ছাইয়ে পরিণত হবে। এমনকি পোশাকী বাহিনী পাঠিয়েও কোন ফায়দা লুটে নেয়া যাবে না।

কথার সত্যতা সহজেই অনুমেয়। সাথে সাথে ছাইবর্ণ হয়ে গেছে ওলিভেট্টির মুখ আর ক্যামারলেনগোর চেহারা। কোনটা নিয়ে অবাক হতে হবে তা ভেবে পায় না ল্যাঙডন। ক্যাথলিক চার্চের অত সম্পদ আছে সেটা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যাবে, নাকি কী করে ইলুমিনেটি এই গোপন খবর পেল সেটা ভেবে হয়রান হবে।

ক্যামারলেনগো আবার শক্ত করে ফেলতে পারল মুখাবয়ব, বিশ্বাস এই গির্জার ভিত্তি। অর্থ নয়।

আবার মিথ্যা কথা! বলল কলার, যেন বেশ মজা পেয়েছে, গত বছর আপনারা একশো তিরাশি মিলিয়ন ডলার ব্যায় করেছেন আপনাদের মেরুদন্ড আরো পোক্ত করার কাজে। সারা দুনিয়া জুড়ে। চার্চে হাজির হওয়ার হার গত বছর ইতিহাসে সবচেয়ে নিচে নেমে এসেছে। ছিচল্লিশ ভাগ। দানের হারও সাত বছরে সবচেয়ে নিচে নেমে এসেছে। সেমিনারিতে মানুষের আসার হার কমছে তো কমছেই। আপনারা বলেন আর নাই বলেন, চার্চের মরণ ঘনিয়ে এসেছে এমনিতেই, তার উপর আমরা একটু প্রভাবক যোগ করে দিলাম। আরেকটু দ্রুত হোক হাটা। এই আরকী!

এক পা এগিয়ে গেল ওলিভেট্টি, এখন আর তাকে আগের মত যুদ্ধংদেহী মনে হচ্ছে না। বরং যেন একটু বিদ্ধস্ত। যেন একটু নুয়ে পড়া। সত্যকে যেন সে মেনে নিচ্ছে। তার দৃষ্টি একজন কোণঠাসা মানুষের মত যে পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আর যদি এমন হয় যে আপনাদের ফান্ডে সেই ক বিলিয়নের কিয়দংশ জায়গা করে নেয়?

আমাদের দু পক্ষকেই অপমান করার কোন মানে হয় না।

আমাদের অনেক অনেক টাকা আছে।

ঠিক আমাদের মতই। আপনারা তার কোন তল খুঁজে পাবেন না।

ইলুমিনেটির অর্থ সম্পদের কথা একবার মনে করার চেষ্টা করল ল্যাঙডন। সেই আদ্যিকাল থেকে তারা সামরিক দিক দিয়ে শক্তিমান হবার বদলে সমস্ত মনোযোগ দিয়েছে অর্থনীতি আর রাজনীতির দিকে। সেই কবেকার মেসনদের সম্পদও তাদের করতলে। প্রথমদিকের ব্যাভারিয়ান মেসনদের সম্পদ, রথসচাইল্ডের টাকার কাড়ি, বিল্ডার বার্গার আর ইলুমিনেটির সেই হীরা।

আই প্রেফেরিতি! প্রসঙ্গ বদল করল ক্যামারলেনগো, অনুনয় ঝরে পড়ল তার ঠান্ডা কণ্ঠে। ছেড়ে দিন তাদের। তারা বয়স্ক। তারা....

তারা চিরকুমার... হাসল কলার, গা জ্বালানো হাসি, আপনি কি সত্যি সত্যি মনে করেন তাদের কৌমার্য অক্ষত আছে? তাদের মরণের সময় সত্যি কি তাদের জন্য কেঁপে উঠবে ঈশ্বরের সিংহাসন? স্যাক্রিফিসি ভার্জিনি নেল অল্টেয়ার ভিসিয়েঞ্জা।

অনেক অনেক সময় ধরে চুপ করে থাকল ক্যামারলেনগো, তারপর বলল, তারা বিশ্বাসের মানুষ। আর অবশেষে সাহস ভর করল তার কণ্ঠে, তারা মরণকে ভয় পান না।

হাসল কলার। লিওনার্দো ভেট্রাও বিশ্বাসের মানুষ ছিল। গতরাতে তাকে যখন আমি হত্যা করি তখন তার চেহারায় রাজ্যের ভয় ভর করেছিল। এমন একটা ভয় যেটাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম আমি।

এতোক্ষণ চুপ করে ছিল যে, সেই ভিট্টোরিয়া এবার সাথে সাথে জ্বলে উঠল তেলে বেগুনে। হ্যাসাসিনো! সে ছিল আমার বাবা।

একটা মৃদু হাসি শোনা গেল ফোনের অপর প্রান্ত থেকে, আপনার বাবা? কী শুনছি আমি!

ভেট্রার একটা মেয়েও আছে নাকি? আপনার জানা উচিৎ, শেষ বেলায় আপনার বাবা হাল ছেড়ে দিয়ে ফুপিয়ে কেঁদেছিল। বাচ্চা ছেলের মত। আফসোস। কিন্তু যা সত্যি তাই বলছি আমি।

কথাগুলো যেন কোণঠাসা করে ফেলল ভিট্টোরিয়াকে! একেবারে পড়ে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে রইল সে কোনমতে। সাহায্য করার জন্য ল্যাঙডন এগিয়ে যেতেই আবার সামলে নিল। তার গহীন চোখদুটো স্থির হল ফোনের দিকে, আমি আমার প্রাণ হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আজ রাতটা কেটে যাবার আগেই আমি তোমার টুটি চেপে ধরব। তার কণ্ঠ আরো আরো সরু হয়ে যাচ্ছে, আর একবার তোমাকে পেলে...

আবার হাসল লোকটা, তেজ আছে মেয়েটার। আমি স্তম্ভিত! হয়ত আজ রাত পেরিয়ে যাবার আগেই আমি তোমাকে খুঁজে পাব, আর একবার তোমাকে পেলে...

কথাটুকু ভেসে থাকল বাতাসে কিছুক্ষণ। তারপর সে চলে গেল।

কার্ডিনাল মর্টাটি কালো রোব গায়ে দেয়া অবস্থায় ঘেমে একসা হচ্ছেন। সিস্টিন চ্যাপেলের কী অবস্থা তা ঈশ্বরই ভাল জানেন। এটা যেন কোন শোনা বাথের ঘর। আর বিশ মিনিটের মধ্যে কনক্লেভ শুরু হয়ে যাবে। এখনো কোন পাত্তা নেই সেই চার কার্ডিনালের। তাদের অনুপস্থিতিতে অন্য কার্ডিনালদের কথোপকথন এখন অস্থিরতার রসে জারিত হচ্ছে।

ভেবে পান না কোন চুলোয় যেতে পারেন ঐ চার কার্ডিনাল। ক্যামারলেনগোরের সাথে নেই তো? ভাবেন তিনি। তার ভালই জানা আছে, ক্যামারলেনগো আজ বিকালে বেছে নেয়া চারজনের সাথে চা-চক্রে বসেছিলেন। কিন্তু সেটা কয়েক ঘণ্টা আগের কথা। তারা কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? খাবারের সাথে বেখাপ্পা কিছু খাইয়ে দেয়া হয়নি তো? এ নিয়েও সংশয় কম নেই। মৃত্যুশয্যায় থাকলেও তারা এখানে হাজির হতেন সময় মত। একটা জীবনে এমন সুযোগ আর আসে না। সুপ্রিম পন্টিফ হিসেবে নির্বাচিত হতে হলে অবশ্যই সেই কার্ডিনালকে এই সিস্টিন চ্যাপেলের ভিতরে থাকতে হবে নির্বাচনের সময়। এ নিয়মের কোন নড়চড় নেই।

চারজন প্রেফারিতি থাকলেও কার্ডিনালদের মধ্যে দ্বিধা আছে, কে হতে পারেন সেই সোনার মুকুটধারী। গত পনেরটা দিন একের পর এক ফোন আর ফ্যাক্স এসেছে, কে হতে পারেন পরবর্তী পোপ। কথামত চারজনকে প্রেফারিতি হিসেবে ধরা হয়। পোপ হবার সমস্ত গুণাবলী তাদের মধ্যে বিদ্যমান।

ইতালিয়, স্প্যানিয়, ইংরেজিতে দক্ষতা,

ক্লজিটের ভিতরে কোন কঙ্কাল থাকতে পারবে না,

বয়স হতে হবে পঁয়ষট্টি থেকে আশির মধ্যে।

প্রথমত, একজন প্রেফারিতিকে আর সবার সামনে কলেজ অব কার্ডিনালরা প্রস্তাব করবেন। আজরাতের সেই মানুষের নাম কার্ডিনাল অলডো ব্যাজ্জিয়া, এসেছেন মিলান থেকে। ব্যাজ্জিয়ার কাজের অতুলনীয় রেকর্ড, অসাধারণ ভাষাজ্ঞান আর আত্মিক যোগাযোগে দক্ষতার কারণে তাকেই সবাই সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বলে ধরে নিয়েছেন।

আর এখন সেই দানব কোথায়? প্রশ্ন ছোঁড়েন মর্টাটি।

এই কনক্লেভ পরিচালনা বা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তার ঘাড়ে পড়েছে দেখে মর্টাটি যার পর নাই উদ্বিগ্ন হন। এক সপ্তাহ আগে থেকেই কলেজ অব কার্ডিনালস মর্টাটিকে দ্য গ্রেট ইলেক্টর হিসেবে নিয়োগ করেছিল-কনক্লেভের অভ্যন্তরীণ নেতা হিসেবে। ক্যামারলেনগো আসলে প্রথা অনুযায়ী প্রশাসনের প্রধান হলেও সে সামান্য একজন প্রিস্ট। আর নির্বাচনের জটিলতা বা পদ্ধতি কোনটা সম্পর্কেই তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তাই সিস্টিন চ্যাপেলের ভিতরে এই পুরো প্রক্রিয়া তদারকির জন্য কার্ডিনালদের মধ্যে একজনকে বেছে নেয়া হয়।

কার্ডিনালরা প্রায়ই বলাবলি করেন যে গ্রেট ইলেক্টর নির্বাচিত হওয়া এক প্রকারের নিষ্ঠুর তামাশার নামান্তর। নির্বাচন যেন সুষ্ঠুভাবে হয় তা দেখার দায়িত্ব তার, আবার তিনি সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠ হন, তার ভিতরে পোপ হবার গুণাবলী থাকে, তবু তিনি অন্য কাউকে নির্বাচিত করার পথে সহায়তা করতে পারেন, ব্যস, এটুকুই। তার নিজের পক্ষে নির্বাচিত হবার কোন সুযোগ থাকে না।

কিন্তু এ নিয়ে মর্টাটির মনে কোন আফসোস নেই। বরং দায়িত্ব পেয়ে তিনি খুশীই। তিনি যে সিস্টিন চ্যাপেলের ভিতরের কার্ডিনালদের মধ্যে সবচেয়ে বয়সী তাই শুধু নয়, তিনি ছিলেন বিগত পোপের খুব কাছের মানুষ। যদিও তিনি প্রার্থী হবার যোগ্যতা রাখেন, উনআশি বছরের বয়স্ক হিসাবে, তবু পোপ হিসেবে নির্বাচিত করায় কিছু সমস্যা আছে। এখন আর তিনি তেমন শক্তপোক্ত নন। কার্ডিনালদের কলেজ তাঁকে আর এই জীবনের এত লম্বা সময় পেরিয়ে এসে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত অবস্থায় পোপত্বের মত বড় একটা খাটুনির কাজে নিয়োগ করতে ঠিক রাজি নয়। একজন পোপ গড়ে দিনে চৌদ্দ ঘণ্টা, সপ্তাহে সাতদিন এবং জীবনে ছয় দশমিক তিন বছর কাটান প্রচন্ড ব্যস্ততায়। তারপর ত্যাগ করেন শেষ নিঃশ্বাস। নিষ্ঠুর

রসিকতাটা হল, পোপত্ব মেনে নেয়া আর স্বর্গের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া একই মুদ্রার আরেক পিঠ।

অনেকেই মনে করেন, মর্টাটি তার আরো তরুণ বয়সে পোপত্ব পেতে পারতেন যখন তিনি ছিলেন শক্ত-সমর্থ এবং একই সাথে একটু কট্টর। যখন এ পোপত্ব আসে তখন তিনটা পবিত্র বৈশিষ্ট থাকতে হয়

রক্ষণশীলতা, রক্ষণশীলতা, রক্ষণশীলতা।

একটা ব্যাপার মর্টাটি বেশ খেয়াল করেছেন, বিগত পোপ, ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন, ছিলেন অনেক বেশি উদারপন্থী, অবশ্যই পোপত্ব পাবার পরে। তিনি বুঝতে পারছিলেন, পৃথিবীর গতি এখন অনেক বেশি। মানুষ গির্জার গন্ডি অনেক আগেই পিছনে ফেলে এসেছে, এই হার আরো আরো বাড়ছে, গাণিতিক হারে। তাই তিনি চার্চকে অনেক বেশি উদারপন্থী হিসেবে জাহির করলেন। এমনকি কিছু নির্বাচিত গবেষণার জন্য অর্থও বরাদ্দ করলেন। কিন্তু আসলে এটা রাজনৈতিক আত্মহত্যার শামিল। রক্ষণশীল ক্যাথলিকরা তার উপর ভ্রান্তির কলঙ্ক চাপিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ। তারা শতমুখে বলতে লাগল, পোপ চার্চকে এমন সব ক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছেন যেখানে এর আওতা নেই।

তো, তারা কোথায়?

ঘুরে গেলেন মর্টাটি।

একজন কার্ডিনাল অনেকটা অনিশ্চয়তা নিয়ে তার কাঁধে টোকা দিচ্ছিলেন। আপনি জানেন তারা কোথায়, তাই না?

মর্টাটি খুব একটা উদ্বিগ্নতা না দেখিয়েই বললেন, সম্ভবত ক্যামারলেনগোর সাথে।

এই সময়ে? এটা একেবারে নিয়ম বহির্ভুত। ক্যামারলেনগো সময়ের কথা ভুলে যাননি তো?

এই কথামর্টাটি ঠিক মেনে নিতে পারলেন না। কিন্তু চুপ করে থাকাকেই শ্রেয় মনে করলেন। একটা কথা বেশিরভাগ কার্ডিনাল মনে করেন, ক্যামারলেনগোর কোন মূল্য নেই। এই লোক পোপকে কাছ থেকে দেখাশোনা করার হিসেবে একেবারে বাচ্চা। মর্টাটি জানেন, এদের বেশিরভাগের এই মনোভাবের পিছনে কাজ করে হিংসা। কিন্তু মনে মনে তারিফ করেন মর্টাটি এই কমবয়েসি ক্যামারলেনগোর। পোপ ভুল করেননি এমন একজন চেম্বারলিনকে নিয়োগ করে। আর একটা ব্যাপার বলার মত, ক্যামারলেনগোর চোখ-মুখে একটা অন্যরকম দীপ্তি আছে। আর অনেক কার্ডিনাল যেটা পারেননি সেটা করে দেখিয়েছেন এই ক্যামারলেনগো। রাজনীতি আর স্বার্থ থেকে চার্চকে সুন্দরভাবেই দূরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। ব্যাপারটা দুর্লভ। আসলেই, এ লোক ঈশ্বরের মানুষ।

তবু এই ক্যামারলেনগোর থলেতে যে কিছুই নেই সেটা বলা যাবে না। বরং অনেক বেশি অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার আছে তাকে ঘিরে, তার ছেলেবেলায়... এমন একটা ব্যাপার ঘটেছিল যার কোন তুলনা নেই। সব মানুষের মনেই একটা স্থির বিশ্বাসের জন্মদেয় ব্যাপারগুলো। মনে মনে একটু আফসোসও করেন মর্টাটি। তার কৈশোরে এমন। মিরাকল ঘটলেও ঘটতে পারত।

চার্চের দুর্ভাগ্য, ভাবলেন তিনি, পরিণত বয়সেও কখনোই ক্যামারলেনগো পোপ হতে পারবে না। পোপ হবার জন্য প্রচন্ড রাজনৈতিক জেদ থাকা দরকার যা এই অপেক্ষাকৃত তরুণ লোকটার ভিতরে নেই। বারবার সে পোপের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে, সে খুব বেশি কিছু হতে চায় না। আর দশজনের মত থেকে চার্চের সেবা করাই তার ইচ্ছা।

এরপর কী হবে? আবার কার্ডিনাল তার কাঁধে টোকা দিলেন।

চোখ তুলে তাকালেন মর্টাটি, আই এ্যাম স্যরি?

দেরি হয়ে যাচ্ছে তাদের। কী করব আমরা?।

আমরা আর কী করতে পারি? সতেজে জবাব ঝাড়লেন মর্টাটি, আমরা অপেক্ষা করব। বিশ্বাস রাখব অটুট।

পুরোপুরি অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন কার্ডিনাল ছায়ায়।

একটা দীর্ঘ মুহূর্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন মর্টাটি। আসলেই, কী করব আমরা? তিনি ফাঁকা চোখে তাকালেন মাইকেলেঞ্জেলোর করা সেই ভুবনখ্যাত দেয়ালচিত্রের দিকে। দ্য লাস্ট জাজমেন্ট। তার ব্যকুলতা একটুও কমাতে পারল না ছবিটা। পঞ্চাশ ফুট লম্বা বিশাল এক ছবি। সেখানে যিশুখ্রিস্ট মানুষের বিশাল এক দলকে পথদেখাচ্ছেন। পাপীরা চলে যাচ্ছে নরকের দিকে, নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আর পথপ্রাপ্তরা অপেক্ষা করছে। মাইকেলেঞ্জেলোর শত্রুদের একজন বসে আছে নরকে, তার পরনে গাধার কান। জা দি মপসাঁ একবার বলেছিলেন যে ছবিটা দেখে মনে হয় কোন নিচু স্তরের কয়লা-আকিয়ে কোন রেসলিং বুথের জন্য ছবি একে রেখেছে।

একমত হলেন কার্ডিনাল মর্টাটি।

ল্যাঙডন তাকিয়ে আছে নিচের মিডিয়ার লোকজনের দিকে, তাদের ট্রাকগুলোর দিকে, পোপের বুলেটপ্রুফ অফিসে দাঁড়িয়ে থেকে। বিচ্ছিরি ফোনকলের কথাগুলো তার মনে বারবার আঘাত করছে... কেন যেন তেতে উঠছে মন। তার নিজের প্রতি নয়, অবশ্যই।

ইলুমিনেটি, পুরনো দিনের একটা বিশাল সাপের মত বেরিয়ে এসেছে গর্ত থেকে, আর এসেই সোজা জড়িয়ে ধরেছে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে। কোন দাবি নেই। নেই কোন হাত মেলানো। শুধুই শোধ। শয়তানির মতই সরল। শুষে ফেলা। এমন এক প্রতিশোধ, যার জন্য চারশো বছর অপেক্ষা করতে হল। শতবর্ষের খোলস ছেড়ে বিজ্ঞান এবার তেড়েফুড়ে আসছে প্রচন্ড প্রলয় হাতে নিয়ে।

ক্যামারলেনগো সোজা বসে আছে তার আসনে। ফাঁকা দৃষ্টি ফেলছে ফোনের উপর। ওলিভেট্টিই প্রথমে নিরবতা ভাঙল, কার্লো, বলল সে, ক্যামারলেনগোর প্রথম নাম ধরে, তার কণ্ঠে অফিসারসুলভ কোন ভঙ্গিমা নেই, তার বদলে ভয়ে জবুথবু এক বন্ধুর চিহ্ন পাওয়া যায়। ছাব্বিশ বছর ধরে আমি এই অফিসের নিরাপত্তার জন্য প্রাণপাত করেছি। আজ রাতে আমার মনে হচ্ছে আমার যথাযথ সম্মানটুকু পাচ্ছি না।

ক্যামারলেনগো সাথে সাথে বলল, আমি আর আপনি দুজনেই দু পথে ঈশ্বরের সেবা করে গেছি। আর সেবা সব সময় সম্মান বয়ে আনে।

এই ব্যাপারগুলো... আমি কল্পনাও করতে পারি না কী করে... এই পরিস্থিতি... ওলিভেট্টি যেন একেবারে মিইয়ে গেছে।

আপনি জানেন, আমাদের সামনে একটা মাত্র পথ খোলা আছে। কলেজ অব কার্ডিনালের নিরাপত্তার জন্য আমার ঘাড়েও একটা দায়িত্ব বর্তায়।

আমার ভয় হচ্ছে, দায়িত্বটা আসলে পুরোদস্তুর আমার, সিনর।

তার মানে আপনার লোকজন খুব দ্রুত এ জায়গা খালি করার কাজে নেমে পড়বে।

সিনর?

পরের কাজটার জন্য পরে উঠেপড়ে লেগে গেলেও চলবে। ডিভাইসটার খোঁজ পরে করলেও আমাদের চলবে। খোঁজ করতে হবে হারানো কার্ডিনালদেরও। কিন্তু সবার আগে এখানে হাজির কার্ডিনালদের নিরাপত্তার দিকটা দেখতে হবে আমাদের। মানুষের মূল্য আর সবকিছুর উপরে। ঐ লোকগুলো এ গির্জার ভিত।

আপনি বলছেন এখন আমরা কনক্লেভ বাদ দিয়ে দেব?

আর কোন উপায় কি আছে আমার?

নতুন পোপ নির্বাচনের জন্য আপনার উপর যে দায়িত্ব ছিল তার কী হবে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তরুণ চ্যাম্বারলিন ফিরে দাঁড়াল জানালার দিকে। নিচে, রোমের দিকে তার দৃষ্টি ঘুরছে ফিরছে। হিজ হলিনেস একবার আমাকে বলেছিলেন যে পোপ হলেন এমন এক মানব যিনি দুটো জগতের মাঝখানে পড়ে যান... বাস্তব ভুবন আর ঐশ্বরিক দুনিয়া। তিনি সব সময় আমাকে মনে করিয়ে দিতেন যে, কোন চার্চ যখনি বাস্তবতাকে মেনে না নিয়ে কাজ করবে সে-ই বঞ্চিত হবে ঐশ্বরিক জগতে। হঠাৎ তার কণ্ঠে ঝরে পড়ল বাস্তবতা, আমাদের উপর আজ রাতে বাস্তব দুনিয়া ভেঙে পড়ছে। আমরা সেটাকে অবহেলা করার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না। ঐতিহ্য আর গর্ব কখনোই কারণকে অবজ্ঞা করতে পারে না।

নড করল ওলিভেট্টি, তার চোখেমুখে সত্যিকার বন্ধুত্ব, আমি আপনাকে ছোট করে দেখেছি, সিনর।

কথাটা যেন শুনতে পায়নি ক্যামারলেনগো, তার চোখ ঘুরে ফিরছে রোমের উপরে।

খোলাখুলিই বলব আমি, সিনর। বাস্তব দুনিয়া হল আমার দুনিয়া। আমি প্রতিদিন এত বেশি বার এ নোংরা দুনিয়ার মুখোমুখি হই, এত বেশিবার পৃথিবীর খারাপ দিকগুলোর মোকাবিলা করি, একটা মাত্র কারণে, অন্যরা যেন একটা পরিষ্কার জগৎ উপহার পায়।

আমাকে আজ বলতে দিন। এ পরিস্থিতির জন্যই আমাকে বারবার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে... আপনার সিদ্ধান্ত ভয়ংকর হতে পারে।

ঘুরে দাঁড়াল ক্যামারলেনগো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওলিভেট্টো। এখন আপনার পক্ষে সবচেয়ে বেশি জটিল হবেযে কাজটা, তা হল, কলেজ অব কার্ডিনালসকে সিস্টিন চ্যাপেল থেকে বের করে আনা।

ক্যামারলেনগো যেন খুব একটা দ্বিমত পোষণ করছে না। আপনি কী বলেন?

কার্ডিনালদের কিছু না বলা। তাদের কনক্লেভ সিল করে দেয়া। সেই সাথে সময় বুঝে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া। আমাদের হাতে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হল, সময়।

দ্বিধায় পড়ে গেছে যেন ক্যামারলেনগো, আপনি কি বলতে চান যে টাইম বোমার উপরে রেখে কলেজ অব কার্ডিনালসকে কনক্লেভে বন্দি করে ফেলব?

জি, সিনর। এখনকার জন্য। পরে, যদি প্রয়োজন পড়েই যায়, আমরা দ্রুত তাদের সরিয়ে নিতে পারব।

মাথা নাড়ল ক্যামারলেনগো, দরজা বন্ধ হয়ে যাবার আগে, যা করার করতে হবে। একবার কনক্লেভ বন্ধ হয়ে গেলে, সেটাকে আর কোনমতেই সরানো যাবে না। নিয়ম অনুযায়ী...

বাস্তব ভুবন, সিনর। আজ রাতে আপনি এখানেই আছেন। মন দিয়ে শুনুন। এবার ওলিভেট্টির স্বর শুনতে কোন ফিল্ড অফিসারের সুরের মতই শোনাচ্ছে, একশো পয়ষট্টিজন কার্ডিনালকে রোমে তুলে আনা একই সাথে অনিরাপদ এবং ঝামেলার কাজ। তাদের সবাই বয়স্ক। সবাই শারীরিকভাবে একটু হলেও অক্ষম। তাদের এই বয়সে এতখানি সরিয়ে আনা একেবারে অবিবেচকের মত কাজ হবে। এক মাসে একটা চরম স্ট্রোকই যথেষ্ট।

একটা চরম স্ট্রোক। কথাটা মনে করিয়ে দিল ল্যাংডনের অতীত স্মৃতি। সে হার্ভার্ডে থাকার সময় পত্রিকায় দেখেছিলঃ পোপ স্ট্রোকে ভুগছেন। ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

এ ছাড়াও, বলছে ওলিভেট্টি, সিস্টিন চ্যাপেল আসলে একটা দুর্গ। আমরা কথাটা বলে বেড়াই না। কিন্তু এর ভিত যে কোন ধাক্কা সয়ে যাবার মত করে তৈরি করা। আমরা আজ বিকালে পুরো চ্যাপেল খুঁটিয়ে দেখেছি। কোন ছারপোকা বা অন্য কোন ধরনের আড়ি পাতা যন্ত্রের খোঁজেই আমাদের এ কাজ করতে হয়। চ্যাপেল একেবারে পরিচ্ছন্ন। আর আমি নিশ্চিত এন্টিম্যাটারটা আর যেখানেই থাক না কেন, চ্যাপেলের ভিতরে নেই। এখন এমন কোন নিরাপদ জায়গা নেই যেখানে এ মানুষদের থাকতে দেয়া যায়। পরেআমরা অবশ্যই জরুরি নির্গমন করাতে পারব। তাই ব্যাপারটা বাদ দিয়ে দেয়া হচ্ছে না।

আবার চমৎকৃত হল ল্যাঙডন। ওলিভেট্টির এই শীতল যুক্তি আর ধারালো কথা মনে করিয়ে দিল কোহলারের নাম।

কমান্ডার, বলল ভিট্টোরিয়া, তার কণ্ঠ ভয় পাওয়া, আরো চিন্তার বিষয় আছে। এত বেশি পরিমাণে এন্টিম্যাটার আর কেউ বানায়নি। বিস্ফোরণের এলাকা, আমি শুধু হিসাব করতে পারি। আশপাশের রোমের কিছু অংশও ঝুঁকির মধ্যে আছে। ক্যানিস্টারটা যদি আপনাদের ভিতরের মাঝামাঝিতে থাকা কোন ভবনে লুকানো থাকে, যদি আন্ডারগ্রাউন্ডেও থাকে, তবু তার প্রভাব এই দেয়ালের বাইরে খুব একটা ক্ষতিকর নাও হতে পারে... এ বিল্ডিংয়ে, উদাহরনের জন্য বলছি... সে একটা দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের দিকে।

বাইরের দুনিয়ার দিকে আমার কী কাজ আছে সে ব্যাপারে আমি ভাল করেই জানি। বলল ওলিভেট্টি, আর তাতে এই পরিস্থিতির কোন উন্নতি হবে না, আর যাই হোক না কেন। দু দশকেরও বেশি সময় ধরে আমার আত্মার ধ্যান-ধারণা এই ভবনগুলোর নিরাপত্তার সাথে জড়িত। আমার কোন ইচ্ছা নেই, এমন কোন ইচ্ছা নেই... জিনিসটা বিস্ফোরিত হোক এমনটা আমি কখনোই চাইনি।

ক্যামারলেনগো এবার আশা নিয়ে একটা দৃষ্টি দিল, আপনি মনে করেন এটাকে খুঁজে বের করতে পারবেন?

সার্ভেল্যান্স স্পেশালিস্টদের ব্যাপারে কিছু কথা বলতে দিন আমাকে। আমরা যদি ভ্যাটিকানের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিই। যদি এখান থেকে বিদ্যুতের সমস্ত কর্মকান্ড বন্ধ করে দিই তাহলে সহজেই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের পরীক্ষা করে বের করে ফেলতে পারব এন্টিম্যাটারটুকু।

যেন অবাক হল ভিট্টোরিয়া, আপনি ভ্যাটিকান সিটিকে ব্লাক আউট করে ফেলতে চান?

সম্ভবত। আমি বলব না যে ব্যাপারটা খুব একটা সহজ হবে। কিন্তু একটা চেষ্টা চালিয়ে দেখা যায়।

কার্ডিনালরা তখন বোঝার চেষ্টা করবেন কী ঘটছে এখানে। বলল ভিট্টোরিয়া।

ওলিভেট্টি সাথে সাথে জবাব দিল, কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হয় মোমবাতির আলোয়। কার্ডিনালরা জানতেই পারবেন না। একবার কনক্লেভ সিল হয়ে গেলেই আমার সব প্রহরী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব, মাত্র কয়েকজনকে পাহারায় রাখলেই চলবে। একশো মানুষ খুব তাড়াতাড়ি বিশাল এলাকা চষে ফেলতে পারবে। পাঁচ ঘণ্টা অনেক সময়।

চার ঘণ্টা। বলল ভিট্টোরিয়া, ক্যানিস্টারটাকে আমার উড়িয়ে নিতে হবে সার্নে। ব্যাটারি রিচার্জ না করলে বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী।

এখানে রিচার্জ করার কোন উপায় নেই?

মাথা ঝাঁকাল ভিট্টোরিয়া, ইন্টারফেসটা খুব জটিল। আমি পারলে সেটা তুলে আনতাম।

তাহলে চার ঘণ্টাই সই। বলল ওলিভেট্টি, এখনো সময় আছে হাতে। আতঙ্ক আর যাই হোক, কোন কাজে আসবে না। সিনর, আপনার হাতে দশ মিনিট সময় আছে। সোজা চলে যান কনক্লেভের দিকে, সিল করে দিন। আমার লোকজনকে কাজ করার জন্য কিছুটা সময় দিন। আমরা যত ঝুঁকিপূর্ণ সময়ের কাছে যাব তত ঝুঁকিহীন সিদ্ধান্ত নেব।

ল্যাঙডন ভেবে পেল না আর কত ঝুঁকিপূর্ণ সময়ের দিকে এগুতে চাইছে লোকটা।

ফাঁকা দৃষ্টি ক্যামারলেনগোর চোখে, কিন্তু কলেজ সাথে সাথে প্রেফারিতিদের ব্যাপারে প্রশ্ন করবে... বিশেষত ব্যাজ্জিয়ার ব্যাপারে... তারা কোথায়।

তাহলে সাথে সাথে আপনার অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে, সিনর। বলুন, তাদেরকে চায়ের সাথে এমন কিছু খাইয়েছেন যার কারণে এখন তারা আসতে সমর্থ নন।

ক্ষেপে উঠল ক্যামারলেনগো, সিস্টিন চ্যাপেলের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কলেজ অব কার্ডিনালসের সামনে কনক্লেভের আগের মুহূর্তে মিথ্যা কথা বলব?

তাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই। উনা ব্যাগিয়া ভেনিয়ালে। একটা শুভ্র মিথ্যা কথা। আপনার কাজ শান্তি বজায় রাখা। দরজার দিকে তাকাল ওলিভেট্টি, এখন আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন তো কাজ শুরু করতে পারি।

কমান্ডান্টে, বলল ক্যামারলেনগো, যুক্তি দেখিয়ে, হারিয়ে যাওয়া কার্ডিনালদের ব্যাপারে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না।

ওলিভেট্টি সাথে সাথে দরজা থেকে ফিরে তাকাল, ব্যাজ্জিয়া এবং অন্যেরা এখন আমাদের ক্ষমতার বাইরে। আওতায় নেই তারা। এখন অবশ্যই তাদের যেতে দিতে হবে... সবার কল্যাণের জন্য। সামরিক দৃষ্টিতে এটাকে ট্রায়াজ বলা হয়।

আপনি কি ছেড়ে আসা বোঝাতে চাইছেন না?

তার কণ্ঠ এবার শক্ত হয়ে উঠল, যদি কোন উপায় থাকত, সিনর... স্বর্গে যদি ঐ কার্ডিনালদের চিহ্নিত করার কোন উপায় থাকত, আমি আমার জীবন নষ্ট করে দিতাম তাদের খুঁজে বের করার কাজে। আর এখনো... সে হাত তুলল ডুবে যেতে বসা সূর্যের দিকে, তার রক্তিম আভায় রোমের বিশাল ছাদ-সমুদ্র ঝকঝক করছে, পঞ্চাশ লাখ লোকের সিটিতে সার্চ চালানো আমার আওতার বাইরে। একটা নিস্ফল কাজের জন্য এ মুহূর্তে এক পল সময়ও আমি ব্যয় করতে রাজি নই। আমি দুঃখিত।

কিন্তু হাল ছাড়ার মানুষ নয় ভিট্টোরিয়া, কিন্তু আমরা যদি খুনীকে ধরে ফেলি? আপনি কি তাকে কথা বলাতে পারবেন না?

সাথে সাথে অগ্নিদৃষ্টি হানল ওলিভেট্টি তার দিকে, সৈন্যরা কখনোই সাধু সাজার চেষ্টা করে না, মিস ভেট্রা। বিশ্বাস করুন, আমি আপনার ব্যক্তিগত দুঃখটার ব্যাপারে একমত। এ লোককে ধরার ব্যাপারে আমার মনে কম ক্ষোভ নেই।

শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কথা বলছি না আমি, সাথে সাথে ইটের বদলে পাটকেল ছুঁড়ে দেয় ভিট্টোরিয়া, খুনী জানে এন্টিম্যাটারটা কোথায় আছে... জানে কোথায় আছেন হারানো কার্ডিনালরা... যদি কোনক্রমে তাকে একবার বগলদাবা করা যায়...

বিশ্বাস করুন আমার কথা, যে কথা আপনি বলছেন তেমন কিছু করা আদৌ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের সীমিত জনবল নিয়ে রোমের শত শত গির্জা চষে ফেলতে অনেক সময় লাগবে এবং সেজন্য পুরো ভ্যাটিকান সিটিকে খালি করে ফেলতে হবে... কোন প্রহরী থাকবে না... তার পরও, সেই ইলুমিনেটি লোকটাকে কুপোকাৎ করা কোন সহজ কম্ম হবে না। বাকী যে কার্ডিনালরা আছেন তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে মুখে কুলুপ এটে রাখাই শ্রেয়।

ব্যাপারটা সবাইকে নতুন করে ভাবাল।

রোমান পুলিশের সাহায্য নেয়ার ব্যাপারে কী বলেন আপনি? ক্যামারলেনগো সাথে সাথে বলল। আমরা তাদের সহায়তায় পুরো মহানগরী চষে ফেলতে পারি। অপহরণ করা কার্ডিনালদের খুঁজে বের করার জন্য এরচেয়েয়ে ভাল আর কোন উপায় নেই।

আরেকটা ভুল। বলল ওলিভেট্টি, আপনি ভাল করেই জানেন রোমান কারাবিনিয়েরি আমাদের সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করে। আমরা সারা দুনিয়ার সামনে আমাদের ক্রাইসিসটার কথা প্রচার করার বদলে সামান্য একটু লোক দেখানো সহায়তা পাব। ব্যস। এই ব্যাপারটাই চাইছে আমাদের শত্রুরা। দ্রুত মুখোমুখি হতে হবে মিডিয়ার। তাতেই তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে।

আমি আপনাদের কার্ডিনালদের মিডিয়ার সামনে তুলে ধরব, খুনীর কথাটা মনে পড়ে যায় ল্যাঙডনের, রাত আটটায় প্রথম কার্ডিনালের মরদেহ পড়ে থাকবে। তারপর প্রতি ঘণ্টায় একটা করে। প্রেস ব্যাপারটাকে ভালবাসবে।

আবার কথা বলছে ক্যামারলেনগো, তার কণ্ঠে রাগের একটু আভাস, কমান্ডার, আমরা হারানো কার্ডিনালদের ব্যাপারে এমন কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

চোখে মরা মানুষের দৃষ্টি নিয়ে ক্যামারলেনগোর দিকে তাকায় ওলিভেট্টি, সেন্ট ফ্রান্সিসের জন্য যে প্রার্থনা করা হয়, সিনর। আপনার কি কথাটা মনে আছে?

ক্যামারলেনগোর কণ্ঠে ধ্বণিত হয় বেদনার করুণ সুর, হে ঈশ্বর, আমাকে শক্তি দিন এমন ব্যাপার মেনে নিতে, যাকে আমি বদলাতে পারি না।

বিশ্বাস করুন আমাকে, বলেছে ওলিভেট্টি, এটা তেমনি এক পরিস্থিতি। তারপর সে পিছন ফিরে চলে গেল।

লন্ডনের পিকাডেলি সার্কাসের পাশেই ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি) সেন্ট্রাল অফিস। সুইচবোর্ডের ফোন বেজে উঠল, সাথে সাথে একজন জুনিয়র কন্টেন্ট এডিটর তুলে ধরল ফোনটা।

বিবিসি। বলল মেয়েটা, মুখ থেকে ডানহিল সিগারেট সরিয়ে।

ফোনের অপর প্রান্তের কণ্ঠটা একটু ঘষটানে ঘষটানো। মধ্যপ্রাচ্যের সুর আছে সেখানে। আমার কাছে একটা ব্রেকিং স্টোরি আছে, যেটা আপনাদের কর্পোরেশন লুফে নেবে।

সাথে সাথে এডিটর তুলে নিল খাতা আর কলম। বিষয়?

পোপ সিলেকশন।

সে একটু বিরক্ত হল। বিবিসি সেখানে থেকেই নিউজ কাভার করছে। আজকাল মানুষের এ ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ নেই, ঐশ্বরিক খবরটা কী?

রোমে কি নিউজ কাভার করার জন্য কোন লোক পাঠিয়েছেন আপনারা?

আমরা তেমনিই করি।

আমি সরাসরি তার সাথে কথা বলতে চাই।

আই এ্যাম স্যরি। কিছু আইডিয়া না পেলে আমি আপনাকে সেই নাম্বারটা দিতে পারব না–

কনক্লেভের উপরে একটা হুমকি এসেছে। এরচেয়েয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না আমি।

সাথে সাথে আরো ঝুঁকে এল সম্পাদক, আপনার নাম?

নাম ইম্মেটেরিয়াল।

একটুও অবাক হয়নি এডিটর। আপনার কাছে এই দাবির প্রমাণ আছে?

আছে।

আমি আপনার কাছ থেকে তথ্যটুকু পেলেই বরং খুশি হই। আমাদের পলিসির মধ্যে এমন কোন ফাঁক নেই যে সরাসরি রিপোর্টারের কাছে...

বুঝতে পারছি আমি। আমি নাহয় অন্য কোন নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ করব। সময় দেয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। গুড...

এক মিনিট, বলল এডিটর, একটু ধরে থাকতে পারবেন?

কলারকে লাইনে রেখে সম্পাদক গলা লম্বা করল। কলারদের ফোন ট্রেস করার কোন না কোন উপায় থাকে তাদের কাছে। কিন্তু এরই মধ্যে কলার দুটো পরীক্ষায় উৎরে গেছে। সে তার নাম জানানোর জন্য মোটেও উদগ্রীব নয় এবং সে ফোনটা রেখে দিতে চাইছে। মানুষ সাধারণত এমন সব কলে নিজের নামটা প্রচার করতে চায়।

রিপোর্টারদের হাতে মিস করার মত খবর সহজে আসে না। যদি কোনক্রমে একটা সত্যিকার খবর মিস হয়ে যায় তাহলে এডিটরের অবস্থা আর দেখতে হবে না। তাই পাগলদের দেয়া খবরও, যত্ন নিয়ে শুনতে হয়। রিপোর্টারের পাঁচটা মিনিট হারিয়ে যেতে দেয়া যায়। তাতে খুব একটা পাপ হয় না। কিন্তু যদি খবরটা মিস হয়ে যায়, যদি খবরটা হেডলাইন হয়, তাহলে আর দেখতে হবে না।

হাই তুলতে তুলতে মেয়েটা তার কম্পিউটারের দিকে তাকাল, তারপর লিখল, ভ্যাটিকান সিটি। তারপর পাপাল সিলেকশনে থাকা ফিল্ড অপারেটরের নাম দেখে মুখ বাঁকিয়ে হাসল সে। বিবিসি তাকে লন্ডনের একটা ট্যাবলয়েড থেকে তুলে এনেছে সাধারণ ফিল্ড রিপোর্ট কাভার করার জন্য। এডিটররা তাকে একেবারে নিচের স্তরের রিপোর্টার বলে মনে করে।

সে সারা রাত সেখানে এক পায়ে খাড়া হয়ে থাকবে। তারপর তার দশ সেকেন্ডের লাইভ রিপোর্ট করে কম্ম সারা করবে। অন্তত বিরক্তিকর কাজগুলো থেকে একটু মুক্তি পেয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

ভ্যাটিকান সিটিতে থাকা রিপোর্টারের স্যাটেলাইট এক্সটেনশন বের করল এডিটর। তারপর আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে নাম্বারটা জানিয়ে দিল কলারকে।

এতে কোন কাজ হবে না। বলল ভিট্টোরিয়া। পোপের অফিসে সারাক্ষণ পায়চারি করছে সে। চোখ তুলে তাকাল ক্যামারলেনগোর দিকে। যদি সুইস গার্ড পুরো সিটি ব্লাক আউট করতেও পারে, যদি তারা ক্যানিস্টারটার খোঁজ পায়, তাহলে তাদেরকে সেটার ঠিক উপরে থাকতে হবে। এর সিগন্যাল নির্ঘাৎ দুর্বল হবে। যদি সেটা পাওয়াও যায়, তার ফল শুভ নাও হতে পারে। যদি আপনাদের গ্রাউন্ডের কোথাও সেটা লোহার বাক্সে ভরে মাটি চাপা দেয়া থাকে তাহলে? কিম্বা উপরে, ধাতব কোন ভেন্টিলেটিং ডাক্টে থাকে? তাহলে আর তা পাবার কোন উপায় থাকবে না। আর কে বলতে পারে যে আপনাদের সুইস গার্ড গুপ্তচরহীন? কে বলতে পারে তারা ঠিকমত সার্চ করবে?

একেবারে বিদ্ধস্ত দেখাচ্ছে ক্যামারলেনগোর চেহারা, আপনি কী করতে বলেন, মিস ভেট্রা?

এবার বেশ স্বস্তিতে পড়ল ভিট্টোরিয়া। এ কথাটা আসতই, তাই নয় কি? আমি বলি স্যার, আপনারা দ্রুত অন্য কোন প্রস্তুতি নিন। আমরা আর সব আশা বাদ দিয়ে আশা করতে পারি কমান্ডারের সার্চ ঠিকমত শেষ হবে। তারপর? একই সাথে জানালার বাইরে তাকান। ঐ মানুষগুলোকে কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন? পিয়াজ্জার বাইরে ঐ বাড়িগুলোকে? মিডিয়া ভ্যানগুলো? ট্যুরিস্টদের? তারা অবশ্যই বিস্ফোরণ এলাকার ভিতরে আছে। আপনাদের যা করার এখনি করতে হবে।

আবারও ফাঁকা একটা নড করল ক্যামারলেনগো।

হতাশ হল ভিট্টোরিয়া। ওলিভেট্টি সফল। সবাইকে সে বুঝিয়ে বলতে পেরেছে যে, হাতে প্রচুর সময় আছে। কিন্তু সে জানে, যদি একবার, কোন না কোন ফাঁক ফোঁকর দিয়ে খবরটা বাইরের দুনিয়ায় জানাজানি হয়ে যায় তাহলে আর দেখতে হবে না। চোখের সামনে ভরে যাবে সামনের এলাকাটা। সুইস পার্লামেন্ট বিল্ডিংয়ের বাইরে এমন ঘটনা ঘটতে দেখেছে সে। ভিতরে বোমা সহ লোকজনকে আটকে রাখায় চারপাশে মানুষের ভিড় উপচে পড়ছিল। সবাই দেখতে চাইছিল কী ঘটবে। যদিও পুলিশ বারবার তাদের বলছিল যে তারা বিপদে আছে, তবু মানুষ প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে এসেছিল। মানুষের মনে মানুষের জীবন সংশয়ের মত আগ্রহোদ্দীপক আর কোন ব্যাপার ঘটে না।

সিনর, ভিট্টোরিয়া আবার কথা তুলল, আমার বাবার হন্তা লোকটা বাইরেই কোথাও আছে। এই শরীরের প্রতিটা কোষ প্রাণপণে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে তাকে ধরে টুকরা টুকরা করে ফেলতে চাইছে। কিন্তু আমি আপনার অফিসে দাঁড়িয়ে আছি... কারণ একটাই, আমার কিছু দায়বদ্ধতা আছে আপনাদের প্রতি। আপনার প্রতি এবং আর সবার প্রতি। জীবন এখন সংশয়ে আছে। আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন সিনর?

এবারো কোন জবাব দিল না ক্যামারলেনাগো।

ভিট্টোরিয়া তার নিজের হৃদয়কে ধুকতে দেখল। সুইস গার্ড কেন লোকটাকে চিহ্নিত করতে পারল না? ইলুমিনেটি এ্যাসাসিনইতো সব কাজের চাবিকাঠি। সে জানে কোথায় রাখা হয়েছে ক্যানিস্টারটা... হেল! সে জানে কোথায় আছে কার্ডিনালরা। শুধু খুনিটাকে ধরে আন। বাকি সব আপসে শেষ হয়ে যাবে।

টের পাচ্ছে ভিট্টোরিয়া, অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে সে। একটা মানসিক বিকার। ব্যাপারটা ঘটত অরফানেজে থাকার সময়। এমন হতাশা যেখানে করার মত কিছুই নেই। তোমার হাতে কাজ করার মত চাবিকাঠি আছে। বলল সে নিজেকে, সব সময় তোমার হাতে কাজ করার মত চাবিকাঠি থাকে। কিন্তু এ কথা ভেবেও কোন কাজ হল না তার। তার মনের ভিতরে চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে সারাক্ষণ। সে একজন রিসার্চার। একজন প্রবলেম সলভার। কিন্তু এ এমন এক সমস্যা যার কোন সমাধান চোখে দেখে বের করা যাচ্ছে না। কোন ডাটা তোমার দরকার? কী তথ্য তুমি চাও? সে নিজেকে বলল, শ্বাস নাও বড় করে, সমাধান তোমার হাতের কাছেই আছে। এবং অবাক হয়ে দেখল, জীবনে এই প্রথম তার সামনে কোন সমাধান

নেই। এই প্রথম, সব কিছুর বদলে সে দেখল, ফোঁপাচ্ছে সে।

মাথা ব্যথা করছে ল্যাঙডনের। সেও কোন কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছে না। সেও অসহায়ভাবে একবার তাকায় ক্যামারলেনগোর দিকে, আরেকবার তাকায় ভিট্রোরিয়ার দিকে। কিন্তু তার চিন্তা ভাবনা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। বারবার মনে পড়ছে কয়েকটা চিত্র। বিস্ফোরণ, সাংবাদিকদের উপচে পড়া ভিড়, ক্যামেরার চলাচল, চারজন চিহ্ন আঁকা মানুষের লাশ।

শাইত্বোয়ান... লুসিফার... আলোক আনয়নকারী... স্যাটান...

মন থেকে দৃশ্যগুলো তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল সে। পরিকল্পিত সন্ত্রাস, বলল সে নিজেকে, হিসাব কষা ধ্বংস। এক সেমিনারের কথা তার মনে পড়ে যায়। সন্ত্রাসি কর্মকান্ডে সিম্বল ব্যবহারের উপর তাকে একটা বক্তব্য রাখতে হয়েছিল। এর পর আর কখনো সে এমন করে সন্ত্রাসের কথা ভাবেনি।

সন্ত্রাসের, বলেছিল এক প্রফেসর, একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। কী সেটা?

নিস্পাপ মানুষকে হত্যা করা? সাথে সাথে বোকার মত জবাব দিয়েছিল এক ছাত্র।

ভুল। হত্যাকান্ডটা সন্ত্রাসের একটা পথ মাত্র, এরচেয়েয়ে বেশি কিছুই নয়।

শক্তিমত্তার প্রমাণ?

না। ক্ষীণতর পথপরিক্রমা নয়।

আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়া?

এতোক্ষণে মূল কথায় এসেছো। সন্ত্রাসের একটা মাত্র লক্ষ্য আছে। ভীতি আর আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়া। সন্ত্রাস সব সময়ই একটু হলেও দুর্বল... তারা তাদের দুর্বলতা ঢাকতে চায় সন্ত্রাস দিয়ে। যে কোন একটা মেসেজ জানিয়ে দেয়া তাদের লক্ষ্য। কথাটা টুকে রাখ। সন্ত্রাস মোটেও শক্তিমত্তার পাগলাটে প্রদর্শনী নয়। এটা একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার। সরকারের অকর্মণ্যতা প্রমাণ করে, তুমি পরে মানুষের মন জয় করে নাও, এমনও হতে পারে।

মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা...

এই একটা ব্যাপারেই কি সব রহস্য লুকিয়ে আছে? সারা দুনিয়ার খ্রিস্টানেরা ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখবে? পাগলা কুকুরের সময়টায় কুকুরদের মেরে যেভাবে রাস্তায় ফেলে রাখা হত, সেভাবে তাদের কার্ডিনালদের সেখানে পড়ে থাকতে দেখে তাদের মনে কী প্রতিক্রিয়া হবে? যদি একজন কার্ডিনালের মত সর্বোচ্চ ক্ষমতার মানুষ শয়তানের হাত থেকে না বাঁচতে পারে, যদি ভ্যাটিকান সিটির মত পবিত্রতম শহর মাটির সাথে মিশে যায় তাহলে সাধারণ খ্রিস্টানদের মনে তার কী প্রভাব পড়বে? ল্যাঙডনের মন আরো দ্রুত কাজ করছে এখন... মনের ভিতরে কোথায় যেন দুটো অস্তিত্ব লড়াই করছে। একটা সুতা নিয়ে টানাহেঁচড়া করছে।

বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করে না... রক্ষা করে ওষুধ আর এয়ারব্যাগ... ঈশ্বর বলতে কেউ নেই... আর যদিও থেকেও থাকে, তার কোন দায় পড়েনি যে সে তোমাকে রক্ষা করবে... তোমাকে যা রক্ষা করে, তার নাম বুদ্ধিমত্তা। আলোই রক্ষা করে তোমাকে। আলোকিত হও। বিজ্ঞানের আলোতে। এমন কিছুর উপর ভরসা রাখ, যে তোমাকে রক্ষা করবে। কেউ একজন জলের উপর দিয়ে হেটে গেছে, তারপর কত যুগ পেরিয়ে গেল। আর কেউ কি কাজটা করতে পেরেছে? আধুনিক মিরাকলগুলোর স্রষ্টা হল বিজ্ঞান... কম্পিউটার, ভ্যাকসিন, স্পেস স্টেশন... এমনকি সৃষ্টির আদি দিকগুলোও হাপিস হয়ে গেছে। বিজ্ঞান, জিনতত্ত্ব হাতে তুলে নিয়েছে সে দায়িত্ব। এমনকি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় যে তত্ত্ব, শূণ্য থেকে জন্ম নেয়া, সেটাও হচ্ছে এখন ল্যাবে। কার আর ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে? না! সায়েন্স ইজ গড!

কলারের কথাগুলো ধ্বণিত প্রতিধ্বণিত হচ্ছে ল্যাঙডনের মনে, মস্তিষ্কে। মধ্যরাত... খুনের ধারাবাহিক পথ পরিক্রমা... স্যাক্রিফিসি ভার্জিনি নেল অল্টারে ভিসিয়েঞ্জা।

তারপর হঠাৎ করেই, যেভাবে কোন বন্দুকের গুলি হাপিস হয়ে যায়, সেভাবে মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা উধাও হয়ে গেল।

সিট ছেড়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল রবার্ট ল্যাঙডন। তার পিছনে পড়ে গেল চেয়ারটা, মার্বেলের মেঝের উপর।

ভিট্টোরিয়া আর ক্যামারলেনগো সাথে সাথে চমকে গেল।

আমি আসল ব্যাপারটা ধরতে পারিনি। যেন মোহগ্রস্থ ল্যাঙডন কথা বলছে। আমার সামনেই ছিল। ধরতে পারিনি আমি।

কী মিস করেছ? দাবি করল ভিট্টোরিয়া।

প্রিস্টের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল ল্যাঙডন, ফাদার, তিন বছর ধরে আমি ভ্যাটিকানের কাছে আবেদন জানিয়ে আসছি। যেতে চাই আপনাদের আর্কাইভে। সাতবার আমাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

মিস্টার ল্যাঙডন, আমি দুঃখিত, কিন্তু এ সময়ে এমন একটা ব্যাপার নিয়ে অভিযোগ তোলাটা আমার কাছে বিচিত্র বলে মনে হচ্ছে।

ল্যাঙডন সাথে সাথে বলল, আমি এখনি এখানে প্রবেশাধিকার চাই। চারজন কার্ডিনাল হারিয়ে গেছেন। আমি ভেবে বের করতে চাই কোথায় তাদের হত্যা করা হবে।

ভিট্টোরিয়া এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

ক্যামারলেনগোর দৃষ্টিও ফাঁকা। যেন তাকে নিয়ে কোন নিষ্ঠুর কৌতুক করা হচ্ছে। আপনি বলতে চান যে এই তথ্যটা আমাদের আর্কাইভে আছে?

আমি প্রতিজ্ঞা করতে পারছি না যে, ঠিক ঠিক বের করতে পারব। তবে আশা করতে কোন দোষ নেই। আমি আশাবাদী...।

মিস্টার ল্যাঙডন, আমি আর চার মিনিটের মধ্যে সিস্টিন চ্যাপেলে যাব। আর্কাইভটা ভ্যাটিকান সিটির অপর প্রান্তে।

তুমি সিরিয়াস, তাই না? চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টি হানল ভিট্টোরিয়া, জানতে চায় কতটুকু সিরিয়াস সে।

মশকরা করার মত সময় নয় এটা। সাথে সাথে জবাব দিল ল্যাঙডন।

ফাদার, ভিট্টোরিয়া বলল ক্যামারলেনগার দিকে তাকিয়ে, যদি কোন সুযোগ থাকেই... যদি বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকে তারা কোথায় মারা যাবেন তা জানার, তাহলে আমরা অন্তত লোকেশনগুলো বের করতে পারব।

কিন্তু আর্কাইভে? অনুনয় ঝরে পড়ল ক্যামারলেনগোর কণ্ঠে, কী করে সেখানে কোন ক্লু লুকিয়ে থাকতে পারে?

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা, বলল ল্যাঙডন, অনেক সময় নেবে, অন্তত চার মিনিটে সুরাহা করা যাবে না। কিন্তু আমি যদি সত্যি সত্যি ক্লু টা পেয়ে যাই, তাহলে হ্যাসাসিনকে ধরার একটা সুযোগ থেকে যাচ্ছে।

এমনভাবে ক্যামারলেনগো তাকাল যেন সে এ কথাতে ভরসা রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু কী করে যেন তার বিশ্বাসটা ঠিক খাপ খেল না। খ্রিস্টানত্বের সবচেয়ে গোপনীয় ডকুমেন্টগুলো সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এমন সব সম্পদ সেখানে লুকানো যেগুলোর দিকে চোখ রাখার অনুমতি আমি নিজেও পাইনি।

আমি সে সম্পর্কে ভাল ভাবেই জানি।

ক্যামারলেনগো বলল, ভিতরে ঢোকার একটা মাত্র রাস্তা আছে। কিউরেটর আর বোর্ড অব ভ্যাটিকান লাইব্রেরিয়ানসের লিখিত অনুমতি নিতে হবে।

অথবা, বলল ল্যাঙডনক্যামারলেনগোকে, পাপাল পদে আসীন কারো অনুমতি। আপনার কিউরেটর যতবার আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে ততবার চিঠিতে আমি এ কথাটা পেয়েছি।

নড করল ক্যামারলেনগা।

রুক্ষ হয়ে কথাটা বলছি না, বলল ল্যাঙডন, আমার যদি কোন ভুল নাহয়ে থাকে, তো

পাপাল ম্যান্ডেট আসে এই অফিস থেকেই। আর আমি আরো যতটুকু জানি, আজ রাতে এ অফিসে আসীন আছেন আপনি নিজে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে বলা যায়...

পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করে এক পলক তাকিয়ে নিল ক্যামারলেনগো। মিস্টার ল্যাঙডন, আজ রাতে এই চার্চের সুরক্ষার জন্য আক্ষরিক অর্থেই আমার জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত।

ল্যাঙডন তাকাল লোকটার চোখের দিকে। সেখানে সত্যের ঝলক দেখা যাচ্ছে।

এই ডকুমেন্ট, জিজ্ঞেস করল ক্যামারলেনগো, আপনি কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন যে পেলে আপনি ঠিক ঠিক চারজন চার্চকে খুঁজে বের করতে পারবেন?

আমি ভিতরে ঢুকে হাজারটা ডকুমেন্ট ধরে একটা হ-য-ব-র-ল লাগিয়ে দেব না। আপনারা যখন কোন শিক্ষককে বেতন দেন তখন ইতালি আপনাদের মাথায় ভেঙে পড়ে না। আপনাদের হাতে যে ডকুমেন্ট আছে তা একই সাথে পুরনো এবং–

প্লিজ, বলল ক্যামারলেনগো, ক্ষমা করুন আমাকে। আমার মনে এরচেয়েয়ে বেশি কোন কথা আসছে না এ মুহূর্তে। আপনি কি জানেন কোথায় সেই গোপন ডকুমেন্ট লুকানো আছে?

উল্লাসের একটা ঝলক খেলে গেল ল্যাঙডনের চোখেমুখে, সান্তা এনার গেটের ঠিক পিছনে।

চমৎকার! বেশিরভাগ স্কলার মনে করেন এটা সেন্ট পিটারের পবিত্র সিংহাসনের পিছনে আছে।

না। এটা নিয়ে বেশিরভাগ মানুষই গোল পাকিয়ে বসে। আর্কাভিয়ো দেলা রেভারেন্দা দ্য ফ্যাব্রিকা ভিসন্ত পিতেরো। একটা কমন মিসটেক।

একজন লাইব্রেরিয়ান সব প্রবেশপথে নজর রাখতে পারে না। তাকে সাথে থাকতে হয়। আজ রাতে আমরা কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। একজন কার্ডিনাল ঢোকার সময়েও সাথে একজন না একজন থাকেই।

আমি আপনাদের সম্পদকে অত্যন্ত যত্নের সাথে নিরীক্ষণ করব। আপনাদের লাইব্রেরিয়ান আমার সেখানে থাকার কোন প্রমাণ পাবে না।

মাথার উপর সেন্ট পিটারের ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। পকেট থেকে বের করে আবার ঘড়িটা দেখল ক্যামারলেনগো। আমায় যেতেই হচ্ছে। আমি আর্কাইভে আপনার জন্য একজন সুইস গার্ড পাঠিয়ে দেব। আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম, মিস্টার ল্যাঙডন। এগিয়ে যান এবার।

মুখে কোন রা সরল না ল্যাঙডনের।

ফিরে গেল কমবয়েসি প্রিস্ট। যাবার আগে আর একবার ফিরে এল সে। হাত রাখল ল্যাঙডনের কাঁধে, তারপর সর্বশক্তি দিয়ে চেপে ধরল তাকে, পিছন থেকে। আপনি যা-ই খুঁজছেন, আশা করি তা পেয়ে যাবেন। আর বের করুন এটাকে। দ্রুত।

একটা পাহাড়ের উপরে, বর্জিয়া কান্ট্রিইয়ার্ডের পরে, সান্তা এ্যানের শেষ প্রান্তে ভ্যাটিকানের গোপনীয় আর্কাইভ অবস্থিত। সেখানে বিশ হাজারের বেশি পুরনো বই আর দলিল-দস্তাবেজ আছে। শোনা যায় এখানে এমন অনেক বস্তু আছে যার দু একটা বাইরে প্রকাশ পেলেই উল্টে যাবে ইতিহাসের পাশার ছক। আছে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির গোপন ডায়েরি, আছে বাইবেলের না-ছাপা হওয়া কপি।

এখনো ল্যাঙডন তার মনকে বিশ্বাস করাতে পারছে না যে, সে পৃথিবীর সবচেয়ে গোপনীয় একটা অঞ্চলে প্রবেশ করছে। তার পাশে পাশেই আসছে ভিট্টোরিয়া। কষ্ট করে তার পায়ের সাথে তাল মেলাচ্ছে। তার খোলা চুলে খেলে যাচ্ছে হাওয়া। বাতাসের সেই প্রবাহ থেকে আসছে অচেনা একটা সুগন্ধ, সেটুকু নির্দ্বিধায় টেনে নিচ্ছে ল্যাঙডন।

ভিট্টোরিয়া সাথে সাথে তাকে পেয়ে বসল, তুমি কি আমাকে বলবে কী খুঁজছি আমরা?

একটা ছোট্ট বই। গ্যালিলিও নামের এক লোকের লেখা।

অবাক হয়ে গেল সে। তুমি আর কোন গোল পাকিও না। এর ভিতরে কী লেখা আছে?

এর ভিতরে এমন কিছু থাকার কথা যাকে লোকে এল সাইনো বলে।

দ্য সাইন?

সাইন, ক্লু, সিগন্যাল... নির্ভর করবে তুমি এটাকে কীভাবে অনুবাদ করছ তার উপর।

কীসের সাইন?

ল্যাঙডন আরো বাড়িয়ে দিল চলার গতি, একটা গুপ্ত অবস্থান। গ্যালিলিওর ইলুমিনেটি তাদের দলকে চার্চের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য গোপন বিভিন্ন আস্তানা বেছে বের করত। তাই তারা ভ্যাটিকানের হাত থেকে বাঁচার জন্য এখানে, এই রোমেই একটা অতি গোপনীয় আস্তানা বের করে। এটাকে তারা দ্য চার্চ অব ইলুমিনেটি নামে ডাকত।

বাহ্! একটা শয়তানি আড্ডাকে চার্চ নামে ডাকা!

মাথা নাড়ল ল্যাঙডন, গ্যালিলিওর ইলুমিনেটি মোটেও শয়তানি সংঘ ছিল না। তারা ছিলেন আলোকবর্তিকা হাতে এক একজন সম্মানিত বিজ্ঞানী। তাদের আড্ডাখানা। কোন শয়তানি কাজে লাগত না। বরং তাদের আড্ডাতে কথা হত এমন সব বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নিয়ে যা চার্চ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমরা সবাই জানি গোপন আড্ডাটা আছে। এ পর্যন্তই। কেউ জানে না সেটা কোথায়।

শুনে, মনে হচ্ছে ইলুমিনেটি ভাল করেই জানে কী করে একটা ব্যাপারকে গোপন রাখতে হয়।

অবশ্যই। ইন ফ্যাক্ট, ব্রাদারহুডের বাইরে কেউ কখনো কোনক্রমে তাদের সেই গুপ্ত সংঘের কথা বলেনি। এর ফলে তাদের গোপনীয়তা রক্ষা পায়। একই সাথে আর একটা সমস্যার উদয় হয়। নতুন রিক্রুট করার সময় খুব সাবধান হতে হয় তাদের।

তারা বেড়ে উঠতে পারত না, যদি তারা প্রচার না করত। পায়ের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করছে মেয়েটার মস্তিষ্ক !

ঠিক তাই। ষোলশ ত্রিশের দশকে গ্যালিলিওর দুনিয়া বিস্তৃত হতে শুরু করে। এমনকি এ সময়টায় গোপনে গোপনে মানুষ এমনভাবে রোমে আসত যেভাবে কোন মানুষ তীর্থ দেখতে যায়। তারা আসত ইলুমিনেটিতে যোগ দিতে... গ্যালিলিওর টেলিস্কোপে এক বার চোখ রাখার লিপ্সা তাদের এখানে নিয়ে আসত। মহান শিক্ষকের মুখের একটা কথা শোনার জন্য তারা উদগ্রীব হয়ে থাকত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, জ্ঞানলিপ্সু বিজ্ঞানীর দল জানত না কোথায় মিলিত হতে হবে সেই প্রবাদ পুরুষের সাথে, কীভাবে দেখা করতে হবে ইলুমিনেটির সাথে। তারা বৃথাই ঘুরে মরত রোম জুড়ে। ইলুমিনেটি নতুন রক্ত চায়, চায় তরুণ মেধা, কিন্তু একই সাথে তাদের মাথায় রাখতে হয় যে তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

বলল ভিট্টোরিয়া, অনেকটা সিচুয়েজিওনে সেঞ্জা সলিউজিওনের মত শোনাচ্ছে।

ঠিক তাই। একটা ক্যাচ-২২, বর্তমানে আমরা যা বলতে পারি।

তাহলে তারা কী করত?

তারা বৈজ্ঞানিক। পুরো সমস্যা খতিয়ে দেখে একটা করে উপায় বের করে তারা। সত্যি সত্যি খুব মেধাবী কাজ ছিল সেটা। তাদের জন্য আসা বিজ্ঞানীদের জন্য একটা মানচিত্রের ব্যবস্থা করা।

ম্যাপ? শুনতে বোকামি বোকামি ঠেকছে না? একবার যদি কোন ভুল হাতে গিয়ে পড়ে...

কখনোই পড়তে পারবে না। বলল ল্যাঙডন, এর কোন কপি ছিল না কোথাও। কাগজে বসানো কোন ম্যাপ ছিল না সেটা। সারা মহানগরী জুড়ে সেই ম্যাপ আকা ছিল। কেউ সেটা থেকে ভালমন্দ বুঝতে পারবে না।

ওয়াকওয়ের পাশে তীরচিহ্ন দেয়া?

এক কথায়, তাই বলা চলে। কিন্তু তা আরো অনেক বেশি জটিল ছিল। সাধারণ মানুষের পথেই ছড়ানো ছিল সেগুলো, কিন্তু তার প্রক্রিয়া ছিল ভিন্ন। বিভিন্ন চিহ্ন ছড়ানো ছিটানো, সারা রোম জুড়ে। পরের জায়গা... তার পরের জায়গা... একটা পথ... আর সবশেষে ইলুমিনেটির আসল আড্ডা।

ভিট্টোরিয়ার চোখ চকচক করে উঠল, মনে হচ্ছে কোন গুপ্তধন বের করার সন্ধানে নামা ছাড়া উপায় ছিল না কোন।

মুখ ভেঙচে হাসল একটু ল্যাঙডন, এক কথায়, তাও বলা চলে। এটাকে ইলুমিনেটি বলত, দ্য পাথ অব ইলুমিনেশন। যে কেউ, যে চায় ইলুমিনেটিকে খুঁজে বের করতে, সেখানে যোগ দিতে, তাকে এ পথ ধরেই আসতে হবে। একই সাথে ব্যাপারটা এক ধরনের পরীক্ষা।

কিন্তু ভ্যাটিকান যদি ইলুমিনেটিকে খুঁজে বের করতে চায়? বাদ সাধল ভিট্টোরিয়া, তারা কি সোজাসাপ্টা পাথওয়ে অনুসরণ করে করে পৌছে যেতে পারবে না?

না। পথটা ছিল গুপ্ত। একটা পাজল। শুধু অনুমোদিত মানুষজনই এ পথ দেখে বুঝতে পারবে। আর কেউ নয়। ইলুমিনেটি চার্চ কোথায় লুকিয়ে আছে তা শুধু তারাই বের করতে পারবে। এটাকে শুধু এজন্যই জটিল করে তোলা হয়নি। একই সাথে তারা সবচেয়ে মেধাবী বিজ্ঞানীদের ছেঁকে তুলতে চেয়েছিল। তাদের দরজায় যেন আর কোন মানুষ কড়া না নাড়তে পারে সে ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়েছিল।

কিন্তু আমি কিছুতেই একমত হতে পারছি না। ষোলশো শতকের রোম ছিল সারা দুনিয়ার সবচেয়ে মেধাবী মুখের তীর্থস্থান। চার্চের কেউ না কেউ নিশ্চিত খুঁজে বের করতে পারত জায়গাটা। ভ্যাটিকানে শুধু মূর্খরাই থাকবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই।

অবশ্যই। বলল ল্যাঙডন, যদি তারা চিহ্নগুলো সম্পর্কে কিছু জানত। কিন্তু সব ঘটেছিল তাদের অগোচরে। ইলুমিনেটি সেগুলোকে এমন পথে নির্দেশ করেছিল শুধু জানা লোকজনই এগিয়ে যেতে পারবে। তারা যে প্রক্রিয়া ধরে এগিয়েছিল সিম্বলজিতে তাদের বলা হয় ডিসিমিউলেশন।

ক্যামোফ্লেজ।

বেশ আশ্চর্য হল ল্যাঙডন, তুমি অর্থটা জান?

ডিসিমিউল্যাজিওনে, সে বলল, প্রকৃতির সবচেয়ে সেরা প্রতিরক্ষা। সাগরের আগাছায় ভেসে থাকা একটা ছোট মাছকে খুঁজে বের করার মত কষ্টকর একটা প্রক্রিয়া।

ওকে। বলল ল্যাঙডন, ইলুমিনেটি একই পদ্ধতি ধরে এগিয়েছে। তারা চাইছিল রোমের ভিতরে যেন হারিয়ে যায় এই প্রতীকগুলো। যেন সেগুলোকে দেখেও না দেখে সাধারণ মানুষ। তারা বৈজ্ঞানিক চিহ্ন ব্যবহার করতে পারত না। ব্যবহার করতে পারত না সাধারণ ভাষা। ব্যবহার করতে পারেনি তাদের প্রচলিত এ্যাম্বিগ্রাম। তাই তারা ডাক দিল তাদের মেধাবী এক আর্টিস্টকে। তিনিই ইলুমিনেটির এ্যাম্বিগ্রামটা তৈরি করেছিলেন। তারা চারটে চিহ্ন বের করল।

ইলুমিনেটি স্কাল্পচার?

ঠিক তাই। এমন স্কাল্পচার যা দিয়ে মাত্র দুটো অর্থ বোঝাবে। প্রথমেই, সেগুলোকে এমন হতে হল যা রোমের সাধারণ আর্টের সাথে মিশে যায়... এমন সব আর্টওয়ার্ক যেগুলোকে ভ্যাটিকান মোটেও সন্দেহ করবে না।

ধর্মীয় চিত্রাঙ্কন!

নড করল ল্যাঙডন, একটু উত্তেজিত হয়ে উঠছে সে। তার কথার বেগ বেড়ে গেছে অনেক গুণ। আর দ্বিতীয় ব্যাপার হল, চারটে চিত্র খুব সুনির্দিষ্ট থিম বহন করবে। প্রত্যেক খন্ড বিজ্ঞানের চার বস্তুকে নির্দেশ করবে।

চার বস্তু? ভিট্টোরিয়া বলল, কিন্তু প্রকৃতিতে শতাধিক বস্তু আছে।

ষোড়শ শতকে নয়। মনে করিয়ে দিল ল্যাঙডন তাকে, বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, পুরো ইউনিভার্স মাত্র চারটে বস্তু দিয়ে গঠিত। মাটি, জল, বাতাস, আগুন।

প্রথম দিককার ক্রস। ল্যাঙডন ভাল করেই জানে, এ দিয়ে সহজেই চারটেকে বোঝানো যায়। চার হাত দিয়ে আগুন, জল, বাতাস আর মাটি। যদিও পৃথিবীতে এই চারকে বোঝানোর জন্য ডজন ডজন প্রতীক ছিল- পিথাগরিয়ান সাইকেল অব লাইফ, চাইনিজ হঙ-ফান, জাঙ্গিয়ান পুরুষ এবং মহিলা, জোডিয়াক প্রতীক, এমনকি মুসলিমরাও এই চিহ্ন চতুষ্টয় তুলে ধরে... ইসলামে সেটার নাম ছিল স্কোয়ারস, মেঘমালা, বজ্রপাত আর ঢেউ। তবু একটা ব্যাপার এখনো জ্বালাতন করে লাঙডনকে, মেসনরা আজো চার চিহ্নের বেড়াজালে আটকা পড়ে আছে মাটি, বাতাস, আগুন, জল।

যেন মোহাবিষ্ট হয়ে গেছে মেয়েটা, তার মানে ইলুমিনেটি এমন প্রতীক বানাল যেটা আসলে দেখতে হবে ধর্মীয়, আদপে ভিতরে ভিতরে তা মাটি জল, আগুন, বাতাসের প্রতিনিধিত্ব করবে?

ঠিক তাই। বলল ল্যাঙডন, ভায়া সেন্ট্রিয়ানেল থেকে আর্কাইভের দিকে ঘুরতে ঘুরতে। রোম জুড়ে থাকা ধর্মীয় আর্টওয়ার্কের সমুদ্রে প্রতীকগুলো মিশে গেল। আগেই এগুলো চার্চে চার্চে সওয়ার হল। তারপর প্রতিটা গির্জার বাইরে এঁকে দেয়া হল এসব চিহ্ন। এতোক্ষণে এগুলো ধর্মের গন্ডিতে পার পেয়ে গেছে। তারপর এল, আর সব জায়গায় এগুলো এঁটে দেয়ার কাজ। একটা গির্জায় এঁকে দেয়া হল... দেখিয়ে দেয়া হল পরের গির্জার পথ... সেখানে প্রতীক্ষা করছে পরের চিহ্নটা। তাদের প্রতীক ধর্মচিন্তার রূপ নিয়ে অপেক্ষা করছে পরের স্টপেজে। কোন চার্চে যদি কোন ইলুমিনেটি-প্রেমী মাটির চিহ্ন পায়, তাহলে সে পরের চার্চে খুঁজবে বাতাস... এরপর আগুন... সবশেষে জল... আর তারপরই আসছে চার্চ অব ইলুমিনেশনের কথা।

আরো আরো ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে ভিট্টোরিয়ার মাথা। আর এর সাথে হ্যাসাসিনকে খুঁজে বের করার কোন না কোন সম্পর্ক আছে?

হাসল ল্যাঙডন সুন্দর করে। দৃকপাত করল মেয়েটার দিকে, ওহ! ইয়েস! ইলুমিনেটিরা এই চার চার্চকে অন্য একটা নাম দিয়েছে, দ্য অল্টার্স অব সায়েন্স।

আবার হাসল ল্যাঙডন। চারজন কার্ডিনাল, চারটে চার্চ, চারটে অল্টার অব সায়েন্স!

কিন্তু খুব একটা তুষ্ট মনে হচ্ছে না ভিট্টোরিয়াকে, তুমি বলতে চাও কার্ডিনাল চারজন যে চার গির্জার ভিতরে স্যাক্রিফাইজড় হবে সে গির্জাগুলোই অল্টার অব সায়েন্স? ইলুমিনেটিকে খুঁজে পাওয়ার পথ?

আমি এমনি মনে করি। ঠিক এমনই।

কিন্তু খুনী কোন দুঃখে আমাদের হাতে সূত্র ধরিয়ে দেবে?

কেন নয়? ল্যাঙডন পটাপট জবাব দেয় ভিট্টোরিয়াকে, খুব কম ইতিহাসবেত্তা এই চার চার্চের খবর জানে। আর অনেক কম জন বিশ্বাস করে তার অস্তিত্ব আছে। আর তাদের সিক্রেটটা চার শতক ধরে গোপনই আছে। কোন সন্দেহ নেই, আর মাত্র পাঁচ ঘণ্টা এই রহস্যটা রহস্যই থাক, তা মনেপ্রাণে চাইবে ইলুমিনেটি। আর এখন ইলুমিনেটির প্রয়োজন

নেই পাথ অব ইলুমিনেশনের। তাদের গোপন আস্তানা এতোদিনে দূরে কোথাও চলে গেছে। কোন সন্দেহ নেই। তারা এখনকার উন্নততর পৃথিবীতে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। তারা এখন প্রাইভেট ব্যাঙ্কের ঘরে ঘরে আসন পেতে বসে। বসে পাবলিক প্লেসে, বসে খাবার জায়গায়, বসে গলফ ক্লাবে। আজ রাতে তারা চায় তাদের গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে যাক। এটাই তাদের মহান মুহূর্ত, যার জন্য চারশো বছর ধরে তারা ওৎ পেতে ছিল, যার জন্য তাদের অনেক অনেক বিজ্ঞানী প্রাণপাত করেছে, যার জন্য পুরো দুনিয়ার অর্থনীতি তারা কব্জা করে রেখেছে, যার জন্য পৃথিবীর বেশিরভাগ উঁচু সারির রাজনীতিকদের তারা নিজেদের দলে টেনেছে, যে মুহূর্তের স্বপ্ন দেখত গ্যালিলিও। পৃথিবী থেকে ক্যাথলিক চার্চের বিদায়, স্রষ্টার নামে বিজ্ঞানকে পদদলিত করার দিনের বিদায়, শ্রেণিহীন-বিজ্ঞান নির্ভর একক বিশ্বের উদয়,

তাদের গ্র্যান্ড আনভেইলিং।

আরো একটা কথা ভেবে মনে মনে ভয় পাচ্ছে ল্যাঙডন। মিলে যাচ্ছে সব। একে একে। সেই চারটে প্রতীকের ছাপ কি থাকবে পোড়া চামড়ায়? কে জানে! সেই খুনি বলেছে, তাদের চারজনের কাছে চারটে প্রতীক থাকবে। বলেছিল সে, প্রমাণ করব আগের দিনের কিংবদন্তীগুলো ভুল নয়। চার পুরনো দিনের এ্যাম্বিগ্রামের চিহ্ন! সেই চারটে চিহ্ন! ইলুমিনেটিরই মত বয়স হয়েছে যেগুলোরঃ আর্থ-এয়ার-ফায়ার-ওয়াটার! মাটি-বাতাস-আগুন-জল! চারটে শব্দ, পরিপূর্ণ অবস্থা সহ। দ্বিমুখী চিহ্ন। ঠিক ইলুমিনেটির মত। সে নামটা এরই মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে আরেক প্রিস্টের বুকে। প্রত্যেক কার্ডিনালের জন্য অপেক্ষা করছে বিজ্ঞানের প্রাচীণতম প্রতীক। ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে এ নিয়ে আরো একটা বিতর্ক চালু আছে। ইলুমিনেটির চার প্রতীক সহ ইলুমিনেটির নামটাও দ্বিমুখী। সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আর একটা ব্যাপার বাকি থেকে যাচ্ছে। নামগুলো ইতালিয় নয়, ইংরেজিতে লেখা। ইংরেজিতে রাখাটা তাদের পাইকারি ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আর তাদের মধ্যে কোন কাজেই পাইকারি নয়... খুব গোছানো।

আর্কাইভ ইমারতের সামনে থেমে দাঁড়ায় ল্যাঙডন। প্রশস্ত সিড়িতে। শত শত ছবি ভেসে উঠছে তার চোখের সামনে। কীভাবে ইলুমিনেটি মার খেয়ে গেল একের পর এক, কীভাবে তারা জীবনগুলো হারাল, তারপর কীভাবে ডুব মারল ইতিহাসের পাতা থেকে, কীভাবে ভিতরে ভিতরে শক্তি সঞ্চয় করল, আবার কীভাবে দিনের আলোয় বুক পেতে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। তারা এবার উঠে আসবে, তাদের ইতিহাসখ্যাত ষড়যন্ত্রের সত্যতা তুলে আনবে। কিন্তু এখানে কি তারা থামবে, নাকি পুরো বিশ্ব দখলের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়বে? যারা এমন গোপন জায়গা থেকে এমন গোপন একটা অস্ত্র ততোধিক গুপ্ত একটা এলাকায় এনে তা আবার ফলাও করে প্রচার করতে পারে তাদের পক্ষে কোন কাজই অসম্ভব নয়। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাকাতে তাদের ছাপ শোভা পায়। মানুষের সামনে তাদের কথা প্রচার করার একটা সুযোগ চলে আসছে।

ভিট্টোরিয়া বলল, এইতো এগিয়ে আসছে আমাদের এসকর্ট। সামনের লন থেকে হন্তদন্ত হয়ে এগুতে থাকা সুইস গার্ডের দিকে চোখ তুলে তাকাল ল্যাঙডন।

তাদেরকে দেখার সাথে সাথে গার্ড জায়গাতেই থেমে গেল। তাদের দিতে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লোকটা। যেন ভুল দেখছে চোখের সামনে। আর এক বিন্দু অপেক্ষা না করে সে সেখানেই জমে গেল, পকেট থেকে তুলে আনল ওয়াকি টকি। তড়িঘড়ি করে লোকটা কথা বলে গেল লাইনের অপর প্রান্তে থাকা লোকটার সাথে। যেন সে মেনে নিতে পারছে না ব্যাপারটা। কিন্তু ঠিকঠিক বুঝতে পারল ল্যাঙডন, অপর প্রান্ত থেকে ভাল ধাক্কা পেয়েছে লোকটা। অসন্তুষ্ট একটা দৃষ্টি হানল সে।

গার্ড তাদেরকে বিল্ডিংয়ের দিকে গাইডিং করে নিয়ে যাবার সময় কোন কথা হল তাদের মধ্যে। তারা চারটে স্টিলের দরজা পেরিয়ে নেমে এল নিচে। সেখানে আরো দুটো কি প্যাড আছে, সেগুলোতে সঠিক পাসওয়ার্ড দেবার পরই সামনে আরো অনেকগুলো হাইটেক গেট পড়ল। তারপর হাজির হল ওকের তৈরি ভারি পাল্লা। এবার থামল প্রহরী, তাদের দিকে রোষ-

কষায়িত নেত্রে একটু তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করতে করতে দেয়ালের একটা ধাতব বাক্সের দিকে এগিয়ে গেল। আনলক করল সেটাকে, ঢুকল ভিতরে, তারপর আরো একটা কোড প্রেস করল। অবশেষে তাদের সামনের দরজার ভারি পাল্লা আস্তে করে খুলে গেল। প্রশস্ত হল তাদের পথ।

গার্ড ঘুরে দাঁড়াল, কথা বলল প্রথম বারের মত। এ দরজার শেষ প্রান্তেই আর্কাইভ। এ পর্যন্ত আসার কথা আমার, তার পরই ফিরে গিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হতে হবে।

চলে যাচ্ছেন আপনি? প্রশ্ন তুলল ভিট্টোরিয়া।

এই পবিত্র আর্কাইভে সুইস গার্ডদের প্রবেশাধিকার নেই। আপনারা এখানে, তার একমাত্র কারণ আমাদের কমান্ডার ক্যামারলেনগোর কাছ থেকে একটা সরাসরি আদেশ পেয়েছেন।

তাহলে আমরা বাইরে বের হব কী করে?

মনোডিরেকশনাল সিকিউরিটি। এপথে যাবার সময় এ নিরাপত্তা নিয়ে ভাবা হয়। বেরুনোর পথে আপনাদের কোন সমস্যায় পড়তে হবে না। কথার এখানেই ইতি টেনে মার্চ করে বেরিয়ে গেল প্রহরী।

কিছু কথা বলল ভিট্টোরিয়া, কিন্তু কান দিতে পারল না ল্যাংডন। তার চোখ সামনের দুই দুয়ারী ঘরের দিকে। কে জানে তার ভিতরে কী রহস্য লুকিয়ে আছে।

যদিও সে জানে, হাতে সময় বেশি নেই, তবু ক্যামারলেনগো কার্লো ভেন্ট্রেস্কা আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। ওপেনিং প্রেয়ারের আগে তার মনটাকে গুছিয়ে নেয়া জরুরী। অনেক বেশি কান্ড ঘটে যাচ্ছে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে। সে সামনেএগিয়ে যেতে যেতে টের পায়, গত পনের বছরের গুরুভার এবার তার কাঁধে এসে বর্তাবে।

তার পবিত্র দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে সে, সারা জীবন।

ঐতিহ্য অনুযায়ী পোপের মৃত্যুর পর ক্যামারলেনগো ব্যক্তিগতভাবে এগিয়ে যাবে পোপের দিকে। চেষ্টা করবে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনার। হাত রাখবে পোপের ক্যারোটিড আর্টারিতে, তারপর তিনবার পোপের নাম নিয়ে ডাকবে। নিয়ম অনুযায়ী আর কোন উপায় নেই। সাথে সাথে সে সিল করে দেবে পোপের বেডরুম, ধ্বংস করে দেবে পাপাল ফিসারমেন্স রিং, লাশের রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা করে শেষকৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করবে। এ পাট চুকলে, পরের ধাক্কা আসবে ক্যামারলেনগোর উপরে, কনক্লেভের জন্য প্রস্তুতি।

কনক্লেভ। ভাবল সে, শেষ ঝক্কি-ঝামেলার কাজ। খ্রিস্টানত্বের সবচেয়ে পুরনো ঐতিহ্যের একটা এই ব্যাপার। এর পিছনেও অনেক কথা আছে। এটা খ্রিস্টানত্বের প্রতীক হলেও সমালোচনা হয়েছে এ নিয়ে। ভিতরে কী ঘটে সেটা ভিতরের কার্ডিনালরাই ভাল বলতে পারবে। ক্যামারলেনগো জানে, এটা ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া আর কিছুই নয়। কনক্লেভ মোটেও ভোটাভুটির মাধ্যমে পাপাল নির্বাচন নয়। এটা প্রাচীণ এক পদ্ধতি। ঐশ্বরিক ক্ষমতা বন্টনের পথ। এই ঐতিহ্যের যেন কোন শেষ নেই... গোপনীয়তা, কাগজের ভাঁজ করা দলা, ব্যালটগুলো পুড়িয়ে ফেলা, পুরনো রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণ, ধোঁয়ার সিগন্যাল...।

অষ্টম জর্জের এলাকা পেরুতে পেরুতে চিন্তায় পড়ে যায় ক্যামারলেনগো। কী করছেন এখন কার্ডিনাল মর্টাটি? এখনো ধৈর্য ধরে রাখতে পারছেন কি? নিশ্চয়ইমর্টাটি দেখেছেন প্রেফারিতিরা এখনো হাজির হননি। তারা হাজির না থাকলে সারা রাত ধরে ভোটিং চলবে। মর্টাটিকে গ্রেট ইলেক্টর পদে আসীন করাটা বিজ্ঞোচিত কাজ হয়েছে, নিজেকে একটু আশ্বস্ত করে ক্যামারলেনগো। লোকটা মুক্তচিন্তার মানুষ। ভাল সিদ্ধান্ত নিতে জানেন। আজ রাতের মত নেতা আর কোনদিন কনক্লেভের প্রয়োজন পড়েনি।

রাজকীয় সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ক্যামারলেনগোর মনে হল সে শেষ বিচারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই উচ্চতা থেকেও সে স্পষ্ট টের পেল একশো পঁয়ষট্টি জন কার্ডিনালের অস্বস্তি মাখা আলোচনা।

একশো একষট্টি জন কার্ডিনাল। শুধরে নিল সে।

এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলল ক্যামারলেনগো। সে পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে নরকের পাঁকে, চিৎকার করছে লোকজন, আগুনের লেলিহান শিখা উঠে আসছে তার দিকে, আকাশ থেকে পাথর আর রক্ত বর্ষাচ্ছে।

আর তারপর, নিথর দুনিয়া।

***

যখন শিশু জেগে উঠল, সে স্বর্গে বাস করছিল। তার চারপাশের সব বস্তু শ্বেত বর্ণের। খাঁটি আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়, যদিও সবাই বলে দশ বছরের কিশোর কখনোই স্বর্গের স্বর্গীয়তা বুঝতে পারে না। কিন্তু দশ বছরের কার্লো ভেন্ট্রেস্কা ঠিক ঠিক চিনে নিতে পারল স্বর্গকে। সে এখন ঠিক ঠিক স্বর্গে আছে, আর কোথায় সে থাকতে পারে? তার দশ বছরের ছোট্ট জীবনটায় কার্লো ঠিক ঠিক ঈশ্বরকে চিনে নিতে পেরেছিল। পাইপ অর্গানের বজ্রনিনাদ, উঁচু উঁচু গম্বুজ, সুরের মূর্ছনায় পরিবেশিত সঙ্গীত, আলো করা কাঁচ আর ব্রোঞ্জ ও স্বর্ণের ছড়াছড়ি। কার্লোর মা, মারিয়া তাকে প্রতিদিন সাধারণ্যে নিয়ে আসতেন। গির্জাই কার্লোর আবাসভূমি।

প্রতিদিন আমরা মানুষের সামনে আসি কেন? একটুও রাগ না করে প্রশ্ন করেছিল কার্লো।

কারণ আমি ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এমনটাই করব। বলতেন মা, আর ঈশ্বরের কাছে করা প্রতিজ্ঞা আর সব কাজেরচেয়ে দামি। স্রষ্টার কাছে দেয়া কোন কথা কখনো ভঙ্গ করবে না।

কার্লো মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কখনো স্রষ্টাকে দেয়া কোন প্রতিশ্রুতি সে ভাঙবে না। এই পৃথিবীর আর সবকিছুর চেয়ে সে তার মাকে ভালবাসত। তিনি তার কাছে পবিত্র দেবী। সে তাকে মাঝে মাঝে ডাকত মারিয়া বেন্ডেট্রা-আশীর্বাদপুষ্ট মেরি—নামে, যদিও তিনি তা ঠিক পছন্দ করতেন না। তিনি যখন প্রার্থনায় বসতেন তখন কার্লো মায়ের সুগন্ধ নিত, আবেশিত হত তার প্রার্থনার সুর লহরীতে। হেইল মেরি, মাদার অব গড... আমাদের পাতকদের জন্য প্রার্থনা করুন... এখন এবং আমাদের শেষ নিঃশ্বাসের সময়টায়...

আমার বাবা কোথায়? প্রশ্ন করত কার্লো। যদিও সে জানে তার বাবা তার জন্মের আগেই মারা গেছে।

ঈশ্বরই এখন তোমার পিতা। সাথে সাথে তিনি জবাব দিতেন নির্দ্বিধায়। কথাটা মনে রেখ, এখন থেকে তোমার বাবা হলেন ঈশ্বর। তিনি তোমার ভালমন্দ দেখবেন, রক্ষা করবেন সব বিপদ থেকে। ঈশ্বরের কাছে তোমাকে নিয়ে অনেক বড় পরিকল্পনা অপেক্ষা করছে, কার্লো। শিশু জানত তার মায়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সে তখনি অনুভব করত, ঈশ্বর মিশে আছেন তার শোণিত ধারায়।

রক্তে,...

আকাশ থেকে রক্তের বর্ষণ!

নিরবতা। তারপরই স্বর্গ।

তার স্বর্গ, যতটা মনে পড়ে কার্লোর, ছিল সান্তা ক্লারা হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট। পালারমোর বাইরে। সে তখন ছিল একটা চ্যাপেলে, সেটা ভেঙে পড়ে সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায়। সেখানে সে ছিল, ছিল তার মা, তারা মানুষের সামনে বেরিয়ে এসে ঈশ্বরের মহিমা নিয়ে গুণকীর্তন করছিল। সাইত্রিশজন মারা পড়ে সাথে সাথে। তাদের মধ্যে তার মা-ও ছিলেন। কার্লোর বেঁচে যাওয়াটাকে পত্রিকারা ডাকে দ্য মিরাকল অব সেন্ট ফ্রান্সিস নামে। কার্লো সৌভাগ্যক্রমে ঠিক বিস্ফোরণের আগ মুহূর্তটায় ছিল একটু নিরাপদ কক্ষে। সেখানে সে সেন্ট ফ্রান্সিসের গল্প নিয়ে মেতে ছিল।

ঈশ্বর আমাকে সেখানে ডেকে নিয়েছিলেন, বলত সে নিজেকে, তিনি চাইতেন আমি টিকে থাকি।

ব্যথায় জর্জরিত ছিল কার্লো। সে এখনো তার মায়ের কথা ঠিক ঠিক মনে করতে পারে। তার মা, একটা মিষ্টি চুমু ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন তার দিকে। তারপরই একটা বিস্ফোরণ, শতছিন্ন হয়ে গেল তার মিষ্টি গন্ধ ভরা শরীর। সে আজো মানুষের কদর্য দিকটার কথা মনে করতে পারে। এখনো তার সামনে রক্তের হোলি খেলার দৃশ্য ভেসে বেড়ায়। তার মায়ের শোণিত উপর থেকে পড়ে তার গায়ে! আশীর্বাদপুষ্ট মারিয়ার রক্ত!

ঈশ্বর তোমাকে সব সময় চোখে চোখে রাখবে। সব সময় রক্ষা করবে তোমাকে। বলত মা।

কিন্তু এখন কোথায় সেই ঈশ্বর?

তারপর, মায়ের কথামত এক লোক এল তার কাছে, হাসপাতালে। সে সামান্য কোন মানুষ ছিল না, ছিল একজন বিশপ। সে তাকে নিয়ে প্রার্থনা করল। প্রার্থনা করল তারা জন্য। সেন্ট ফ্রান্সিসের অলৌকিক মহিমার জন্য। তারপর যখন সে সুস্থ হল, সেই বিশপের আওতায় তাকে একটা মনাস্টারিতে জায়গা করে দেয়া হল। আর সবার সাথে শিক্ষা নেয় কার্লো। তাকে পাবলিক স্কুলে ভর্তি হতে বলল সেই বিশপ, কিন্তু রাজি নয়কার্লো। এখন সে সত্যি সত্যি তুষ্ট। সে এখন আসলেই বাস করছে ঈশ্বরের ঘরে।

প্রতি রাতে কার্লো মায়ের জন্য নতজানু হয়ে প্রার্থনা করত।

ঈশ্বর কোন এক উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমাকে রক্ষা করেছেন, সব সময় তার ছিল এই

এক ভাবনা। কিন্তু কী সেই কারণ?

কার্লোর যখন ষোল বছর বয়স তখন সে ইতালির বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিংয়ে অংশ নেয়। সেটা ছিল রিজার্ভ মিলিটারি। এই কাজ থেকে দূরে থাকতে হলে তাকে সেমিনারিতে ভর্তি হতে হবে, বলেছিল তাকে বিশপ। সাথে সাথে বিজ্ঞোচিত জবাব দিয়েছিল সে, তার প্রিস্ট হবার ইচ্ছায় কোন খাদ নেই, কিন্তু সে খারাপকে চেখেদেখতে চায়।

কিন্তু কথাটার মর্ম বুঝতে পারল না বিশপ।

সে খুলে বলল, যদি সে চার্চে থেকে সারা জীবন মন্দের হাত থেকে দূরে থাকার কাজ করে তবে আগে তাকে অবশ্যই মন্দ কী তা বুঝতে হবে, জানতে হবে। সে বুঝতে পারছিল, সামরিকতা ছাড়া মন্দকে খুব দ্রুত আর কোথাও চিনতে পারা যাবে না। সেনাবাহিনী গোলা বারুদ নিয়ে কাজ-কারবার করে। একটা বোমার আঘাতেই আমার আশীর্বাদপ্রাপ্ত মা ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

বিশপ তাকে সামরিক বাহিনী থেকে যথা সম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু মন স্থির করে ফেলেছে কার্লো।

কিন্তু সাবধান, আমার পুত্র! বলেছিল বিশপ, আর মনে রেখ, চার্চ তোমার, প্রত্যাবর্তনের আশায় দিন গুণবে।

কার্লোর দু বছরের সামরিক চাকুরি আসলেই নরকে কেটেছিল। কার্লোর মত মেঘমন্দ্র, তার ভাবনা সুচিন্তিত, তার ধী স্থির, কিন্তু সামরিক বাহিনীতে এসবের কোন মূল্য নেই। এখানে নিরবতার কোন স্থান নেই। অষ্টপ্রহর শব্দ আর শব্দ। চারধারে অতিকায় যন্ত্র, শান্তির জন্য বরাদ্দ নেই একটা ঘণ্টাও। যদিও সৈন্যরা সপ্তাহে একদিন ছুটি পায়, কেউ কেউ চার্চেও যায়, তবু কার্লো তার সহকর্মীদের মধ্যে ঈশ্বরের ছায়া দেখতে পায়নি। তাদের মনে-মগজে ধ্বংস সব সময় দামামা বাজায়। ঝংকার তোলে ইন্দ্রিয় কাঁপিয়ে। প্রকম্পিত করে তোলে মনোজগত।

নতুন জীবনকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে শেখে কার্লো। ফিরে যেতে চায় শান্তির বসতে। কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র নয় সে। এখনো মন্দকে চেখে দেখতে হবে তাকে। সে অস্ত্র তুলে নিতে অস্বীকার করল, তাই সামরিক বাহিনী তাকে মেডিক্যাল হেলিকপ্টার চালানো শিখাতে চায়। সে শব্দকে ঘৃণা করে, ঘৃণা করে এই যান্ত্রিকতা, কিন্তু সেই হেলিকপ্টারই তাকে নিয়ে যায় মাটির পৃথিবী থেকে উপরে, তার মায়ের কাছাকাছি। যখন কার্লো জানতে পারল এ ট্রেনিংয়ের সাথে আরো আছে প্যারাস্যুটের কারসাজি, সে ব্যাপারটাকে ঠিক মেনে নিতে পারল না। কিন্তু পা বাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আর কোন উপায় নেই।

ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন। বলে সে নিজেকে।

কার্লোর প্রথম প্যারাস্যুট ট্রেনিং ছিল তার জীবনে সবচেয়ে কষ্টকর অভিজ্ঞতার একটা। একই সাথে দামি। যেন ঈশ্বরকে পুঁজি করে সে উড়ছে, উড়ছে তার সাথে। ব্যাপারটার সাথে তাল মিলিয়ে নিতে পারল না কার্লো... সেই নৈঃশব্দ... সেই ভেসে থাকা... সে মেঘের সাদা এলাকা পেরিয়ে নিচের ভূমিতে ফিরে আসতে আসতে দেখতে পায় মায়ের মুখ, মেঘমালাতে। তোমাকে নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা আছে, কার্লো। মিলিটারি থেকে ক্ষান্ত দিয়ে ফিরে এসে কার্লো যোগ দেয় সেমিনারিতে।

সেটা তেত্রিশ বছর আগের কথা।

রাজকীয় সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে ক্যামারলেনগো কার্লো ভেন্ট্রেস্কা, সে মনে করার চেষ্টা করে সেই সময়টার কথা। বেরিয়ে আসতে চায় তারপর। আসতে চায় বর্তমানে।

দূর করে দাও সব ভীতি, বলল সে, আর আজকের রাতটাকে ছেড়ে দাও ঈশ্বরের হাতে।

সিস্টিন চ্যাপেলের বিশালবপু ব্রোঞ্জ গেটটা সে দেখতে পাচ্ছে এখন স্পষ্ট। চারজন সুইস গার্ড আড়াল করে রেখেছে পথটাকে। গার্ডরা পাল্লা খুলে দেয়ার জন্য বিশাল ছিটকিনি খুলল। ভিতরের প্রত্যেকেরমুখ ঘুরে গেছে এদিকে। ক্যামারলেনগো তার সামনের কালো

রোব আর লাল কাপড়ের ঢাকনার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ। হঠাৎ সে বুঝে যায় তার জন্য ঈশ্বরের কী পরিকল্পনা ছিল।

নিজেকে ক্রস করে নিয়ে পা ফেলল ক্যামারলেনগো সিস্টিন চ্যাপেলের ভিতরে।

বিবিসি সাংবাদিক গুন্টার গ্লিক সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে বিবিসির ভ্যানে বসে দরদর করে ঘামতে ঘামতে গালি দিয়ে একসা করছে তার এডিটরকে। কেন এই মরার কাজে তাকে টেনে আনা। যদিও তার প্রথম মাসের কাজের পর অনেক বাহবা জুটেছে কপালে—মেধাবী, দক্ষ, নির্ভরতার পাত্র-তবুও এই এখানে বসে বসে, শুধু শুধু মাছি মারাটা তার মোটেও ভাল লাগছে না। যদিও বিবিসি তাকে শাবাস জানাতে দ্বিধা করেনি, তবু এভাবে রিপোর্ট করাটা তার আইডিয়া ছিল না।

গ্লিকের এ্যাসাইনমেন্টটা একেবারে সরল। সে এখানে বসে বসে মাছি তাড়াবে আর তারপর, বুড়োদের দল তাদের নূতন বুড়োকে নির্বাচিত করলে সে পনের সেকেন্ডের লাইভ অনুষ্ঠান প্রচার করবে, আর কিছু নয়। পিছনে থাকবে ভ্যাটিকান সিটির অবয়ব।

ব্রিলিয়ান্ট!

গ্লিক ভেবে পায় না কী করে বিবিসি এখানে রিপোর্টার পাঠায় আরো। তোমরা কি চোখে ঠুলি পরেছ? আমেরিকান নেটওয়ার্ক এখানে ঢু মারছে সে ব্যাপারটা কি চোখে পড়ে না? এখানে পড়ে আছে সিএনএন। তারাও ওৎ পেতে বসে আছে। বসে আছে এমএসএনবিসি। তাদের প্রস্তুতি আরো ঝকমারি। কৃত্রিম বর্ষার ব্যবস্থা করাই আছে। লোকে আর খবর শুনতে চায় না, চায় বিনোদন।

উইন্ডশিল্ড দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আরো আরো বিরক্ত হয়ে পড়ে গ্লিক। সামনেই ভ্যাটিকানের রাজকীয় পাহাড়ে বসে আছে গোটা ভ্যাটিকান সিটি। লোকে এখানে মনোযোগ দেয়ার মত কী পায় ঈশ্বরই জানে।

আমি আমার জীবনে কী পেলাম? নিজেকেই সে প্রশ্ন করে সশব্দে, কিস্যু নয়। একেবারে ফাঁকা।

তাহলে হাল ছেড়ে দাও, সাথে সাথে তার পিছন থেকে একটা মেয়ে কণ্ঠ বলে উঠল।

লাফ দিয়ে উঠল গ্লিক। সে যে একা নয় এ কথাটাই বেমালুম ভুলে বসেছিল। ফিরে তাকায় যেখানে তার মহিলা ক্যামেরা চালক চিনিতা মার্চি বসে বসে তার চশমার কাঁচ পরিষ্কার করছে। এই মেয়েটা সর্বক্ষণ কাঁচ ঘষতে ঘষতে পার করে দেয়। চিনিতা কালো। এমনিতে আফ্রিকান আমেরিকানদের প্রতি তার ভাল সহমর্মিতা আছে, কিন্তু আদপে চিনিতা বিশাল। সে কখনোই কাউকে ভুলে যেতে দেবেনা যে সে একজন কালো মানিক। আর গ্লিক তাকে ভালই পছন্দ করে। এখন এই সঙ্গটুকু উপভোগ করতে বাকি।

সমস্যা কী, গ্লিক? জিজ্ঞেস করে চিনিতা।

কী করছি আমরা এখানে?

এক অসাধারণ ব্যাপার দেখছি। এখনো মনোযোগ দিয়ে গ্লাস পরিষ্কার করছে সে।

বুড়ো মানুষগুলো কালিগোলা অন্ধকারে ডুবে আছে এটা খুব বেশি দর্শনীয় ব্যাপার হল?

তুমি ভাল করেই জান যে তোমার শেষ গন্তব্য নরক, জান না?

এখন তাহলে কোথায় আছি?

আমার সাথে কথা বল, যেন শাসাচ্ছে মা কোন দস্যি ছেলেকে।

আমি শুধু অনুভব করছি, আমার মাথা থেকে সব প্রশংসা উবে যাচ্ছে।

তুমি ব্রিটিশ ট্যাটলারের জন্য আবেদন করেছ?

হুঁ। কিন্তু এতে কোন বদ নিয়ত নেই।

কাম অন! আমি মনে করেছি তুমি একটা দুনিয়া কাঁপানো আর্টিকেল লিখেছ পত্রিকায়, রাণীর সাথে এলিয়েনদের যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে।

থ্যাঙ্কস।

হেই, বিধাতা চোখ তুলে তাকিয়েছে। আজ রাতে তুমি জীবনে প্রথমবারের মত পনের সেকেন্ডের শট নিতে যাচ্ছ, তাও আবার লাইভ।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল গ্লিক। সে এখনি বাহবাটার কথা বলে দিতে পারে, থ্যাঙ্কস গুন্থার,

গ্রেট রিপোর্ট। তারপর তার দিক থেকে চোখ চলে যাবে প্রকৃতির দিকে, আমারএকটা স্থির অবস্থান দরকার।

হাসল মাক্রি, এই অভিজ্ঞতার ঝোলা আর মুখটাকা দাড়ি নিয়ে?

হাত বোলাল গ্লিক তার জঙ্গুলে দাড়িতে, আমি মনে করেছিলাম এগুলো থাকলে আমাকে আরো বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান লাগে।

কপাল ভাল। গ্লিক আরো একবার হেরে বসার আগে ভ্যানের সেল ফোনটা বেজে উঠল। মনে হয় এডিটর। বলল সে। আশায় চকচক করছে তার চোখে। কী মনে হয়, কোন লাইভ আপডেট জানতে চাইবে কি তারা?

এই কাহিনীর উপর? হাসল ম্যাক্রি আবারও, স্বপ্ন দেখতে থাক। দোষ নেই কোন এ কাজে।

যথা সম্ভব ভারিক্কি চালে গ্লিক তুলে নিল ফোনটা। গুন্টার গ্লিক, বিবিসি, ভ্যাটিকান সিটি থেকে সরাসরি।

লাইনের লোকটার স্বরে আরবি টানের সুস্পষ্ট চিহ্ন, মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বলল সে, আমি আপনার জীবনটা বদলে দিতে যাচ্ছি।

ল্যাঙডন আর ভিট্টোরিয়া এখন একা একা দাঁড়িয়ে আছে গোপন আর্কাইভের দুই দুয়ারের সামনে। সামনে দেয়াল থেকে দেয়ালে চলে যাওয়া গালিচা, নিচে মর্মরের মেঝে, উপরে সিকিউরিটির ওয়্যারলেস ক্যামেরা। ভেবে পায় না ল্যাঙডন, এটা কোন বিশোধিত রেনেসাঁ নয়ত? সামনে ছোট্ট একটা ব্রোঞ্জের প্লেট, তাতে লেখা :

আর্কিভিও ভ্যাটিকানো

কিউরেটরে, পাদ্রে জ্যাকুই টমাসো

ফাদার জ্যাকুই টমাসো। ল্যাঙডন তার ঘরে রাখা ফিরিয়ে দেয়ার চিঠিগুলোতে লেখা নামটা মনে করতে পারছে ভালভাবেই। প্রিয় মিস্টার ল্যাঙডন, আমি অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ভ্যাটিকানের আর্কাইভে আপনার প্রবেশাধিকার দিতে পুনর্বার অপারগতা প্রকাশ করিতে হইতেছে...

দুঃখের সহিত জানানো। গোবর! জ্যাকুই টমাসোর রাজত্ব শুরু হবার সময় থেকে কোন নন ক্যাথলিক আমেরিকানকে দেখতে পায়নি যে ভ্যাটিকান আর্কাইভে প্রবেশ করতে পেরেছে। এল গার্ডিয়ানো, তাকে ব্যঙ্গ করে ডাকত ইতিহাসবেত্তারা। জ্যাকুই টমাসো ইহধামের সবচেয়ে রক্ষণশীল কিউরেটর, সবচেয়ে কর্কষ লাইব্রেরিয়ান। ভিতরে প্রবেশ করার সময়ই মনে মনে একবার দেখে নেয় ল্যাঙডন কিউরেটরকে। সে পরিপূর্ণ সামরিক সাজে সজ্জিত, তার পাশে বাজুকা হাতে একজন সৈনিক। কিন্তু না। ব্যাপারটা তেমন নয়। পুরো এলাকা জনশূণ্য। খাঁ খাঁ করছে।

নিরবতা আর নিবু নিবু আলো।

আর্কিভিও ভ্যাটিকানো। তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান মুহূর্তগুলোর একটা। ভিতরে চোখ রেখেই মৃদু একটা ধাক্কা খেল ল্যাঙডন। কল্পনার চোখে কী বিচিত্রই ছিল ভ্যাটিকান সিটির আর্কাইভ। তার সাথে মোটেও মিলছে না আসল চিত্র। সে কল্পনায় দেখেছিল ধূলিপড়া অতিকায় বুকশেলফগুলো দাঁড়িয়ে থাকবে, সেখানে শোভা পাবে সোনার জলে আঁকা, চামড়ার মলাটে বাঁধানো বিরাট বিরাট সব বই। সামনে থাকবে আলো-আঁধারি, থাকবে ধর্মনেতাদের উপস্থিতি। নিবিষ্টচিত্তে তারা পড়ালেখা করবে ভিতরে...। কল্পনার ধারেকাছ দিয়েও বাস্তব যাচ্ছে না।

প্রথম দৃষ্টিতে যা মনে হল, সামনের এলাকাটা বিশাল কোন হ্যাঙ্গার, আর তার ভিতরে বিরাট বিরাট নাড়াতে পারা মাঠ। এমন প্রতিরক্ষাই থাকার কথা। ভিতরে থাকবে বই, বাইরে কাঁচ। তার মাঝখানে বায়ুশূণ্য স্থান। বাতাসের জলীয়বাষ্প আর ভেসে বেড়ানো এসিড খুব সহজেই ক্ষয়িষ্ণু ভলিউমগুলোকে তুবড়ে ফেলতে পারে। নষ্ট করে ফেলতে পারে বইগুলোকে। তাই তাদের এভাবেই সংরক্ষণ করতে হবে। আর কোন উপায় নেই। সংরক্ষিত ভল্টে ভিট্টোরিয়া কখনো না গেলেও ল্যাঙডন বহুবার গিয়েছে। তাও এ পরিস্থিতির কোন তুলনা নেই... এমন কোন একটা বদ্ধ কন্টেইনারে আটকে পড়া যেখানে লাইব্রেরিয়ানের ইচ্ছানুসারে অক্সিজেন সরবরাহ আসবে।

ভল্টগুলো কালো, ভল্টগুলোর শেষপ্রান্তে আলোর ক্ষীণ একটা রেখা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। এখানে লুকিয়ে আছে অযুত রহস্য, যা আর সবার সামনে প্রকাশ করা যাবে না। যেন পুরনোদিনের ইতিহাস মুখ ব্যাদান করে আছে। এ সঞ্চয়ের কোন তুলনা নেই।

ভিট্টোরিয়াও যেন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছে। বিশাল আকারের স্বচ্ছ কাচের দিকে তাকিয়ে সেও পাশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

হাতে সময় বেশি-নেই। একটুও দেরি করতে রাজি নয় ল্যাঙডন, তার দরকার একটা বিশাল বপু এনসাইক্লোপিডিয়া যেটায় নজর বুলিয়ে জানতে পারা যাবে কোন কোন বই আছে এখানে। তারপর যা দেখা গেল, ঘরের প্রান্তে প্রান্তে কম্পিউটার সাজানো। দেখেশুনে মনে হচ্ছে তারা সমস্ত বইয়ের ক্যাটালগ কম্পিউটারাইজড করে ফেলেছে।

আশান্বিত দেখাচ্ছে ভিট্টোরিয়াকে, এমন হয়ে থাকলে কাজ হয়ে যাবে আলোর গতিতে।

ল্যাঙডন আশা করে তার উচ্ছ্বাসটা ভাল। কিন্তু আসলে সে বেশ দ্বিধায় পড়ে গেছে। কম্পিউটারাইজড করা হলে শাপে বরের বদলে বরে শাপ হতে পারে। একটা টার্মিনালের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে টাইপ করা শুরু করল। তার মনে সন্দেহ দানা বাঁধছে। পুরনো নিয়মই ভাল ছিল।

কেন?

কারণ সত্যিকার বইগুলোতে পাসওয়ার্ড প্রটেকশন নেই। মনে হয় না ফিজিসিস্টরা স্বভাবসুলভ হ্যাকার।

মাথা ঝাঁকাল ভিট্টোরিয়া, আমি এক-আধটু চেষ্টা করে দেখতে পারি। এই যা।

লম্বা করে একটা দম নিয়ে ল্যাঙডন ফিরে তাকাল ভল্টগুলোর দিকে। সবচেয়ে কাছেরটার দিকে এগিয়ে গিয়ে সে চোখ ফেলল ভিতরে। ভিতরে থরে বিথরে বই সাজানো। বুক শেলফ, পার্চমেন্ট বিন আর একজামিনেশন ট্যাবলেট। প্রত্যেক বইয়ের সারির শেষ মাথায় জ্বলজ্বলে ট্যাব আছে। এই সারিতে কী কী বই আছে সেটা লেখা সেখানে। স্বচ্ছ বাধার সামনে সারিবদ্ধ নামগুলো সে দেখতে থাকে।

পিয়েভেট্রা লেরেমিটা... লা ক্রুসিয়াটে... আরবানো টু... লেভান্ট...

লেবেল এঁটে দিয়েছে বইগুলোর গায়ে। বলল সে, হাঁটছে এখনো, কিন্তু এখানে লেখকদের নাম অনুসারে বর্ণক্রমে সাজানো নেই। অবাক হয়নি সে। পুরনো দিনের লাইব্রেরিগুলোতে লেখকের নাম অনুসারে বইয়ের তালিকা দেয়া থাকে না কারণ অনেক অনেক বইয়ের লেখকের নাম অজানা। আর অনেক অনেক ঐতিহাসিক বইয়ের বদলে চিঠিপত্র আর ছেঁড়াখোরা পাতা, পার্চমেন্টও থাকে। যাই হোক, এই ক্রমবিন্যাস কোন কাজে লাগবে না।

ভিট্টোরিয়ার দিকে তাকাল ল্যাঙডন, তার চোখে হতাশা, মনে হচ্ছে ভ্যাটিকান আর্কাইভের নিজস্ব রীতি আছে।

আসলেই, চমক বলা চলে।

আবার সে লেবেলগুলো একবার পরখ করে দেখে। বইগুলোর নামে ক্রম ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সে অনুভব করছে, কোন না কোন সূত্রে সেগুলোকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মনে হয় কোন গাণিতিক নিয়ম রক্ষা করে বইয়ের তালিকা রাখা আছে।

গাণিতিক? বলল ভিট্টোরিয়া, তার চোখে হতাশা, খুব একটা কার্যকর বলে মনে হচ্ছে না।

আসলে... ভাবল ল্যাঙডন, আরো কাছ থেকে ব্যাপারটা নিরীক্ষণ করছে সে, এ হয়ত আমার দেখা সবচেয়ে কিম্ভুত ক্যাটালগিং সিস্টেম। সে সব সময় তার ছাত্রদের বলে এসেছে, পুরো ব্যাপার বুঝে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। যেখানে যে সুর ধ্বণিত হয় সেটাই বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এখন মনে হচ্ছে এই ভ্যাটিকান আর্কাইভের রীতিও তেমন কিছু, বেসুরো কোন সুর,

এই ভল্টের সবগুলো ব্যাপারকে দেখে মনে হচ্ছে, বলল সে, অবশেষে, এখানকার সব বই ক্রুসেড বিষয়ক... শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্মযুদ্ধের উপরে লেখাগুলো জায়গা পেয়েছে। সব আছে এখানে, অনুভব করল সে। ঐতিহাসিক ব্যাপার, চিঠিপত্র, আর্টওয়ার্ক, রাজনৈতিক-সামাজিক তথ্য, আধুনিক বিশ্লেষণ। এক জায়গায় সব মিলেমিশে গুবলেট হয়ে গেছে... যে কোন একটা বিষয়ে গভীর মনোযোগ দেয়া সম্ভব। ব্রিলিয়ান্ট।

তেতে উঠল ভিট্টোরিয়া, কিন্তু ডাটাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাজানো যায়।

আর তাই তারা বহুমাত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাপারটাকে সাজিয়েছে... একটা সেকেন্ডারি ইন্ডিকেটরের দিকে হাত নির্দেশ করল ল্যাঙডন, এগুলো দিয়ে আরো অন্য বিষয়ের সাথে যুক্ত হওয়া যায়।

অবশ্যই, বলল মেয়েটা, কোমরে হাতদুটো রেখে সে সারা আর্কাইভের বিশাল ঘরের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তারপর তাকাল ল্যাঙডনের দিকে, তো, প্রফেসর, আমরা যা খুজছি, এই গ্যালিলিও-লেখাটার নাম কী?

হাসা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই ল্যাঙডনের। তাকাল সে ঘরটার চারদিকে, তারপর নিজেকে শুনিয়ে বলল, আছে, এখানেই কোথাও আছে। অপেক্ষা করছে আমার জন্য, মৃদু আলোর কোন কোণে...

ফলো মি। বলল ল্যাঙডন, তাকাল ইন্ডিকেটরগুলোর দিকে। মনে মনে একটু হিসাব কষে নিয়ে বলল, মনে আছে তো? ইলুমিনেটি কীভাবে পথ বের করত? বলেছিলাম না নতুন সদস্যরা কীভাবে চিনে নিত?

গুপ্তধন উদ্ধার করা। বলল ভিট্টোরিয়া, কাছ থেকে দেখতে দেখতে।

চিহ্নগুলো ঠিক মত বসানোর পর তাদের আরো একটা কাজ করা বাকি থেকে যায়। জানানো। জানাতে হয় নতুন বিজ্ঞানীদের, কী করে প্রতীকগুলো চিনে নেবে।

লজিক্যাল। বলল ভিট্টোরিয়া, নাহলে কেউ কশমিন কালেও চিহ্নের ব্যাপারটা জানতে পারবে না।

ঠিক তাই। এমনকি যদি তারা জানতেও পারত যে চিহ্নগুলো আছে, তবু বিজ্ঞানীরা জানতেও পারত না কোথা থেকে পথটা শুরু হবে। আদ্যিকাল থেকেই রোম অনেক বড় এক মহানগরী।

ওকে।

পরের সারির দিকে চোখ রেখে ল্যাঙডন বলে চলল। বছর পনের আগে এক বিজ্ঞানী সূত্র আবিষ্কার করে। ইলুমিনেটির সূত্র। দ্য সাইনো।

সাইন। পথটা কোথা থেকে শুরু হল তার হদিস।

ঠিক তাই। এবং তার পর থেকে অনেক অনেক ইলুমিনেটি এ্যাকাডেমিক, আমি সহ, সাইনোর ব্যাপারটা বের করতে পারি। আজ এটা স্বীকৃত সত্যি যে সাইনো বলে কিছু একটা ছিল এবং গ্যালিলিয় বিজ্ঞানীদের কাছে যুগযুগ ধরে ইলুমিনেটির পথে এই চিহ্নগুলো কাজ করে এসেছে। বিন্দুমাত্র বুঝতে পারেনি ভ্যাটিকান।

কীভাবে?

তিনি অনেক অনেক বই লিখেছেন। ছাপিয়েছেন সেগুলোকে। বছরের পর বছর ধরে।

নিশ্চয়ই ভ্যাটিকান ঠিক ঠিক দেখেছিল? দেখেশুনে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ।

ঠিক তাই। সাইনো প্রচার করা হয়েছে।

কিন্তু কেউ কোনদিন সেটা জানতে পারেনি?

না। ব্যাপারটা বেখাপ্পা হলেও, সাইনোর চিহ্ন যাই হোক না কেন, –মেসনিক ডায়েরিগুলোয়, আগের দিনের সায়েন্টিফিক জার্নালে, ইলুমিনেটির চিঠিগুলোতে একটা নাম্বার দিয়ে ব্যাপারটাকে মাঝে মাঝে প্রকাশ করা হত।

সিক্স সিক্স সিক্স?

হাসল ল্যাঙডন, না। আসলে ছিল ফাইভ ও থ্রি।

অর্থ?

আমাদের কেউ এখনো অর্থটা বের করতে পারিনি। ফাইভ ও থ্রি নিয়ে আমি আমি কম গলদঘর্ম হইনি। সংখ্যাতত্ত্ব, মানচিত্র চিহ্ন, ভূতাত্ত্বিক অবস্থান–নানাভাবে ব্যাপারটাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমরা। সারির শেষ মাথায় চলে গিয়ে ল্যাঙডন পরের সারির দিকে চোখ বুলাতে বুলাতে বলে গেল। অনেক বছর ধরে ফাইভ ও থ্রির একমাত্র যে সূত্রটা আমরা বের করতে পারলাম তা হল, ব্যাপারটা শুরু হচ্ছে ফাইভ দিয়ে। এ সংখ্যাটা ইলুমিনেটির গোপনীয় নাম্বারের মধ্যে একটা। থামল সে একটু।

আমার মন কেন যেন বলছে সম্প্রতি তুমি ফাইভ ও থ্রির একটা সুরাহা করতে পেরেছ এবং সেজন্যই আমরা আজ এখানে।

ঠিক কথা। বলল ল্যাঙডন। একটা মুহূর্তের জন্য সে, তার গর্বকে সমুন্নত করে রাখল । তুমি কি গ্যালিলিওর একটা বইয়ের নামের সাথে পরিচিত? নাম ডায়ালোগো?

অবশ্যই। বিজ্ঞানীদের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত। বৈজ্ঞানিক কর্মধারার এক ঐশীবাণী বলা চলে বইটাকে।

ষোলশো ত্রিশের প্রথমদিকে গ্যালিলিও একটা বই প্রকাশ করতে চান। তিনি কোপার্নিকাসের সূর্য কেন্দ্রীক সৌরজগতের মডেল নিয়ে আলোচনা করতে চান সেটায়। কিন্তু ভ্যাটিকান সিটি বইটাকে প্রকাশ করতে দেবে না যে পর্যন্ত না গ্যালিলিও চার্চের পৃথিবীকেন্দ্রীক মডেলের ব্যাপারে যথাযথ যুক্তি দেখিয়ে সেটাকেও সমুন্নত না করছেন। এমন এক মডেলকে সত্যি বলে প্রমাণ করতে হবে যেটাতে গ্যালিলিওর মোটেও বিশ্বাস নেই। তাই আর কোন পথ থাকল না তার। তিনি দু মডেলেরই পক্ষে বিপক্ষে বিস্তর কাহিনী রেখে লিখলেন বইটাকে।

যদ্দূর মনে হয়, বলল ল্যাঙডন, তুমি জান যে এ বইটার জন্যে আজো বিতর্ক দানা বাঁধে মানুষের মনে। এটার জন্যই ভ্যাটিকান গ্যালিলিওকে বন্দী করে ফেলে।

কোন ভাল কাজই শাস্তি ছাড়া করা যায় না।

হাসল ল্যাঙডন, একেবারে সত্যি কথা। গৃহবন্দি হয়ে থাকার সময়টায় তিনি আরো একটা বই লেখেন। অনেক স্কলারই এটাকেও ডায়ালোগোর সাথে গুলিয়ে ফেলে। আসলে তার নাম ডিসকর্সি।

নড করল ভিট্টোরিয়া, আমি এটার কথাও জানি। ডিসকোর্সেস অন দ্য টাইড।

অবাক হয়ে গেল ল্যাঙডন মেয়েটার কথা শুনে। সে কিনা জোয়ার ভাটার উপর গ্রহগুলোর প্রভাব বিষয়ক বইটার কথাও জানে!

হেই! বলল মেয়েটা, তুমি একজন ইতালিয় মেরিন ফিজিসিস্টের সাথে কথা বলছ, যার বাবা গ্যালিলিওর আরাধনা করতেন।

হাসল ল্যাঙডন। তারা ডিসকর্সির খোঁজে জান জেরবার করছে না। ল্যাঙডন ব্যাখ্যা করল, ডিসকর্সিই গ্যালিলিওর গৃহবন্দি হয়ে থাকার সময় একমাত্র লেখা বই নয়। ইতিহাসবিদরা মনে করে তিনি সেই সময়টায় আরো একটা বই লিখেছিলেন। ডায়াগ্রামা।

ডায়াগ্রামা ডেলা ভেরিটা, বলল ল্যাঙডন, ডায়াগ্রাম অব টুথ।

এ নাম কখনো শুনিনি।

অবাক হইনি মোটেও। ডায়াগ্রামা গ্যালিলিওর সবচেয়ে গোপনীয় কাজগুলোর মধ্যে একটা। বলা উচিৎ এককভাবে সবচেয়ে গোপনীয়। তিনি এমন সব বৈজ্ঞানিক ব্যাপার সেখানে আলোচনা করেছেন যেগুলোকে তিনি সত্যি বলে জানতেন কিন্তু প্রকাশ্যে বলতে পারতেন না। তার আর অনেক লেখার মত এটাও গোপনে রোম থেকে তার এক বন্ধুর মাধ্যমে বাইরে চালান করে দিয়ে হল্যান্ড থেকে সেটাকে প্রকাশ করা হয়। ইউরোপিয় গুপ্ত বৈজ্ঞানিক সমাজের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয় লেখাটা। ভ্যাটিকান এটার গন্ধ টের পেয়ে বই পোড়ানোর উৎসব শুরু করে।

চোখ তুলে তাকাল আবার মেয়েটা, বলল, আর তুমি মনে কর ডায়াগ্রামাতেই সেই সত্যের সন্ধান আছে? সেটা আসলে শুধু কোন মামুলি বই নয়, বরং তার ভিতরেই লুকিয়ে ছিল সংকেতটা, যেটা ইউরোপের সমস্ত বিজ্ঞানীকে আকৃষ্ট করে ইলুমিনেটির দিকে, যেটা থেকে তারা জানতে পারে কীভাবে ইলুমিনেটির সন্ধান পাওয়া যাবে? দ্য সাইনো? দ্য পাথ অব ইলুমিনেশন?

ডায়াগ্রামাতেই আসলে গ্যালিলিও পথটার সন্ধান ভরে রেখেছিলেন। আমি নিশ্চিত। ল্যাঙডন চলে গেল তৃতীয় সারির দিকে, ট্যাবগুলো দেখতে দেখতে বলে গেল এক সুরে, আর্কাইভিস্টরা ডায়াগ্রামার একটা কপি পাবার জন্য প্রাণপাত করতে প্রস্তুত। অনেক বছর ধরে। কিন্তু ভ্যাটিকানের বই পোড়ানোর উৎসব আর পুস্তিকাটার গোপনীয়তার কারণে পারমানেন্স রেটিংয়ের জন্য পৃথিবীর মুখ থেকে হাপিস হয়ে যায় বইটা।

পারমানেন্স রেটিং?

টিকে থাকার কাল। আর্কাইভিস্টরা বইকে দশের মধ্যে একটা রেটিং দেয়, যেটা বইয়ের

কাগজ টিকে থাকার সময়কাল উল্লেখ করে। ডায়াগ্রামা প্রিন্ট হয়েছিল সিজ প্যাপিরাসে। জিনিসটার সাথে টিস্যু পেপারের সাথে তুলনা চলে শুধু। এর জীবদ্দশা এক শতাব্দির বেশি হবে না।

এরচেয়েয়ে শক্ত পোক্ত কোন কাগজ নয় কেন?

এটাও গ্যালিলিওর চালাকি। তার অনুসারীদের টিকিয়ে রাখার কৌশল। যদি কোন বিজ্ঞানী একটা বই সহ ধরা পড়ে যায় তাহলে সোজা সে বইটাকে জলে ছেড়ে দেবে। হাপিস হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না সেটা প্রমাণ লুকিয়ে ফেলার চমৎকার কৌশল। কিন্তু আর্কাইভিস্টদের জন্য ব্যাপারটা দুঃখজনক। বলা হয়ে থাকে, অষ্টাদশ শতাব্দির পর একটা মাত্র ডায়াগ্রামার কপি টিকে ছিল।

একটা? আর এখানেই আছে সেটা? কপালে চোখ উঠে গেল মেয়েটার। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তার।

গ্যালিলিওর মৃত্যুর পরপর ভ্যাটিকান সেটাকে উদ্ধার করে নেদারল্যান্ড থেকে। আমি এটাকে খুঁজে পাবার আশায় হন্যে হয়ে গেছি যখন থেকে জানতে পারলাম এটার ভিতরে কী আছে।

ল্যাঙডনের মনের লেখা পড়তে পেরে সাথে সাথে ভিট্টোরিয়া চলে গেল অন্য প্রান্তে। বইটা খোঁজার চেষ্টাদ্বিগুণ করার জন্য।

থ্যাঙ্কস, বলল সে, খুঁজছি এমন কোন রেফারেন্স ট্যাব যেটাতে গ্যালিলিওর কোনকোন সূত্র আছে, একটু-আধটু নামটা থাকলেও চলবে। সায়েন্স, সায়েন্টিস্ট পেলেও চলে। দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে।

ঠিক আছে। কিন্তু এখনো বললানি ঠিক কীভাবে বুঝে উঠতে পারব যে এখানে গ্যালিলিওর ক্লু আছে। ইলুমিনেটির চিঠিগুলোতে যে লেখাগুলো আছে তার সাথে কোন সম্পর্ক নেইতো? কিম্বা ফাইভ ও থ্রির সাথে?

হাসল ল্যাঙডন, আসলেই। আমি প্রথমে যোগ-সাজসটা টের পাইনি। কিন্তু এই ফাইভ ও থ্রির সাথে ভাল যোগ আছে অন্যান্য সূত্রের। আছে সরল একটা ব্যাখ্যা। এটার সাথে সরাসরি ডায়াগ্রামার যোগসূত্র আছে।

এক মুহূর্তের জন্য ল্যাঙডন চলে গেল দু বছর আগের ষোলই আগস্টে। তার এক কলিগের ছেলের বিয়ের নেমন্তনে গিয়ে সে হ্রদের ধারে দাড়িয়ে ছিল। তারপর সেই লেকে ভেসে বেড়াতে দেখল একটা ফুলে ফুলে ছাওয়া প্রমোদতরী। অবাক হয়ে ল্যাঙডন জিজ্ঞেস করল কনের বাবাকে, সিক্স ও টুর সাথে কী সম্পর্ক?

সিক্স ও টু?

ভিসি আই আইর অর্থ রোমান অক্ষরে সিক্স ও টু।

হাসল লোকটা, এটা কোন রোমান অংক নয়। বরং ভাসতে থাকা বার্জটার নাম। ডিসি টু।

দ্য ডিসি টু?

নড করল লোকটা, দ্য ডিক এ্যান্ড কনি টু।

বোকার মত তাকিয়ে থাকল ল্যাঙডন। মাঝে মাঝে সে এমন বোকামি করে ফেলে। নাম দুটো বর আর কনের। অবশ্যই, তাদের প্রতি সম্মান জানাতে বার্জটায় এমন নাম দেয়া হয়েছে। ডিসি ওয়ানের কী খবর?

দুঃখ ভেসে উঠল লোকটার কণ্ঠে, গতকাল সেটা ডুবে গিয়েছিল, ভাসানোর সময়।

হাসল ল্যাঙডন, কথাটা শুনে আমি দুঃখিত। তাকাল সে ডিসি টুর দিকে। মনে পড়ে গেল তার কিউ ই টুর কথা। ব্যাপারটা তাকে স্থবির করে দিল কিছুক্ষণের জন্য।

এবার ল্যাঙডন ফিরে দাঁড়াল ভিট্টোরিয়ার দিকে। ফাইড ও থ্রি, বলল সে, আগেই বলেছি, এটা একটা কোড। এটা ইলুমিনেটির এক ধরনের চালাকি। তারা এটাকে রোমান সংখ্যার সাথে মিলিয়ে নিয়েছে। রোমানে ফাইভ ও থ্রির প্রকাশ হচ্ছে,..

ভি আই আই আই।

চোখ তুলে তাকাল ল্যাঙডন, এত দ্রুত কী করে বললে! আবার বলে বসো না আমাকে যে তুমি একজন ইলুমিনেটা।

হাসল মেয়েটা, আমি রোমান অক্ষর ব্যবহার করি কোনকিছুকে নির্দেশ করার কাজে।

ঠিক তাই, মনে মনে বলল ল্যাঙডন, আমরা সবাই কি একই কাজ করি না? চোখ তুলে তাকাল ভিট্টোরিয়া, তো, ভি আই আই আইর অর্থ কী?

ভিআই আর ভিআই আই এবং ভিআই আই আই অনেক আদ্যিকালের শব্দ সংক্ষেপণ। আগের দিনের বিজ্ঞানীরা গ্যালিলিওর পুরনো দিনের তিনটা বইকে নির্দেশ করত এ তিন নামে। এর আরেক মানে হল...।

আরো একটা শ্বাস নিল ভিট্টোরিয়া, ডায়ালোগো... ডিসকর্সি... ডায়াগ্রামা।

ডি-ওয়ান, ডি-টু, ডি-থ্রি। প্রতিটাই বৈজ্ঞানিক। প্রতিটাই বিতর্কিত। আর ফাইভ ও থ্রির অর্থ হল, ডি-থ্রি। ডায়াগ্রামা। তার বইগুলোর মধ্যে তৃতীয়টা।

এখনো ঠিক মিলে যাচ্ছে না ভিট্টোরিয়ার হিসাব-কিতাব, কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার নয়। এই এত পথ, এই এত গোপনীয়তা, তারপরও কেন ভ্যাটিকান সিটি আসল ব্যাপারটা উদ্ধার করতে পারল না? খুব সহজ। তাহলে বই পোড়ানোর উৎসবে কিম্বা পরে আর্কাইভে সারিবদ্ধ করে রাখার সময় কেন তারা টের পেল না মোটেও?

তারা দেখেছে ঠিকই, বুঝতে পারেনি। ইলুমিনেটির দ্বিমাত্রিকের মধ্যে নামটাকে লুকিয়ে রাখার কারসাজি দেখেছ না তুমি? না জানলে কীভাবে বুঝতে পারতে কোন ছাতা মাথা আঁকা আছে সেখানে? পারতে না। একই ভাবে, যারা সেটা খুঁজছে না তারা কশমিন কালেও বুঝে উঠতে পারবে না।

মানে?

মানে, গ্যালিলিও জিনিসটাকে ভালভাবেই লুকাতে পেরেছিলেন। ইতিহাসবিদরা বলে, সাইনোটা একটা প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে এসে ইলুমিনেটির সাথে গ্যাটছড়া বাঁধে। তাকে বলা হয় লিঙ্গুইয়া পিউরা।

দ্য পিওর ল্যাঙ্গুয়েজ?

হ্যা।

ম্যাথমেটিক্স?

আমিও তাই ভাবছিলাম। দেখেশুনে মনে হচ্ছে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে যাওয়া মোটেও রহস্যময় নয়। গ্যালিলিও আসলেই একজন বিজ্ঞানী। আর তিনি লিখছিলেন শুধুমাত্র বিজ্ঞানীদের জন্য। স্বভাবতই, গণিতই পথ, যেটা দিয়ে এক বিজ্ঞানী আরেক বিজ্ঞানীকে ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারবে। ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না বাকীরা। পুস্তিকাটার নাম ডায়াগ্রামা। তার মানে গাণিতিক ডায়াগ্রামগুলোও আরেকটা উৎস হতে পারে।

আরো যেন বিভ্রান্ত হয়ে উঠছে মেয়েটা, আশা করি কোনমতে গ্যালিলিও বিজ্ঞানীদের বোধগম্য করে লেখাটা লিখেছিলেন।

তোমার সুর শুনে মনে হচ্ছে হাল ছেড়ে দিচ্ছ? সারির শেষদিকে সরে যেতে যেতে বলল ল্যাঙডন আস্তে করে।

আমি ছেড়ে দিচ্ছি না। আসলে হাল ছাড়ছি না। কারণ তুমি এখনো আশা ধরে রেখেছ। তুমি যদি ডি-থ্রির ব্যাপারে এতই নিশ্চিত হয়ে থাক তাহলে কেন এ কথাটা প্রচার করনি? তাহলে এখানে, ভ্যাটিকান আর্কাইভে যারা আসত বা আসার অনুমতি পেত তারা এখানে এসে ডায়াগ্রামাকে নিয়ে বেশ ভালভাবেই ব্যাপারটার সুরাহা করতে পারত।

আমি কথাটা চাউর করে দিতে চাইনি। বলল ল্যাঙডন, তথ্যটা বের করার জন্য গাধার খাটুনি খাটতে হয়েছে আমাকে। বের করতে হয়েছে অনেক অনেক তথ্য আর...। নিজেকে থামিয়ে দিল সে। একটু অপ্রস্তুত হয়ে নিজেকে থামিয়ে দিল।

তুমি সুনাম চেয়েছিলে।

কথা বলল ল্যাঙডন, বলতে গেলে... আসলে-

অপ্রস্তুত হবার কোন কারণ নেই, বলল সাথে সাথে ভিট্টোরিয়া, তুমি একজন সায়েন্টিস্টের সাথে কথা বলছ। সার্নে এই ব্যাপারটার একটা চলতি নামও আছে।

আমি শুধু প্রথম হবার চেষ্টায় এমন করেছি তা কিন্তু না। এমন চিন্তাও ছিল, কোন ভুল লোকের হাতে প্রমাণটা পৌঁছলে ডায়াগ্রামা হাপিস হয়ে যেতে পারে।

ভুল লোক মানে ভ্যাটিকান?

তাদের কাজ যে ভুল এমন কোন কথা আমি বলছি না। কিন্তু তাই বলে ভ্যাটিকান যে ইলুমিনেটির হুমকিকে কখনো ছোট করে দেখেছে তাও না। এমনকি উনিশো সালের দিকে চার্চ ইলুমিনেটিকে অতিকথনের দোষে দুষ্ট করে। সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা তাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা হল, তাদের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে দাঁড়াল দুনিয়ার খ্রিস্টানত্বের বিরোধী দলগুলো মোটামুটি এক সাথে। দখল করল অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, সামাজিক ক্ষেত্র, রাজনৈতিক মাঠ। দখল করল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। কথাটা কি ঠিক হল? এখনো এমন এক শক্তি আছে যা দখল করে আছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, সামাজিক ক্ষেত্র, রাজনৈতিক মাঠ; দখল করে আছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

আরো একটা প্রশ্ন আছে আমার। ভিট্টোরিয়া তাকে থামিয়ে দিল, তারপর অদ্ভুত চোখে তাকাল তার দিকে, তুমি কি সিরিয়াস?

একটু ধাক্কা খেল ল্যাঙডন, কী বলতে চাও তুমি?

মানে, আজকের দিনটাকে রা করাই কি তোমার সত্যিকার পরিকল্পনা?

ল্যাঙডন ঠিক ঠিক বলতে পারবে না মেয়েটার আতঙ্কে ভর্তি চোখে করুণা দেখতে পেয়েছে কিনা, তুমি কি ডায়াগ্রামাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে বলছ?

আমি বলতে চাই, তুমি ডায়াগ্রামাকে খুঁজে বের করবে, চারশ বছর আগের সাইনো বের করবে, ভাঙবে কিছু গাণিতিক কোড, তারপর এমন কিছু প্রাচীণ শিল্পকর্মের পিছনে ছুটবে যেটার অর্থ বের করতে গলদঘর্ম হতে হয়েছে ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত আর মেধাবী বিজ্ঞানীদেরও, তারপর সেই লোকটার গোড়াসুদ্ধ উপড়ে এনে বাকি সমস্যাগুলোর সমাধান করবে... আর এ সবই শেষ হবে আগামী চার ঘণ্টার মধ্যে?

শ্রাগ করল ল্যাঙডন, আমি অন্য যে কোন পরামর্শ নিতে রাজি আছি।

রবার্ট ল্যাংডন আর্কাইভ ভল্ট নাইনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গাদা করে রাখা বইয়ের লেবেলগুলো খুটিয়ে পড়ছে।

ব্রাহে... ক্ল্যাভিয়াস... কোপার্নিকাস... কেপলার... নিউটন...

আরেকবার তালিকাটা পড়ে কেমন একটু অস্বস্তি জেঁকে বসতে দেখল সে নিজের মনে, এখানে সব বিজ্ঞানীর কথা উল্লেখ করা আছে, কিন্তু কোথায় গেল গ্যালিলিও?

সাথের আরেকটা ভল্টের লেখা চেক করতে থাকা ভিট্টোরিয়ার দিকে তাকাল সে, আমি পথটা পেয়ে গেছি, কিন্তু গ্যালিলিওর নাম-গন্ধও নেই কোথাও।

না, তিনি নিখোঁজ নন, বলল সে, তাকিয়ে আছে তার সামনের ভল্টটার দিকে, তিনি এখানে। তবে আশা করি তুমি একটা ভাল লুকিং গ্লাস এনেছ, কারণ এ পুরো ভল্টটায় তার নাম, পুরোটাই তার।

দৌড়ে চলে এল ল্যাংডন, ঠিক কথাই বলেছে ভিট্টোরিয়া, এই ভল্টের প্রতিটা ইন্ডিকেটরে একটা নামই ফুটে উঠছেঃ

এল প্রসেসো গ্যালিলিয়ানো

এবার হঠাৎ করে ল্যাংডন বুঝে ফেলল কেন গ্যালিলিওর নিজের জন্য মস্ত একটা ভল্ট বরাদ্দ করা হয়েছে। দ্য গ্যালিলিও এ্যাফেয়ার্স, বলল সে সামনে ঝুকে এসে, ভ্যাটিকানের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আইনি ধাক্কা। চোদ্দ বছরে কত শত কাজ! সবই এখানে গুটিয়ে রাখা।

কয়েকটা লিগ্যাল ডকুমেন্টও আছে।

আশা করি গত কয়েক শতাব্দিতে খুব বেশি বাগিয়ে নিতে পারেনি আইনজীবিরা।

হাঙররাও খুব বেশি খাবার পায়নি গত কয়েক শতাব্দিতে।

ল্যাংডন ভল্টটার পাশের বিশাল হলুদ একটা বাটনে চাপ দিল। এটায় চাপ দিতেই উপর থেকে আলোর বন্যা এসে ভাসিয়ে দিল চারপাশ। আলোর রঙ লাল চুনীর মত। ঝকঝকে, ভল্টটাকে রক্তে ভেসে যাওয়া একটা জীবন্ত কোষের মত দেখাচ্ছে, ভিতরের বইয়ের উঁচু উঁচু তাক আরো গভীরতা এনে দেয়।

মাই গড! চিৎকার করে উঠল ভিট্টোরিয়া, তুমি কি এখানে কাজ করার কথা ভাবছ?

পার্চমেন্ট আর ছেঁড়াখোড়া কাগজ খুজতে হবে।

খোঁজাখুজি করতে করতে পাগল না হয়ে যাও!

অথবা আরো খারাপ অবস্থা... ভাবে ল্যাংডন। ভল্টের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, অক্সিজেন কিন্তু অক্সিডেন্ট, আর ভল্টগুলোতে এ জিনিসটার তেমন উপস্থিতি নেই। ভিতরটা অনেক অংশে ভ্যাকুয়াম। তোমার শ্বাস কিন্তু ক্ষতিকর হতে পারে তোমার জন্য।

হেই, বৃদ্ধ কার্ডিনালরা যদি এখানে উৎরে যেতে পারে তাহলে আমার ভুলটা কোথায়?

হয়ত, ভাবল ল্যাংডন, আশা করি আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

ভল্টগুলোতে একটা করে রিভলভিং ডোর আছে, সেগুলো বাইরের পরিবেশের সাথে খুব দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এক মুহূর্তে এমনভাবে দরজাটা খুলে যায় যে বাইরে থেকে খুব বেশি বাতাস ভিতরে ঢুকতে পারে না। ভিতরটাকে সংরক্ষিত রাখার একটা উপায় বলা চলে।

আমি ভিতরে ঢুকে যাবার পর, বলল ল্যাংডন, তুমি বাটনটা টিপে দিয়ে আমার মত করবে, ব্যস। ভিতরের বাতাসে জলীয় বাষ্পের হার আট পার্সেন্ট। সুতরাং একটা খটখটে শুকনো মুখের জন্য প্রস্তুত হও।

ল্যাংডন ঘুরতে থাকা কম্পার্টমেন্টের বাটন চেপে ধরল। দরজা জোরে শব্দ করে ঘুরতে শুরু করেছে। ভিতরে প্রবেশ করেই সে একটা থাক্কা খেল, বেশ বড়সড় ধাক্কা। কোন মানুষকে সাগরপৃষ্ঠের উচ্চতা থেকে যদি এক মুহূর্তে বিশ হাজার ফুট উপরে তুলে নেয়া হয়

তাহলে লোকটার হাল যেমন হবে, ল্যাঙডনের অবস্থাও ঠিক তেমনি। মাথা ঘোরানো আর ফাঁকা ফাঁকা লাগার রোগটা নতুন নয়। এখানে অবাক হবার কিছু নেই। এমন হবেই। ডাবল ভিশন, ডাবল ওভার, মনে মনে আর্কাইভিস্টের শ্যেণদৃষ্টির মন্ত্র আউড়ে গেল সে। ল্যাঙডন টের পেল তার কানের পর্দায় চাপ নেই, টের পেল, পিছনে দরজাটা খুলে গেছে।

ভিতরে চলে এসেছে সে।

প্রথমেই যে কথাটা ল্যাঙডনের মনে পড়ল, তার অনুমানের চেয়ে বেশি পাতলা ভিতরের বাতাস। দেখে মনে হচ্ছে ভ্যাটিকান সর্বোচ্চরও কিছু বেশি যত্ন-আত্তি করছে ভল্টগুলোয় লুকিয়ে থাকা সম্পদগুলোর। ল্যাঙডন জোর করে শান্ত থাকল যখন তার শিরা-উপশিরা প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। কিন্তু এখানেই তার পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগল। দিনে পঞ্চাশ ল্যাপ সাঁতারের সুফল পাওয়া যাবে এখন। ভিতরে ঢোকো ডলফিন, বলল ল্যাঙডন নিজেকেই। অনেকটা ঠিকমত শ্বাস নিতে নিতে সে তাকাল চারদিকে, চোখ বোলাল। চারপাশে বইয়ের দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ করে তার মনে পড়ে গেল পুরনো ভয়টার কথা, মাথাচাড়া দিয়ে উঠল বিরক্তিকর অনুভূতি, আমি একটা বাক্সে বন্দি! ভাবল সে, আমি একটা রক্তলাল স্বচ্ছ প্রায় বায়ুহীন বাক্সে বন্দি!

তার পিছনে দরজা শব্দ করে উঠতেই পিছন ফিরে তাকাল ল্যাঙডন, ভিট্টোরিয়া প্রবেশ করছে। সাথে সাথে বড়বড় হয়ে গেল মেয়েটার চোখ, ভরে উঠল জলে। শ্বাস নিতে শুরু করল সে জোরে জোরে।

এক মিনিট সময় দাও, উপদেশ ঝাড়ল ল্যাঙডন, যদি মাথা ফাঁকা ফাঁকা লাগে তাহলে উবু হও একটু।

আমার... মনে হচ্ছে...খাবি খাচ্ছে ভিট্টোরিয়া, ডাঙায় তোলা মাছের মত, আমি যেন কোন... স্কুবা ডাইভিংয়ে... ভুল মিশ্রণ সহ...

মেয়েটার সয়ে নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ল্যাঙডন। সে জানে, সয়ে নিতে পারবে যোগ ব্যায়ামের ওস্তাদ মেয়েটা। কী চমৎকার গড়ন ওর! অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রশংসার দৃষ্টি চলে যায়, টলে যায় মন। সে এমন একটা মেয়েকে দেখেছিল আরেক আদ্যিকালের লাইব্রেরিতে। সেখানে পরে তার ভাগ্যে যে ভদ্রমহিলা জোটে তাকে এক কথায় বুড়ি বললেও কম বলা হবে। ল্যাঙডন নিশ্চিত তার দাঁতগুলোও কৃত্রিম, বাঁধানো।

এখন একটু ভাল লাগছে? প্রশ্ন করল সে।

নড করল ভিট্টোরিয়া।

আমি তোমাদের মরার প্লেনে চড়েছি, তাই আমি মনে করি তোমার মানিয়ে নিতে কষ্ট হবে না।

এ কথায় একটা হাসি উপচে পড়ল মেয়েটার ঠোঁট বেয়ে, উস্!

দরজার পাশের বাক্সের কাছে চলে গেল ল্যাঙডন, সেখান থেকে তুলে আনল কিছু কটন গ্লাভ।

এমনটাই করা উচিৎ? জিজ্ঞেস করল ভিট্টোরিয়া।

আঙুলের এসিড। এগুলো ছাড়া ডকুমেন্ট ধরা অনুচিৎ। তোমারও একজোড়া দরকার।

ভিট্টোরিয়াও নিয়ে নিল একজোড়া, হাতে কতটা সময় আছে?

ল্যাঙডন তার হাতের মিকি মাউস ঘড়ির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়, সাতটা বেজেছে একটু আগে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই জিনিসটা পেতে হবে আমাদের।

আসলে, বলল ল্যাঙডন, আমাদের হাতে সেটুকু সময়ও নেই। হাত তুলে দেখাল সে উপরে, সাধারণত কিউরেটর ঐ ডাক্টে করে বাড়তি অক্সিজেন পাঠায় ভিতরে কেউ থাকলে। আমরা এ অবস্থায় তার সহায়তা পাব বলে তো মনে হচ্ছে না। লোকটা ভ্যাটিকানে নেই। বিশ মিনিট। আর দেখতে হবে না। বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করবে ফুসফুস।

কথার ধাক্কা কোনমতে সয়ে নিল মেয়েটা।

একটু হেসে উঠল ল্যাংডন, হোক বা না হোক, মিস ভেট্রা, মিকি টিকটিক করছে।

বিবিসি অপারেটর গুন্থার গ্লিক সেলফোনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তুলে দেয়ার আগে ঝাড়া দশটা সেকেন্ড সে তাকিয়ে থাকল।

এদিকে ভ্যানের পিছন থেকে ক্রিস্টিনা ম্যাক্রি তাকিয়ে আছে তার দিকে, কে?

ঘুরে দাঁড়াল গ্লিক, তার দৃষ্টি অনেকটা বাচ্চা ছেলের মত, যে আশাও করেনি এমন মহা মূল্যবান ক্রিস্টমাস গিফট পাবে। আমি শুধু একটা সূত্র পেয়েছি, ভ্যাটিকানে কিছু একটা ঘটছে।

এর নাম কনক্লেভ, বলল মেয়েটা, সবজান্তার ভঙ্গিতে, হ্যালুভা টিপ।

না। এটুকু আমিও জানি। এরচেয়েয়ে বেশি কিছু আছে। বড় কিছু। সে এখনো খাবি খাচ্ছে, কলার যে কথাটা বলল সেটা সত্যি হবার সম্ভাবনা কতটুকু! বেশ লজ্জা পেল গ্লিক উপলব্ধি করে যে, সে কথাটার সত্যি হবার পক্ষে প্রার্থনা করছিল। আমি যদি তোমাকে বলি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারজন কার্ডিনাল আজ রাতে অপহৃত হয়েছে এবং মারা যেতে যাচ্ছে চারটে ভিন্ন চার্চে, তুমি কী বলবে?

আমি বলব যে তোমাকে নিয়ে অফিস থেকে কেউ বিশ্রী মানসিকতা নিয়ে মশকরা করছে।

যদি আমি বলি প্রথম কোথায় হত্যাকান্ডটা ঘটছে সেটাও বলে দেয়া হয়েছে আমাকে?

আমি জানতে চাই কোন চুলোয় কার সাথে তুমি এতক্ষণ কথা বললে।

নাম বলেনি সে।

কারণ হয়ত সে গোবর ভরা মাথা নিয়ে কথা বলেছে।

সাথে সাথে সত্যের একটু ধাক্কা খেল গ্লিক। তার মনে পড়ে গেল একটা দশক জুড়ে সে ব্রিটিশ টেটলার-এ পাগলাটে মানুষের ফোন কল এবং সরাসরি যোগাযোগে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল তার জীবন। কিন্তু এ কলারও যে তেমন তা ঠিক ভেবে উঠতে পারছে না সে। এই লোক তেমন কোন মোহগ্রস্থ কলার নয়। পূর্ণ সচেতন, ঠান্ডা, যুক্তিনির্ভর। আমি আপনাকে আটটার ঠিক আগে কল করব, বলেছিল সে, আর বলব ঠিক কোথায় প্রথম হত্যাকান্ডটা ঘটবে। যে ছবি তুলবেন আপনি সেগুলো আপনাকে এক মুহূর্তে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। যখন গ্লিক জিজ্ঞেস করেছিল কেন তাকে এগুলো বলা হচ্ছে তখন লোকটা বলে, তার মধ্যপ্রাচ্যের টান সহ, বরফ-শীতল কণ্ঠে, সাফল্যের ডানহাত হল মিডিয়া।

সে আমাকে আরো একটা কথা বলেছে, বলল সে।

কী? এলভিস প্রিসলি এইমাত্র পোপ নির্বাচিত হয়েছেন?

বিবিসি ডাটাবেসে ডায়াল কর, করবে কি তুমি? বলল গ্লিক, তেতে উঠছে সে মেয়েটার কথায়, এই লোকদের সম্পর্কে আর কী জানি আমরা সেটা জানতে হবে আমাকে।

কোন লোকদের সম্পর্কে?

আর কোন কথা জিজ্ঞেস করোনা আমাকে।

ম্যাক্রি সাথে সাথে বিবিসি ডাটাবেসে সংযোগ দিতে দিতে বলল, এক মিনিট সময় লাগবে।

গ্লিক ভাসছে কল্পনার জগতে, কলার আমাকে প্রশ্ন করেছিল আমার সাথে কোন ক্যামেরাম্যান আছে কি-না।

ভিডিওগ্রাফার।

আর আমরা সরাসরি সম্প্রচার করতে পারব কিনা।

এক দশমিক পাঁচ তিন সাত মেগাহার্টজ। কী নিয়ে এত ভোলপাড় পড়ে গেল? বিপ করল ডাটাবেজ, ওকে, ঢুকে গেছি আমরা, কার খোঁজ করছ তুমি?

একটা কি-ওয়ার্ড দিল গ্লিক তাকে।

সাথে সাথে চোখ বড় বড় করে ম্যাক্রি তার দিকে তাকাল, আশা করি তুমিও তামাশায় মেতে যাওনি!

আর্কাইভাল ভল্টের ভিতরকার স্থান চিহ্ন ল্যাঙডন যেমনটা আশা করেছিল তেমন নয়। তার উপর ডায়াগ্রামাকে গ্যালিলিওর আর সব রচনার সাথে এক লাইনে বসিয়ে রাখা হয়নি। বাইবেলিয় কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ঢুকে এখান থেকে বের না করে আর কোন উপায় দেখছে না তারা দুজন। চোখে দেখছে স্রেফ সর্ষে ফুল।

তুমি শিওর ডায়াগ্রামা এখানেই আছে? অবশেষে প্রশ্ন না করে পারল না মেয়েটা।

হ্যাঁ-বোধক। এখানে একটা জায়গা আছে যেখানে উফিসিও ডেলা প্রোপাগান্ডা ডেলা ফ্রেডে নামে একটা তালিকা আছে–

চমৎকার। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে ব্যাপারটার প্রমাণ থাকছে ততক্ষণ অব্দি।

ল্যাঙডন এবার ডান দিকের পথ ধরল। চলছে তার ম্যানুয়াল সার্চ। তাকে গতি বজায় রাখতে হবে, তাকাতে হবে তার চোখের সামনে পড়া সব লেখার দিকে, আর এই ভল্টের ঐশ্বর্যের কোন তুলনা নেই। হেন জিনিস নেই যা এখানে নেই। দ্য এ্যাসেয়ার... নাক্ষত্রিক সংবাদবাহী... সানস্পট বিষয়ক চিঠিপত্র... গ্র্যান্ড ডাচেস ক্রিস্টিনার কাছে পাঠানো পত্র... এ্যাপোলোজিয়া প্রো গ্যালিলিও... আরো এবং আরো।

অবশেষে সফল হল ভিট্টোরিয়াই, একপাশ থেকে হঠাৎ করে চিৎকার করে উঠল, ডায়াগ্রামা ডেলা ভেরিটা!

সাথে সাথে লাল আলোয় সামনে আসতে শুরু করল ল্যাঙডন, কোথায়?

ভিট্টোরিয়া আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল। সাথে সাথে বুঝতে পারল ল্যাঙডন, জিনিসটাকে বের করতে এত পরিশ্রম হবার কারন। জিনিসটা শেলফে ছিল না, ছিল একটা ফোলিও বিনে। না বাধা কাগজপত্র রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় ফোলিও বিন। কন্টেইনারটার গায়ে আঁটা লেবেল দেখে খুব সহজেই বলে দেয়া চলে কোন ভুল হয়নি।

ডায়াগ্রামা ডেলা ভেরিটা
গ্যালিলিও গ্যালিলি, ১৬৩৯

ল্যাঙডন নিচু করে ফেলল তার কনুই। ধ্বক ধ্বক করছে তার হৃদপিন্ড। ডায়াগ্রামা! কোনমতে একটা দুর্বল হাসি ম্যানেজ করতে পারল সে, এ বিন থেকে কাগজগুলো তুলে আনতে সাহায্য কর আমাকে।

ভিট্টোরিয়া নুয়ে এল তার কাছাকাছি। সামনেই বিনটার মধ্যে সাজানো আছে লেখাগুলো।

কোন লক নেই? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ভিট্টোরিয়া।

নেভার। ডকুমেন্টগুলোকে মাঝেমধ্যে হঠাৎ করে সরিয়ে আনতে হয়। আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে, সম্ভাবনা থাকে বন্যা হবার।

তাহলে এটাকে খোলা যাক।

ল্যাঙডনের মোটেও প্রয়োজন নেই বাড়তি কোন উৎসাহ-উদ্দীপনার। এমনিতেই সে টইটম্বুর। তার সারা ক্যারিয়ার জোড়া কাজের, স্বপ্নের সাকারত্ব দেখতে পাচ্ছে সে, অনুভব করছে, চোখের সামনে পাতলা হয়ে আসছে বাতাস। সেখানে, পাকানো কাগজের দলার ভিতরে এক ধরনের প্রিজার্ভেটিভ। কাগজটুকুকে বের করে আনল সে। পড়ে থাকল কালো প্রিজার্ভেটিভের বাক্সটা।

আমি বরং কোন রত্নের কৌটা আশা করেছিলাম এখানে। বলল ভিট্টোরিয়া।

ফলো মি! বলল ল্যাঙডন, তার হাতে ধরা ব্যাগটা, যেন অত্যন্ত প্রিয় কোন উপহার, অত্যন্ত পবিত্র, সংরক্ষিত, সে চলে গেল ভল্টের ঠিক মাঝখানটায়, যেখানে রাখা আছে আর্কাইভাল এক্সাম টেবিল। এটার কেন্দ্র থেকে চারদিক দিয়ে কাচ চলে গেছে। ছোট করেছে ভল্টের আয়তন। এতে অনেক সুবিধা, এক পাশের ডকুমেন্ট অন্য পাশে যেতে পারবে না, একপাশে ক্ষতিকর কোন কিছু হলে অন্যপাশে তার প্রতিক্রিয়া পড়বে না। সবচেয়ে বড় কথা, আবিষ্কারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোন স্কলারই চায় না তার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ আড়চোখে দেখে ফেলুক তার কাজ।

ল্যাঙডন পাউচটাকে বসিয়ে দেয় টেবিলের গায়ে। পাশে পাশে আছে ভিট্টোরিয়া সর্বক্ষণ। এগিয়ে গেল সে। খুলে ধরল ব্যাগের মুখ। কাঁপছে তার আঙুল, সুতি গ্লাভের ভিতরেই।

রিল্যাক্স, ফোড়ন কাটল ভিট্টোরিয়া, এটা কাগজের থলি, প্লুটোনিয়াম নয়।

কিন্তু তার কথায় দমে যাবার পাত্র নয় ল্যাঙডন, সে সম পরিমাণ সাবধানতা এবং দক্ষতার সাথে স্পর্শ করল ভিতরের কাগজগুলোকে, আলতো করে ধরল, যেন ভেঙে যায় একটুও। একজন আর্কাইভিস্টের দক্ষতায় সে কাগজটাকে ধরল। তারপর সেটাকে তুলে না এনে ব্যাগটাকেই নামিয়ে দিল নিচে। এ-ও আর্কাইভিস্টের কায়দায়। তারপর কাজটা শেষ করতে না করতেই হাঁপাতে শুরু করল সে।

কাগজগুলোকে খতিয়ে দেখার জন্য স্থাপন করল সে এক্সাম টেবিলে। তার পাশ থেকে এবার ভিট্টোরিয়া কথা বলে উঠল, ছোট ছোট কাগজের দলা।

নড করল ল্যাঙডন। তাদের সামনের কাগজের দলাটাকে দেখে মনে হতে পারে কোন পেপারব্যাক থেকে ছিড়েখুড়ে আনা হয়েছে ভঙ্গুর কয়েকটা পাতা। সে দেখতে পেল সেখানে কাগজ আর কলমের চিহ্ন আছে, আছে গ্যালিলিওর নিজের হাতে করা স্বাক্ষর।

এক মুহূর্তেই ল্যাঙডন যেন অন্য ভুবনে চলে গেল, ভুলে গেল যে তারা এখন জীবন-মরণের ঠিক মাঝখানে বসবাস করছে, ভুলে গেল স্থান-কাল-পাত্রের কথা। নির্জলা বিস্ময় নিয়ে সে শুধু চেয়ে আছে কাগজগুলোর দিকে। মোনালিসায় ব্রাশের টানের ক্ষেত্রে কোন বিশেষজ্ঞ যেমন সাবধানতা অবলম্বন করবে তেমন যত্ন এখন ল্যাঙডনের হাতে...।

হাতে ধরা বিবর্ণ হলদে প্যাপিরাসগুলোর আসল হবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, পাতাগুলোর হাল একেবারে সুন্দর। রঙে একটু বিচ্যুতি আছে, সূর্যে নেয়ে ওঠা কাগজের একটা ভাব আছে, তারপরও, এত ভাল অবস্থা আশাও করা যায় না।

তার মুখমন্ডল একটু ঘেমে উঠছে, কেঁপে উঠছে কিছুটা। আর বোবা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে ভিট্টোরিয়া।

একটা স্পাটুলা এগিয়ে দাও, প্লিজ। বলল ল্যাঙডন। সাথে সাথে পাশে থাকা স্টেইনলেস স্টিল আর্কাইভাল টুল থেকে একটা তুলে আনল ভিট্টোরিয়া। দিল তার হাতে। সে খুব সাবধানতার সাথে সেটা দিয়ে খুলল কাগজের ভাঁজ, তার আগে হাত দিয়ে টুলটার গা থেকে সম্ভাব্য ময়লা ঝেড়ে নিয়েছে।

একটু অবাক হয়েই সে টানা টানা লেখার প্রথম পৃষ্ঠার দিকে নজর দিল। সেখানে ছোট ছোট ক্যালিগ্রাফিক লেখাও আছে যেগুলো দেখে কোন মানে বোঝা যায় না। এখানে কোন গাণিতিক হিসাব নেই, নেই কোন ডায়াগ্রাম, একটা নির্জলা একটা রচনা।

হেলিওসেন্ট্রিসিটি, সূর্যকেন্দ্রিকতা। বলল ভিট্টোরিয়া, ফোলিও ওয়ানের হেডলাইনটাকে অনুবাদ করে। দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবী কেন্দ্রিকতার পক্ষে সাফাই গেয়েছেন এখানে গ্যালিলিও। পুরনোদিনের ইতালিয়ান, পড়া কষ্টকর। অনুবাদ করা আরো গলদঘর্ম হয়ে যাবার মত কাজ।

ভুলে যাও, যেন কিছুই এসে যায় না ল্যাঙডনের, আমরা গণিতের খোঁজ করছি। দ্য পিওর ল্যাঙ্গুয়েজ। পরের পাতাটা খোলার জন্য সে টুলটাকে ব্যবহার করল। আরো এক রচনা। নেই কোন অঙ্ক, নেই কোন নকশা। দস্তানার ভিতরে ঘেমে নেয়ে উঠছে ল্যাঙডনের হাত।

গ্রহগুলোর গতিবিধি, এবারও অনুবাদ করে দিল ভিট্টোরিয়া।

আর যে কোন দিন হলে প্রাণপাত করে হলেও ল্যাঙডন খুঁটিয়ে পড়ত পুরো বইটা, এতোদিন পরে নাসার গ্রহ-অবস্থিতি বিষয়ক চূড়ান্ত গবেষণায় যে কথা উঠে আসছে সেটার শুরু এখান থেকেই। কিন্তু আজ সময় নেই হাতে।

নো ম্যাথ। অবশেষে বলল ভিট্টোরিয়া, তিনি কথা বলছেন গ্রহগতিবিদ্যা আর ডিম্বাকার কক্ষপথ টাইপের বিষয় নিয়ে।

ডিম্বাকার কক্ষপথ! মনে আছে ল্যাঙডনের, গ্যালিলিও মহা বিপাকে পড়ে যান গ্রহের ডিম্বাকার পরিভ্রমণ পথ বাৎলে দেবার পরই। উঁহু, ভ্যাটিকান সায় দিচ্ছে না। ভ্যাটিকান বলছে, গ্রহগুলোর পথ একেবারে নিখুঁত, গোলাকার। ডিম্বাকার হতেই পারে না। কিন্তু গ্যালিলিওর ইলুমিনেটি তার কথা মেনে নিয়েছে। অক্ষরে অক্ষরে। ইলুমিনেটির ডিম্বাকার পথ আজো বিখ্যাত। আজকের মেসনিক লেখাগুলোতে, প্যাডে বা চিহ্নে সেই ডিম্বাকার পথের প্রমাণ মিলে যায়।

পরেরটা। বলল ভিট্টোরিয়া।

সাথে সাথে উল্টে দিল ল্যাঙডন।

চন্দ্রকলা ও জোয়ার-ভাটা। বলল সে, কোন সংখ্যা নেই। নেই কোন ডায়াগ্রাম।

আবার উল্টাল ল্যাঙডন। কিছুই নেই। আরো প্রায় ডজনখানেক পাতা উল্টে গেল সে সাথে সাথে। নেই। নেই। নেই।

আমি মনে করেছিলাম এ লোক গণিতবিদ ছিলেন,হতাশ সুরে বলল ভিট্টোরিয়া, এখানে অঙ্কের কোন নাম-নিশানাও নেই।

টের পাচ্ছে ল্যাঙডন, তার ভিতরের বাতাস আস্তে ধীরে পাতলা হয়ে আসছে। পাতলা হয়ে আসছে আশা। চিড় ধরছে বিশ্বাসের গায়ে।

এখানে কি নেই। অবশেষে সিদ্ধান্ত দেয়ার সুরে বলল ভিট্টোরিয়া, কোন গণিত নেই। কয়েকটা তারিখ, কয়েকটা স্ট্যান্ডার্ড ফিগার, কিন্তু কোনটা দেখেই মনে হয় না যে সেখানে কোন ক্লু আছে।

পরের পাতা উল্টে নিল ল্যাঙডন। ছাড়ল একটা দীর্ঘশ্বাস। এটাও রচনা। শেষ পাতা।

একেবারে ছোট বই। বলল ভিট্টোরিয়া।

নড করল ল্যাঙডন।

মার্ডা, আমরা রোমে এ নামেই এগুলোকে ডাকি।

হাবিজাবি বলল ল্যাঙডন মনে মনে। তাকিয়ে আছে কাঁচের দিকে। তার মন মেনে নিতে পারছে না। কোন না কোন সূত্র থাকবেই থাকবে, বলল সে অবশেষে। এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে সেই সাইনো। আমি নিশ্চিত।

হয়ত ভিআই আই আই এর ব্যাপারে তোমার কোন ভুল হয়েছে নাকি?

লিঙ্গুয়া পিউরা। আর কী হতে পারে এর মানে?

আর্ট?

এখানে তো কোন ডায়াগ্রাম বা ছবি নেই।

যদ্দূর বোঝা যাচ্ছে, লিঙ্গুয়া পিউরা বলতে ইতালিয় বাদে অন্য কোন ভাষা বোঝানো হচ্ছে। এটুকু বোঝা যায় সহজেই।

আমিও তোমার সাথে একমত।

কিন্তু সহজে মেনে নেবার পাত্র নয় ল্যাঙডন, নাম্বারগুলো অবশ্যই লেখা আছে। গণিত নিশ্চয়ই ইকুয়েশনের বদলে শব্দে লেখা আছে। আমি নিশ্চিত।

সাথে সাথে বলল ভিট্টোরিয়া, সবগুলো পাতা খুটিয়ে দেখতে অনেক সময় লাগবে। অন্তত আমাদের হাতে থাকা সময়ের তুলনায় অনেক।

এই সময়টারই অভাব আছে আমাদের। কাজ ভাগ করে নিতে হবে। আর কোন গত্যান্তর নেই। সাথে সাথে উল্টে নিল ল্যাঙডন পাতাগুলো, সংখ্যা খুঁজে বের করার মত ইতালিয় আমার জানা আছে। কার্ডের মত করে সে দু ভাগ করে ফেলল পাতাগুলোকে, তারপর এগিয়ে দিল ভিট্টোরিয়ার দিকে অর্ধেকটা। আমি নিশ্চিত, এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে আমাদের লক্ষ্য।

ভিট্টোরিয়া হাত বাড়িয়ে নিল তার পাতা। তারপর সেটায় দৃষ্টি দিল।

স্প্যাটুলা! চিৎকার করে উঠল ল্যাঙডন সাথে সাথে, হাতে ধরো না। স্প্যাটুলা ব্যবহার কর।

আমার হাতে গ্লাভ পরা আছে। সতেজে জবাব দিল ভিট্রোরিয়া, কতটা ক্ষতি করতে পারব আমি?

যা বললাম কর। অবশেষে মেয়েটা তুলে নিল স্প্যাটুলা, তুমিও কি আমার মত অনুভব করছ? টেনশন?

না। দমের অভাব।

অবশ্যই, ল্যাঙডন অতিমানব নয় যে দমের অভাব বোধ করবে না। তার কল্পনার চেয়েও দ্রুত পাতলা হয়ে যাচ্ছে বাতাস। তারা জানে তাদের তড়িঘড়ি করতে হবে। আর্কাইভের এই হালের সাথে সে মোটেও অপরিচিত নয়। কিন্তু এ অবস্থা অনাকাঙ্ক্ষিত। আর একটুও বাক্যব্যয় না করে সে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুভুক্ষুর মত।

দেখা দাও! ড্যাম ইট! দেখা দাও!

৫৩

আণ্ডারগ্রাউন্ড টানেলে, রোমের কোন এক জায়গায় একটা কালো অবয়ব হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে। আদ্যিকালের প্যাসেজওয়েয়ের গুমোট বাতাস হাপ ধরিয়ে দেয়। টর্চের আলোয় যেন আরো ভারি হয়ে যাচ্ছে। উপরে, ভয় পাওয়া কণ্ঠস্বরের কথা ধ্বণিত প্রতিদ্ধণিত হচ্ছে বৃথাই।

কোণা ঘুরে সে তাদের দেখতে পায়। ঠিক যেভাবে ফেলে রেখে গিয়েছিল সেভাবেই। চারজন বুড়ো লোক, একটা পুরনো পাথরের গায়ে শিকল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে তাদের।

কুই এ্যাটেস ভোয়াস? তাদের একজন ফ্রেঞ্চে দাবি করল, আমাদের নিয়ে কী করতে চাও তুমি?

হিলফে! আরেক কণ্ঠ বলল, যেতে দাও আমাদের!

আমরা কারা সে সম্পর্কে তোমার কি বিন্দুমাত্র জ্ঞান আছে? আরেকজন স্প্যানিশ টান সহ ইংরেজিতে বলল।

নিরবতা! ভারি কণ্ঠ একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল। এর উপরে আর কোন শব্দের গুঞ্জন নেই।

চার বন্দির একজন, ইতালিয়, গভীর চোখে তাদের অপহরণকারীর দিকে তাকাল, তার সারা গা শিরশির করে উঠল, কী যেন দেখতে পেল সে সেখানে। গড হেল্প আস। বলল সে মনে মনে।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল লোকটা, তারপর চোখ ফেলল তার বন্দিদের দিকে। সে বলল সময় চলে এসেছে, কে আগে যাবে?

আর্কাইভাল ভল্টের ভিতরে সামনের ক্যালিগ্রাফির দিকে তাকিয়ে রবার্ট ল্যাঙডন

বুঝতে পারলে সেখানে সংখ্যা আছে। মিল... সেন্ট্রি... উন, দিয়ে, ত্রে... সিঙ্কোয়ান্তা। আমার একটা গাণিতিক রেফারেন্স দরকার, যে রকমই হোক না কেন, একটা গানিতিক রেফারেন্স!

একের পর এক পাতা পড়ে যেতে শুরু করেছে সে। হাতে ধরা স্প্যাটুলার সাথে সাথে হাতও কাঁপছে তার, থরথর করে। একটু পরে সে টের পায়, স্পাটুলাটা সরিয়ে রেখেছে সে। উল্টাচ্ছে পাতা হাত দিয়েই। উপস! ভাবল সে। অক্সিজেনের অভাব কী ভয়ংকর একটা ব্যাপার। বোধবুদ্ধির লয় আসে যে কোন সময়। দেখে মনে হচ্ছে আমি আর্কাইভিস্টদের নরকে জ্বলেপুড়ে মরব।

সময় বয়ে যাচ্ছে? বলল ভিট্টোরিয়া, তারপর তাকাল ল্যাঙডনের হাতের দিকে। মহোৎসাহে সেও সমান তালে হাত দিয়ে পাতা উল্টানো শুরু করল সাথে সাথে।

ভাগ্যের দেখা?

মাথা নাড়ল ভিট্টোরিয়া, কোন লেখা দেখে বোঝার উপায় নেই ম্যাথমেটিকাল কোন ক্লু আছে কিনা।

বাড়তে থাকা জটিলতার সাথে হাতের পাতাগুলো উল্টে যাচ্ছে ল্যাঙডন। এমনিতেই ল্যাঙডনের ইতালিয় জ্ঞান আধপোড়া, তার উপর প্রাচীণ ভাষা আরো বেশি তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে। ল্যাঙডনের অনেক আগেই ভিট্টোরিয়া তার ভাগের পাতাগুলো উল্টে পাল্টে দেখা শেষ করেছে। এবার সে একটা হতাশা ভরা দৃষ্টি দিল ল্যাঙডনের দিকে। তারপর আবার দেখা শুরু করল আগের পাতাগুলোই।

শেষ পাতা শেষ করে ল্যাঙডন কষে একটা গালি ঝেড়ে তাকাল ভিট্টোরিয়ার দিকে। বেচারি তার পাতার দিকে একটু অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

কী? জিজ্ঞেস করল ল্যাঙডন।

জবাব দিল না ভিট্টোরিয়া, বরং প্রশ্ন করল, তোমার পাতায় কোন ফুটনোট পেয়েছ নাকি?

মনে হয় না। কেন?

এ পাতায় একটা পাদটিকা আছে। দেখে একটু খটকা লাগে।

সাথে সাথে এগিয়ে এল ল্যাঙডন, ভিট্টোরিয়ার ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকাল সামনে। প্রথম প্রথম সে কিছুই দেখতে পায় না, দেখল শুধু পাতা নং-৫, তারপর আরো খেয়াল দিতে দিয়ে সে একটু ভিরমি খেল। ফোলিও ফাইভ, ফাইভ, পিথাগোরাস, পেন্টাগ্রাম, ইলুমিনেটি। ভেবে পায় না ল্যাঙডন, ইলুমিনেটি কি পাঁচ নম্বর পাতাকে তাদের লুকিয়ে থাকার সূত্র হিসাবে উপস্থাপিত করেছে? আশপাশের লালচে ধোঁয়াশায় একটু আশার আলো দেখতে পায় সে। ফুটনোট কি গাণিতিক?।

মাথা নাড়ল ভিট্টোরিয়া, টেক্সট। একটাই লাইন। খুবই ছোট প্রিন্টিং, দেখে প্রায় বোঝাই যায় না।

আশা আরো মিইয়ে গেল, কিন্তু এটা গাণিতিকভাবে থাকার কথা। লিঙ্গুয়া পিউরা।

জানি, আমি জানি। বলল মেয়েটা, তবু আমার মনে হয় কথাটার অর্থ তুমি জানতে চাইবে। কী একটা আভাস যেন তার কণ্ঠে।

পড়ে যাও।

সাথে সাথে ভিট্টোরিয়া পড়ে ফেলল লাইনটাকে, আলোক-পথ পড়ে আছে, পবিত্র পরীক্ষা।

কথাগুলোর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝে উঠতে পারল না যেন ল্যাঙডন, আই এ্যাম স্যরি?

আলোক-পথ পড়ে আছে, পবিত্র পরীক্ষা।

আলোক-পথ?

ঠিক তাই, আলোক-পথ।

এক মুহূর্তে যেন ডুবে গেল ল্যাঙডন কোন অতলে, আলোক-পথ পড়ে আছে, পবিত্র পরীক্ষা! সে বুঝে উঠতে পারে না কীভাবে ব্যাপারটাকে নেবে, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারে, এখানে সরাসরি ইলুমিনেটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলোক-পথ পড়ে আছে, পবিত্র পরীক্ষা! মাথাটা যেন ভুল জ্বালানি দেয়া কোন ইঞ্জিন। তুমি নিশ্চিত, অনুবাদে কোন ভুল হয়নি?

একটু ইতস্তত করে ভিট্টোরিয়া, আসলে... একটা অদ্ভুত নজর দিয়ে তাকায় সে ল্যাঙডনের দিকে, টেকনিক্যালি বলতে গেলে, এটা ঠিক ভাষান্তর নয়। লাইনটা লেখা আছে ইংরেজিতে!

সাথে সাথে ঠান্ডা হয়ে এল ল্যাঙডনের ভিতরটা। কেঁপে গেল অন্তরাত্মা, ইংরেজি?

ঠেলে দিল ভিট্টোরিয়া লেখাটা তার দিকে। আর সাথে সাথে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ল্যাঙডন সেটার উপরে। আলোক-পথ পড়ে আছে, পবিত্র পরীক্ষা। ইংরেজি! কিন্তু একটা ইতালিয় বইতে ইংরেজি আসছে কোন দুঃখে?

শ্রাগ করল ভিট্টোরিয়া। তার চোখমুখেও দ্বিধা। হয়ত কারোমতে ইংরেজিই লিঙ্গুয়া পিউরা! আজকের দিনে আমরা এ ভাষাটাকেই বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে অভিহিত করি। অন্তত সার্নে।

কিন্তু এটা কোন কথা হল, বল? যুক্তি দেখাচ্ছে ভিট্টোরিয়া, আলোক-পথ পড়ে আছে, পবিত্র পরীক্ষা! এই মরার কথা কোন মানে দেখায় বল?

তার কথা ঠিক, ভাবল ল্যাঙডন। কোন মানে এখন আপাতত বোঝা যাচ্ছে না। তারপরও, তোলপাড় চলছে তার মনে। ব্যাপারটা বেখাপ্পা, ভাবছে সে, এ কথা দিয়ে কী বোঝা যাবে?

আমাদের এখান থেকে পাততাড়ি গুটাতে হবে। বলল ভিট্টোরিয়া, তাড়াতাড়ি!

কান দিল না তার কথায় ল্যাঙডন। তার তনুমন এখন একটা চিন্তায় মশগুল, আলোক-পথ পড়ে আছে, পবিত্র পরীক্ষা। এটা ইম্বিক পেন্টামিটারের লাইন নয়তো? সে বলল হঠাৎ করে, তারপর বলতেই থাকল, সিলেবল্ নিয়ে খেলা। একবার একভাবে পড়া তো আরেকবার আরেকভাবে পড়া।

জিজ্ঞেস করল ভিট্টোরিয়া, কী বলছ?

ফিলিপ এক্সটারের একাডেমি অব ইংলিশের কথা এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল ল্যাঙডনের। শেক্সপিয়রের লিম্বিক পেন্টামিটারের একটা লাইন নিয়ে হাবুডুবু খাওয়া স্কুল বেসবলের তারকা পিটার গ্রির সারাক্ষণ নাকাল হত। তাদের প্রফেসর, একজন পটে আকা আদর্শ স্কুলমাস্টার, বলতেন, পেন্টা-মিটার, গ্রির! বড়ির প্লেটের কথা একবার ভাব। একটা পেন্টাগন। পাঁচটা পাশ, পেন্টা! পেন্টা! পেন্টা! পেন্টা! হায় ভগবান!

পাঁচটা কুপলেট, আর প্রতিটায় দুটো করে সিলেবল। সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে যে, সে তার পুরো ক্যারিয়ার জুড়ে এমন সব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করে কাটিয়েছে। লিম্বিক পেন্টামিটারের সাথে ইলুমিনেটির মিল আছে। ইলুমিনেটির বেসও পাঁচ আর দুই!

এইতো, হচ্ছে! জোরে জোরে ভাবা শুরু করল ল্যাঙডন, সরিয়ে দিতে চাইছে মন থেকে। কী যেন খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। পাঁচ, পিথাগোরাস আর পেন্টাথলনের চিহ্ন দুই, জগতের সব কিছুর বৈপরীত্যের। জোড়ার চিহ্ন।

আর এক মুহূর্তে বাকি কথাটাও তার ভিতরে উদিত হল। পিওর ভার্স, পিওর ল্যাঙ্গুয়েজ, লা লিঙ্গুয়া পিউরা। এই কথাটাই কি বোঝাতে চায় ইলুমিনেটি? আলোক পথ পড়ে আছে, পবিত্র পরীক্ষা...

ওহ! না! বলল ভিট্টোরিয়া।

না। এটার দ্বিমুখী লেখা হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এ্যাম্বিগ্রাম নয় এটা।

না। এটা এ্যাম্বিগ্রাম নয়, কিন্তু, এটা... কথা শেষ না করেই লেখাটিকে ঘোরাতে শুরু করে নব্বই ডিগ্রি করে।

এটা কী?

চোখ তুলে তাকাল ভিট্টোরিয়া, এটাই একমাত্র লাইন নয়।

আরো একটা আছে?

প্রত্যেক মার্জিনে একটা করে লাইন আছে। উপরে, নিচে, বামে, ডানে। আমার মনে হয় এটা কোন কবিতা।

চার লাইনের? বিষম খেল ল্যাঙডন, আমাকে দেখতে দাও, গ্যালিলিও কবি ছিলেন!

কিন্তু তার দিকে এগিয়ে দিল না ভিট্টোরিয়া পাতাগুলো। আমি লেখাগুলো আগে দেখিনি কারণ এগুলো মার্জিনের কাছে বসে আছে। আর এগুলোর আকার একেবারে ক্ষুদে। একটা কথা জান? গ্যালিলিও কথাগুলো লেখেননি।

কী?

এখানে যে কবির স্বাক্ষর আছে নাম তার জন মিল্টন।

জন মিল্টন? সেই বিখ্যাত ইংরেজ কবি, যিনি প্যারাডাইস লস্টের মত বিখ্যাত লেখার রচয়িতা। তিনিও গ্যালিলিওর সমসাময়িক, তিনিও গ্যালিলিওর সাথে দেখা করেছেন, তাদের মধ্যে কোন প্রকার আঁতাত থাকা বিচিত্র কিছু নয়। সবাই জানে, জন মিল্টন ষোলশ আটত্রিশে রোমে একটা তীর্থযাত্রা করেন, আলোকিত মানুষদের সাথে দেখা করার জন্য। তিনি এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর বাড়িতে দেখা করেন, তার গৃহবন্দি থাকার সময়টায়। সেখানে তারা আলো নিয়ে আলোচনা করেন, আলোচনা করেন জ্ঞান নিয়ে, পৃথিবীর রেনেসার দুই দিকপাল। তাদের এ দেখা করা নিয়েও অনেক শিল্পকর্মের জন্ম হয়েছে। এ্যানিব্যাল গ্যাটির গ্যালিলিও গ্র্যান্ড মিল্টন এমনি এক বিখ্যাত চিত্র। ফ্লোরেন্সের আই এম এস এস জাদুঘরে আজো সেই ছবি শোভা পায়।

মিল্টন গ্যালিলিওকে চিনতেন, তাই না? বলল ভিট্টোরিয়া, হয়ত তিনি গ্যালিলিওর খাতিরে কবিতাটা লিখে দিয়েছেন।

এবার হাতে তুলে নিল ভিট্টোরিয়ার হাত থেকে কাগজটাকে, তারপর দেখল সবচেয়ে আগের লাইনটা, তারপর একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আরেকপাশের লেখা, তারপর আবার, তারপর আবার। চক্র পূর্ণ হয়েছে। প্রথম লাইনটা ভিট্টোরিয়া পড়ল, আসলে সেটা কবিতার তৃতীয় লাইন। এবার ল্যাঙডন আবার লেখাটা পড়তে শুরু করল। ঘড়ির কাঁটার দিকে। উপর-ডান-নিচ-বাম। যখন সে পড়াটা শেষ করল, দম বন্ধ হয়ে এল তার। আপনি পেরেছেন, মিস ভেট্রা।

হাসল মেয়েটা, প্রাণখোলা হাসি, দারুণ, এবার কি আমরা এই নরক থেকে বেরুতে পারি?

আমার এই লাইনগুলো কপি করতে হবে। একটা পেন্সিল আর কাগজ পেতে হবে।

মাথা নাড়ল ভিট্টোরিয়া, ভুলে যাও, প্রফেসর। খেলার মত কোন সময় হাতে নেই। মিকি টিকটিক করছে। তার হাত থেকে ছোঁ মেরে কাগজটুকু তুলে নিয়েই সে রওনা হল দরজার দিকে।

দাঁড়িয়ে থাকল ল্যাঙডন, তুমি এটাকে বাইরে নিয়ে যেতে পার না। এটা—

কিন্তু বেরিয়ে গেল ভিট্টোরিয়া।

ল্যাঙডন আর ভিট্টোরিয়া পবিত্র আর্কাইভের বাইরে বেরিয়ে এল। ল্যাঙডনের ফুসফুস ভরে দিচ্ছে পরিচ্ছন্ন বাতাস। নির্মল বাতাসের যেন কোন তুলনা নেই। সে পৃথিবীর সবচেয়ে গোপনীয় ভল্ট থেকে বেরিয়ে এল। ক্যামারলেনগো বলেছিল, আমি আপনাকে আমার বিশ্বাস দিয়ে দিচ্ছি।

তাড়াতাড়ি, বলল ভিট্টোরিয়া, ওলিভেট্টির অফিসের দিকে তার দৃষ্টি।

যদি এক বিন্দু জল ঐ প্যাপিরাসে পড়ে ....

শান্ত হও। আমরা এর ব্যবচ্ছেদ করে ফেললে তারপর যত্ন-আত্তি করে তাদের পবিত্র ফোলিও পাঁচ ফিরিয়ে দিতে পারব।

গতি বাড়িয়ে দিল ল্যাঙডন। তার চলায় আসল আরো দ্রুতি। কিন্তু একটা ব্যাপার সে মোটেও ভুলতে পারছে না। জন মিল্টন একজন ইলুমিনেটি ছিলেন। তিনি ফোলিও পাঁচ প্রকাশ করার জন্য একটা কবিতা লিখেছেন... ভ্যাটিকানের চোখের আড়ালে।

বাইরে বেরিয়েই ভিট্টোরিয়া ফোড়ন কাটল, তুমি কি মনে কর এটা ডিসাইফার করার তোমার কম্ম? নাকি এতটা সময় আমরা উলুবনে মুক্তো ছড়ালাম?

ল্যাঙডন যত্ন করে কাগজটা তুলে নিল ভিট্টোরিয়ার হাত থেকে। তারপর সেটাকে নির্দ্বিধায় পুরে ফেলল টুইড জ্যাকেটের পকেটে, সূর্যের আলো আর আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করতে। আমি এরই মধ্যে এটাকে ডিসাইফার করে ফেলেছি।

সাথে সাথে থমকে গেল ভিট্টোরিয়া, তুমি কী করেছ?

কিন্তু থামল না ল্যাঙডন।

হাল ছাড়ার পাত্রী নয় ভিট্টোরিয়া, তুমি মাত্র একবার পড়েছ এটা। আর তাতেই হয়ে গেল? এটার জটিল হবার কথা।

ল্যাঙডন জানে, মেয়েটার কথাই সত্যি হবার কথা। কিন্তু তার পরও, সে কীভাবে কীভাবে যেন একবার পড়েই এটার কোড ভেঙে ফেলেছে। এখনো তার মনে পড়ে যায় পুরনোদিনের একটা কথাঃ যদি সমাধানটা যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন না হয়, তাহলে বুঝতে হবে তুমি ভুল করেছ।

আমি ডিসাইফার করেছি এটাকে। চলার গতি বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, আমি জানি প্রথম হত্যাকান্ডটা কোথায় হবে। ওলিভেট্টির কাছে পৌঁছতে হবে যে করেই হোক।

আরো কাছে চলে এল ভিট্টোরিয়া, তুমি এরই মধ্যে জেনে গেলে কী করে? আরেকবার জিনিসটাকে দেখতে দাও। বক্সারের দক্ষতায় মেয়েটা তার জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল কাগজটাকে।

সাবধান, বলল ল্যাঙডন, তুমি...

ওর কথায়থোড়াই পরোয়া করে ভিট্টোরিয়া। ফোলিওটাকে হাতে নিয়ে সে যেন ল্যাঙডনের পাশে পাশে উড়ছে, আলতো হাতে ধরে রেখেছে সেটাকে, বিকালের সূর্যের শেষ আলোয়। তাকিয়ে আছে মার্জিনগুলোর দিকে। মেয়েটা জোরে জোরে পড়া শুরু করতেই ল্যাঙডন তার দিকে হাত বাড়িয়ে ছোঁ মারল। কিন্তু তার বদলে একটা মুখ ঝামটা দিয়ে ফিরিয়ে দিল তাকে ভিট্টোরিয়া। তার কণ্ঠ চিরে শব্দগুলো এখন বিমূর্ত হয়ে উঠছে।

এক মুহূর্তের জন্য, শব্দগুলো শুনতে পেয়ে বিবশ হয়ে পড়ে ল্যাঙডন, যেন সময়ের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করা শুরু হল... যেন সেও গ্যালিলিওর গুপ্ত সভার সভ্য, প্রথমবারের মত ঐশীবাণীর মত এই কবিতা শুনতে পাচ্ছে... যেন সে জানে, এটা একটা সূত্র, একটা ম্যাপ, বিজ্ঞানের চার প্রতীকের চিহ্ন, চিহ্ন চতুষ্টয়... এই চারটে প্রতীক রোমে ছড়িয়ে আছে, বাতলে দিচ্ছে রোমের ভিতর থেকে ইলুমিনেটিতে যাবার গুপ্ত দ্বারের কথা। ভিট্টোরিয়ার ঠোঁট থেকে গানের সুরে বেরিয়ে আসতে লাগল কথাগুলোঃ

ফ্রম শানজি'স আর্থি টম্ব উইথ ডেমনস্ হোল,
ক্রস রোম দ্য মিস্টিক এলিমেন্টস আনফোল্ড।

দ্য পাথ অব লাইট ইজ লেইড, দ্য সেক্রেড টেস্ট,
লেট এ্যাঞ্জেলস গাইড ইউ অন ইউর লফটি কোয়েস্ট।

ভিট্রোরিয়া পরপর দুবার লেখাগুলো পড়ে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল।

মনে মনে আউড়ে নিল ল্যাংডন, ফ্রম শানজি'স আর্থি টম্ব উইথ ডেমন হোল, এই একটা ব্যাপারে কবিতা স্ফটিক-স্বচ্ছ। পাথ অব ইলুমিনেশনের শুরু হয়েছে শানজির মাজারে। সেখান থেকে, এ্যাক্রস রোম, পথ বলে দিতে দ্বিধা করেননি মিল্টন।

ফ্রম শানজি'স আর্থি টম্ব উইথ ডেমনস্ হোল,
ক্রস রোম দ্য মিস্টিক এলিমেন্টস আনফোল্ড।

রহস্যময় এলিমেন্ট। তারপরও, পরিষ্কার। ও আর্থ-এয়ার-ফায়ার-ওয়াটার। বিজ্ঞানের চার এলিমেন্ট। প্রাচীণ বিজ্ঞানের চার মূলমন্ত্র। চার মৌলিক পদার্থ। ধর্মের ছদ্মাবরণে ইলুমিনেটির চার প্রতীক প্রায় প্রকাশ্যেই লুকিয়ে আছে।

প্রথম মার্কারটা, বলল ভিট্রোরিয়া, দেখে মনে হচ্ছে এটা শানজি'স টম্বে আছে।

হাসল ল্যাংডন, বলেছি না আমি তোমাকে? ব্যাপারটা তেমন জটিল কিছু নয়।

তো? শানজি-টা কে? ভিট্রোরিয়া জিজ্ঞেস করল, যেন ল্যাংডন সবজান্তা, আর তার টম্বেটাই বা কোথায়?

নিজে নিজে মুচকে হাসল ল্যাংডন। সে ভেবে বেশ পুলকিত হয়, সাধারণ মানুষ শানজি বলতে কাউকে চেনে না। অথচ এটা রেনেসার আমলের সবচেয়ে দামি শিল্পীদের মধ্যে একজনের নামের দ্বিতীয় অংশ... এমন এক লোক যিনি মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের জন্য কাজ করা শুরু করেছিলেন। আর আটত্রিশ বছর বয়সে যখন তিনি মারা যান, তার কাজের মধ্যে ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফ্রোস্কোগুলো। আর প্রথম নাম দিয়ে পরিচিতি পাওয়া খুবই দুর্লভ একটা ব্যাপার, তার অধিকারী হয়েছিলেন নেপোলিয়ান, গ্যালিলিও আর যিশুর মত ব্যক্তিত্বরা। এ লোকের চিহ্ন, যাকে টাও ক্রস বলা হয়, সেটাও কম বিখ্যাত নয়। SHAPE * MERGEFORMAT

টাও ক্রস। এর সাথে কৌতুহলোদ্দীপক চিহ্নও আছে।

শানজি, বলল সে অবশেষে, হল মহান রেনেসাঁ আর্টিস্ট রাফায়েলের শেষ নাম।

চোখ তুলে তাকাল দ্বিধান্বিত ভিট্রোরিয়া, শানজি? রাফায়েল? সেই রাফায়েল?।

ওয়ান এ্যান্ড ওনলি রাফায়েল। প্রায় উড়ে চলেছে ল্যাংডন সুইস গার্ডের অফিসের দিকে।

তার মানে রাফায়েলের কবর থেকেই পাথ অব ইলুমিনেশন শুরু হচ্ছে?

এমনটাইতো মনে হয়। তড়িঘড়ি করে যেতে যেত বলল ল্যাংডন, ইলুমিনেটি বড় বড় আকিয়ে আর শিল্পীদের মাঝেমধ্যে অনারারি ব্রাদার হিসাবে নেয়। হয়ত শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই ইলুমিনেটি রাফায়েলের কবর বেছে নিয়েছে। আবার এ-ও জানত ল্যাংডন, আরো অনেক ধর্মীয় শিল্পীর মত রাফায়েলও তোপের মুখে পড়া ব্যক্তিত্ব।

যত্ন করে কাগজটা ফিরিয়ে দিল ভিট্রোরিয়া, তো, কোথায় লুকিয়ে আছে রাফায়েল?

বিশ্বাস কর আর নাই কর, তার কবর প্যান্থিয়নে।

প্যান্থিয়নে?

দ্য রাফায়েল এট দ্য প্যান্থিয়ন। প্যান্থিয়ন এমন এক জায়গা যেখানে আকিয়েরা সমাহিত হন। বলতেই হল ল্যাংডনকে, আর যাই হোক, প্যান্থিয়নকে তারা আশা করেনি। এখানে প্রথম মার্কারটা থাকবে সেটা কে ভেবেছিল! তার মনে হয়েছিল প্রথম চিহ্নটা থাকবে কোন অখ্যাত, দুর্গম জায়গার নিভৃত কোন চার্চে, যেখানে মানুষের আনাগোনা তেমন নেই। সেই ষোলশ সালেও, রোমের মধ্যে সবচেয়ে দর্শনীয় জায়গার একটা ছিল এই প্যান্থিয়ন, এর বি-শা-ল, শতছিদ্রযুক্ত গম্বুজটা দেখার মত জায়গা ছিল।

প্যান্থিয়ন কি কোন গির্জা? প্রশ্ন করল মেয়েটা।

রোমের প্রাচীনতম ক্যাথলিক চার্চ।

কিন্তু তুমি কি মনে কর প্রথম কার্ডিনালকে কোতল করা হবে প্যান্থিয়নে? এটাতো রোমের সবচেয়ে ব্যস্ত টুরিস্ট স্পটের মধ্যে একটা। লোকে লোকারণ্য।

শ্রাগ করল ল্যাঙডন, ইলুমিনেটির দাবি অনুযায়ী, তারা এমন কিছু করতে চায় যেটা সারা দুনিয়া দেখবে। প্যান্থিয়নের মত একটা জায়গায় একজন সম্ভাব্য পোপকে মারা যেতে দেখলে কিছু লোকের চোখতো ঠিক ঠিক খুলে যাবে।

কিন্তু কী করে এ লোকগুলো আশা করে যে প্যান্থিয়নের মত একটা জায়গায় প্রকাশ্যে খুন করে তারা ঠিক ঠিক বেঁচেবর্তে চলে যেতে পারবে? এ তো একেবারে অসম্ভব।

ভ্যাটিকান সিটি থেকে চারজন সম্ভাব্য পোপকে তুলে আনার মতই অসম্ভব, কী বল? কবিতাটা স্পষ্ট পথ দেখাচ্ছে।

আর তুমি নিশ্চিত যে রাফায়েল ঐ মরার প্যান্থিয়নের মধ্যেই শুয়ে আছে?

আমি তার কবর অনেকবার দেখেছি।

নড করল ভিট্রোরিয়া, কটা বাজে?

সাড়ে সাত।

প্যান্থিয়ন কি এখান থেকে দূরে?

মাইলখানেক হবে। আমাদের হাতে সময় আছে।

কবিতায় লেখা আছে শানজি'স আর্থ টম্ব। এর কোন সুরাহা করতে পারছ? আসলে রোমে এরচেয়েয়ে আর্থি আর কোন জায়গা নেই। একটা কথা বলে রাখি, প্যান্থিয়ন মানে যেমন আঁকিয়েদের কবরস্থান, একই ভাবে এ শব্দের আরো একটা অর্থ আছে, সব দেবতাদের আরাধনাস্থল। প্যান্থেসিজম থেকে এ শব্দটা এসেছে। পাগন দেবতাদের জন্য এটা নির্ধারিত। মাদার আর্থ তাদের আরাধ্য।

আর্কিটেকচারের ছাত্র হিসাবে ল্যাঙডন একবার ভিরমি খেয়েছিল একটা ব্যাপার জানতে পেরে, প্যান্থিয়নের মূল চেম্বারটার ডাইমেনশন নাকি গায়ার প্রতি উৎসর্গীকৃত ছিল! গায়া-দ্য গডেস অব আর্থ।

ওকে! বলল ভিট্রোরিয়া, এখনো হাল ছাড়তে নারাজ সে, আর ডেমনস্ হোল? ফ্রম শানজিস আর্থি টম্ব উইথ ডেমনস্ হোল?

এ একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না ল্যাঙডন, নিশ্চয়ই সেটা ওকুলাসকে নির্দেশ করে। বলল সে, কোনমতে নিজেকে জড়ো করে নিয়ে, প্যান্থিয়নের ছাদে যে বিশাল আকৃতির গর্ত রয়েছে সেটার কথা বোঝানো হয়ে থাকতে পারে ডেমনস্ হোল দিয়ে।

কিন্তু এটা একটা গির্জা। বলল ভিট্রোরিয়া, তার পাশে পাশে হাটতে হাটতে, তারা কেন ঐ খোলা জায়গাটাকে ডেমনস্ হোল বলবে? শয়তানের গর্ত বলার কোন কারণতো দেখা যাচ্ছে না।

এই একটা ব্যাপার নিয়েই নাকানি-চুবানি খাচ্ছিল ভিতরে ভিতরে ল্যাঙডনও। সে কখনো শয়তানের গর্ত-কথাটা শোনেনি। কিন্তু একজন বিখ্যাত সমালোচকের কথা তার মনে পড়ে যায়, তিনি বলেছিলেন, ষষ্ঠ বোনিফেসের দ্বারা নির্মিত হবার সময় প্যান্থিয়ন থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য শয়তানরা এ গর্তটা করেছিল।

আর কেন, বলল ভিট্রোরিয়া, কেন তারা শানজি নামটা ব্যবহার করবে যেখানে তার আসল নাম রাফায়েল। অন্তত এ নামে সবাই চেনে তাকে।

তুমি অনেক প্রশ্ন কর।

আমার বাবা এ কথাটাই বলতেন।

দুটো সম্ভাব্য কারণ আছে। প্রথমত, রাফায়েল শব্দটায় অনেক বেশি সিলেবল আছে। এটা হয়ত কবিতার মাত্রা আর ছন্দকে বিদ্ধস্ত করে দিত।

খুব একটা ধোপে টিকছে না।

ঠিক আছে। আর শানজি নামটা দিয়ে রাফায়েলের ব্যাপারটাকে আরো একটু ঘোলাটে করে নেয়া হল, যেন সহজে কেউ বুঝে উঠতে না পারে।

ভিট্টোরিয়া এখনো তার কথা মেনে নিতে পারছে না। আমি নিশ্চিত রাফায়েল যখন জীবিত ছিলেন সে সময়টায় তার দু নামই যথেষ্ট বিখ্যাত ছিল।

অবাক হলেও, কথাটা মোটেও সত্যি নয়। সে সময়কার একটা ঐতিহ্য ছিল, এক শব্দের নামের মধ্যে মাহাত্ম ছিল একটু হলেও বেশি। আজকালের পপ স্টাররা যেমন করে, তেমনি করেছিলেন রাফায়েল। ম্যাডোনার কথাই ধর। সে কিন্তু তার নামের সাথে সিক্কোনে ব্যবহার করে না কখনো।

বেশ মজা পেল যেন ভিট্টোরিয়া, তুমি ম্যাড়োনার শেষ নাম জান?

একটু মজা পেল ল্যাঙডনও। কোন কথা বলল না সে। সোজা হেঁটে গেল সুইস গার্ডের অফিসের দিকে।

তাদের পিছন থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠল, ফার্মাতেভি!

ভিট্টোরিয়া আর ল্যাঙডন সাথে সাথে তাদেরকে একটা বন্দুকের মুখে দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

এ্যাটেন্টো! চিৎকার করে উঠল ভিট্টোরিয়া, পড়ে গেল এক পাশে, দেখ, দেখ...

নন স্পোসটাটোভি! চিৎকার করল গার্ডও, কক করছে তার আগ্নেয়াস্ত্র।

সোলডেটো! মাঠের অপর প্রান্ত থেকে ভোজবাজির মত উদয় হল ওলিভেট্টি, যেতে দাও ওদের!

আমতা আমতা করছে সৈন্যটা, মা, সিনর, ই উনা ডোনা—

ভিতরে!

সিনর, নন পোসে–

এখনি! আমাদের উপর নূতন আদেশ এসেছে। ক্যাপ্টেন রোচার কোরকে ব্রিফ করবে। দু মিনিটের মধ্যে। আমরা একটা সার্চের কাজে নেমে পড়ব।

চোখে বিস্ময় নিয়ে গার্ড তড়িঘড়ি করে ঢুকে গেল সিকিউরিটি সেন্টারের দিকে। তাদের দিকে মার্চ করে এগিয়ে এল ওলিভেট্টি, আমাদের সবচেয়ে গোপনীয় আর্কাইভে? আমি একটা ব্যাখ্যা চাই।

আমাদের কাছে সুসংবাদ আছে। বলল ল্যাঙডন। সরু হয়ে গেল ওলিভেট্টির চোখ, আশা করি খবরটা আসলেই সু হবে।

চার অচিহ্নিত আলফা রোমিও ১৫৫ টি-স্পার্ক ভায়া ডেই করোনারি ধরে ফাইটার প্লেনের মত ছুটে চলল। চার্চি-পার্দিনি সেমি অটোমেটিক সহ বারোজন সাদা পোশাকের সুইস গার্ড আছে সেগুলোতে। আছে লোকাল রেডিয়াস নার্ভ গ্যাস ক্যানিস্টার, আর লঙ রেঞ্জ শটগান। তিনজন শার্প শুটার হাতে নিয়েছে লেজার সাইটেড রাইফেল।

সবচেয়ে সামনে থাকা গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিটে বসা ওলিভেট্টি ফিরে তাকাল পিছনে বসা ভিট্টোরিয়া আর ল্যাঙডনের দিকে। আমাকে আপনারা নিশ্চয়তা দিয়েছেন। ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখন আমি বেরিয়ে এলাম।

ছোট গাড়িতে একটু হাসফাস করে উঠল ল্যাঙডন, আমি আপনার সমস্যা বুঝতে পারছি—

না, আপনি বুঝতে পারছেন না! কখনো চড়ে না ওলিভেট্টির গলা, আমি এইমাত্র ভ্যাটিকান থেকে আমার সেরা এক ডজন লোককে সরিয়ে নিলাম। কনক্লেভের ঠিক আগে। আমি বেরিয়ে এলাম একজন আমেরিকানের কথায় যে কিনা আগে কখনো আমার চোখে পড়েনি এবং যার কাছে একটা চারশো বছর আগের কবিতা আছে প্রমাণস্বরূপ। আর এন্টিম্যাটার খুঁজে বের করার মত গুরুভার দিয়ে এলাম জুনিয়র অফিসারদের হাতে।

পকেট থেকে প্যাপিরাসটা বের করে এবার কথা বলে উঠল ল্যাঙডন, আমি যতটুকু জানি তা হল, চিহ্নটা আছে রাফায়েলের কবরে, আর রাফায়েলের কবর আছে। প্যান্থিয়নে।

সাথে সাথে কমান্ডারের পাশে বসা অফিসার বলে উঠল, তার কথা ঠিক, কমান্ডার। আমি আর আমার স্ত্রী—

ড্রাইভ! যেন চড় বসিয়ে দিল ওলিভেট্টি। আবার ফিরে এল ল্যাঙডনের দিকে।

কীভাবে এমন একটা জনাকীর্ণ জায়গায় হত্যাকান্ড ঘটিয়ে আপসে আপ সটকে পড়বে?

আমি জানি না। বলল ল্যাঙডন, কিন্তু ইলুমিনেটির কাজকারবার যে অনেক উচ্চ স্তরের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তারা সার্ন আর ভ্যাটিকানের মত দুর্গগুলোয় খুব সহজেই কেল্লা ফতে করেছে। এটা বলা চলে একেবারেই ভাগ্যের ব্যাপার যে আমরা জানি হত্যাকান্ডটা কোথায় হবে। প্যান্থিয়নই আপনার একমাত্র সুযোগ, পাকড়াও করে নিন লোকটাকে সেখানেই।

আরো বৈপরীত্য। বলল ওলিভেট্টি, একমাত্র সুযোগ? আমার মনে হয় আপনারা বললেন আরো কী সব পাথওয়ে আছে। মার্কারের সিরিজ। প্যান্থিয়নই সে জায়গা, যেখান থেকে আর সব পথের সন্ধান আমরা পাব। লোকটাকে ধরার চারটে সুযোগ থাকছে আমাদের সামনে।

আমি তেমনি আশা করেছি, হার মানার পাত্র নয় ল্যাঙডনও, সুযোগ থাকত আরো এক শতাব্দি আগে।

ল্যাঙডন জানে, প্যান্থিয়ন প্রথম জায়গা। কিন্তু পরেরগুলো যে কোথায় তা ভেবে কুল পায়না সে। যে কোন জায়গায় হতে পারে। সময় তাদের সাথে গাদ্দারি করতে পারে। প্রতারিত হতে পারে তারা। এই এত বছর পরেও পাথ অব ইলুমিনেশন যে অক্ষত থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু আশা ছাড়ছে না সে। ইলুমিনেটি লেয়ার পর্যন্ত যাবার আশা রাখা যায়। হায়! এমনটা না হবার সম্ভাবনাই বেশি।

ভ্যাটিকান প্যান্থিয়নের সব মূর্তি ধ্বংস আর স্থানান্তর করেছে আঠারোশ সালের শতকে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় ভিট্টোরিয়া, কেন?

স্ট্যাচুগুলো পাগান অলিম্পিয়ান দেবতাদের। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, প্রথম নিদর্শন হাপিস হয়ে গেছে। আর সেই সাথে.....

আর কোন আশা? বলল ভিট্টোরিয়া, ইলুমিনেটির পথ খুঁজে পাবার?

মাথা নাড়ল ল্যাঙডন, আমাদের হাতে একটা গুলি আছে। দ্য প্যান্থিয়ন, তারপর উধাও হয়ে যাবে পথ।

তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে চিৎকার করে উঠল ওলিভেট্টি, পুল ওভার! সাথে সাথে ব্রেক কষে ধরল ড্রাইভার, তীক্ষ্ণ একটা ক্যাচ-ক্যাচে শব্দে থেমে গেল গাড়িটা, সেই সাথে পিছনের তিনটা আলফা রোমিও। থেমে গেল ভ্যাটিকানের গাড়ি বহর।

কী করছেন আপনি! চিৎকার করে উঠল ভিট্টোরিয়াও।

আমার কাজ। ঠান্ডা সুরে বলল ওলিভেট্টি, মিস্টার ল্যাঙডন, আপনি যখন আমাকে বললেন যে প্যান্থিয়নে আসার পথে আপনি ব্যাপারটা ব্যখ্যা করবেন, তখনও আমার একটা ছোট্ট আশা ছিল যে আমি জানতে পারব কেন আমার লোকেরা এখানে আসছে। আমি এ পর্যন্ত আশা রাখতে পারছিলাম, কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। আপনার রূপকথার গালগল্প অনেক শুনলাম, এবং আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। এখুনি সরিয়ে নিচ্ছি আমি এই মিশন। বের করল সে তার ওয়াকিটকি, কথা বলতে শুরু করল।

পিছন থেকে এগিয়ে এসে ভিট্টোরিয়া তার হাত জাপ্টে ধরল, আপনি পারেন না...

সাথে সাথে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে তাকাল ভিট্টোরিয়ার দিকে, আপনি কখনো প্যান্থিয়নে গেছেন?

না। কিন্তু আমি—

আমাকে এ সম্পর্কে একটু বলতে দিন। প্যান্থিয়ন একটা ঘর। পাথর আর সিমেন্টে গাঁথা একটা বিশাল গোলাকৃতি ঘর। এর প্রবেশপথ মাত্র একটা, কোন জানালা নেই, নেই কোন সরু গলিপথ। সে প্রবেশপথ আগলে রাখে কমপক্ষে চারজন রোমান পুলিশ, সশস্ত্র পুলিশ, জায়গাটাকে আগলে রাখে শিল্পকর্ম চোরদের, এন্টি ক্রিশ্চিয়ান টেররিস্টদের, ভবঘুরে আর জিপসিদের কাছ থেকে।

আপনার পয়েন্ট? ঠান্ডা স্বরে বলল মেয়েটা।

আমার পয়েন্ট? হাত ঝাঁকাল ওলিভেট্টি, আঁকড়ে ধরেছে গাড়ির সিটটা সে। আমার পয়েন্ট হল, আপনারা এইমাত্র আমাকে যা হবার কথা বললেন সেটা হওয়া একেবারে অসম্ভব। একবার দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে কল্পনা করুন, প্যান্থিয়নের ভিতরে কী করে একজন কার্ডিনালকে হত্যা করা সম্ভব? আর গোড়ার কথা ধরতে গেলে, কী করে একজন মানুষ সাথে বন্দি নিয়ে পুলিশের চোখ এড়িয়ে এগিয়ে যাবে? আর পরের কথাতো আরো স্বাভাবিক, কী করে তাকে সেখানে খুন করে আবার সাত তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গোটাবে? শরীর এলিয়ে দিল ওলিভেট্টি, তার ঠান্ডা চোখ এখন ল্যাঙডনের মুখের দিকে তাকিয়ে, কীভাবে, মিস্টার ল্যাঙডন? একটা বিশ্বাসযোগ্য দৃশ্য গড়ে নিন।

আরো যেন এগিয়ে আসছে ল্যাঙডনের চারপাশের এলাকা, আরো যেন সংকুচিত হয়ে পড়ছে সে। আমার কোন ধারণাই নেই। আমি কোন এ্যাসাসিন নই! সে কোন মরার পন্থা অনুসরণ করবে তার থোড়াই আমি জানি! আমি শুধু জানি যে

একটা মাত্র দৃশ্য বানিয়ে নিন। বলল ভিট্টোরিয়া, চাপ দেয়ার ভঙ্গীতে, তার কণ্ঠ আস্তে আস্তে সরু হয়ে উঠছে, কীভাবে? ঘরটার বিশাল ফুটোওয়ালা ছাদের উপরে একটা হেলিকপ্টার নিয়ে হত্যাকারী এগিয়ে আসবে, তারপর ছুড়ে দেবে একজন ব্র্যান্ডেড কার্ডিনালকে? কার্ডিনাল মার্বেলের টাইলের উপর আছড়ে পড়বেন এবং সাথে সাথে বেমক্কা পটল তুলবেন!

সাথে সাথে সবাই ভিট্টোরিয়ার দিকে চোখ মেলে তাকাল। তোমার কল্পনা, মেয়ে, ভাবল ল্যাঙডন, খুবই অসুস্থ এবং খুবই ত্বড়িৎ গতির।

কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারল না ওলিভেট্টি, সম্ভব,.. আমি মানছি... কিন্তু–

কিম্বা হন্তারক কার্ডিনালকে একটা হুইল চেয়ারে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে যাবে প্যান্থিয়নের দিকে, তারপর ভিতরে নিয়ে গলা টিপে তাকে সেখানেই বসিয়ে রেখে সটকে পড়বে।

কথাগুলো যেন ভালই প্রভাব ফেলল ওলিভেট্টির উপর।

নট ব্যাড! খুশি হয়ে উঠছে ল্যাঙডনও।

অথবা, মেয়েটার বলা যেন ফুরাতে চায় না, কিলার অন্য পথে–

আমি আপনার কথা শুনেছি, বলল অধৈর্য ভঙ্গিমায় ওলিভেট্টি, যথেষ্ট! বড় করে আরেকটা দম নিল কমান্ডার। বাইরের দিকে তাকাল সে। সেখানে আরেক কার থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একজন সোলজার। তার পরনে সাদামাটা সাহেবি পোশাক।

সব ঠিক আছেতো, কমান্ডার? জামার হাতা গুটিয়ে মিলিটারি কায়দায় দাঁড়াল সে, সাতটা চল্লিশ, কমান্ডার, আমাদের পজিশন নিতে সময় লাগবে।

অনেকটা দিশেহারা ভঙ্গীমায় নড করল ওলিভেট্টি, কিন্তু অনেক সময় ধরে টু শব্দটাও করল না। ড্যাশবোর্ডের উপর, হালকা ধূলার পরতে হাত দিয়ে সে একটা রেখা তৈরি করল অনেক সময় ধরে। সাইডভিউ মিররে সে অনেকণ ধরে ল্যাঙডনকে পর্যবেক্ষণ করল, ল্যাঙডনও অনুভব করছে তার শ্যেন দৃষ্টি। অবশেষে সে ফিরে তাকাল গার্ডের দিকে। তার কণ্ঠে প্রতিদ্ধণিত হল কর্তৃত্বের সুর, আমি ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে যাওয়াটাকেই শ্রেয় মনে করছি। পিয়াজ্জা ডেলা রাউন্ড ধরে গাড়ি যাবে, যাবে ভায়া ডিগ্রি অরফ্যানি ধরে, পিয়াজ্জা সেন্টারনিও আর সেন্ট ইউস্টাচিও ধরে। একটা অন্যটার ত্রিসীমানায় যেন না যায়, ছায়াও যেন না মাড়ায় দু ব্লকের মধ্যে। একবার কোনমতে পার্ক করতে পারলেই তোমরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে অপো করবে আমার অর্ডারের জন্য। তিন মিনিট।

ভেরি গুড, স্যার। সৈন্যটা ফিরে গেল তার গাড়িতে।

সাথে সাথে খুশিতে ঝলমল করে উঠল ভিট্টোরিয়ার ম্লান মুখ, উদ্ভাসিত হল ল্যাঙডনের ভাবভঙ্গিও। একই সাথে তারা দুজন অনুভব করল একটা ক্ষীণ সুতা যেন তাদের মধ্যে আছে। যেন তারা এরই মধ্যে বাঁধা পড়ে গেছে।

কমান্ডার ঘাড় ঘোরাল ল্যাঙডনের দিকে, কটমটে দৃষ্টি হেনে বলল, মিস্টার ল্যাঙডন, আমাদের দেখে গায়েপড়ে না হাসাটাই ভাল হয়।

সাথে সাথে কষ্টেসৃষ্টে একটু হাসি জড়ো করতে পারল সে। কীভাবে আমি এমন কাজ করতে পারি?

৫৭

সার্নের ডিরেক্টর, ম্যাক্সিমিলিয়ান কোহলার চোখ খুলল নাস্তানাবুদ অবস্থায়। তার গায়ের বিভিন্ন জায়গায় নানা কিম্ভুত বস্তু জুড়ে দেয়া হয়েছে। হাজারটা মেডিক্যাল এ্যাপারেটার্স। সে নিজেকে সার্নের একটা গুরুত্বপূর্ণ মেডিক্যাল রুমে শোয়া অবস্থায় আবিষ্কার করল। বিছানার পাশেই আছে হুইলচেয়ারটা। সবচেয়ে ভাল সংবাদ, সে এখন খুব সহজেই শ্বাস নিতে পারছে।

সে দেখতে পায় চেয়ারে ঝোলানো আছে জামাকাপড়। বাইরে একজন নার্সের কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সে আলগোছে, একটুও শব্দ না করে উঠে বসল, হাত বাড়াল খুলে রাখা জামা-কাপড়ের জন্য। মরে যাওয়া পা দুটোর সাথে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে সে শরীরটা তুলে দেয় হুইলচেয়ারে, কোনমতে।

একটু কেশে নিয়ে সে চেয়ার চালালো দরজার দিকে। সে চলছে হাতে হাতে। তারপর একটুও শব্দ না করে যখন সে দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল তখন দেখতে পেল সামনের বারান্দায় কেউ নেই।

একেবারে চোরের মত নিঃশব্দে ম্যাক্সিমিলিয়ান কোহলার বেরিয়ে এল মেডিক্যাল এরিয়া থেকে।

সাত-চল্লিশ-ছয় এবং ত্রিশ... মার্ক! ওয়াকি-টকিতে কথা বলা সত্ত্বেও ওলিভেট্টির গলার স্বর উঁচুতে উঠল না একটুও। একেবারে ফিসফিসিয়ে বলা হল কথাটুকু।

আলফা রোমিওর ব্যাকসিটে বসা ল্যাঙডন বেশ বুঝতে পারছে, ঘামছে সে ভিতরে ভিতরে, হ্যারিস টুইড এবার ক্যারিশমা দেখাবে। প্যান্থিয়ন এখান থেকে তিন ব্লক দূরে। তার পাশে বসে আছে ভিট্টোরিয়া, বেচারির দৃষ্টি ওলিভেট্টির দিকে। কমান্ডার শেষ মুহূর্তের অর্ডার দিচ্ছে ওয়াকি-টকিতে।

ডিপ্লয়মেন্টটা হবে আট পয়েন্টে। আট দিক থেকে এগিয়ে যাবে তোমরা। তোমাদের যেন শেষ মুহূর্তের আগে দেখা না যায়। খেয়াল রাখতে হবে, হামলা হবে নন-লিথাল। ছাদটাকে স্পট করার জন্য আমাদের কিছু লোক প্রয়োজন পড়বে। প্রাইমারি হচ্ছে টার্গেট, আর আমাদের পরের লক্ষ্য সেকেন্ডারি, এ্যাসেট।

হায় ভগবান! ভাবল ল্যাঙডন, এইমাত্র যে কথাটা ওলিভেট্টি তার দলকে বলল, সেটার ধাক্কায় বোবা হয়ে গেছে সে, কার্ডিনালকে বাঁচানো মূল লক্ষ্য নয়। সেকেন্ডারি, এ্যাসেট।

আবার বলছি, সাধারণ নিয়ম, টার্গেটকে অবশ্যই জীবিত পেতে হবে। গো! ওয়াকি-টকি অফ করে দিল ওলিভেট্টি।

ভিট্টোরিয়ার চোখমুখ এখনো শক্ত হয়ে আছে, কমান্ডার, ভিতরে কেউ কি যাচ্ছে?

ভিতরে?

প্যান্থিয়নের ভিতরে। যেখানে ঘটনাটা ঘটার কথা, সেখানে?

এ্যাটেন্টো! আরো বেশি শক্ত হয়ে গেছে কমান্ডারের কণ্ঠ, আমার রাঙ্ক এর ব্যাপারে আপনার কোন আপত্তি আছে কি? আমার লোকজন একবার দেখেই বেশ বুঝে ফেলতে পারবে করণীয়। আপনার সহকর্মী এইমাত্র আমাকে বললেন যে এটাই খুনিকে ধরার একমাত্র সুযোগ। সেটা ভেস্তে দেয়ার কোন ইচ্ছা আমার নেই, ভিতরে কোন সৈন্যদলকে মার্চ করিয়ে দিয়ে।

কিন্তু যদি এরই মধ্যে খুনি ভিতরে ঢুকে গিয়ে থাকে?

হাতের ঘড়ি আরেকবার পরীক্ষা করে নিল ওলিভেট্টি সাথে সাথে, টার্গেটের ভিতরে যাবার কথা আটটায়। এখনো পনের মিনিট বাকি আছে।

সে বলেছে শিকারকে হত্যা করা হবে আটটায়। তার মানে এই নয় যে সে পনের মিনিট আগে ভিতরে যেতে পারবে না তাকে নিয়ে। আর আপনার লোকেরা যদি টার্গেটকে বেরিয়ে আসতে দেখে এবং জানতে না পারে কে সে, তাহলে? কারো না কারো জানাতেই হবে যে ভিতরে কোন সমস্যা নেই।

এ মুহূর্তে কোন ঝুঁকি নেয়া যাবে না।

যদি লোকটাকে চেনাই না গেল তবুও না?

ভোল পাল্টে যাবার মত সময় নেই আমাদের হাতে। ছদ্মবেশ নেয়ার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে—

আমি আসলে আমার কথা বলছিলাম। বলল ভিট্টোরিয়া।

সাথে সাথে ফিরে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকল ল্যাঙডন।

মাথা নাড়ল ওলিভেট্টি, অবশ্যই নয়।

সে আমার বাবাকে হত্যা করেছে।

ঠিক তাই, এজন্যেই সে জানতে পারে কে আপনি।

ফোনে তার কথা আপনি ঠিকই শুনতে পেয়েছেন। তার কোন ধারণাই ছিল না যে লিওনার্দো ভেট্রার একটা মেয়ে আছে। আর এ-ও ঠিক, সে আমি দেখতে কেমন তার কচুটাও জানে না। একজন টুরিস্টের মত আমি ভিতরে ঢুকে যেতে পারব অবলীলায়। আমি যদি সন্দেহজনক কোন কিছু দেখি সাথে সাথে ইশারায় আপনার লোকদের আসতে বলতে পারি।

স্যরি। এমন কিছু করতে দিতে পারি না আমি।

কমান্ডান্টে! ওলিভেট্টির রিসিভার কঁকিয়ে উঠল, উত্তর পয়েন্টের দিকে উই হ্যাভ এ সিচুয়েশন। আমাদের দৃষ্টির পথ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সামনের ফোয়ারার জন্য। পিয়াজ্জার সমভূমির দিকে না এগিয়ে গেলে আমরা কিছুই দেখতে পাব না। অন্তত প্রবেশপথটা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যাবে। আপনার কী মত? আমরা দৃষ্টিহীন হয়ে থাকব, নাকি ধরা পড়ে যাব চোখে?

ভিট্টোরিয়ার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেছে, এইতো! এবার যাচ্ছি আমি! বলেই সে খুলে ফেলল তার পাশের দরজা। বেরিয়ে এল সাথে সাথে।

সাথে সাথে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল ওলিভেট্টিও। হাতে ধরা ওয়াকি-টকি। চক্কর দিল সে একটা, ভিট্টোরিয়াকে ঘিরে।

বেরিয়ে এল ল্যাঙডনও, কী করছে মেয়েটা!

পথরোধ করে দাঁড়াল ওলিভেট্টি, মিস ভেট্রা, আপনার অনুভূতি খুবই ভাল, কিন্তু আমি কোন সিভিলিয়ানকে নাক গলাতে দিতে পারি না।

নাক গলাতে দেয়া! আপনি চোখ বেঁধে উড়ছেন। আমাকে সহায়তা করতে দিন।

ভিতরে একজন মার্কার থাকলে আমার বরং ভাল হয়। কিন্তু...

কিন্তু কী? তেতে উঠল ভিট্টোরিয়া, আমি একটা মেয়ে, এইতো?

চুপ করে থাকল ওলিভেট্টি।

আপনি ভাল করেই জানেন, কমান্ডার, এখানে মেয়ে হওয়াটা মোটেও খারাপ কোন ব্যাপার না। বরং সেখানে সবাইকেই সন্দেহ করা হতে পারে, কোন মেয়েকে হাফ প্যান্ট পরা অবস্থায় ভ্যাটিকান পাঠিয়েছে এ ব্যাপারটা খুনি কল্পনাও করতে পারবে না। এরচেয়েয়ে বড় কোন সুযোগ হয় না।

আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দিন।

আমাকে সাহায্য করতে দিন।

খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আপনার সাথে যোগাযোগ রাখার কোন পথ থাকবে না হাতে। আমি আপনার হাতে আর যাই হোক, একটা ওয়াকি-টকি তুলে দিতে পারছি না। আবার না দিলেও দূরে সরে যাচ্ছেন।

শার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভিট্টোরিয়া তার সেলুলার ফোনটা তুলে আনল, অনেক টুরিস্ট যেমন সেলফোন ব্যবহার করে।

ওলিভেট্টি কোনমতে দাঁত কামড়ে রইল।

ভিট্টোরিয়া ফোনের ভাঁজ খুলল, তারপর উল্লসিত কণ্ঠে বলল, হাই হানি! আমি দাঁড়িয়ে আছি প্যান্থিয়নে। চমৎকার জায়গা। তোমার দেখা উচিৎ! আবার ভাঁজটা বন্ধ করল সে, কে জানবে কীভাবে? একেই বলে নো রিস্ক সিচুয়েশন। আমাকে আপনার চোখ হতে দিন। বলল সে হড়বড় করে, আপনার নাম্বার কত?

কোন জবাব দিল না ওলিভেট্টি।

ড্রাইভারকে দেখে মনে হচ্ছে তার মনেও কিছু কিছু কথা ঘোরাঘুরি করছে। বেরিয়ে এল সেও। টেনে নিয়ে গেল কমান্ডারকে একপাশে, তারপর বেশ কিছুক্ষণ গুজগুজ করল ইতালিয়ানে। এরপর ফিরে এল সে। বলল, এ নাম্বারগুলো প্রোগ্রাম করুন। সে ডিজিট বলা শুরু করল।

ভিট্টোরিয়া তার ফোন প্রোগ্রাম করল।

এবার নাম্বারটা কল করুন।

অটো ডায়াল প্রেস করল ভিট্টোরিয়া। ওলিভেট্টির বেল্টের ফোন বাজতে শুরু করল। সে তুলে আনল ফোনটা, তারপর বলল, ভিতরে চলে যান, মিস ভেট্রা খোলা রাখুন চোখ। বেরিয়ে আসুন, তারপর সব খুলে বলুন আমাকে।

বন্ধ করে ফেলল ভিট্টোরিয়া ফোনটা, থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।

এবার একটু সচকিত হয়ে উঠল ল্যাঙডন, এক মিনিট, বলল সে, আপনি তাকে একা একা ভিতরে পাঠাচ্ছেন?

রবার্ট, আমি ভালই থাকব। বিশ্বাস রাখতে পার অবলীলায়। প্লিজ।

আবার সুইস গার্ড ড্রাইভার কথা বলতে শুরু করল ওলিভেট্টির সাথে।

ব্যাপারটা বিপজ্জনক। ভিট্টোরিয়াকে বলল ল্যাঙডন।

তার কথা কিন্তু একদম ঠিক, বলল ওলিভেট্টি, আমাদের সেরা লোকজনও কোনদিন একা একা কাজ করে না। আর আমার লেফটেন্যান্ট বলল তাদের মতামত। তারা চায় আপনারা দুজনেই ভিতরে যাবেন।

আমাদের দুজনেই! মনে মনে দ্বিধায় পড়ে গেল ল্যাঙডন, আসলে আমি ভাবছি—

আপনাদের দুজনেই যাচ্ছেন, একত্রে, ফরমান জারি করল ওলিভেট্টি, আপনাদের দেখতে একেবারে ট্যুরিস্ট জুটির মত লাগবে, প্রয়োজনে একে অন্যকে ব্যাক-আপও দিতে পারবেন। এ ফরম্যাটটায়ই আমি সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পাব।

শ্রাগ করল ভিট্টোরিয়া, ফাইন। আমি দ্রুত যেতে চাচ্ছি।

মনে মনে গজগজ করল ল্যাঙডন, নাইস মুভ, কাউবয়!

সামনে, রাস্তার দিকে আঙুল তাক করল ওলিভেট্টি, ভায়া ডেলগি অরফ্যানি আপনাদের প্রথম রাস্তা। বামে যান। সোজা প্যান্থিয়নে গিয়ে হাজির হবেন। দু মিনিট হাটতে হবে, ব্যস। তারপর আমি আমার লোকদের নির্দেশনা দেব এখানে বসে। অপেক্ষা করব আপনাদের কলের জন্য। সে খুলে আনল পিস্তলটা, আপনাদের কেউ কি জানেন কী করে একটা আগ্নেয়াস্ত্রকে সামলাতে হয়?

একটা বিট মিস করল ল্যাঙডনের হার্ট, আমাদের আদৌ কোন আগ্নেয়াস্ত্রের দরকার নেই!

হাত বাড়িয়ে দিল ভিট্টোরিয়া, আমি চল্লিশ মিটার দূর থেকে ধেয়ে যাওয়া কোন শিপের বো তে রাখা যে কোন বস্তুকে চোখের পলকে ঝেড়ে ফেলতে পারি।

গুড! উফুল্ল কণ্ঠে বলল কমান্ডার, আপনাকে ব্যাপারটা প্রমাণ করতে হবে।

ভিট্টোরিয়া তার শর্টসের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ মেলল ল্যাঙডনের দিকে।

ওহ, না? তুমি এমন কাজ করতে পার না! চোখের ভাষায় বলল ল্যাঙডন, কিন্তু মেয়েটা এত চটপটে যে ধরা পড়ে গেল সে। সোজাসাপ্টা হাত বাড়াল সে, খুলে ফেলল জ্যাকেটের একপাশ, তারপর সেঁধিয়ে দিল পিস্তলটাকে, তার বুক পকেটে। যেন কোন পাথর সোজা ধেয়ে আসছে তার পকেটে। তার একমাত্র শান্তির খবর হল, ডায়াগ্রামা এই পকেটে নেই। আছে অন্য একটায়।

দেখতে আমাদের দুগ্ধপোষ্য লাগছে, বলল ভিট্টোরিয়া, তারপর আকড়ে ধরল ল্যাঙডনের হাত, ঠিক প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া জুটির মত, তারপর নেমে পড়ল পথে।

ড্রাইভার আহ্লাদে আটখানা হয়ে গিয়ে বলল, কথাটা মগজে ঢুকিয়ে নিন, আপনারা প্রেমে চুর হয়ে যাওয়া একটা জুটি। হাতে হাত রাখা, তারপর ঘনিষ্ঠভাবে চলাচল করাটা তাই দেখতে অত্যন্ত প্রীতিকর লাগবে। আপনারা কিন্তু নববিবাহিত দম্পতি।

ল্যাঙডন এখনো ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না ব্যাপারটার সাথে। সে কি ভুল দেখল? ভিট্টোরিয়ার ঠোঁটের কোণে একটা হাসির মৃদু রেখা দেখা দিয়েছিল কি?

কর্পো ডি ভিজিল্যাঞ্জায় সুইস গার্ডের বাইরের ঘাঁটি, এটায় তারা বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে, ভ্যাটিকানের বাহ্যিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, পাপাল এরিয়ায় কোন অনুষ্ঠান হলে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। আজকে, যাই হোক, সেটা অন্য কোন কাজের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

সুইস গার্ডের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড আজ এখানে আস্তানা গেড়েছে। হম্বিতম্বি করে বেড়াচ্ছে বুক ফুলিয়ে। ক্যাপ্টেন এলিয়াস রোচার। ক্যাপ্টেনের বুকের ছাতি দেখলে যে কারো অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে। তার পরনে প্রচলিত ক্যাপ্টেনের পোশাক। মাথায় একটা লাল রঙের ব্যারেট, তেরছা করে পরে আছে সে সেটাকে, খুব কায়দা করা সৈনিকের মত। এত বিশালদেহী মানুষটার কন্ঠরিনঝিনে,ঠিক মানায় না।যেন কোন সরু সুরের যন্ত্র বেজে যাচ্ছে। তার লোকজন তাকে আড়ালে-আবডালে অর্সো বলে ডাকে। গ্রিজলি ভালুক। অনেকে আবার তাকে ভাইপার সাপের ছায়ায় চলা ভালুক নামেও ডাকে। কমান্ডার ওলিভেট্টি হল সেই ভাইপার। রোচার, ভাইপারের চেয়ে কোন অংশে কম ভয়াল নয়, কিন্তু অন্ততপক্ষে তাকে আসতে দেখা যাবে।

রোচারের লোকজন একেবারে নিখুঁত এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কোন নড়াচড়া নেই। এইমাত্র যে খবর তারা পেয়েছে তাতে তাদের রক্তচাপ বেড়ে গেছে কয়েক গুণ।

আরেক লেফটেন্যান্ট চার্ট্রান্ড মনেপ্রাণে আফসোস করছিল এখানে আসতে চাওয়া আর নিরানব্বই ভাগ ব্যর্থ অফিসারের সাথে সে কেন ছিল না। বিশ বছর বয়সে চার্ট্রান্ড ফোর্সের সবচেয়ে নবীন গার্ড। সে ভ্যাটিকানে আছে মোটামুটি মাস তিনেক ধরে। আর সবার মত চার্ট্রান্ডও সুইস আর্মির কাছ থেকে ট্রেনিং পেয়েছে আর দু বছর কাটিয়েছে অসবিল্ডাঙ এ। রোমের বাইরে সুইস গার্ডের গুপ্ত ব্যারাকেও তার সময় কেটেছে অনেক। তবু, তার ট্রেনিংয়ের কোন অংশই তাকে এই রকম অবস্থা মোকাবিলা করার মত দক্ষ করে তোলেনি।

প্রথমে চার্ট্রান্ড মনে করেছিল যে এই ব্রিফিংটা আসলে বিদঘুটে কোনট্রেনিংয়ের অংশ। ভবিষ্যতের অস্ত্র? প্রাচীণ গুপ্ত সংঘ? অপহৃত কার্ডিনাল-রা? তারপরই রোচার তাদের, এর উপর ভিডিও দেখাল। সাথে সাথে চার্ট্রান্ড বুঝে ফেলল, এটা কোন প্রশিক্ষণ নয়, নয় কোন পরীক্ষা।

আমরা নির্বাচিত জায়গার পাওয়ার অফ করে দেব, বলছে রেচার, যাতে বোমাটার চৌম্বক ক্ষেত্রের দেখা পাই। আমরা চারজন চারজন করে ময়দানে নেমে যাব। প্রত্যেকের সাথে থাকবে ইনফ্রারেড গগলস। প্রচলিত বাগ-ফাইন্ডার দিয়েও কাজ সারব আমরা। সাব ওম থ্রি থাকলেই সেখানটা সার্চ করতে হবে। কোন প্রশ্ন?

নেই।

চার্ট্রান্ড একটু আগ বাড়িয়ে বলল, যদি জিনিসটাকে খুঁজে না পাই তো? আর প্রশ্নটা করেই মনেপ্রাণে সে কামনা করতে থাকে, এটা যেন শুনতে না পায় ক্যাপ্টেন।

লাল ব্যারেটের নিচ থেকে গ্রিজলি ভালুক তার দিকে আগুন ঝরানো দৃষ্টি হানল। তারপর একটা স্যাটুল ঠুকে দিয়ে ব্রিফিংয়ের ইতি টানল।

ঈশ্বরের গতি, ছেলেরা!

প্যান্থিয়ন থেকে দু ব্লক দূরে, ভিট্টোরিয়া ও ল্যাঙডন একটা ট্যাক্সির সারি পেরিয়ে গেল। ড্রাইভাররা ফ্রন্ট সিটে বসে ঝিমোচ্ছে।

নিজের সমস্ত চিন্তা ভাবনা গুটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিল ল্যাঙডন, কিন্তু পরিস্থিতি একেবারেই প্রতিকূল। মাত্র দু ঘণ্টা আগে সে কেম্ব্রিজের আরামদায়ক বাসায় শুয়ে ছিল, আর এখন সে ইউরোপে, আদ্যিকালের দানবদের মধ্যকার লড়াই চাক্ষুস করছে। হ্যারিস টুইডের দু পকেটে দুটো বিপরীত ধারা এখন, আর সেই সাথে বাহুলগ্ন হয়ে আছে এক অনিন্দ্যসুন্দর মেয়ে।

সে আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখে ভিট্টোরিয়ার দিকে। মেয়েটার দৃষ্টি একেবারে সামনে। তার ধরে থাকার মধ্যে এক ধরনের শক্তিমত্তা আছে; স্বাধীন, ড্যামকেয়ার মেয়ের শক্তিমত্তা। তার আঙুলগুলো আলতো করে আদর করছে তাকে, সত্যিকার প্রেমিক-যুগলের মত। একটুও জড়তা নেই। একটু যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল ল্যাঙডন। বাস্তবে ফিরে এসো! বলল সে নিজেকেই।

তার জড়তা টের পাচ্ছে ভিট্টোরিয়াও, রিল্যাক্স! বলল সে, আমাদের দেখতে নববিবাহিত দম্পতির মত লাগার কথা।

আমি রিল্যাক্সড।

তুমি আমার হাতটা গুঁড়ো করে ফেলছ। সাথে সাথে হাতটায় ঢিল দিল ল্যাঙডন।

চোখ দিয়ে দম নাও। বলল ভিট্টোরিয়া।

কী?

এটা মাসলগুলোকে রিল্যাক্স করে। নাম প্রণায়ামা।

পিরানহা?

মাছ না। প্রণায়ামা। নেভার মাইন্ড।

তারা মোড় ঘোরার সাথে সাথে সামনে ভোজবাজির মত উদিত হল প্যান্থিয়ন। ল্যাঙডন সাথে সাথে প্রশংসার দৃষ্টি হানল এটার দিকে। চোখেমুখে তার ঠিকরে বেরুচ্ছে প্রশংসা। দ্য প্যান্থিয়ন! সব দেবতার মন্দির। পাগান দেবতাদের। প্রকৃতি আর পৃথিবীর দেবতাগণ। অবাক চোখে সে তাকায় সামনে। তাকিয়েই থাকে। এখান থেকে দেখতে অনেকটা চৌকোণা মনে হলেও সে জানে আসলে সেটা ভিতরে গোলাকার। তারা যে ভুল করেনি তা বোঝা গেল এম এ্যাগ্রিপ্পা এল এফ কোস টার্টিয়াম ফেসিট দেখে। সাথে সাথে মনে মনে অনুবাদ করে নিল লেখাটাকে ল্যাঙডন। মার্কাস এ্যাগ্রিপ্পা, কনসাল ফর দ্য থার্ড টাইম, বিল্ট দিস।

চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে সে। হাতে ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে একদল টুরিস্ট সেখানে আনাগোনা করছে। লা টাজা ডিওরোর আউটডোর ক্যাফেতে অনেকে আবার রোমের সেরা আইস কফি চেখে দেখছে। আর প্যান্থিয়নের বাইরে, ঠিক যেমনটা বলেছিল ওলিভেট্টি, চারজন সশস্ত্র রোমান পুলিশ এ্যাটেনশন হয়ে দাড়িয়ে আছে।

দেখতে বেশ শান্তই লাগে। বলল ভিট্টোরিয়া।

নড করল ল্যাঙডন। সে এখানে বাহুলগ্না করে একটা মেয়েকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াল ঘটনাগুলোর মধ্যে একটার জন্য, কল্পনাটা মোটেও স্বস্তিদায়ক নয় তার জন্য। ভিট্টোরিয়া তার পাশে পাশে আছে ঠিকই, তারপরও, একটা ব্যাপার ভেবে সে বিষম খায়, সে-ই সবাইকে এখানে দাঁড় করিয়েছে, প্রতিটা ক্লু দিয়েছে। চিনিয়েছে ইলুমিনেটি পোয়েমের অর্থ। সে জানে, এই সেই স্থান। এটাই শানজিস টম্ব। এখানে, রাফায়েলের কবরের পাশে, উপরের বিশাল ছিদ্রটার নিচে, সে অনেকবার এসেছে।

বাজে কটা? প্রশ্ন ছুড়ল ভিট্টোরিয়া।

সাতটা পঞ্চাশ। আর দশ মিনিট।

আশা করি ব্যাটারা ভাল হবে। বলল ভিট্টোরিয়া, ভিতরে যদি কিছু ঘটেই যায়, বলল সে

আফসোসের সুরে, আমরা সবাই ক্রসফায়ারে পড়ে যাব।

বড় করে একটা দম নিয়ে ল্যাঙডন এগিয়ে গেল সামনের দিকে। পকেটের গানটা যেন আরো ভারি হয়ে আসছে। তার মনে একটা চিন্তা বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে। একবার যদি চোখ দেয় পুলিশেরা, তাহলে কেল্লা ফতে। সোজা হাজতের ভাত জুটবে কপালে। কিন্তু অফিসার তার দিকে একবারের বেশি দৃষ্টি দিল না। না, ছদ্মবেশ ভালই হয়েছে।

প্রশ্ন করল সে ভিট্টোরিয়ার দিকে লক্ষ্য করে, ট্রাঙ্কুইলাইজার গানের বাইরে আর কিছু দিয়ে কখনো গুলি করেছ?

তুমি কি আমাকে ঠিক বিশ্বাস কর না?

বিশ্বাস করা? আমি তোমাকে আদৌ এখন পর্যন্ত ভাল করে চিনতেই পারলাম না! বিশ্বাসের প্রশ্ন আসছে কী করে?

আর আমি কিনা ভেবে বসে আছি আমরা নববিবাহিত দম্পতি!

প্যান্থিয়নের ভিতরে বাতাস শীতল, একটু ভারি। চারদিকে ইতিহাসের সব দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একশো চল্লিশ ফুট উঁচু গম্বুজের ভিতরে ঢুকে আবারও ঠান্ডা হয়ে আসে ল্যাঙডনের ভিতরটা। সেন্ট পিটার্সও হার মেনে যাবে এটার সামনে। এখানে একই সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং আর আর্টের অসাধারণ মিশেল দেখা যাচ্ছে। তাদের মাথার উপরে বিশাল গোলাকার ছিদ্রটা দিয়ে বিকালের রোদ আলস্য ভরে এলিয়ে পড়ছে। দ্য অকুলাস! ভাবল সে, দ্য ডেমনস্ হোল!

এসে পড়েছে তারা।

তাদের পায়ের কাছে, পালিশ করা মার্বেলের মেঝের দিকে নেমে এসেছে এই সুউচ্চ ভবনটা। দর্শনার্থীদের পায়ের মৃদু শব্দই ভিতরে শব্দের একটা ইন্দ্রজাল তৈরি করে দিচ্ছে। দেখতে পেল ল্যাঙডন, ডজনখানেক পর্যটক এলোমেলো পা ফেলে যাচ্ছে। তুমি কি এখানেই আছ?

দেখে বেশ শান্ত মনে হচ্ছে। বলল ভিট্টোরিয়া। এখনো তার হাত ধরে আছে। নড করল ল্যাঙডন।

রাফায়েলের কবর কোথায়?

একটু সময় নিল ল্যাঙডন। দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। রুমটায় আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। কবর। পিলার। ভাস্কর্য। শিল্পকর্ম। সে ঠিক নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারছে না। তারপর অবশেষে সে বলল, আমার মনে হয় রাফায়েলেরটা ঐদিকে।

পুরো রুমের বাকি জায়গাটুকু একটু দেখে নিল ভিট্টোরিয়া। আমি এমন কাউকে দেখছি না যাকে তাকিয়ে খুনি বলে মনে হবে এবং যে এখানে এসেছে একজন প্রেফারিতি কার্ডিনালকে হত্যা করতে। আমরা কি আরেকটু চোখ বুলিয়ে নেব?

নড করল ল্যাঙডন, এখানে মাত্র একটা জায়গাই আছে যেখানে যে কেউ গা ঢাকা দিতে পারবে। আমাদের বরং রিইন্ট্রাঞ্জে চেক করে দেখা ভাল।

দ্য রিএ্যাক্সেস?

হ্যাঁ। দ্য রিএ্যাক্সেস ইন দ্য ওয়াল।

কবর আর শিল্পকর্মের সারির বাইরে আরো একটা জিনিস আছে এখানে। দেয়াল থেকে বাঁকা হয়ে একটু করে অংশ বেরিয়ে আছে। এগুলো খুব একটা যে বড় তা না। কিন্তু অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়ার জন্য এরচেয়ে ভাল জায়গা এখানে নেই। মনের দুঃখ সহ সে কল্পনা করে, প্যান্থিয়নের এখানটায় পাগন দেবতাদের মূর্তি রাখা হত। তারপর দিন পাল্টে গেল। ভ্যাটিকান দখল করে নিল জায়গাটাকে। বানাল চার্চ। হারিয়ে গেল অলিম্পিয়ান গডরা। একটা কথা ভেবে কুল পায় না সে। সে বিজ্ঞানের প্রথম দিককার এক অনন্য সৃষ্টির ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এর নির্মাতারা কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে। তাদের সংস্কৃতি আর তাদের ধর্ম আজ শুধুই গবেষণার বিষয়। বিলুপ্তির অতলে হারিয়ে গেছে তারা। তার কল্পনায় এখন ইলুমিনেটির দিকে নির্দেশ করা একটা মূর্তির কথা ঘুরপাক খাচ্ছে। এর স্রষ্টা কে? কোথায় আছে এখন সেটা? টিকে আছেতো? পাথ অব ইলুমিনেশন কি খুঁজে পাওয়া যাবে এখান থেকে এ যুগেও?

আমি বামের পথ ধরছি, বলল ভিট্টোরিয়া, আর তুমি যাচ্ছ ডানে। চেক করতে করতে একশো আশি ডিগ্রিতে আবার দেখা হচ্ছে।

আড়ষ্ট একটা হাসি দিল ল্যাঙডন।

তারপর এগিয়ে গেল পথ ধরে। তার মন এখনো আগের কথাগুলো আউড়ে যাচ্ছে। খুনির কথা প্রতিধ্বণিত হচ্ছে। আটটার সময়। বিজ্ঞানের বেদীতে কুমারি মেয়ের বলিদান। মৃত্যুবরণের একটা গাণিতিক হার... আট, নয়, দশ, এগারো... একেবারে মধ্যরাতে।

হাতের ঘড়ি আরো একবার পরীক্ষা করে নিল সে। সাতটা বাহান্ন। আর মাত্র আট মিনিট।

ল্যাঙডন সামনে এগিয়ে যাবার সময় একজন ইতালিয় ক্যাথলিক রাজার কবর পেরিয়ে

গেল। লোকটার কবর একটু বিচিত্রভাবে বসানো। দর্শনার্থীদের একটা জটলা ব্যাপারটা নিয়ে ধাঁধায় পড়ে গেছে। কিন্তু ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য থামল না ল্যাঙডন। পূর্বদিকে মাথা করে কবর দেয়া নিয়ে একটু ঝামেলা আছে। সিম্বলজি দুশো বারো ক্লাসে এ নিয়ে একটা হট্টগোল বেঁধে গিয়েছিল। এই গত মাসেই।

অসম্ভব! এমন কিছু হতেই পারে না। বলেছিল একটা মেয়ে। পূর্বমুখী খ্রিস্টান কবরগুলির মূল কথা বোঝানোর পর সে চেঁচিয়ে উঠেছিল। কেন শুধু শুধু খ্রিস্টানরা তাদের টম্বগুলোকে উঠতি সূর্যের দিকে মুখ করে রাখবে? আমরা খ্রিস্টানত্বের ব্যাপারে কথা বলছি... সূর্য পূজার ব্যাপারে নয়।

সাথে সাথে আপেল চিবাতে চিবাতে সে ডাকল, মিস্টার হিজরট! চিৎকার করল সেও।

পিছনের সারিতে বসে ঝিমাতে থাকা একটা ছেলে হড়বড় করে বলল, জ্বি? আমি?

ল্যাঙডন দেয়ালে ঠাসা একটা রেনেসাঁর আর্টের পোশাকের দিকে নির্দেশ করল। ঈশ্বরের সামনে নতজানু হয়ে আছে লোকটা, কে সে?

উম... কোন সন্ত?

ব্রিলিয়ান্ট! আর কী করে তুমি বুঝলে যে সেটা কোন সন্তের ছবি?

তার পরনে একটা হ্যালো আছে?

এ্যাক্সিলেন্ট! আর এই সোনালি হ্যালো কি তোমাকে অন্য কোন কথা মনে করিয়ে দেয়?

সাথে সাথে হিজরটের মুখের ম্লান ভাব উধাও হয়ে যায়। হাসিতে ভেসে ওঠে সে। ইয়াহু! গত টার্মে আমরা যে ইজিপ্সিয়ান জিনিসগুলো নিয়ে লেখাপড়া করেছিলাম। সেই... উম্... সানডিস্ক...।

ঠিক তাই, মিশরিয় সৌর চাকতি, থ্যাঙ্ক ইউ, হিজরট। আবার ঘুমিয়ে পড়। ফিরে তাকাল ল্যাঙডন ক্লাসের দিকে, হ্যালোস, আর বেশিরভাগ ক্রিশ্চিয়ান সিম্বলজির মত, এটাকেও ইজিপ্সিয়ান সূর্য-আরাধনা থেকে ধার করা হয়েছে। খ্রিস্টবাদে সূর্যপূজার উদাহরণের কোন শেষ নেই।

এক্সকিউজ মি? তেতে উঠল প্রথমদিকে বসা সেই মেয়েটা, আমি সব সময় চার্চে যাই। সেখানে সূর্য পূজার মত কোন ব্যাপার আমার চোখে পড়েনি কখনো!

আসলেই? পঁচিশে ডিসেম্বর তোমরা কী সেলিব্রেট কর?

ক্রিসমাস। জেসাস ক্রাইস্টের জন্মজয়ন্তি।

অথচ, বাইবেলের কথানুসারে, যীশু খ্রিস্ট জন্ম নেন মার্চে। তাহলে আমরা ডিসেম্বরের শেষ দিকটায় কী উদযাপন করছি?

নিরবতা।

হাসল ল্যাঙডন, ডিসেম্বর পঁচিশ, আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, হল গিয়ে প্রাচীণ পাগান ছুটির দিন। সোল ইনভিক্টাস। অজেয় সূর্য। এটা কিন্তু অবাক হলেও সত্যি কথা, সূর্যের ফিরে আসার দিন। তার আগ পর্যন্ত দিন শুধু ছোটই হত। তারপর এ দিনটা এলে আবার তা বড় হতে থাকে। তার মানে সূর্যের অজেয়তার পূজা করা হচ্ছে।

আরো এক কামড় আপেল মুখে নিল ল্যাঙডন।

বিজয়ী ধর্মগুলো, সে বলে চলছে, মাঝে মাঝে পুরনো ধর্মের দু-একটা ব্যাপার ইচ্ছা করেই তাদের ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়, যেন ধর্ম পাল্টানোটা খুব বেশি আঘাত হয়ে দেখা না দেয়। এর একটা সুন্দর নাম আছে। ট্রান্সমিউটেশন। এর ফলে মানুষ নতুন ধর্মের উপর কিছুটা আস্থা রাখতে শেখে। ফলে বদলে যাওয়া লোকগুলো সেই একই অনুষ্ঠান পালন করে, একই ভাবে সূর্য পূজা করে, শুধু তাদের পরনে থাকে নতুন ধর্মের খোলস... ফলে অন্য আরো কোন ঈশ্বরের আরাধনা চলে আসে তাদের কর্মে।

সামনের মেয়েটা ফোঁস ফোঁস করছে যেন, আপনি বলতে চান খ্রিস্টবাদ আসলে সূর্য পূজার নূতন রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়?।

অবশ্যই না। খ্রিস্টান শুধু সূর্য পূজা থেকে ধার করেনি, ঐতিহ্য ধার করেছে আরো

অনেক কিছু থেকে। ক্রিস্টিয়ান ক্যানোনাইজেশন আসলে আগের দিনের দেব সৃষ্টির কাজ থেকে নেয়া। গড-ইটিংয়ের ব্যাপারটা এসেছে প্রাচীণ এ্যাজটেকদের কাছ থেকে। সেই হোলি কম্যুনিয়ন! এমনকি আমাদের পাপ মোচনের জন্য যীশুর আত্মাহুতিও আমাদের মৌলিক কোন ব্যাপার নয়। এটাও ধার করা। কোয়েৎজালকোটের প্রাচীণ পুরাণে দেখা যায় জনপদের পাপ স্খলন করতে তরুণ যুবার দল জীবনপাত করছে।

এবার আরো কঠিন হয়ে গেল মেয়েটার কণ্ঠ, তাহলে, এমন কিছু কি আছে খ্রিস্টানত্বে যা দিয়ে ব্যাপারটার কিছু দিককে মৌলিক বলা চলে?

যে কোন মূল বিশ্বাসের বেশিরভাগই আসলে মোটামুটি খাদ মিশানো। ধর্ম কখনোই এককভাবে শুরু হয়নি। বরং তাদের একটার উপর ভিত্তি করে আরেকটা গজিয়ে উঠছে হরদম। আধুনিক ধর্ম আর কিছুই নয়... মানুষ শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে অচেনাকে চেনার, অব্যাখ্যতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য যা করে আসছে সেগুলোর একটা সম্মিলিত রূপই এই ধর্ম।

উম... হোল্ড অন! হিজরট বলল, বোঝা যাচ্ছে এতোক্ষণে তার চোখের ঘুম পালিয়েছে, আমি ক্রিশ্চিয়ানিজমের এমন কিছুর কথা জানি যা একেবারে মৌলিক। আমাদের গডের ব্যাপারে কী হবে? খ্রিস্টানরা কখনোই ঈশ্বরকে অন্যের আদলে আঁকেনি। তারা এ্যাজটেক আর সৌর-পূজারীদের মত তাকে কোন অবয়ব দেয়নি। তার অবয়ব শ্বেত-শুভ্র, তার দাড়ি লম্বা এবং পাকা। এর সাথে নিশ্চয়ই আর সব ধর্মের মিল নেই। আমাদের ঈশ্বর মৌলিক, ঠিক না?

আবারো হাসল ল্যাঙডন। যখন প্রথমদিকের খ্রিস্টানরা তাদের আদিকালের দেবতাদের ছেড়ে এসেছে—পাগান দেবতা, রোমান দেবতা, গ্রিক, সান, মিথ্রাইক, যাই হোক—তারা চার্চকে সর্বক্ষণ প্রশ্ন করে তিতি বিরক্ত করেছে, তাদের নতুন ঈশ্বর দেখতে কেমন? বিজ্ঞের মতই জবাব দিয়েছে গির্জা। সবচেয়ে ক্ষমতাবান, সবচেয়ে ভয় পাওয়া জনকেই বেছে নিয়েছে তারা... সব ইতিহাস-সচেতন মানুষের কাছেই তার পরিচিতি আছে।

এখনো ঠিক যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না ছাত্রটা। একজন বৃদ্ধলোক, যার শ্বেত-শুভ্র দাঁড়ি আছে?

দেয়ালে রাখা প্রাচীণকালের দেবতাদের চার্টের দিকে আঙুল তাক করল ল্যাঙডন। সেখানেও বড় বড় সাদা দাড়ির সাথে মানিয়ে গেছেন দেবতা।

জিউসের সাথে মিল পাওয়া যায় না কি?

সেদিন ক্লাসটা এভাবেই শেষ হয়েছিল।

গুড ইভিনিং. একটি কণ্ঠ শোনাগেল।

সাথে সাথে লাফ দিল ল্যাঙডন। ফিরে এসেছে সে প্যান্থিয়নে। নীল ক্যাপ পরা এক বয়েসি লোকের সাথে সে আরেকটু হলে ধাক্কা খেয়েছিল। তার বুকে একটা লাল ক্রস। তার হলদে দাঁতে ঝিকিয়ে উঠল হাসি।

আপনি ইংরেজ, ঠিক না? লোকটার উচ্চারণ পুরোপুরি টাসকান।

পিটপিট করল ল্যাঙডন চোখ, তারপর বলল, আসলে তা নয়, আমি আমেরিকান।

লোকটা যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, ওহ্, হ্যাভেন! মাফ করবেন, প্লিজ। আপনার পোশাক এত ভালভাবে সাজানো ছিল... আমি মনে করে বসলাম... ক্ষমা করবেন।

আমি কি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি? বলল ল্যাঙডম অবশেষে। তার হৃদপিন্ড এখনো ধ্বক ধ্বক করছে।

না, আসলে আমি ভাবছিলাম আমিই হয়ত আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আমিই এখানকার সিসেরোন।

লোকটা তার সিটি ইস্যু করা ব্যাজের দিকে সগর্বে নির্দেশ করল। আপনার রোম ভ্রমণ আরো চিত্তাকর্ষক করার দায়িত্ব বর্তেছে আমার মত মানুষদের কাঁধে।

আরো চিত্তাকর্ষক! ল্যাঙডন জানে, এরচেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক রোম ভ্রমণ গত কয়েক শতকে কোন মানুষ করেনি।

আপনাকে দেখে মনে হয় উঁচু কোন কাজে নিয়োজিত আছেন বলল গাইড, মনে হচ্ছে আপনি ইতিহাস সম্পর্কে আর সবার চেয়ে বেশি আগ্রহী। অন্তত গডপড়তার চেয়ে বেশি। আপনাকে এই অত্যন্ত সুন্দর এলাকা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

হাসল সে সাথে সাথে, অনেক ধনাবাদ আপনাকে, কিন্তু আমি নিজেই একজন আর্ট হিস্টোরিয়ান আর....

অসাধারণ! যেন কোন জুয়ায় এইমাত্র লোকটা একটা বিশাল দান জিতে নিয়েছে, এমন সুরে বলল, নাহলে আপনার মত আগ্রহ আর কার হবে এসব বিষয়ে?

না। আসলে আমি আশা করি। দ্য প্যান্থিয়ন... লোকটা বলা শুরু করল তার ধূসর স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে, মার্কাস এ্যাগ্রিপ্পা এটা বানিয়েছিলেন খ্রিস্টপূর্বাব্দ সাতাশ সালে।

হ্যাঁ। এবং একশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে সেটাকে আবার বানানো হয়। এবার স্থপতি ছিলেন হ্যাড্রিয়ন।

নিউ অর্লিন্সে উনিশো ষাট সালে সুপারডোম গড়ার আগে এটাই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফ্রি স্ট্যান্ডিং ডোম!

মনে মনে গজগজ করল ল্যাঙডন। লোকটাকে কোনমতে থামানো যাচ্ছে না।

আর পঞ্চম শতাব্দির এক লোক প্যান্থিয়নকে তুলনা করেছিল শয়তানের আস্তানার সাথে। তার মতে, উপরের দিককার ঐ ছিদ্রটা দিয়ে শয়তানরা অনুপ্রবেশ করবে। এন্ট্রান্স ফর দ্য ডেমনস্।

লোকটা এখনো ভাগছে না। কী করা যায়। সে এবার কথা বলতে বলতে মুখ তুলে তাকাল ওকুলাসের দিকে। তার মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করল একটা চিন্তা। ভিট্টোরিয়ার কথা যদি ঠিক হয়? একটা অসাড় করা চিন্তা এলোমেলোভাবে চলছে তার মনোজগতে... একজন ব্র্যান্ডেড কার্ডিনাল ঐ গর্ত ধরে পড়ছে! পড়ছে মর্মরের বাঁধানো মেঝেতে। এটা দেখার মত একটা ব্যাপার হবে, অন্তত মিডিয়ার কাছে। ল্যাঙডন এরই মধ্যে জরিপ শুরু করে দিয়েছে। ভিতরে কোন সাংবাদিক আছে কি, নেই।

রুমের অন্যপ্রান্তে, ভিট্টোরিয়া চষে চলেছে চারধার। তার স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে। বাবার মৃত্যুর পর, এই প্রথম সে একা হতে পেরে যেন নিজের কষ্টটাকে উঠে আসতে দিল। গত আটটা ঘণ্টা কীভাবে কীভাবে পেরিয়ে গেল কে জানে! খুন হয়ে গেছে তার বাবা– নিষ্ঠুরভাবে, নির্মমভাবে। একই ব্যথা উথলে ওঠে তার বাবার আবিষ্কারকে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রে রূপান্তরিত হতে দেখে। এন্টিম্যাটারটা বহনযোগ্যতা পেয়েছে তার দোষে। তারই আবিস্কৃত পন্থায়। ব্যাপারটা আরো যন্ত্রণা বয়ে আনে তার কাছে... তার বাবার সত্যানুসন্ধান আজ পড়ে আছে ভ্যাটিকানে, খোদ আরাধ্য স্থানে, ধ্বংসদূত হয়ে।

তার জীবনে আরেক বিস্ময় এই একেবারে অপরিচিত লোকটা। রবার্ট ল্যাঙডন। লোকটার চোখে কোন আকর্ষণ নেই... নিরুত্তাপ। একটা মেয়ে যে তার সাথে আছে, সুন্দর একটা মেয়ে, তা যেন সে টেরই পাচ্ছে না। ঠিক যেন কোনকিছুকে বিন্দুমাত্র মূল্য না দেয়া সমুদ্রের উর্মিমালা... বেপরোয়া, কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক। আজও সে সেই সমুদ্রের কাছেই ছিল। তারপরই খবরটা... সে আসলেই সন্তুষ্ট ল্যাঙডনের মত একজন সঙ্গী পেয়ে। শুধু উষ্ণ সঙ্গই নয়, নয় শক্তির একটা উৎস হিসাবে, ল্যাঙডনের ত্বড়িৎ বুদ্ধিমত্তা তার বাবার খুনিকে ধরে ফেলার একটা সুযোগ এনে দিয়েছে।

বিশাল গোলার্ধ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে বড় করে শ্বাস নেয় একটা ভিট্টোরিয়া। সে ভাবতেও পারে না সমস্ত প্রাণীর প্রতি অদ্ভুত মায়া মাখানো লোকটা, নিতান্তই ধার্মিক লোকটাকে এমন বিকৃত মানসিকতায় খুন করা যায়। সে খুনিকে মৃত অবস্থায় দেখতে চায়। মৃত। সে দেখতে পায় কী এক অব্যাখ্যাত ক্রোধ তার ইতালিয় রক্তে টগবগ করে ফুটছে... এ জীবনে প্রথমবারের মত। তার সিসিলিয়ান পূর্বপুরুষরা পরিবারের অমোচনীয় তিতে ফিসফিস করে যেন প্রতিশোধের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। ভেন্ডেট্টা! ভাবল

মেয়েটা, এবং প্রথমবারের মত তার মূল অর্থ অনুধাবন করতে পারল।

এগিয়ে গেল সে সামনে, যেখানটায় রাফায়েল শানজির কবর আছে। শায়িত আছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক দেয়ালচিত্র আঁকিয়ে।

রাফায়েল শানজি, ১৪৮৩-১৫২০

সে মনোযোগ দিয়ে পড়ল কবরফলকটা। দেখল সেখানকার লেখা।

তারপর... সে আবার পড়ল।

এরপর পড়ল আর।

এক মুহূর্ত পরে, সে ঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটে যেতে লাগল, রবার্ট। রবার্ট!

ল্যাঙডন গায়ে পড়া গাইডের জ্বালায় হন্যে হয়ে গেছে, কিন্তু লাভ হচ্ছে না কিছুমাত্র। তার কাজ আটকে গেছে অনেকাংশে, আটকে গেছে শেষটা। সে ফিরে তাকাল লোকটার দিকে। এখনো একমনে বকবক করছে বয়েসি লোকটা। ল্যাঙডন এগিয়ে গেল সামনের এ্যালকোভের দিকে।

দেখে মনে হচ্ছে বেশ উপভোগ করছেন আপনি এ ব্যাপারটা, বেহায়ার মত কথা বলেই যাচ্ছে লোকটা। আপনি কি জানেন, দেয়ালের এই পুরুত্বের জন্যই ডোমটা প্রায় ভরশূণ্য হয়ে আছে?

নড করল ল্যাঙডন, একবিন্দুও শুনছে না সে লোকটার কথা। হঠাৎ পিছন থেকে কে একজন তাকে ধরে ফেলল। ভিট্টোরিয়া। তার চোখমুখে ঠিকরে পড়ছে আতঙ্ক। সাথে সাথে ল্যাঙডনের মনে হল একটা কথা। সে নিশ্চয়ই কোন মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে। আৎকে উঠল ল্যাঙডন।

আহ্! আপনার স্ত্রী। গাইড লোকটা যেন সত্যি সত্যি উৎফুল্ল হয়েছে, আরো একজন অতিথি পেয়ে যেন আহ্লাদে আটখানা। সে তার শর্ট প্যান্ট আর উঁচু হয়ে ওঠা বুটের দিকে চোখ রেখে বলল, এবার আমি হলপ করে বলতে পারি, আপনি একজন আমেরিকান।

আমি একজন ইতালিয়। ওহ! ডিয়ার!

রবার্ট! ফিসফিস করল ভিট্টোরিয়া, পিছনটা দিল গাইডের দিকে, গ্যালিলিওর ডায়াগ্রামা। আমি দেখতে চাই ওটাকে।

ডায়াগ্রামা! নির্দ্বিধায় নাক গলাল সেই বেহায়া গাইড, মাই! আপনারা নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানেন। কপাল মন্দ, ডকুমেন্টটা দেখতে পাবেন না। সেটা ভ্যাটিকান সিটির গোপন আর্কাইভে।

আপনি কি আমাদের মাফ করতে পারবেন? একটু রুষ্ট হয়ে যেন বলল ল্যাঙডন। ভিট্টোরিয়ার আতঙ্ক দেখে সে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। যত্ন করে সে ডায়াগ্রামার ফোলিওটা বের করল। হচ্ছেটা কী?

এখানে কোন ডেট দেয়া আছে।

খুঁটিয়ে দেখল ল্যাঙডন, কোন তারিখ তো...

ট্যুরিস্ট রিপ্রোডাকশন, বলল ল্যাঙডন, দাঁতের ফাঁক দিয়ে, আপনার সহায়তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আর আমার স্ত্রী একটু একান্ত সময় কাটাতে চাই।

লোকটা পিছিয়ে গেল। তার চোখ পড়ে আছে কাগজটার উপর।

তারিখ... আবার বলল ভিট্টোরিয়া, কবে এটা প্রকাশ পায়?

রোমান অক্ষরে লেখা আছে। সমস্যাটা কোথায়?

ষোলশ উনচল্লিশ?

হু। সমস্যা কোথায়?

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল মেয়েটার, আমরা সমস্যায় আছি, রবার্ট, মহা সমস্যায়। তারিখ মিলছে না।

কোন তারিখ মিলছে না?

রাফায়েলের টম্বের তারিখ। সতেরশো উনষাটের আগ পর্যন্ত তিনি এখানে শায়িতই হননি। ডায়াগ্রামা ছাপা হবার এক শতক পরে।

ল্যাঙডন একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চেষ্টা করছে কথার মর্ম বোঝার। না। রাফায়েল মারা গেছেন পনেরশ বিশে। ডায়াগ্রামার অনেক অনেক আগে।

ঠিক তাই। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন না। অনেক অনেক পরে। তাকে এখানে কবর দেয়া হয়।

কী যা-তা বলছ?

আমি এইমাত্র সেটা পড়ে এলাম। সতেরশ আটান্ন সালে রাফায়েলের দেহাবশেষ এখানে

কবর দেয়া হয়। ইতিহাসের বিখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে তাকে এখানে দাফন করাহয় আবার।

কথাগুলোর ধাক্কা মোটেও সামলে উঠতে পারছে না সে। কী আবোল তাবোল কথাবার্তা হচ্ছে এসব!

কবিতাটা যখন লেখা হয়, ঘোষণার সুরে বলে ভিট্টোরিয়া, তখন রাফায়েলের কবর অন্য কোথাও ছিল। এখানে নয়। সে সময়টায় প্যান্থিয়নের সাথে এ লোকের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না।

কিন্তু... এর মানে...

তাই আমি বলছি। আমরা ভুল জায়গায় এসে বসে আছি।

অসম্ভব... আমি নিশ্চিত ছিলাম... ভাবছে ল্যাঙডন।

সাথে সাথে এগিয়ে গেল ভিট্টোরিয়া ল্যাঙডনকে টেনে নিয়ে, সিনর, মাফ করবেন আমাদের। ষোলশ সালের আগে রাফায়েলের দেহাবশেষ কোথায় ছিল?

আর্ব... আর্বিনো। তার জন্মস্থানে।

অসম্ভব! বলল ল্যাঙডন, মাথা নাড়তে নাড়তে। ইলুমিনেটির আস্তানা এই রোমেই ছিল। আর তাদের সমস্ত কর্মকান্ডও সীমিত ছিল এখানে। রাফায়েলের জন্মস্থানের সাথে এটার পথের কোন সম্পর্ক গড়ানো অসম্ভব।

ইলুমিনেটি? সাথে সাথে রসগোল্লার মত বড় বড় হয়ে গেল গাইডের চোখজোড়া, আপনারা কারা বলুন তো?

সাথে সাথে দায়িত্ব নিয়ে নিল ভিট্টোরিয়া, আমরা এমন এক জায়গার সন্ধানে বেরিয়েছি যেটাকে শানজিস আর্থি টম্ব বলা হয়। রোমের ভিতরেই কোথাও। আপনি কি আমাদের বলতে পারেন কোথায় হতে পারে জায়গাটা?

রোমে এটাই রাফায়েলের একমাত্র কবর।

ল্যাঙডন চেষ্টা করছে ভাবার। কিন্তু তার মন মানতে রাজি নয়।

ষোলশ পঞ্চান্নতে রাফায়েলের টম্ব যদি রোমে না-ই থেকে থাকে তাহলে কী উদ্দেশ্যে কবিতাটা লেখা হয়? শানজিস আর্থি টম্ব উইথ দ্য ডেমনস্ হোল? কোন চুলোর কথা এটা? ভাব!

শানজি নামে আর কোন আর্টিস্ট কি ছিলেন? যথা সম্ভব কথা আদায় করে নিচ্ছে মেয়েটা।

আমি তো জানি না।

আর কোন কোন পেশায় এমন বিখ্যাত কেউ থাকতে পারেন? বিজ্ঞানী, কবি বা এ্যাভেট্রানোমার? শানজি নামে?

এবার যাবার পাঁয়তাড়া কষছে গাইড লোকটা, না, ম্যাডাম, আমি একমাত্র শানজির কথা জানি। রাফায়েল দ্য আর্কিটেক্ট।

আর্কিটেক্ট? আমিতো জানতাম তিনি একজন পেইন্টার।

তিনি উভয়ই ছিলেন। তাদের সবাই। মাইকেলেঞ্জেলো, দা ভিঞ্চি, রাফায়েল।

ল্যাঙডন চারপাশের কবরগুলোর অবস্থিতি দেখে এখন আর কোন কথা তার মনে জায়গা করে নিতে পারছে না। শানজি একজন স্থপতি ছিলেন। তখনকার আর্কিটেক্টরা দু ধরনের কাজই করত। এক-বিশাল বিশাল ধর্মীয় মূর্তি বানাত, অথবা বিভিন্ন দর্শনীয় কবরের এলাকায় ভবন তৈরি করত। শন্তিস টম্ব। এমনটা কি হতে পারে? তার কল্পনা এবার খুব দ্রুত পাখা মেলতে শুরু করল...

দা ভিঞ্চির মোনালিসা
মনেটের ওয়াটারলিলি
মাইকেলেঞ্জেলোর ডেভিড
শানজির আর্থি টম্ব...

শানজি টম্বটার ডিজাইন করেছেন। বলল ল্যাঙডন অবশেষে।

ঘুরে দাঁড়াল ভিট্টোরিয়া, কী?

রাফায়েলের টম্ব বলতে রাফায়েল যেখানে শায়িত আছেন সেকথা বলা হয়নি, তিনি যে টম্ব ডিজাইন করেছেন সেটার কথা বলা হচ্ছে।

কী আবোল তাবোল বকছ?

আমরা ভুল পথে হাঁটছি, আসলে শানজি যেখানে শুয়ে আছেন সেখানকার কথা বলা হয়নি। তিনি যে টম্বটার ডিজাইন করেছিলেন অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করে সেটার কথাই বলা হয়েছে। রেনেসাঁর সময়টায় যত জ্ঞানী-গুণী মারা যেত তাদের কবর দেয়া হত রোমে। আর সে সময়টার লোক ছিলেন রাফায়েল। রাফায়েলের টম্ব বলতে শত শত কবরখানাকে বোঝানো হতে পারে। নিশ্চয়ই তিনি অনেক ডিজাইন করেছেন।

শত শত?

ঠিক তাই।

আর তার মধ্যে কোন না কোনটা আর্থি, প্রফেসর।

সাথে সাথে একটা ধাক্কা খেল ল্যাঙডন। সে রাফায়েলের কাজ সম্পর্কে খুব বেশি জানে না। যা জানে তা দিয়ে মোটামুটি কাজ চালিয়ে নেয়া যায়। তাই বলে... এখানে মাইকেলেঞ্জেলো হলে সে তেড়েফুঁড়ে সব বলতে পারত। সে বড়জোর আরো খান-দুই বিখ্যাত টম্বের কথা বলতে পারবে কিন্তু সেগুলো দেখতে কেমনতরো তার বিন্দু বিসর্গও বলতে পারবে না।

একটু একটু করে পিছিয়ে যেতে থাকা গাইডের দিকে তাকাল ভিট্টোরিয়া, কারণ ল্যাঙডন কোন খেই পাচ্ছে না। সে খপ করে ধরে ফেলল লোকটার হাত, আমরা একটা টম্বের হদিস চাই। এমন এক টম্ব যেটা রাফায়েলের ডিজাইন করা এবং যাকে আর্থি বলা চলে।

এবার যেন গাইডের অবস্থা ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। রাফায়েলের টম্ব? আমি জানি না। তিনি অনেক অনেক ডিজাইন করেছেন। আর আপনারা হয়ত রাফায়েলের ডিজাইন করা কোন চ্যাপেলের কথা বলছেন, টম্ব নয়। স্থপতিরা সব সময় টম্বের সাথে চ্যাপেলের গড়ন গুলিয়ে ফেলেন। এটা করে তারা মজা পান।

হঠাৎ টের পায় ল্যাঙডন, লোকটার কথা কত সত্যি!

রাফায়েলের টম্ব বা চ্যাপেলগুলোর কোনটা কি মেটে হিসাবে বিবেচিত?

শ্রাগ করল লোকটা। আমি দুঃখিত। আপনি কী বলতে চান তার কিছুই আমি বুঝে উঠতে পারছি না। মেটে দিয়ে কী বোঝাচ্ছেন তা আপনিই ভাল বলতে পারবেন। আমায় এবার যেতে হয় যে!

এবার নাচার হয়ে যাওয়া গাইডের দিকে তাকিয়ে ডায়াগ্রামা থেকে পড়তে শুরু করল ভিট্টোরিয়া, ফ্রম শানজিস আর্থি টম্ব উইথ ডেমনস্ হোল। এর কোন মানে কি আপনি ধরতে পারছেন?

একটুও নয়।

এবার হঠাৎ করে খেই ধরে ফেলল ল্যাঙডন, উল্লসিত হয়ে উঠল সে, ডেমনস্ হোল! আরে, মরার শব্দগুলো আগে কেন মনে পড়ল না!

রাফায়েলের টম্ব বা চ্যাপেলের কোনটায় কি ওকুলাস আছে? মানে উপরে কোন ছিদ্র আছে?

আমার জানা মতে, প্যান্থিয়ন ইউনিক। কিন্তু...।

দুজনে একই সাথে চিৎকার করে উঠল, কিন্তু কী?

একটা ডেমনস্ হোল? কিন্তু... বুকো ডিয়াভোলো?

নড করল ভিট্টোরিয়া, অর্থ করলে, ঠিক তাই।

হাসল লোকটা। এই একটা ব্যাপার আছে যেটার সাথে আমি তেমন একটা পরিচিত নই। আমার ভুল না হলে বুকো ডিয়াভেলো দিয়ে আন্ডারক্রফট বোঝানো হয়।

আন্ডারক্রফট? জিজ্ঞেস করল ল্যাঙডন, ক্রিপ্ট?

ঠিক তাই। চার্চের নিচে, মাটির তলায় লাশ মাটি দেয়ার জায়গা। কিন্তু এটা দিয়ে শুধু ক্রিপ্ট বোঝানো হয় না। বোঝানো হয় বিশেষ ধরনের ক্রিপ্ট। আমি যদ্দূর জানি, কবর দেয়ার এক বিশাল এলাকা, যেটা কোন চ্যাপেলে থাকে... অন্য কোন টম্বের নিচে...

অসুয়ারি এ্যানেক্স? জবাব দাবি করল ল্যাংডন, সাথে সাথে উবে গেল তার ভিতরের হতাশা।

আরে... এই শব্দটাই আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ব্যাপারটাকে মাথায় সেঁধিয়ে নিল ল্যাংডন। অসুয়ারি এ্যানেক্স হল এক প্রকারের চ্যাপেল। মাঝে মাঝে চার্চ যখন তাদের প্রিয় সদস্যদের কবর দেয়, তখন মাঝে মাঝে পরিবারের লোকজন দাবি করে যেন তাদের একত্রে কবর দেয়া হয়... তাদের আশা থাকে গির্জার ভিতরেই কোথাও তারা দুজনেই বা সবাই সমাহিত হবে। যখন একটা চার্চের যথেষ্ট টাকা বা জায়গা থাকে না একটা পরিবারের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়ার মত তখন বিকল্প ব্যবস্থা দেখা হয়। তখনি তারা মাঝে মাঝে অসুয়ারি এ্যানেক্স খোঁড়ে। টম্বের পাশে মেঝেতে একটা গর্ত খোদাই করে। ডেমনস্ হোল। কালক্রমে এটা বেশ জনপ্রিয় একটা পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়।

এবার ল্যাংডনের হৃদপিন্ড লাফাচ্ছে। ফ্রম শানজিস আর্থি টম্ব উইথ ডেমনস্ হোল। যেন কোন প্রশ্নের উত্তর মিলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। রাফায়েল কি এমন কোন টম্ব ডিজাইন করেছিলেন যেটায় তেমন ডেমনস্ হোল ছিল?

আসলে... আমি দুঃখিত, এখন একটার কথা মাত্র মনে পড়ছে।

মাত্র একটা! হতাশ হল ল্যাংডন। সে আরো বেশি আশা করেছিল।

কোথায়? প্রায় চিক্কার করে উঠল ভিট্টোরিয়া।

তাদের দিকে অবাক করা চোখে তাকাল লোকটা, এটাকে চিগি চ্যাপেল নামে ডাকা হয়। অগাস্টিনো চিগি আর তার ভাইয়ের টম্ব। শিল্প আর বিজ্ঞানের বড় বড় মহারথী তারা।

বিজ্ঞানের? ভিট্টোরিয়ার দিকে চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে ল্যাংডন তাকাল লোটার দিকে।

কোথায়? আবার প্রশ্ন করল মেয়েটা।

আমি বলতে পারি না টম্বটা আর্থি কিনা... কিন্তু এটুকু নির্দ্বিধায় বলতে পারি... একটু ডিফারেন্টে।

ডিফারেন্ট? ল্যাংডন বলল, কীভাবে?

স্থাপত্যের দিক দিয়ে। রাফায়েল শুধু আর্কিটেক্ট ছিলেন। ভিতরের কারুকাজ আর অন্যান্য ব্যাপার করেছে বাকীরা। আমার মনে পড়ছে না কারা।

ল্যাংডন এবার যেন তীরের কাছে চলে এসেছে। সেই বিখ্যাত ইলুমিনেটি আর্টিস্ট, মাস্টার, আর কে?

কবরটা আর যেমনি হোক না কেন.. বলছে গাইড, সেটা দেখে মনে তৃপ্তি আসবে না। কেন আসবে না? আমার ঈশ্বর জানেন। কে পিরামিদেসের নিচে শায়িত হতে চায়?

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না ল্যাংডন, পিরামিড? একটা চ্যাপেলের ভিতরে পিরামিড আছে? এখান থেকে কতদূরে?

মাইলখানেক উত্তরে। সান্তা মারিয়া ডেল প্রোপোলোতে।

সাথে সাথে ধন্যবাদ দিয়ে হিসাব চুকিয়ে দিতে চাইল ভিট্টোরিয়া, ধন্যবাদ আপনাকে, চল-

হেই! সাথে সাথে বাধা দিল বয়েসি গাইড লোকটা, আমি ভেবে পাই না কী বোকা আমি!

ভিট্টোরিয়া সাথে সাথে তার দিকে তাকাল, বলবেন না প্লিজ, আপনার কোন ভুল হয়েছে।

না, ভুল হয়নি। বরং একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আসি। চিগি চ্যাপেল সব সময় চিগি নামে পরিচিতি পায় না। এর আরো একটা নাম আছে। চ্যাপেলা ডেলা টেরা।

চ্যাপেল অব দ্য ল্যান্ড? অনুবাদ করেই জানতে চাইল ল্যাংডন।

না। শুধরে দিল ভিট্টোরিয়া, চ্যাপেল অব দ্য আর্থ।

ভিট্রোরিয়া ভেট্রা তার সেলফোনে যোগাযোগ করল কমান্ডারের সাথে। কমান্ড ওলিভেট্টি! বলল সে, আমরা ভুল জায়গায় মাথা কুটে মরছি।

ভুল? কী বলতে চান আপনি?

সায়েন্সের প্রথম অল্টার হল চিগি চ্যাপেল।

কোথায়? কিন্তু মিস্টার ল্যাঙডন বলেছিলেন...

সান্তা মারিয়া ডেল পোপোলো। এক মাইল উত্তরে। আপনার লোকজনকে সেখানে সরিয়ে নিন। দ্রুত। আমাদের হাতে মাত্র চার মিনিট সময় আছে।

কিন্তু আমার লোকজন এখানে পজিশনে আছে। আমি সম্ভবত সময়ের মধ্যে...

মুভ! বন্ধ করে দিল ভিট্রোরিয়া তার সেলফোনটা।

তার পিছনে পিছনে প্যান্থিয়ন থেকে বেরিয়ে এল ল্যাঙডন।

এখন আর সুইস গার্ডের গাড়িতে আরামে আয়েশে ফিরে যাবার সময় নেই। ভিট্রোরিয়া খামচে ধরল ল্যাঙডনের হাত। সোজা টেনে নিয়ে চলল সামনের দিকে। তারপর যেখানে ট্যাক্সির লাইন জটলা বাধিয়ে রেখেছে সেখানে প্রথম ক্যাবটাকে খালি পেয়েই ঝটকা দিয়ে খুলে ফেলল সেটার দরজা। ধড়ফড় করে জেগে উঠল ড্রাইভার।

কিছু বোঝার আগেই ভিতরে ঠেলে দিল সে ল্যাঙডনকে, তারপর কিছু বুঝতে না দিয়ে ড্রাইভারকে বলল, সান্তা মারিয়া ডেল পোপোলো। চিৎকার করে বলল, প্রেসতো!

ঘুমভাঙা চোখে তাকিয়ে কী বুঝল ড্রাইভারই বলতে পারবে। সোজা এ্যাক্সিলারেটরে পা দাবিয়ে দিল সে।

গুন্থার গ্লিক, চিনিতাম্যাক্রির কাছ থেকে কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল নিজের হাতে।

আমি তোমাকে আরো আগেই বলেছিলাম, বলল গ্লিক, কম্পিউটারের আরো কিছু কি চাপ দিয়ে, ব্রিটিশ টেটলার একমাত্র পত্রিকা নয় যেটা সর্বক্ষণ এসব নিয়ে মেতে থাকে।

ম্যাক্রি আরো কাছে এসে চোখ বুলিয়ে নেয়। গ্লিকের কোথাও ভুল তো হয়নি। গত দশ বছরে বিবিসির ডাটাবেসে ইলুমিনেটি নামক সংস্থাটা নিয়ে ছবার খবর বেরিয়েছে। আমাকে লালচে রঙে রাঙিয়ে নাও। মনে মনে বলল ম্যাক্রি। কে এই কাহিনীর জনক? কোন সাংবাদিক? সে রসিকতা ভালই করতে জানে।

নোংরা রসিকতা বিবিসি করে না।

তারা তোমাকে ভাড়া করেছে কোন দুঃখে?

আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি এমন করছ। ইলুমিনেটি একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার।

একই রকম ঐতিহাসিক ব্যাপার ডাইনি বুড়িরা, ইউ এফ ও এবং নোচ নেস দানবেরা।

ঘটনার পরম্পরা পড়ছে গ্লিক। উইনস্টন চার্চিল নামে কোন লোকের কথা কি কখনো তুমি শুনেছ?

মনের ঘন্টি বাজিয়ে দেয়।

তুমি কি জান, উনিশো বিশের দশকে এই চার্চিল ইলুমিনেটির অনৈতিক কাজের জন্য সারা দুনিয়াকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন?

কোথায় এ নিয়ে লেখা এসেছিল? ব্রিটিশ টেটলারে?

লন্ডন হেরাল্ডে। আটই ফেব্রুয়ারি, উনিশো বিশ।

অসম্ভব।

নিজের চোখে দেখ।

ক্লিপটার দিকে আরো তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় ম্যাক্রি। ঠিকই তো! যাক। চার্চিল একজন প্যারানয়েড ছিল।

সে একা হলেও কথা ছিল। উড্রো উইলসন উনিশো একুশে আরো একটা তথ্য জানান। রেডিও ব্রডকাস্টে তিনি ঘোষণা করেন, আমেরিকান অর্থনীতির উপর ক্রমাগত ইলুমিনেটির প্রভাব বাড়ছে। তুমি কি রেডিও ট্রান্সক্রিপ্টটা দেখতে চাও?

আরে না না।

তিনি বলেছিলেন, খুব ভালভাবে সংগঠিত, খুব তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন, খুব পরিপূর্ণ, খুব লক্ষ্যস্থির করা এমন এক শক্তি আছে, যারা যখন কোন কথা বলে তার উপর কোন কথা বলার মত শক্তি আর কেউ পায় না।

আমি কখনো এ সম্পর্কে কিছু শুনিনি!

হয়ত এজন্যে যে উনিশো একুশের দিকে তুমি একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলে।

ভাল, ভাল! ম্যাক্রি মনে মনে একটু ধাক্কা পেলেও সেটাকে কোনমতে সামলে নেয়। তার বয়স এখন তেতাল্লিশ। কম নয়। তার চুলের ঢল এখন একটু ধূসর হয়ে উঠছে। তার মা, একজন ব্যাপ্টিস্ট, যে তাকে শিক্ষা দিয়েছিল।

দেখো তুমি একজন কালো মেয়ে, তার মা বলতেন, কখনো সত্যটা লুকানোর চেষ্টা করবে না। যেদিন তুমি তেমন কোন চেষ্টা করবে সেদিনই তোমার আত্মিক মৃত্যু হবে। আর তাই, সব সময় তুমি হাসবে। তারা ভেবে মরবে কোন দুঃখে তুমি হাসছ।

কখনো সিসিল রোডসের নাম শুনেছ? জিজ্ঞেস করল গ্লিক।

ব্রিটিশ প্রযোজক?

হ্যাঁ। রোডস স্কলারশিপ যিনি শুরু করেন।

আমাকে বলো না–

ইলুমিনেটাস।

বিএস?

বিবিসি, আসলে। নভেম্বর ষোল, উনিশো চুরাশি।

আমরা লিখেছি যে সিসিল রোডস -ইলুমিনেটি?

আর আমরা আরো জানি যে রোডস স্কলারশিপ আর কিছুই নয়,তরুণ ইলুমিনেটিদের পড়ালেখা চালানোর জন্য একটা সহায়তার বৈতরণী।

অসম্ভব! আমার কাকা একজন রোডস স্কলার ছিলেন।

বিল ক্লিনটনও।

এবার তেতে উঠল ম্যাক্রি। সে গুজব খবরে মোটেও বিশ্বাস করে না বরং ব্যাপারটাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। তবু সে জানে, বিবিসির মত কোন প্রতিষ্ঠানই এত ছেঁকে, এত ভেবে চিন্তে খবর প্রকাশ করে না।

আরো একটা ব্যাপার আছে ম্যাক্রি, কথাটা তোমার জন্য ভালই হবে। উনিশো আটানব্বইয়ের পাঁচ মার্চ। পার্লামেন্ট কমিটি চেয়ার, ক্রিস মুলিন ডাকলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সবাইকে, যারা মেসন ছিলেন। তাদের সাথে মত বিনিময় হলতার।

মনে আছে ম্যাক্রির। ভুলে যায়নি সে। কেন এটা হয়েছিল? আরেকবার বলবে?

পড়ল গ্লিক, ... মেসনদের ভিতরেই দানা বেঁধে উঠছে আর একটা গুপ্ত সংস্থা। সেটা আগা-পাশ-তলা এক সর্বগ্রাসী সংঘ যেটা রাজনৈতিক আর আর্থিক সুবিধাগুলো একে একে দখল করে নিচ্ছে।

কথা সত্যি।

কিন্তু তাতে করে সমস্যা আরো বেড়ে যায়। পার্লামেন্টের মেসনরা সাথে সাথে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এমনটাই হবার কথা। বেশিরভাগই ছিল একেবারে গোবেচারা। তারা মেসনে যোগ দিয়েছে রাজনৈতিক সুবিধা পাবার জন্য। মানুষের সেবা, সমাজসেবা, চ্যারিটি... ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের দরকার সুবিধা।

সুবিধাদরকার ছিল।

যাই হোক। বলল গ্লিক, মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে, এটার দিকে তাকাও একবার। এখানে ইলুমিনেটির গোড়ার দিকে আসা হচ্ছে। গ্যালিলিওর সময়টা। ফ্রান্সের গুয়েরেনেট, স্পেনের এ্যালুম্ব্রাডোস, এমনকি কার্ল মার্ক্স এবং রাশিয়ান বিপ্লব।

ইতিহাসের একটা নিজস্ব পন্থা আছে। নিজেকে সে বারবার নিজের মত করে লিখে নেয়।

দারুণ! তুমি সাম্প্রতিক কালের কোন তথ্য পেতে চাও? এদিকে চোখ মেলে তাকাও। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে এখানে একটা নতুন খবর আছে।

জার্নালে?

তুমি কি জানো আমেরিকায় বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় কম্পিউটার গেম কোনটা?

পিন দ্য টেইল অন পামেলা এন্ডারসন।

কাছাকাছি গেছ। এর নাম ইলুমিনেটি: নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার।

ম্যাক্রি এবার এগিয়ে এসে পড়তে শুরু করল, স্টিভ জ্যাকসনের গেম সব সময়েই দারুণ বাজার পায়... এক পরা-ঐতিহাসিক এ্যাডভেঞ্চার যেখানে বাভারিয়া থেকে প্রাচীণ শয়তানি সংঘের দ্বারা পুরো পৃথিবীতে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়। আপনি এগুলোকে অন-লাইনেও পেতে পারেন...।

এবার টনক নডল ম্যাক্রির, এই ইলুমিনেটির সাথে ক্রিশ্চিয়ানিটির কী প্রতিদ্বন্দ্বীতা?

শুধু খ্রিস্টবাদ নয়। এক কথায় ধর্ম। আমি যে লোকটার কথা এইমাত্র শুনলাম সে আর যাই হোক না কেন, এমন কোন সংঘ থেকে আসতেও পারে।

ওহ্! কাম অন! তুমি নিশ্চয়ই আশা কর না যে এ লোকদের সাথে সত্যি সত্যি সেই প্রাচীণ ইলুমিনেটির যোগাযোগ আছে এবং তারা নাকিভ্যাটিকান সিটি থেকে চারজন কার্ডিনালকে গায়েব করে দিয়েছে?

ইলুমিনেটির সেই বার্তাবাহকের কথা? অবশ্যই বিশ্বাস করি।

ল্যাঙডন আর ভিট্টোরিয়ার ট্যাক্সি এক মিনিটের মধ্যে ভায়া ডেলা স্ক্রোফা ধরে এক টানে চলে এল মাইলখানেক পথ। ঠিক যেন কোন ড্রাগ গেম, কিম্বা বলা ভাল স্প্রিন্ট। আটটার ঠিক আগে আগে তারা সেখানে পৌঁছল। কোন সমস্যা না হওয়াতে ল্যাঙডন ট্যাক্সিওয়ালা লোকটাকে ডলারে পে করল। অনেক বেশি। সাথে সাথে বাইরে বেরিয়ে এল তারা দুজন। জনপ্রিয় রোসাতি ক্যাফেতে এলাকার কয়েকজন লোকের হৈ হল্লা ছাড়া এলাকাটাকে একেবারে নিরব বলা চলে। বাতাসে পেস্ট্রির চনমনে গন্ধ।

এখনো ল্যাঙডন প্যান্থিয়নের ব্যাপারটা ভুল হবার ধাক্কা সামলে উঠতে পারছে না। চোখ পড়ে আছে মিকির দিকে, তার মন পড়ে আছে রাত আটটার দিকে। এখনি টিকটিক শুরু করে দিয়েছে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। পিয়াজ্জা যেন ইলুমিনেটির নানা বর্ণের প্রতীকে ভরপুর। শুধু আকৃতিগত মিল নয়। দেখা যাচ্ছে ডলারে থাকা পিরামিড। উচ্চতার প্রতীক। এখানে এটা একটু অন্যরকম। পাথুরে গড়ন, বিশাল উচ্চতা, বিপুল বপু। এখানে সবাই এটাকে এক নামে চেনে।

মনোলিথটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ল্যাঙডন টের পায় যে আরো বেশি উল্লেখ্য কিছু দেখা যাচ্ছে এখানে।

আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি, বলল সে শান্ত স্বরে, একবার আশপাশে তাকিয়ে দেখ। শিউরে উঠছে সে মনে মনে প্রকাশ করছে না।

সামনে একটা পাথুরে পথ। সেদিক থেকে আরো একটা ব্যাপার চোখে পড়ে। দেখে পরিচিত মনে হচ্ছে কি?

ত্রিকোণ পাথরের স্তুপের উপরে জ্বলজ্বলে একটা তারকা?

পিরামিডের উপরে আলোক বর্তিকার উৎস।

নড়েচড়ে দাঁড়াল ভিট্টোরিয়া, ঠিক যেন... ঠিক যেন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট সিল?

ঠিক তাই। মেসনিক এক ডলারের নোট।

সাথে সাথে গভীর ভাবে একটা দম নিল ভিট্টোরিয়া, তারপর একটা মুহূর্ত চুপ থেকে সে বলল, তাহলে কোথায় সেই মরার চার্চ?

সান্তা মারিয়া ডেল পোপোল গির্জা দাঁড়িয়ে আছে একটা ভুল জায়গায় বসানো যুদ্ধজাহাজের মত। পিয়াজ্জার দক্ষিণ-পূর্ব পাশে। একাদশ শতকের স্থাপত্য সগর্বে মাথা উঁচু করে রেখেছে।

এগিয়ে গেল ল্যাঙডনও। ভিতরে কি সত্যি সত্যি কোন হত্যাকান্ড হতে যাচ্ছে? কে জানে! শিউরে উঠল সে আবার। তার মনে একটাই আশা। ওলিভেট্টি যদি কোনমতে তাড়াতাড়ি করতে পারে! আবারও তার পকেটের পিস্তলটা ভারি ভারি ঠেকছে।

গির্জার প্রথমদিকের সিঁড়িগুলো হল ভেন্টাগ্লিও- স্বাগত জানানো, বাঁকানো পথ কিন্তু এ পথ বাঁধা পড়ে আছে। নির্মাণ সামগ্রীতে ঠাসা জায়গাটা। সেই সাথে একটা সতর্কবাণীও লটকে দেয়া আছেঃ-

কন্সট্রাজিওন। নন এন্টারে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আরেকবার বিষম খেল তারা দুজনেই। একটা নির্মীয়মান চার্চ মানে খুনির খুন করার জন্য একেবারে অভয়ারণ্য। প্যান্থিয়নের মত না। কোন চালাকির দরকার নেই, নেই কোন পরিকল্পনা বা ছদ্মবেশের। শুধু ঢোকার জন্য একটা পথ বের করে নাও, ব্যস।

বিনা দ্বিধায় ভিট্টোরিয়া সেগুলোর ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগিয়ে গেল।। তাকে বাধা দিল ল্যাঙডন। ভিট্টোরিয়া! বলল সে, এখনো যদি লোকটা ভিতরে থেকে থাকে .....

কিন্তু থোড়াই পরোয়া করে ভিট্টোরিয়া। সে গটগট করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। চার্চের মূল দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তড়িঘড়ি করে তার পিছন পিছন এগিয়ে এল

ল্যাঙডন। প্রাণান্ত চেষ্টা করল তাকে বাধা দেয়ার। কিন্তু যা করার করে বসেছে ভিট্রোরিয়া। চার্চের মূল হলরুমের কাঠের দরজার হাতল ধরে টেনে নিয়েছে নিজের দিকে। কিন্তু দরজা খুলছে না।

নিশ্চয়ই অন্য কোন প্রবেশপথ আছে। বলল ভিট্রোরিয়া।

সম্ভবত। শ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল ল্যাঙডন, কিন্তু ওলিভেট্টি এক মিনিটের মধ্যে এখানে হাজির হচ্ছে। কিন্তু ভিতরে যাওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সবচেয়ে ভাল হয় আমরা যদি বাইরেই থাকি আর অপেক্ষা করি মূল সময়ের জন্য। যেন কেউ বাইরে বেরুতে না পারে–

সাথে সাথে চট করে তার দিকে ফিরল ভিট্রোরিয়া। চোখ তার আগুন বর্ষাচ্ছে, যদি ঢোকার মত অন্য কোন পথ থেকেই থাকে, বেরুবার পথও থাকবে। লোকটা যদি একবার হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, আমাদের প্রাণপাখিও উড়ে যাবে। আমরা হয়ে যাব ফ্রিগেটি।

মেয়েটার কথা যে ঠিক সেটা বোঝার মত ইতালি ল্যাঙডন জানে।

চার্চের মূল পথটা অন্ধকার। দু পাশেই উঁচু দেয়াল। সেখানে আরো একটা গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছে। আর সব মহান সিটির মতই এটা, যেখানে বার আছে অগুণতি কিন্তু রেস্ট রুমের সংখ্যা একেবারে হাতেগোণা। বিশটার অনুপাতে একটা। তাই ইউরিনের গন্ধ তাকে বিরক্ত করছে।

সেই অন্ধকারের দিকেই তারা দুজনে এগিয়ে গেল যেখানে অবশেষে ভিট্রোরিয়া আকড়ে ধরল ল্যাঙডনের বাহু। নির্দেশ করল সামনে।

ভিট্রোরিয়ার দেখানো দিকে চোখ পড়েছে ল্যাঙডনেরও। সামনের কাঠের দরজাটায় ভারি পাল্লা ঠাসা। বোঝাই যাচ্ছে এটা ক্লার্জিদের জন্য একটা প্রাইভেট এন্ট্রান্স।

বেশ কয়েক বছর ধরেই এগুলো একেবারে অকেজো হয়ে আছে। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীরা আর বাড়ি-ঘর বানিয়ে লোকজন, গলি-তস্য গলি আর পথ বানিয়ে বানিয়ে একেবারে অকেজো করে দিয়েছে গির্জাটার অন্য প্রবেশপথটাকে।

দ্রুত এগিয়ে গেল ভিট্রোরিয়া, এগিয়ে গেল ল্যাঙডনও। যেখানে ডোরনব থাকার কথা সেখানে একটা কিম্ভুত কিমার্কার জিনিস ঝুলছে।

এ্যানুলাস, ফিসফিস করল ল্যাঙডন। কাছে এগিয়ে গেছে সে। আলতো করে টেনে ধরেছে সে রিঙটাকে। সে টেনে ধরল রিঙটাকে তার দিকে। ফলে ভিতর থেকে একটু ক্লিক করে শব্দ হল। এগিয়ে গেল ভিট্রোরিয়া, একটু অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে তাকে। রিঙটাকে এবার ল্যাঙডন সেটাকে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরাল। তিনশো ষাট ডিগ্রি ঠিকভাবেই এটা ঘুরে গেল। অন্যদিকেও ল্যাঙডন একই ভাবে ঘোরাল সে জিনিসটাকে এবং একই ফল পেল।

সামনের গলির দিকে চোখ ফেলল ভিট্রোরিয়া, তুমি কি মনে কর সেখানে আরো পথ আছে?

সন্দেহ করছে ল্যাঙডনও। রেনেসাঁর যুগের স্থাপত্যকর্মগুলোর আরো কিছু বৈশিষ্ট আছে। সেগুলোকে নিরাপদ করার একটা তাগিদ থাকত সবার। তাই যথা সম্ভব কম প্রবেশপথ রাখা হত সে যুগে। সেখানে যদি আর কোন পথ থেকেই থাকে, থাকবে পিছনে। অবশেষে বলল সে, তবে সেটা আছে বেরিয়ে আসার পথ হিসাবে। ঢোকার পথ নয়।

কথা শোনার সময় নেই ভিট্রোরিয়ার। সে কথা শেষ হয়ে যাবার আগেই ছোটা শুরু করল।

সামনে এগিয়ে গেল ল্যাঙডন। তার দুপাশে দেয়াল আকাশ ছুঁয়ে দিচ্ছে। আশপাশে কোথাও একটা বেল বেজে উঠল। আটটা বাজে।

প্রথম ডাকটা শুনতে পায়নি রবার্ট ল্যাঙডন। ভিট্রোরিয়া ডাকছে তাকে। সে একটা কাঁচের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চার্চের ভিতরটা দেখার প্রাণান্ত চেষ্টায় মেতে ছিল।

রবার্ট! আবার ডাক শুনে সে সচকিত হয়। একটু জোরে এই ফিসফিসে শব্দটা আসে এবার।

মাথা তুলে তাকাল ল্যাঙডন। পথের শেষপ্রান্তে আছে ভিট্টোরিয়া। সে গির্জার পিছনদিকটা নির্দেশ করে তার দিকে ফিরে হাত নাড়ছিল। ল্যাঙডন ধীরে জগিং করার ভঙ্গিতে তার দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে একটা সরু পথ। সোজা নেমে গেছে গির্জার তলার দিকে।

প্রবেশপথ? জিজ্ঞেস করল ভিট্টোরিয়া।

নড করল ল্যাঙডন। আসলে একটা বহির্গমন পথ। কিন্তু এখন আমরা প্রবেশ বাহির নিয়ে বিবাদ করব না।

ভিট্টোরিয়ার কর্মোদ্যমে কোন ঢিল নেই। সে সাথে সাথে বলল, দরজাটা চেক করে নিই। যদি খোলা পাওয়া যায়!

ল্যাঙডন মুখ খুলতে গিয়েছিল। মানা করবে, তার আগেই কাজে নেমে পড়ল ভিট্টোরিয়া।

দাঁড়াও! বলল ল্যাঙডন তাকে।

অধৈর্য ভঙ্গিতে তার দিকে তাকাল মেয়েটা।

বাগড়া দিল ল্যাঙডন, আমি আগে যাচ্ছি।

কেন? বীরত্ব দেখানো?

সৌন্দর্যের আগে এগিয়ে যাবে বয়স।

এটা কি কোন রকমের প্রশংসার মধ্যে পড়ছে?

হাসল একটু ল্যাঙডন। ভাগ্যিস আলো কম ছিল, তার অপ্রস্তুত ভাবটা ধরা পড়ে যাচ্ছে না। সিড়ির ব্যাপারে সাবধান।

দেয়ালে এক হাত রেখে সে খুব ধীরে ধীরে প্রবেশ করে ভিতরে। হাতের তালুতে খোচা দিচ্ছে পাথুরে এবড়োথেবড়ো দেয়াল। মিনোটারের গোলকধাধায় কীভাবে তরুণ ডেডেলাস আঁধারে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গিয়েছিল সে কথাটা তার মনে পড়ে। একটা বিশ্বাস তার দৃঢ় ছিল, একবারো দেয়াল থেকে সরে না গেলে সে ঠিক ঠিক আসল জায়গায় গিয়ে হাজির হবে। বেরুতে পারবে গোলকধাধা থেকে। দেয়ালে হাত রেখে ল্যাঙডন এগিয়ে যাচ্ছে, সে জানে না ঠিক পথটা শেষ করতে চায় কিনা।

সুড়ঙ্গটা আরো আরো সরু হয়ে আসছে। গতি কমাল ল্যাঙডন। তার ঠিক পিছনেই এগিয়ে আসছে ভিট্টোরিয়া। দেয়াল ঘুরে যাবার পর একটা অর্ধ-গোলাকৃতির এ্যালকেভে গিয়ে হাজির হল তারা। অবাক হলেও সত্যি, এখানে আলোর একটা ক্ষীণতম আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আলোর আড়ালে দেখতে পেল সে, একটা বড় কাঠের দরজা আছে।

ওহ্! বলল সে।

লক করা?

ছিল।

ছিল? এবার এগিয়ে এল মেয়েটা।

হাতের ইশারায় দেখাল ল্যাঙডন। ভিতর থেকে আলোর একটা ক্ষীণ রেখা এগিয়ে আসছে। দরজা ভাসছে আলোয়। এটার পাল্লা খোলা হয়েছে যে টুল দিয়ে সেটা এখনো লাগানো আছে।

নিরবতায় তারা একটা মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকে। তারপর, আঁধারে ভিট্টোরিয়ার হাত টের পায় ল্যাঙডন। তার বুকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে মেয়েটা।

রিল্যাক্স, প্রফেসর। বলল সে, আমি শুধু গানটা খুঁজে পাবার চেষ্টা করছি।

সেই মুহূর্তেই, ভ্যাটিকান মিউজিয়ামের ভিতরে চারদিক থেকে সুইস গার্ডের একটা টাস্ক ফোর্স এগিয়ে এল। জাদুঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং গার্ডরা ইউ এস মেরিনদের জন্য বরাদ্দকৃত নাইট ভিশন গগলস পরে আছে , সবুজের শেডে প্রতিটা জিনিস দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। প্রত্যেকের সাথে একটা করে হেডফোন আছে, সেটার সাথে আছে একটা করে ছোট এ্যান্টেনার মত ডিভাইস। এগুলো তারা ব্যবহার করে সপ্তাহে দুবার। ইলেক্ট্রনিক ছারপোকা

খুঁজে বের করার কাজে। তাদের দক্ষ হাতের কাজ এগিয়ে চলেছে প্রতি পলে। সামনে চৌম্বক ক্ষেত্রের বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা গেলেও সেটা ধরা পড়ে যাবে।

আজ রাতে, যাই হোক, তারা কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না।

৬৫

সান্তা মারিয়া ডেল পোপোলোর ভিতরটা মৃদু আলোয় নেয়ে উঠছে। দেখতে মোটেও ক্যাথেড্রালের মত নয়। বরং দেখে মনে হতে পারে কোন অর্ধ সমাপ্ত সাবওয়ে ট্রেনের স্টেশন এটা। মূল মঞ্চটাও খালি নেই। চারধারে ঠাসা জিনিসপত্র। নির্মাণ সামগ্রী। অতিকায় থাম উঠে গেছে অনেক উপরে, ছাদ পর্যন্ত। সামনে একটা দেয়ালচিত্র দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে যায় ল্যাঙডন সেটার দিকে একটু।

কিছু নড়ছে না ভিতরে। একেবারে স্থির।

দু হাত একত্র করে ভিট্টোরিয়া পিস্তলটা বের করে আনে। ঘড়ি চেক করে দেখে ল্যাঙডন, আটটা বেজে চার। আমরা ভিতরে ঢোকার সাহস করে ঠিক ভাল করিনি। ভাবছে সে, এখানে থাকাটা বেশি সাহসের কাজ। আর এমন খুনে সাহসের কোন দরকার নেই। সে জানে, খুনি যদি এখানে থেকেও থাকে, সে চাইলেই যে কোন দরজা। দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। কোন সমস্যা হবে না তার। আর লোকটা নিশ্চয়ই খুনোখুনীতে সিদ্ধহস্ত। তাই এত কষ্ট করে ভিতরে ঢোকার কোন মানেই দাঁড়াবে না। ভিতরে তাকে পাকড়াও করে ফেলার পথটাই সবচেয়ে ভাল হত... আর যদি সে ভিতরে থেকে থাকত তাহলে না একটা কথা ছিল। ল্যাঙডন প্যান্থিয়নে সে চেষ্টা করে দেখেছে এবং লাভের লাভ কিছু এখানেও হবে বলে মনে হয় না। সে আর এখন যাই বলুক না কেন, সতর্ক থাকতে বলতে পারে না। এই পর্যায়ে সে-ই সবাইকে টেনে এনেছে।

ভিতরটা খুটিয়ে দেখল মেয়েটা... তো, কোথায় তোমার চিগি চ্যাপেল?

চারদিকে তাকাল সে। বিশাল কামরা, কামরার লাগোয়া দেয়াল, দেয়ালের ফ্রেস্কো, স্তুপ করে রাখা রাশি রাশি নির্মাণ সামগ্রী... সবই আছে ঠিকঠাক। কিন্তু একটা ব্যাপার হঠাৎ করে তার মনে পড়ে গেল। রেনেসাঁর যুগে মাঝেমধ্যেই গির্জার মধ্যে একাধিক চ্যাপেল বানানোর রেওয়াজ ছিল। নটরডেমের মত বড় বড় ক্যাথেড্রালগুলোয়ডজন ডজন আছে। চ্যাপেলগুলো ঠিক ঘর নয়, বরং যেন একটা শূণ্যতা। অর্ধ গোলাকার এলাকা... একটা গির্জার বাইরের এলাকা জুড়ে থাকে।

চার দেয়ালে চারটে ছবি দেখে মনে মনে ভাবল ল্যাঙডন, দুঃসংবাদ। এখানে মোট আটটা চাপেল আছে। যদিও আট সংখ্যাটা বুক কাঁপিয়ে দেয়ার মত কিছু নয় তবু এখন এই আটটাকে দেখে ফেলা মুখের কথা নয়। সবগুলোই এখন নির্মাণকালীন সতর্কতার মধ্যে পড়ছে। সবগুলোতেই পলিথিন দিয়ে প্রবেশপথ ঢেকে রাখা।

এই সবগুলোতে প্রবেশ করার কথা চিন্তাও করা যায় না। বলল ভিট্টোরিয়াকে ল্যাঙডন, তারচেয়ে মনে হয় কোনটা চিগি সেটা বোঝার জন্য বরং ভিতরে যাওয়া অনেক ভাল। কিন্তু সেটা নিজের পায়ে কুড়াল মারার মত ব্যাপার হবে না কি? আমি চিন্তা করছিলাম ওলি....

কোথায় সেকেন্ডারি লেফট এপস্?

আর্কিটেকচারাল কথাবার্তা শুনে একটু দমে গেছে ল্যাঙডন মনে মনে, সেকেন্ডারি লেফট এপস?

তার পিছনের দেয়ালের দিকে নির্দেশ করল ভিট্টোরিয়া! সেখানকার পাথরে একটা টাইল বসানো। তারা বাইরে যে সিম্বল দেখেছে এখানেও সেটা আছে। একটা পিরামিডের উপরে এক জ্বলজ্বলে তারকা। এর পাশে লেখা আছে আরো কিছু

কোট অব আর্মস অব আলেক্সান্দার চিগি
হুজ টম্ব ইজ লোকেটেড ইন দি
সেকেন্ডারি লেফট এপস্ অব দ্য ক্যাথেড্রাল

নড করল ল্যাঙডন। চিগির কোর্ট অব আর্মস কি পিরামিড আর তারা? হঠাৎ তার মাথায় আরো একটা চিন্তা খেলে গেল। এই চিগি লোকটাও ইলুমিনেটাস নয়ত? নড করল সে ভিট্টোরিয়ার দিকে তাকিয়ে, নাইস ওয়ার্ক, ন্যান্সি ড্রিউ।

কী?

নেভার মাইন্ড। আমি—

একটা ধাতব জিনিস পড়ল তাদের সামনে। সেটা থেকে ঝনঝন শব্দে সারা হল ভরে গেল। শব্দের দিতে তাক করে ধরেই রেখেছে ভিট্টোরিয়া তার হাতের গানটাকে। তাকে পাশ থেকে আশ্বাসের ভঙ্গিতে ধরল ল্যাংডন। নিরবতা। আবার শব্দ এল। এবার শ্বাস আটকে ধরল ল্যাংডন, আমাদের এখানে আসাটা মোটেও উচিৎ হয়নি! শব্দটা তাদের ভড়কে দিয়েছে। এবার তারা এগিয়ে এল। দেখা যাচ্ছে কী যেন। পিলারের দিকে।

ফিগলিও ডি পুট্টানা! পিছনে পড়ে যেতে যেতে বিড়বিড় করল ভিট্টোরিয়া। ল্যাংডন তার সাথে সাথে এলিয়ে পড়ল।

সামনে ছিল একটা আধ খাওয়া স্যান্ডউইচ মুখে বিশাল বপু এক ইদুর। সেটা বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল তাদের দিকে। নির্নিমেষ। তাকিয়ে থাকল ভিট্টোরিয়ার হাতের গানটার দিকে। যেন ব্যারেল নিরীক্ষণ করছে। তারপর বিরক্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল সামনে।

সন অব এ... কোনমতে নিজেকে সামলে নিল ল্যাংডন। মুখ ফসকে বেমক্কা গালিটা আর একটু হলেই বেরিয়ে যাচ্ছিল।

নিচু করল ভিট্টোরিয়া গানটাকে। ছন্দ ফিরে পেতে কয়েকটা মুহূর্ত নষ্ট করল। সামনে এক মহিলার আধ খাওয়া লাঞ্চবক্স দেখা যাচ্ছে। লিপস্টিক লেগে আছে সেটায়।

ভিট্টোরিয়ার দিকে রোষ কষায়িত নেত্রে তাকিয়ে ল্যাংডন বলল, মরার লোকটা যদি এখানে থেকেই থাকে তাহলে তোমার কথা ঠিক ঠিক শুনতে পেয়েছে, তুমি কি শিওর এখনো ওলিভেট্টির জন্য অপেক্ষা করবে না?

সেকেন্ডারি লেফট অপস, যেন তার কোন কথাই শুনতে পায়নি ভিট্টোরিয়া, এমন সুরে বলল, কোথায় হতে পারে জায়গাটা?

অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ল্যাংডন বুঝে নিল কোথায় আছে চিগি চ্যাপেল। তারপর সেদিকে ফিরে সন্ত্রস্ত হয়ে দেখল, তাদের হিসাব ঠিকই আছে, এটা ভাল খবর। খারাপ খবর হল, তারা একেবারে প্রান্তে বসে আছে। যেতে হলে চিগির চ্যাপেলের মত আরো তিনটাকে পেরিয়ে যেতে হবে।

দাঁড়াও, বলল ল্যাংডন, আমি আগে যাচ্ছি।

ভুলে যাও।

আমিই কিন্তু প্যান্থিয়নে আগে গিয়েছিলাম।

সাথে সাথে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ভিট্টোরিয়া, পুরোপুরি মারমুখী, কিন্তু অস্ত্র আছে আমার কাছে।

তার চোখে আসলে অন্য কথা দেখতে পাচ্ছে ল্যাংডন, ... আমিই সে জন যার বাবা মারা গেছে। গণবিদ্ধংসী অস্ত্র তৈরির ইন্ধন যে যুগিয়েছিল সে জন আমিই। এই লোকটার উপর প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার শুধু...

মেনে নিল ল্যাংডন। এগিয়ে যেতে দিল তাকে। ভিট্টোরিয়ার পাশে পাশে এগিয়ে আসছে সে। যেন পাগলাটে, অন্য গ্রহের আতঙ্কে ভরা কোন খেলা খেলছে তারা।

ভিতরে ভিতরে গির্জাটা একেবারে নিশ্চুপ। বাইরের হট্টগোলের এক কণাও আসছে না পাথুরে দেয়াল ভেদ করে। একের পর এক চ্যাপেল পেরিয়ে যাবার সময় যেন মৃত অতৃপ্ত আত্মাগুলো তাদের দিকে মুখ ভেঙচে দিচ্ছে। প্রাস্টিকের আড়াল সরালেই যেন তাদের দেখা পাওয়া যাবে।

সময় যাচ্ছে বয়ে। ভেবে কূল পায় না ল্যাংডন, এখন বাজে আটটা ছয়। এতোক্ষণে খুনির নকশাও উবে যাবার কথা। হত্যাকারি কি যথেষ্ট সময় সচেতন? সে কি ভিট্টোরিয়া আর ল্যাংডন সেখানে যাবার আগেই পাততাড়ি গুটাবে? সে এসেছে কিনা তাও এখন এক প্রশ্ন। যদি সে এসেই থাকে, যদি কাজ সারতে থাকে তাহলে ঈশ্বর তাদের রক্ষা করুন। সামনে কোন দৃশ্য দেখতে পাবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় ল্যাংডন।

দ্বিতীয় এপস টা পেরিয়ে এল তারা। আস্তে আস্তে আলো নিভে আসছে ভিতরে। বাইরের

দরজা দিয়ে আলো আসছে না। আসছে জানালা দিয়ে। সেদিকে তাকিয়ে বেশ বলে দেয়া যায় সূর্য অস্ত নেয়ার পায়তাড়া কষছে খুব দ্রুত। তারা চলে যাবার সময় পাশে প্লাস্টিক একটু নড়ে উঠল। ঘরের বাতাসের চাপে তারতম্য হলে এমন হয়। এখানে কোন ফ্যানও চলছে না। কোন দরজা খুললেই এমনটা হতে পারে।

সামনে এগিয়ে গিয়েই হাতের পিস্তল প্রস্তুত করল ভিট্টোরিয়া, এখানেই গ্রানাইটের গায়ে খোদিত হয়ে আছে দুটো শব্দঃ

চ্যাপেল চিগি

নড করল ল্যাঙডন অন্ধকারেই। একটা মোটা থামের পিছনে তারা দুজনই সামরিক কায়দায় অবস্থান নিল। তারপর ভিট্টোরিয়া ইশারা করল। সে বসে আছে পিস্তল তাক করে।

প্রার্থনা করার এইতো সময়! ভাবল ল্যাঙডন। তারপর অতি যত্নে সরাল প্লাস্টিকের আবরণ। একটু একটু করে। একটু সরল জিনিসটা তারপর একেবারে বিশ্রী আওয়াজ উঠল সেখান থেকে। কাঠ হয়ে গেল দুজনেই। সতর্কতা। নিরবতা। একটা মিনিট কেটে যাবার আগেই ভিট্টোরিয়া এগিয়ে এল একটু ক্রল করে। চোখ রাখল ফাঁক দিয়ে। তার ঠিক পিছনেই আছে ল্যাঙডন। কাঁধের উপর দিয়ে তাকাচ্ছে।

শ্বাস চেপে রাখল তারা দুজনেই।

খালি! অবশেষে বলল ভিট্টোরিয়া, গানটা নিচু করতে করতে, আমরা বেশি দেরি করে ফেলেছি।

কথা শুনল না ল্যাঙডন। এখন সে অন্য কোন এক ভুবনে বিচরণ করছে। তার জীবনে কখনো এমন একটা চ্যাপেলের কথা চিন্তা করেনি। পুরোটাই চেস্টনাট মার্বেলে বাধাই করা। শ্বাসরোধ করে ফেলে চিগি চ্যাপেল। দেখে খুব সহজেই বলা চলে এটা। যথা সম্ভব আর্থি। দেখে মনে হয় গ্যালিলিও আর তার ইলুমিনেটি সযত্নে এ ডিজাইন করেছে।

মাথার উপরে, গম্বুজের ভিতরপৃষ্টে জ্বলজ্বল করছে নক্ষত্রলোক, জ্যোতির্বিদ্যার সাত গ্রহ। নিচে রাশির বারো চিহ্ন। পাগান আর্থি প্রতীকগুলো আস্তে আস্তে এ্যাস্ট্রোনমিতে জায়গা করে নিয়েছে। রাশিও সরাসরি নির্দেশ করে মাটি, বাতাস, আগুন, জল... আর্থ ইজ ফর পাওয়ার কথাটা মনে মনে আউড়ে নেয় ল্যাঙডন।

দেয়ালের অনেক নিচের দিকে দেখল পৃথিবীর চারটী কাল নিয়ে কথা–প্রিমাভেরা, এস্টাটে, অটান্নো, ইনভেরনো! দূরে আরো একটা জিনিস দেখে থমকে গেল ল্যাঙডন। বিড়বিড় করল, হতে পারে না! এ হতে পারে না! কিন্তু চোখের দেখাকে অবিশ্বাস করার বিন্দুমাত্র যো নেই। দূরে দেখা যাচ্ছে দুটো দশফুট উঁচু মার্বেলের পিরামিড! একেবারে নিখুঁত।

আমি কোন কার্ডিনালকে দেখতে পাচ্ছি না। বলল ফিসফিসিয়ে ভিট্টোরিয়া, কিম্বা কোন খুনিকে। সে প্লাস্টিকটাসরাল, তারপর চলে গেল ভিতরে।

কিন্তু ল্যাঙডনের মন-মগজে ঢুকে গেছে পিরামিড, একটা খ্রিস্টানদের চ্যাপেলে মরার পিরামিড আছে কী করতে? আর অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সেখানে আরো বিস্ময় লুকিয়ে আছে। প্রতিটা পিরামিডের চূড়ায় বসিয়ে দেয়া আছে একটা করে স্বর্ণের মেডেলিয়ান... এমন জিনিস জীবনে খুব কমই দেখেছে ল্যাঙডন... একেবারে নিখুঁত গোলাকৃতি। বাইরে থেকে আলো আসায় চকচক করছে পালিশ করা সোনার চাকতি। গ্যালিলিওর নিখুঁত বৃত্ত? পিরামিড? তারকা খচিত ছাদ? এই ঘরটায় ইলুমিনেটির চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ল্যাঙডনের কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি হারে।

রবার্ট, দেখ!

ভিট্টোরিয়ার কথা শুনে তাকল সে দেখানো দিকটায়। ব্লাডি হেল! চিৎকার করেই সে ঝাঁপ দিল একদিকে।

সামনে তেমনি একটা পিরামিডের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে তারকার প্রতীক, ঠিক যেমনটা তারা বাইরে দেখে এসেছে। আছে একটা খুলির চিহ্ন আর সবচেয়ে বড় কথা, মেঝে থেকে পিরামিড হয়ে ওঠা একটা অংশের উপরটায় নিখুঁত বৃত্ত আছে। সেটা দেখতে

ম্যানহোলের মত।

ডেমনস্ হোল! খাবি খেতে খেতে বলল ল্যাঙডন। সাথে সাথে সে গর্তটার দিকে যাওয়া শুরু করল। ভিতর থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠে আসছে।

মুখের উপর একটা হাত রাখল ভিট্টোরিয়া, চি পুৎজা।

ক্ষয় হতে থাকা হাড় থেকে বাষ্প উঠে আসছে। ব্যখ্যা করল ল্যাঙডন। এগিয়ে গেল সামনের দিকে। জামার হাতায়মুখ চাপা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল ভিতরে। কালিগোলা অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি।

তোমার কী মনে হয়? নিচে কেউ আছে?

জানার কোন উপায় নেই।

গর্তটার দূরপ্রান্তে ভিট্টোরিয়া নজর দিল। একটা পচতে থাকা পুরনো নডবড়ে সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। নেমে গেছে অতলে।

মাথা নাড়ল ল্যাঙডন, ঠিক নরকের মত।

হয়ত নিচে কোন ফ্লাশলাইট আছে। আমি একটু নজর বুলিয়ে নিতে চাই। বলল ভিট্টোরিয়া।

সাবধান! আমরা কিন্তু নিশ্চিত জানি না হ্যাসাসিন এখানে আছে কিনা।তাই ....

কিন্তু এরই মধ্যে হাপিস হয়ে গেছে ভিট্টোরিয়া।

কী কঠিন ধাতুর মেয়েরে বাবা! মনে মনে আউড়ে নিল ল্যাঙডন কথাটুকু।

গর্তের কাছাকাছি যেতেই, গন্ধে মাথা ফাঁকা ফাঁকা অনুভব করল। বড় করে একটা শ্বাস নেয়ার পর সে উঁকি দিল, বলা ভাল মাথা ঢুকিয়ে দিল গর্তের ভিতরে। আস্তে আস্তে চোখ মানিয়ে নিতে শুরু করায় এবার ছায়ার মধ্যেই একটু একটু করে দেখতে পেল সে নানা অবয়ব। বোঝা যাচ্ছে গর্তটা একটা ছোট চেম্বারে গিয়ে উন্মুক্ত হয়েছে। ডেমনস্ হোল! আবার ভাবল সে। কে জানে, চিগিদের কত প্রজন্ম এখানে শায়িত আছে! চোখ বন্ধ করল ল্যাঙডন, তার চোখের তারাকে আরো তীক্ষ্ণ করার চেষ্টা করল যেন অন্ধকারেও দেখা যায়। আবার যখন সে চোখ খুলল, একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পেল। ভিতরে যেন একটা শরীর ভাসছে। আমি কি কোন মরদেহ দেখছি? ভেবে কূল পায় না ল্যাঙডন। আবার চোখ বন্ধ করল সে। আবার খুলল, যেন আলোর ক্ষীণতম রেখাও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

ভিতরটাকে এবার একটু দেখা যাচ্ছে।

এমন সময় পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, দেখ!

সাথে সাথে সে উঠে বসার চেষ্টা করছে, কিন্তু ঘাড়ের দিকে টের পেল একটা শীতল স্পর্শ। জমে গেল সে সেখানেই।

তারপর বুঝতে পারল মানুষটা আর কেউ নয়, স্বয়ং ভিট্টোরিয়া।

কী করছ তুমি! রাগে গজগজ করছে ল্যাঙডন।

তোমার জন্য একটা আলোর উৎস খুঁজে এনেছি। বলল ভিট্টোরিয়া সমান তালে, ব্লো টর্চ।

ভিট্টোরিয়ার হাতের টর্চটার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে দম ফেলল ল্যাঙডন।

এরচেয়ে ভাল কিছু পাওয়া দুষ্কর। কলল ভিট্টোরিয়া, এটাকেই কষ্টে সৃষ্টে তুলে এনেছি। কোন ফ্লাশলাইট নেই।

ঘাড়ের দিকে হাত রেখে বলল ল্যাঙডন, আমি তোমার আসার আওয়াজ পাইনি!

শব্দ করার কথা ছিল কি আমার?

টর্চটা তুলে নিয়ে সে এগিয়ে যেতে থাকে গর্তটার দিকে। ভিতরে আলো ফেলল সে। দেয়ালে। আলোর বন্যায় ভেসে গেল ভিতরটা। ছোট একটা ঘর। গোলাকৃতি। পাশে বিশ ফুট হবে কোনক্রমে। গভীরতা হবে ফুট ত্রিশেক। আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। মেঝে থেকে। মেঝেটা মাটির। সোঁদা গন্ধ তাহলে কিছুটা মাটি থেকেও আসছিল।

তারপর ল্যাঙডন শরীরটা দেখতে পেল।

সাথে সাথে তার সহজাত ক্ষিপ্রতা জানিয়ে দিল কী দেখতে পাচ্ছে সে।

সে এখানে, বলল ল্যাঙডন, চেষ্টা করছে যেন তার দৃষ্টি ঘুরে না যায়। দেহটা পড়ে আছে মাটির উপরে। আমার মনে হয় তাকে উলঙ্গ করে খুন করা হয়েছে গলায় রশি দিয়ে।

কল্পনার চোখে সে দেখে নিল লিওনার্দো ভেট্রার মরদেহ।

কার্ডিনাল?

জানে না,তো কী বলবে ল্যাঙডন। কিন্তু সে ভেবে পায় না আর কে হবে! সে তাকাল নিচে। স্থির একটা দেহের দিকে। অনড়। প্রাণহীন। আর এখনো ইতস্তত করছে ল্যাঙডন। দেহটা যেভাবে পড়ে আছে সেখানে একটা দেখার মত ব্যাপার আছে। মনে হচ্ছে যেন...

অবশেষে শব্দ করল ল্যাঙডন, হ্যালো..

তোমার কী মনে হয়। সে জীবিত?

নিচ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

নডছে না লোকটা, ভিট্টোরিয়াকে বলল, কিন্তু তার পড়ে থাকার মধ্যে.... না, অসম্ভব!

তার পড়ে থাকার মধ্যে কী? এবার ভিট্টোরিয়াও উঁকি দিল তার কাঁধের উপর দিয়ে।

ল্যাঙডন অন্ধকারে দেখল। দেখে মনে হচ্ছে তিনি উঠে দাঁড়াচ্ছেন।

শ্বাসরোধ করে ভিট্টোরিয়া তাকাল নিচের দিকে। তার চেহারায় বিহ্বল ভাব। এক মুহূর্ত পরে পিছিয়ে এল সে।

তোমার কথাই ঠিক। উঠে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। হয়ত তার সহায়তা দরকার। আবার ভিতরের দিকে তাকাল মেয়েটা, বলল, হ্যালো?! মি পুয়ো সেন্ট্রিরে?

ভিতর থেকে কোন প্রতিদ্ধনি উঠে এল না। শুধুই নিরবতা।

আমি নিচে যাচ্ছি। বলল অবশেষে ভিট্টোরিয়া।

তার হাত জাপ্টে ধরল ল্যাঙডন, না, ঝুঁকি আছে। যাচ্ছি আমি।

এবার আর কোন বাদ-অনুবাদ করল না মেয়েটা।

চিনিতা ম্যাক্রি একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। ভায়া টোমাসেলিতে আলস্যে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে বিবিসির ভ্যানটা, সেটার প্যাসেঞ্জার সিটে গা এলিয়ে দিয়েছে সে। গুন্থার গ্লিক রোমের মানচিত্র খুঁটিয়ে দেখছে। যেন সেএই দুনিয়াতেই নেই। চুড়ান্ত ব্যস্ততায় তার সময়কাটবে,কারণ এবার লোকটা কিছু তথ্য সহ ফোন করেছে।

পিয়াজ্জা ডেল পোপোলো, গ্লিক অনুরোধ করল, এ জায়গার খোঁজই আমরা করছি। সেখানে একটা গির্জা আছে, আর ভিতরে আছে কবরস্থান। আর সেখানেই আছে একটা প্রমাণ।

প্রমাণ? শব্দ নিয়ে খেলা করতে বেশ ভাল লাগছে চিনিতা ম্যাক্রির, প্রমাণ আছে যে একজন কার্ডিনাল লাশ হয়ে গেছে?

এই কথাটাই তো সে বলেছিল।

তুমি যা শোন তাতেই কান দিয়ে বসো, না? আশা করছে চিনিতা, যেমনটা সে প্রায়ই করে, যদি সে এখানে ইন-চার্জ থাকত! ভিডিওগ্রাফাররা, যাই হোক, ক্যামেরার সামনে থাকা রিপোর্টারের অধীনে থাকে। এটাই নিয়ম। তা হোক সে পাগল-ছাগল। এই এখন যদি গুন্থার গ্লিক ঠিক করে যে সে যাবে ফোন কলটার সত্যতা খতিয়ে দেখতে, চিনিতা আর বেল্টে বাঁধা একটা কুকুরের মধ্যে কোন ফারাক থাকবে না।

সে আবার তাকাল গ্লিকের দিকে। তার চোয়াল শক্ত হয়ে বসেছে। লোকটার বাবা মা নিশ্চয়ই ভাঁড়, না হলে এ লোকের এমন একটা নাম দেয়! গুন্থার গ্লিক! তার প্রাণান্ত চেষ্টার কথা বাদ দিলে, উঠে আসার জন্য বিচিত্র কসরতের কথাকে গোণায় না ধরলে, গুন্থারগ্লিক একেবারে ভাল একজন মানুষ...

আমাদের কি সেন্ট পিটার্সে ফিরে যাওয়া উচিৎ নয়? যথা সম্ভব কোমল সুরে বলল মাক্রি, আমরা এই রহস্যময় চার্চের ব্যাপারে, পরেও খতিয়ে দেখতে পারি। আরো ঘণ্টাখানেক আগেই কনক্লেভ শুরু হয়ে গেছে। আমরা ফিরে আসার আগে কার্ডিনালরা যদি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় তাহলে ব্যাপারটাকে কি ভাল দেখাবে? নাকি আম আর ছালা দুটোই হারিয়ে আমাদের দেউলিয়া হতে হবে?

গ্লিক তার কথাকে খোড়াই পরোয়া করে। সোজা সে এগিয়ে নিয়ে গেল গাড়িকে। ম্যাপের দিকে তার নজর। বিড়বিড় করল, আমার মনে হয় এবার ডানে যাওয়া দরকার। ঠিক তাই। ডানে। তার পরের বামের মোড়টাতেই জায়গামত হাজির হব। সামনের সরু গলি দিয়েও সে একই গতিতে চালানো শুরু করল ভ্যানটাকে।

দেখ! বলল ম্যাক্রি। সে একজন ভিডিও টেকনিশিয়ান। তার মত তীক্ষ্ণ চোখ আর কার আছে। কপাল ভাল, গ্লিকও বেশ করিৎকর্মা। সাথে সাথে চেপে ধরল সে ব্রেক। আর সেই ফাঁকে চারটে একই রকমের আলফা রোমিও সাঁই সাঁই পাশ থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর সেগুলো থামল একটা ব্লক পরে। যেখানে থামার কথা গ্লিকের।

পাগল নাকি! চিৎকার করে উঠল ম্যাক্রি।

ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করেছ?

হ্যাঁ। লক্ষ্য করেছি। আর একটু হলেই আমাদের তারা যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল।

না। আমি বলতে চাচ্ছি, গাড়িগুলো, সবগুলো গাড়ি একই রকম।

তার মানে তারা বদ্ধ উন্মাদ, কোন বোধ-বুদ্ধি তাদের নেই।

গাড়িগুলো লোকে ঠাসা।

তো কী এসে যায়?

চারটে গাড়ি। প্রতিটায় চারজন করে যাত্রি?

তুমি কি কখনো কারপুলিংয়ের কথা শুনেছ?

ইতালিতে? কড়া করেই জবাব দিল গ্লিক, তাদের এখানে এমন কিছু করার কথা নয়।

এ্যাক্সিলারেটরে পা দাবিয়ে দিল সে। সোজা আরো এগিয়ে গেল সামনে।

নিজের সিটে সেঁধিয়ে গেল ম্যাক্রি, কী করছ তুমি?

আমার হঠাৎ করে মনে হচ্ছে আজ, এ সময়টায়, আমি আর তুমিই শুধু গির্জার দর্শনার্থী নই। তার নজর গিয়ে রয়েছে আলফা রোমিওগুলোর দিকে।

নেমে আসাটা ধীর হল।

একের পর এক ধাপ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নেমে এল ল্যাঙডন... চিগি চ্যাপেলের মেঝের নিচে, আরো, আরো নিচে। ডেমনস্ হোলের ভিতরে... ভাবল সে। তার সামনের দিকটা দেয়ালের দিকে আর পিছনটা চেম্বারের দিকে। আঁধার হাতড়ে নেমে যেতে যেতে সে মনে মনে প্রমাদ গুণল। এই একদিনে আর কত ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হবে কে জানে। প্রতি পদে আরো একটু একটু করে আলগা হয়ে যাচ্ছে সিঁড়িটা। যে কোন মুহূর্তে সে প্রপাত ভূতল হতে পারে।

গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত নাকে এসে হামলে পড়ছে পচা মাংসের উৎকট গন্ধ। কোন চুলোয় বসে আছে ওলিভেট্টি কে জানে!

উপরে ভিট্টোরিয়ার অবয়ব এখনো দেখা যাচ্ছে। ল্যাঙডনের পথটাকে আলোকিত করার জন্য সে ধরে রেখেছে ব্লো টর্চটা। যত নিচে নেমে যাচ্ছে সে ততই ফিকে হয়ে আসছে উপরের আলোর নীলচে রেখা। একমাত্র যে ব্যাপারটা শক্তিমান হয়ে উঠছে ক্রমাগত তা হল-আশঙ্কা।

বারো ধাপ পেরিয়ে যাবার পর ঘটনাটা ঘটল। ল্যাঙডনের পা-টা এগিয়ে এল একটা ধাপের দিকে, যেখান থেকে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে ধাপগুলো। তার উপর গিয়েছে ক্ষয়ে। কোনমতে তাল সামলে নিল সে। তারপর মনে মনে একটা গালি কষে নিয়ে আবার নামা শুরু করল। এবার আরো সন্তপর্ণে, আরো সযত্নে।

তিন ধাপ নামার পর আবারো, আর একটু হলেই পড়ে যেতে বসেছিল সে। এবার ধাপের কোন দোষ নেই। দোষ ভয়ের। সে নেমেই দেখতে পেল খুলির একটা সংগ্রহের সামনে সে নেমে আসছে একটু একটু করে। সে দেখতে পায় ভিতরটা বিচিত্র হয়ে উঠেছে। চারধারে কঙ্কালের ছড়াছড়ি, আছে অনেক অনেক কফিনও। আধো আলো ছায়াতে, এটা আরো বেশি ভৌতিক হয়ে উঠল।

চোখের সামনে খালি অক্ষিকোটর মুখব্যাদান করে আছে। কী অবাক ব্যাপার। মাসখানেক আগেও সে এমনি এক সন্ধ্যায় কঙ্কালের সামনে মৃদু আলোয় বসেছিল। সেবার অবশ্য ইলেক্ট্রিক লাইট ছিল না। ছিল মোমের বাতি। আর ছিল নিমন্ত্রণ। নিউ ইয়র্কের একটা আর্কিওলজিক্যাল জাদুঘরের নিমন্ত্রণে সে যোগ দিয়েছিল ক্যান্ডেল লাইট ডিনারে। তাদের পাশে ছিল আদ্যিকালের ডায়নোসরের কঙ্কাল। রেবেকা স্ট্রসও ছিল সেখানে, এক কালের ফ্যাশন মডেল, এখন টাইমসের আর্ট ক্রিটিক। রেবেকা স্ট্রসের চুলের ঢল এখনো কালো, এখনো একটু আধটু ঝিলিক দেয় তার সৌন্দর্য, এখনো তার স্তনের সৌন্দর্য বিহ্বল করে দেয় যে কাউকে, কাবু করে দেয়। কিন্তু সেদিন ল্যাঙডন নিশ্চিত ছিল। পাত্তা দেবে না। করেছিলও ঠিক তাই। দুবার ডাকে তাকে মহিলা। একবারও উত্তর দেয়নি সে, নিতান্তই অভদ্রলোকের মত। তার মনে একটা কথাই বারবার ঘোরাঘুরি করছিল, রেবেকা স্ট্রসের মত মহিলা আর কতকাল টিকে থাকবে!

নামতে নামতে আরো আতঙ্কিত হয়ে উঠছিল সে। ভেবে কূল পাচ্ছিল না কী করবে। এখন যদি একবার পা ফসকে যায় তাহলেই চিৎপটাং। না, শেষ বেলায় কুপোকাত হওয়া চলবে না। তার মনে সাহস রাখতে হবে। দেয়াল তো আর ভেঙে পড়ছে না তার উপর। কিন্তু একই সাথে জুতার তলাটাও পিচ্ছিল হয়ে আসছিল আস্তে ধীরে।

বোটকা গন্ধটা আরো জাঁকিয়ে বসতেই নাকের উপরসে আরো শক্ত করে আকড়ে ধরে তার জামার হাতা। নিচের দিকে তাকাল সে। মাংসের একটা শুভ্র তাল যে পড়ে আছে। অচল। অন্যদিকে ফেরানো।

তবে এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায়, লোকটা ওঠার চেষ্টা করছিল।

হ্যালো? শব্দ করেই এগিয়ে যেতে থাকে ল্যাঙডন লোকটার আরো কাছে। দেখল সে, লোকটাকে অত্যন্ত খর্বাকৃতি দেখাচ্ছে। একটু বেশিই খাটো লাগছে মনে হয়...

হচ্ছেটা কী? উপর থেকে চিৎকার করল ভিট্টোরিয়া, আলো আরো একটু তুলে দিল সে।

জবাব দিল না ল্যাঙডন। সবটা দেখার মত কাছে চলে গেছে সে। তারপর হঠাৎ করেই একটা ধাক্কা খেয়ে সে ব্যাপারটা বুঝে ফেলল। চেম্বারটা যেন তার চারপাশে শ্বাসরোধ করার জন্য এগিয়ে আসছে। মাটির মেঝে থেকে এগিয়ে আসা একটা দুষ্ট আত্মার মত মানুষটা, আসলে একজন বৃদ্ধ... না হলেও অন্তত তার অর্ধেক।

মাটিতে তাকে অর্ধেকটা পুঁতে দেয়া হয়েছে।

কার্ডিনালের লাল শাটিনের ফিতে দিয়ে তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। গায়ে কোন পোশাক নেই। উপরের দিকে চেয়ে লোকটা পিছন ফিরে আছে। যেন কোন পাঞ্চিং ব্যাগ। লোকটার চোখদুটো এখনো খোলা। ঠিক উপরে, আকাশের দিকে তোলা। যেন ঈশ্বরের কাছে অনুযোগ করছে অন্তরের অন্তস্থল থেকে।

তিনি কি মৃত? উপর থেকে জিজ্ঞেস করল ভিট্টোরিয়া।

শরীরটার দিকে এগিয়ে গেল ল্যাঙডন। আশা করি মারা যাবার সৌভাগ্য হয়েছে তার... এগিয়ে গেল সে। তাকাল লোকটার উপর দিকে তাক করে রাখা চোখের দিকে। এগিয়ে গেল সে এবং আরো একটা ধাক্কা খেল।

না! জেসাস্! না!

কী?

কোনমতে নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে ল্যাঙডন। তিনি মারা গেছেন। আরো আগে। আমি তার মারা যাবার কারণটা দেখছি। সে দেখল, লোকটার মুখ ভর্তি হয়ে আছে মাটিতে।

কেউ একজন তার গলা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে মাটি।

মাটি? ভিট্টোরিয়া সাথে সাথে তাকাল আরো নিচে, তার মানে... আর্থ?

আরো একটা ধাক্কা লাগল ল্যাঙডনের বুকে। আর্থ! সে প্রায় ভুলে বসেছিল, চিহ্ন চতুষ্টয়! আর্থ, এয়ার, ফায়ার, ওয়াটার। খুনিটা সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছে, প্রত্যেক কার্ডিনালকে প্রাচীণ বিজ্ঞানের চার মৌলিক পদার্থে হত্যা করবে।

প্রথম বিষয় ছিল আর্থ। ফ্রম শানজিস আর্থি টম্ব।

চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। আর সেই সাথে তার ভিতরের সিম্বলজিস্ট জেগে উঠল আরো। আর্থ! এটার এ্যাম্বিগ্রাম কীরকম হবে? কেমন হবার কথা? এর কোন এ্যাম্বিগ্রাম কি বানানো সম্ভব?

আর মুহূর্তকাল পরেই সে সেটাকে দেখতে পেল।

ইলুমিনেটির কাহিনীর শতাব্দি-পুরনো ব্যাপারগুলো একে একে আসতে শুরু করল তার মনে। কার্ডিনালের বুকের চামড়া পুড়ে গেছে। সেখানে খোদিত হয়ে আছে একটা লেখা। দ্য লিঙ্গুয়া পিউরা...।

চারপাশের ঘর ঘুরতে শুরু করার সাথে সাথে ল্যাঙডন চোখ মেলে তাকাল এম্বিগ্রামটার দিকে।



আর্থ!

আর্থ! ফিসফিস করল সে, আর্থ! যেন এ কথাটার কোন মানে জানে না রবার্ট ল্যাঙডন।

এবং সাথে সাথে আরো একটা ব্যাপার তার মাথা ঘুরিয়ে দিল, আরো তিনটা চিহ্ন বাকি

আছে।

চিহ্ন চতুষ্টয়!

সিস্টিন চ্যাপেলের নরম মোমের আলোয় কার্ডিনাল মর্টাটি ঘেমে নেয়ে একসা হচ্ছেন। অফিসিয়ালি কনক্লেভ শুরু হয়ে গেছে। আর এই শুরুটার মত বিচিত্র আর কোন ব্যাপার নেই।

আধঘণ্টা আগে, সময়মত, ক্যামারলেনগো কার্লো ভেন্ট্রেস্কা চ্যাপেলে ঢুকেছিল। সামনে এগিয়ে গিয়ে সে সরাসরি ওপেনিং প্রেয়ার শুরু করে। সিস্টিনে আর কখনো এমন নিষ্ঠুর কথা শোনেননি প্রায় অশীতিপর কার্ডিনাল মর্টাটি।

আপনারা ভালভাবেই জানেন, বলেছিল ক্যামারলেনগো, যে আমাদের চারজন প্রেফারিতি এখন কনক্লেভে হাজির নন। আমি, বিগত হিজ হোলিনেসের দিব্যি দিয়ে আপনাদের অনুরোধ করছি... আপনারা শুরু করে দিন কাজ, যা হবার কথা। আশা করি আপনাদের চোখের সামনে শুধু ঈশ্বর থাকবেন। তারপর সে চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

কিন্তু, সাথে সাথে একজন কার্ডিনাল বলল, কোথায় তারা?

থামল ক্যামারলেনগো, সত্যি সত্যি এ কথার জবাব আমার কাছে নেই।

ফিরে আসবেন কখন?

সত্যি সত্যি এ কথার জবাবও আমার কাছে নেই।

তারা ঠিক আছেন তো?

সত্যি সত্যি এও জানা নেই।

তারা কি ফিরবেন?

একটা লম্বা বিরতি নিল ক্যামারলেনগো।

বিশ্বাস রাখুন। বলল সে।

তারপর চলে গেল কামরা ছেড়ে।

নিয়ম অনুযায়ী সিস্টিন চ্যাপেলের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে বাইরে থেকে, দুটো ভারি চেইন সহ। পিছনের হলওয়েতে চোখ রাখছে চারজন সুইস গার্ড। মর্টাটি জানে, এখন আর সেই দরজা দুটোখোলা যাবে না। খোলা যাবে শুধু একজন পোপকে নির্বাচিত করলে, কোন কার্ডিনাল মরণাপন্ন হলে অথবা প্রেফারিতিদের কেউ ফিরে এলে।

শেষের ব্যাপারটাই যেন সত্যি হয় সে আশায় মনে মনে প্রার্থনা করলেন মর্টাটি। কিন্তু তার পেটের ভিতরে যে অনুভূতি গুলিয়ে উঠছে সেটার সাথে আর কিছুর তুলনা নেই। এরই নাম অস্বস্তি।

চালাব, যেমনটা করা উচিৎ আমাদের, ভাবলেন মর্টাটি। আর কী করতে পারি? ক্যামারলেনগো চলে যাবার সাথে সাথে ভাবা শুরু করলেন তিনি।

আরো মিনিট ত্রিশেক চলে গেল এসব নিয়ে অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে করতে। প্রত্যেক কার্ডিনাল এগিয়ে এসে, একে একে ভোটিং এর কাজ সম্পন্ন করতে শুরু করলেন।

অবশেষে শেষ কার্ডিনাল এগিয়ে এলেন। তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন।

আমি বলি আমার দেখা থেকে যে, তার সামনে বলা শুরু করলেন আগন্তুক কার্ডিনাল, ক্রাইস্ট দ্য লর্ড, যিনি আমার বিচারক হবেন, তার কথায় আমি বলি এমন। একজনের জন্য আমার ভোট যাবে যিনি প্রভুর সামনে নতজানু, এবং যোগ্য।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি, তারপর ব্যালটটাকে মাথার উপরে তুলে ধরলেন যেন সবাই দেখতে পায়। সেখানে একটা প্লেট সাজানো আছে। সেটার উপর তিনি রেখে দিলেন কাগজটা। তারপর সেটাকে তুলে ধরলেন তিনি, নিচের পাত্রে ফেলে দিলেন কাগজটা। প্লেটটায় রাখতে হয় যেন কেউ একাধিক ব্যালট ফেলে না দেয় গোপনে, সেটা নিশ্চিত করার জন্য।

তিনি তার ব্যালট হাজির করার পর, আবার বসিয়ে দিলেন প্লেটটাকে পাত্রের উপর। ক্রসের সামনে নিচু হয়ে একটু সম্মান প্রদর্শন করে ফিরে গেলেন নিজের আসনে।

শেষ ব্যালটও বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

এবার মর্টাটির কাজে যাবার পালা।

উপরের প্লেটটাকে সরিয়ে নিয়ে তিনি দু ইঞ্চি পুরু হয়ে পড়া ব্যালট পড়ে শোনানো শুরু করলেন।

এলিগো ইন সুম্মুন পন্টিফিসেম... বললেন তিনি, প্রতিটা ব্যালটের উপরে যে লেখাটা আছে সেটা পড়তে শুরু করলেন, সুপ্রিম পন্টিফ হিসাবে আমি নির্বাচিত করছি... তারপর তিনি ঘোষণা করলেন বিবেচিত প্রার্থির নাম। এলিগো লেখাটার উপর একটা সুই চালিয়ে ছিদ্র করলেন। তারপর একটা লগবুকে সেটা টুকে রাখলেন।

একই কাজ করলেন আবারো। উঠে দাঁড়ালেন। ব্যালট তুললেন একটা। জোরে সেটার নির্বাচিত প্রার্থির নাম বললেন। তারপর সেটাকে ছিদ্র করে অন্য পাশে সরিয়ে রাখলেন। টুকে রাখলেন লগবুকে। বুঝতে পারলেন প্রথম থেকেই, একটা হট্টগোল লেগে যাচ্ছে সামনে।

দ্বিতীয় ব্যালট পর্যন্ত যাবার সময়েই বুঝলেন তার ব্যালটও বৃথা যাবে।

পর পর সাতটা ব্যালটে উঠে আসল সাতজন কার্ডিনালের নাম।

এখানকার লেখাগুলো দেখে সহজেই বোঝা যায় কে কাকে ভোট করছে। একটা বিশৃঙ্খলা লেগে গেছে কনক্লেভে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বোঝা যাচ্ছে চার প্রেফারিতি না থাকায় এবং তাদের কোন বিকল্পের কথা কেউ ভেবে না রাখায় একটা চরম অনিয়ম মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সঠিক যোগ্য লোকের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়াতে সবাই ইচ্ছামত নিজেকে বা নিজের পছন্দসই কাউকে ভোট দিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু মর্টাটি জানেন, এটা আসলে নিজেকে উঠিয়ে আনার চেষ্টা শুধু নয়, বরং কনক্লেভকে আরো দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা। এর মধ্যে যদি কোন কার্ডিনাল যথেষ্ট ভোট না পান তো আবার ভোটাভুটি শুরু হবে...

কার্ডিনালদের আসলে মিথ্যাই এ ভোটাভুটি... আসলে চলছে অপেক্ষা... প্রেফারিতিরা যেন চলে আসেন।

যখন শেষ ভোটটা গণনা করা হল তখন মর্টাটি ঘোষণা করলেন, ব্যর্থ!

তিনি সবগুলো ব্যালট একত্র করলেন। তারপর সেটাকে একটা মালার মত করে নিয়ে শুইয়ে দিলেন একটা প্লেটের উপর, রূপালি প্লেটটার উপর দিতে বললেন কিছু রাসায়নিক দ্রব্য, তারপর সেগুলো সহ সেটাকে তিনি একটা ফায়ার প্লেসের মতো জায়গায় স্থাপন করলেন। ধরিয়ে দিলেন আগুন।

রাসায়নিক পদার্থের কল্যাণে অনেক ধোঁয়া উঠল, কিন্তু সেটা ছড়ালো না। কালো পাক দিয়ে উঠে গেল চিমনির দিকে।

সরু চিমনি বেয়ে প্রকাশ্যে, সবার কাছে ধোঁয়াটা একটা বার্তা বয়ে নিয়ে গেল।

একবার ভোট দেয়া শেষ হয়ে গেছে।

কোন পোপ নির্বাচিত হয়নি।

একটু কষ্ট করে উপরের দিকে চোখ ফেলল ল্যাঙডন। তার মাথা ঘুরছে, অপার্থিব মনে হচ্ছে চারপাশটাকে। কোনমতে উপরে চোখ তুলে তাকাল সে। তারপরও কাটছে না মন থেকে চিন্তাটা...

আর্থ...

আর্থ...

উপরে উঠতে উঠতে তার মাথায় আবার স্লিপ করে পড়ে যাবার ভয় কাজ করতে শুরু করল। উপরে উঠে আসার দু ধাপ আগেই তার পা আবার ফসকে গেল। কোনমতে সে ধরার চেষ্টা করল মইটাকে আঁকড়ে, পারল না। পড়ে যেতে শুরু করল হঠাৎ করে। বাড়িয়ে দিয়েছিল সে হাত, ভিট্টোরিয়ার দিকে। তাতেও কাজ হয়নি। হঠাৎ টের পেল সে এখন সাধারণ অবস্থায় নেই। পড়ে যাচ্ছে।

তারপর কী হল সে কথা মনে নেই তার।

অনেকক্ষণ পরে, দুজন সুইস গার্ড তাকে টেনে তুলল একটা কপিকলের উপর, সে টের পেল ডেমনস্ হোল থেকে বেরিয়ে আসছে তার মাথা। হাঁসফাঁস করছে সে বাতাসের জন্য। তাকে ঠান্ডা পাথুরে মেঝেতে নামিয়ে দিল গার্ডরা।

মুহূর্তখানেক ঠিক বুঝতে পারল না ল্যাঙডন, সে কোথায় আছে। মাথার উপর দেখতে পাচ্ছে তারা... ঘুরতে থাকা গ্রহ। তার চোখের সামনে থেকে আস্তে আস্তে সরে গেল বিচিত্র দৃশ্যগুলো। লোকজন চিৎকার করছে। উঠে বসার চেষ্টা করল সে। একটা পিরামিডের মেঝেতে পড়ে আছে এবং একটা পরিচিত রাগি কণ্ঠ চিৎকার-চেচামেচি করছে, তারপরই একে একে সবগুলো ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কাছে।

চিৎকার করে আকাশ মাথায় তুলছে ওলিভেট্টি, আগে কেন আপনারা এ ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি?

কথাগুলো বলা হচ্ছে ভিট্টোরিয়াকে উদ্দেশ্য করে। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বোঝনোর চেষ্টা করছে মেয়েটা।

তার কথাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ওলিভেট্টি চেঁচিয়ে আদেশ-নির্দেশ দিতে শুরু করল তার লোকজনকে, বডিটা ওখান থেকে তুলে আন। সারা বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খোঁজ!

উঠে বসার চেষ্টা করল ল্যাঙডন। সুইস গার্ডে গিজগিজ করছে চিগি চ্যাপেল। চ্যাপেলের প্রবেশপথে রাখা পলিথিন ছিড়ে ফেলা হয়েছে। তাজা বাতাস এসে ভরে দিচ্ছে তার বুক। এগিয়ে আসছে তার দিকে ভিট্টোরিয়া, তার চোখমুখে পরীর আভা।

ঠিক আছতো তুমি? জিজ্ঞেস করতে করতে কোমল হাতে তুলে নিল ল্যাঙডনের হাত দুটো। পরীক্ষা করল তার হাতের পালস রেট।

থ্যাঙ্কস! বলেই উঠে বসল ল্যাঙডন। ওলিভেট্টি পুরো পাগল হয়ে গেছে!

নড করল ভিট্টোরিয়া। তার পাগল হয়ে যাবার কারণ আছে। আমরা ভুল করেছিলাম।

আমরা মানে? আমি পাকিয়েছি ঝামেলাটা।

তাহলে নিজেকে ফিরে পাও। পরের বার ধরা চাই লোকটাকে।

পরের বার? ভেবে পাচ্ছে না এমন একটা নিষ্ঠুর কথা কী করে বলতে পারল ভিট্টোরিয়া! পরের বার বলে আর কিছু নেই। আমরা খেলায় আসল দানে হেরে বসে আছি!

হাতের ঘড়িটা পরীক্ষা করল ভিট্টোরিয়া। মিকি বলছে আমাদের হাতে আরো চল্লিশ মিনিট সময় আছে। তোমার মন-মস্তিষ্ক ঠিক করে নাও। পরের বার তাকে আমরা পাকড়াও করছি।

আমি তোমাকে ভাল করেই বলেছি, ভিট্টোরিয়া, আমরা সুযোগ হারিয়ে বসে আছি। পাথ অব ইলুমিনেশন- মাঝপথে থেমে গেল ল্যাঙডন।

নরম করে হাসল ভিট্টোরিয়া।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল ল্যাঙডন। চোখ বোলাল চারদিকে। পিরামিড, নক্ষত্র, গ্রহ, অর্ধবৃত্ত... হঠাৎ পুরো ব্যাপারটা তার মাথায় চলে এল।

একটা ব্যাপার এবার তার মাথায় খেলা শুরু করেছে। কী নিখুঁতভাবেই না এই পাথ অব ইলুমিনেশন বের করা হয়েছে! ভুবনখ্যাত প্যান্থিয়নকে আড়াল করেও কী চমৎকার ভাবে ঠিক রাখা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্য। এখানে আক্ষরিক অর্থেই ডেমনস্ হোল আছে, আছে মাটির সব ধরনের চিহ্ন। কোন ভুল-ভ্রান্তির বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। পারফেক্ট।

বড় পিরামিডটা ধরে নিজেকে সোজা করল ল্যাঙডন। ভিট্টোরিয়ার কথাই ঠিক। এটাই যদি বিজ্ঞানের প্রথম মাইল ফলক হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই পরের জায়গাটার ইশারা নিহিত আছে এখানে। এখনো একটা ক্ষীণ সুযোগ আছে, কথাটা ভাবতে না ভাবতেই একেবারে আড়মোড়া ভেঙে শিরদাঁড়া খাড়া করল ল্যাঙডন। সুযোগ এখনো আছে। আছেই। যদি পথটার রহস্য খানিকটা সরে যায় তাহলেই পরের স্টপেজে খুনিকে হাতেনাতে ধরে ফেলার একটা সুযোগ থেকে যাবে।

এগিয়ে এল ভিট্টোরিয়া, আমি বের করে ফেলেছি কে গোপন ইলুমিনেটি শিল্পী ছিল।

তুমি কী করেছ?

এখন আমাদের বের করতে হবে এখানে থাকা কোন নকশা থেকে—

এক মিনিট! তুমি জান ইলুমিনেটির শিল্পী কে?

হাসল ভিট্টোরিয়া, বার্নিনি। বলল সে, দ্য বার্নিনি।

সাথে সাথে বুঝতে পারল ল্যাঙডন। কোথাও কোন ভুল হয়ে গেছে মেয়েটার। বার্নিনি? অসম্ভব। জিয়ানলরেঞ্জো বার্নিনি সর্বকালের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ স্কাল্পটর। তার খ্যাতির উপরে আর একজনই আছেন। স্বয়ং মাইকেলেঞ্জেলো। সপ্তদশ শতকে আর সবার চেয়ে বেশি কাজ করেছেন বার্নিনি। আর তারা এমন একজনের পিছনে লেগেছে যার কোন হদিস ইতিহাসে নেই।

মাথা নাড়ল ভিট্টোরিয়া, তোমাকে দেখে খুব একটা খুশি বলে মনে হচ্ছে না।

বার্নিনি? অসম্ভব।

কেন? বার্নিনি ছিলেন গ্যালিলিওর সহচর। তিনি ছিলেন এক বিখ্যাত শিল্পী।

তিনি ছিলেন এক অতি বিখ্যাত মানুষ। এবং একজন ক্যাথলিক।

ঠিক তাই, বলল ভিট্টোরিয়া, ঠিক গ্যালিলিওর মত।

না। একমত নয় ল্যাঙডন, কোন দিক দিয়েই এক রকম নয় ব্যাপারটা। ভ্যাটিকানের দৃষ্টিতে গ্যালিলিও ছিলেন একজন বিদ্রোহী। অন্যদিকে চার্চের প্রিয়পাত্র ছিলেন বার্নিনি। ভ্যাটিকানের সার্বিক শিল্পের দায়িত্ব দিয়ে দেয়া হয়েছিল তার হাতে।

ভ্যাটিকান সিটির ভিতরে তিনি তার সারা জীবন কাটিয়েছেন।

এ এক চমৎকার কভার। ইলুমিনেটির গুপ্তচর। বিরক্ত বোধ করছে ল্যাঙডন, ইলুমিনেটির সদস্যরা তাদের শিল্পীকে কী নামে ডাকত জান? এল মায়েভেট্রা ইগনোটো–দ্য আননোন মাস্টার।

ঠিক তাই। তাদের কাছে অচেনা। ম্যাসনদের গোপনীয়তার কথা একবার ভাব। একেবারে উপরের দিকে যিনি আছেন তিনিই শুধু পুরোটা জানবেন। আর কেউ নয়। বেশিরভাগ সদস্যের কাছে বার্নিনির পরিচয় গোপন রেখেছিলেন গ্যালিলিও। বার্নিনির নিজের নিরাপত্তার জন্যই। ফলে ভ্যাটিকান কখনোই সত্যিকারের তথ্যটা জানতে পারবে না।

এখনো সব এলোমেলো লাগছে ল্যাঙডনের। কিন্তু এটুকু সে বুঝতে পারছে, ভুল নেই মেয়েটার কথায়। যুক্তি আছে। গোপন ব্যাপারগুলোকে গুপ্ত রাখার কাজে সিদ্ধহস্ত ছিল ইলুমিনেটি। প্রত্যেকে উপরের জনের কাছে তথ্য দিত। আর কারো কাছে নয়। ফলে তাদের গোপনীয়তায় কোন ফাঁক ফোঁকর থাকত না। পুরো ব্যাপারটা খুব কম মানুষের কাছেই ফাঁস হয়েছিল।

আর বার্নিনির ইলুমিনেটির সাথে যোগাযোগের ব্যাপারটাই প্রমাণ করে যে তাদের দুটো পিরামিড বানাতে হয়েছিল। মৃদু একটা হাসি ঝুলে আছে ভিট্টোরিয়ার ঠোঁটে।

বড় আকারের পিরামিডে হাত রেখে উঠতে উঠতে কথাটুকুর গূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারছে

ল্যাঙডন একটু একটু করে। বার্নিনি একজন ধর্মীয় শিল্পী। এই পিরামিড তার গড়ার কথা নয়।

শ্রাগ করল ভিট্টোরিয়া, তোমার পিছনের লেখাটা সে কথাই খুলে বলে।

সাথে সাথে পিছনে ফিরল ল্যাঙডন, দেখতে পেলঃ

চিগি চ্যাপেলের শিল্পকর্ম

যেখানে গতি ছিলেন রাফায়েল,

ভিতরের সব নকশার কারুকার জিয়ানলরেজো বার্নিনি

দুবার লেখাটা পড়ল ল্যাঙডন। এখনো সে কথাটা ঠিক হজম করতে পারছে না। এখনো তাকে তেমন বিশ্বাসী করে তুলতে পারেনি ব্যাপারটা। জিয়ানলরেঞ্জো বার্নিনি তার বিভিন্ন কাজের জন্য বিখ্যাত। কুমারী মেরি, এ্যাঞ্জেল, প্রফেট, পোপ... এসবই ছিল তার শিল্পকর্মের বিষয়। পিরামিড নিয়ে তিনি কী করছিলেন?

উপরের দিকে তাকিয়ে আরো বোবা হয়ে গেল ল্যাঙডন। দুটো পিরামিড। সেগুলোর উপরে ঝকঝকে মেডেল। এরচেয়ে বেশি অখ্রিস্ট কাজ আর কী হতে পারে! পিরামিড, সেগুলোর উপরে তারকা, আশপাশে রাশি। ভিতরের সব নকশার কারুকার জিয়ানলরেঞ্জো বার্নিনি। যদি কথা সত্যি হয়ে থাকে, ভাবল ল্যাঙডন, তাহলে ভিট্টোরিয়ার কোন দোষ নেই।

যদি বার্নিনি সত্যি সত্যি ইলুমিনেটির সেই চির অচেনা শিল্পী হয়ে থাকেন... এ চ্যাপেলের শিল্পকর্মে আর কোন পটুয়ার হাত পড়েনি! তথ্যগুলো এত বেশি দ্রুত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর যে ল্যাঙডন খেই খুঁজে পাচ্ছিল না।

বার্নিনি একজন ইলুমিনেটাস।

বার্নিনি ডিজাইন করেছেন ইলুমিনেটি এ্যাম্বিগ্রামগুলো।

বার্নিনি তৈরি করেছেন পাথ অব ইলুমিনেশন।

রা ফুটছে না ল্যাঙডনের কণ্ঠে। তাহলে এই ছোট্ট চিগি চ্যাপেলেই কি বসে আছে সেই চিহ্ন যেটা ধরে রোমের অন্য কোন প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়ে পাথ অব ইলুমিনেশনের নকশা পাওয়া যাবে। সামনেই পড়ে আছে অল্টার অব সায়েন্স?

বার্নিনি, বলল সে অবশেষে, আমি কখনোই কল্পনা করতে পারি না।

ভেবে বের কর, ভ্যাটিকানের একজন সম্রান্ত আকিয়ে ছাড়া আর কার কলিজায় এত শক্তি আছে যে রোম জুড়ে বিখ্যাত সব চ্যাপেলে পাথ অব ইলুমিনেশন তৈরি করতে পারবে? অচেনা কেউ? অসম্ভব।

কথাটাকে বিবেচনায় নিল ল্যাঙডন। পিরামিডগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকাল সে। এর কোনটা সেই মার্কার নয়তো? নাকি দুটোই?

পিরামিডগুলো দুটো ভিন্ন দিক নির্দেশ করছে, অবশেষে বলল ল্যাঙডন। তারা চিহ্নিত নয়। সুতরাং আমি বলতে পারব না কোনটায় সূত্র বসানো আছে...।

আমার মনে হয় না যে জিনিসের খোঁজে আমরা আতিপাতি করছি সেটা কোন পিরামিড।

কিন্তু এখানে এগুলোই একমাত্র স্কাল্পচার।

ওলিভেট্টির দিকে আঙুল তাক করে ভিট্টোরিয়া তাকে থামিয়ে দিল। সেখানে আরো কয়েকজন প্রহরী ভিড় করেছে ডেমনস্ হোলে।

ল্যাঙডন মেয়েটার হাত অনুসরণ করে তাকাল সামনে। কিছুই নেই। তারপর আস্তে আস্তে নজরে এল ব্যাপারগুলো। একটা সাদা মার্বেল। একটা হাত। একটা মুখাবয়ব। দুটো মানব-অবয়ব। ল্যাঙডনের শ্বাস থেমে গেল। সে পিরামিড আর ডেমনস্ হোল নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে আর কিছুর দিকে তার চোখই যাচ্ছিল না।

সোজা সে এগিয়ে গেল সামনে। সেখানে যে কী লুকিয়ে আছে এতক্ষণ তা খেয়াল করেনি। সাদা মার্বেলে খোদাই করা কারুকাজ। বাতাসে উড়ছে খোদাই করা মানুষগুলোর জামা। খাঁটি বার্নিনি-কাজ। ভ্যাটিকানের অঢেল সম্পদই পারে এমন বস্তু তৈরি করাতে। একেবারে কাছে আসার আগে সে কিছুই টের পেল না।

এরা কারা? প্রশ্ন করল ভিট্টোরিয়া, যেন সব সওয়ালের জবাব আছে ল্যাঙডনের কাছে।

বাক্যব্যয় করার কোন শক্তিই যেন নেই তার। অনেক কষ্টে বলল, হাবাক্কাক এ্যান্ড দি এ্যাঞ্জেল। একেবারে মিইয়ে পড়া কন্ঠে বলল সে। এই কাজটা এতোই বিখ্যাত যে কোন কোন আর্টের বইতেও জায়গা করে নিয়েছে। ভুলেই গিয়েছিল সে, এটা আছে এখানেই।

হাবাক্কাক?

ঠিক তাই। সেই প্রফেট যিনি পৃথিবী ধ্বংসের কথা বলেছিলেন।

অপ্রস্তুত লাগছে ভিট্টোরিয়ার, তোমার কী মনে হয়? এটাই সেই মার্কার?

এখনো স্থাণুর মত মাথা নাড়ল ল্যাংডন। জীবনে আর কখনো কোন ব্যাপারে এত নিশ্চিত হয়নি সে। এটাই প্রথম ইলুমিনেটি মার্কার। কোন সন্দেহ নেই। যদিও ল্যাংডন আশা করেছিল যে এটা দিয়ে কোন একটা দিক দেখানো হবে, তবু তা ঠিক উৎরে যাচ্ছে। এটা যে এত স্পষ্টভাবে দেখানো থাকবে সে কথা সে ভাবতেও পারেনি। প্রফেট আর এ্যাঞ্জেল, দুজনের হাতই দূরে এক দিক নির্দেশ করছে।

হঠাৎ টের পেল ল্যাংডন, হাসছে সে, খুব বেশি কষ্টকর নয়, কী বল?

একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে ভিট্টোরিয়া, তবু তার চোখ থেকে উবে যায়নি বিভ্রান্তি। আমি তাদের দিকনির্দেশ করতে দেখছি, কিন্তু তারা তো বিভ্রান্তিকর দিক নির্দেশ করছে। এ্যাঞ্জেল দেখাচ্ছে একদিক তো আরেকদিক দেখাচ্ছে প্রফেট।

মুখ ভেঙচে হাসল ল্যাংডন। কথাটা সত্যি। যদিও দুজনেই দূর দেখাচ্ছিল, তবু তাদের দিক একে অপরের সাথে মিলে যায় না। এরই মধ্যে সমস্যার সমাধান বের করে ফেলেছে ল্যাংডন। হঠাৎ করে সে দৌড় শুরু করল দরজার দিকে।

কোথায় যাচ্ছ? জিজ্ঞেস করল ভিট্টোরিয়া।

বিল্ডিংয়ের বাইরে। দরজার দিকে ছুটে যেতে যেতে বেশ ভারমুক্ত অনুভব করল ল্যাংডন। আমি দেখতে চাই স্কাল্পচারটা কোনদিক নির্দেশ করছে!

থাম! কী করে তুমি জানলে কোন আঙুল ফলো করতে হবে?

কবিতা। শেষ লাইনটা।

লেট এ্যাঞ্জেল গাইড ইউ অন ইউর লফটি কোয়েস্ট? হতভম্বের মত চেয়ে থাকল মেয়েটা।

গুন্থার গ্লিক আর চিনিতা ম্যাক্রি বিবিসি ভ্যানটাকে পার্ক করিয়ে পিয়াজ্জা ডেল প্রোপোলোর দিকে এগিয়ে গেল। চারটে আলফা রোমিওর একটু পরেই তারা এসে হাজির হয়েছে। বিচিত্র ঘটনার পরম্পরা দেখতে তারা উদগ্রীব। চিনিতা এখনো জানে কী হচ্ছে এসব। শুধু একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ক্যামেরা রোল করাতে হবে।

আসার সাথে সাথে চিনিতা আর গ্লিক দেখতে পেল কম বয়েসি লোকজনের একটা সৈন্যদল বেরিয়ে এল আলফা রোমিও থেকে। চার্চের চারধারে। তাদের কেউ কেউ অস্ত্র বের করে ফেলেছে। একজন অপেক্ষাকৃত বেশি বয়েসি লোক কয়েকজনকে নিয়ে গটগট করে উঠে গেল ভিতরের দিকে। ম্যাক্রি কিছুই শুনতে পায়নি। শুধু একটা ব্যাপার দেখতে পেল। সবাই ঠিকঠাক করে নিচ্ছে তাদের সাইলেন্সর। তারপরই সোজা ঢুকে গেল ভিতরে।

চিনিতা ঠিক করল তারা দূরেই থাকবে, আর ছায়া থেকে ভিডিও করবে সবকিছু। হাজার হলেও, অস্ত্র হল অস্ত্র। আর তারা ভ্যানের ভিতর থেকে বেশ পরিষ্কার চিত্র পাচ্ছে। কোন আপত্তি জানায়নি গ্লিক। তারা এখন দেখতে পাচ্ছে ভিতর থেকে বাইরে, বাইরে থেকে ভিতরে লোকজনের আনাগোনা বেড়ে গেছে। একদল আরেক দলের সাথে উচ্চস্বরে বাদানুবাদ করছে। একটা দল বাইরের দিকটা সার্চ করতে শুরু করল। বিবিসির ক্যামেরা অনুসরণ করল তাদের। তাদের সবাই যদিও বেসামরিক পোশাক পরে আছে তবু ঠিক ঠিক বলা যায় কাজ-কারবারে তারা একেবারে মিলিটারি। কী মনে হয়, কারা ওরা? জানতে চাইল চিনিতা।

জানলে এতক্ষণে নরকে থাকতাম। বলল সে, সমান তেজে, তোমার ক্যামেরা তাদের ধরতে পারছে তো?

প্রত্যেকটা ফ্রেম।

যেন সুযোগ পেল গ্লিক, এখনো তুমি পোপ-ওয়াচে বেরিয়ে পড়তে চাইছ?

কী বলতে হবে তা ঠিক ঠিক জানে না চিনিতা। অনেকদিন ধরে সাংবাদিকতার সাথে যোগ-সাজস আছে তার। সে ভাল করেই জানে, আপাতত বেশ আগ্রহোদ্দীপক ঘটনার পিছনেও একেবারে নির্জলা নিরস কারণ থাকে।

এর কোন মানে নাও থাকতে পারে, বলল সে অবশেষে, এই লোকেরাও হয়ত তোমার মতই একটা উড়ো খবর পেয়েছে। হামলে পড়েছে সত্যতা উদ্ধারের কাজে। ফলস এ্যালার্ম হবার সম্ভাবনা কম নয়।

গ্লিক তার হাত খামচে ধরল। ঐদিকে তাকাও। ফোকাস কর! চার্চের দিক নির্দেশ করল সে।

সাথে সাথে ক্যামেরা ঘুরিয়ে ফেলল চিনিতা। সোজা তাক করল গির্জার প্রবেশপথের দিকে। হ্যালো দেয়ার! বলল সে। যেন স্বাগত জানাল সিঁড়ির লোকটাকে।

উটকো লোকটা কে?

ক্লোজ-আপ নিল চিনিতা। আগে তাকে দেখিনি। বলল সে, কিন্তু তাকে আবার দেখতে কোন আপত্তি নেই আমার।

রবার্ট ল্যাঙডন গির্জা থেকে গুলির মত ছিটকে বেরিয়ে এল। চলে এল পিয়াজ্জার মাঝামাঝি পর্যন্ত। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দক্ষিণ রোমের আশপাশে টপ করে ডুবে যেতে বসেছে সূর্য। আশপাশের ভবন থেকে ছায়া এসে গিলে নিচ্ছে স্কোয়ারটাকে।

ওকে, বার্নিনি! বলল সে জোরে জোরে, কোথায় তোমার এ্যাঞ্জেল দিক নির্দেশ করছে?

ফিরে তাকাল সে গির্জাটার দিকে, যেটা থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে সে। সে ভিতরের চিগি চ্যাপেলের কথা ভাবল। ভাবল সেটার ভিতরে থাকা এ্যাঞ্জেলের নির্দেশিত দিকের কথা। কোন প্রকার অস্বস্তি ছাড়াই সে ফিরে তাকাল পশ্চিমে। সূর্য নামছে পাটে। টিকটিক করে কেটে যাচ্ছে সেকেন্ডের কাঁটা।

দক্ষিণ-পশ্চিম, বলল সে, পরের মার্কারটা সেখানেই।

মনের বারোটা বাজিয়ে পাতার পর পাতা পড়ে যাওয়া ইতালিয় আর্টের বর্ণনা মনে মনে পড়ে নিচ্ছে। বার্নিনি এত বেশি কাজ করেছেন যে কোন স্পেশালিস্ট ছাড়া পুরো ব্যাপারটাকে মানিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। প্রথম কাজটা যেহেতু তার পরিচিত, আশা করছে সে, পরেরটাও পাওয়া যাবে স্মৃতি ঘাটলেই। সেটাও বিখ্যাত কোন কাজ হবে।

আর্থ, এয়ার, ফায়ার, ওয়াটার... ভাবল সে। প্রথমটায় সে আর্থ পেয়েছে। হাবাক্কাক, সেই প্রফেট যিনি পৃথিবী লয়ের কথা বলেছিলেন।

পরেরটা হল এয়ার। মাথাকে ঘামিয়ে বারোটা বাজাচ্ছে সে। বার্নিনির এমন কোন কাজ যেটায় এয়ার আছে... নিজেকে আরো ঝালিয়ে নিল সে। আরো সতেজ হল। আমি পাথ অব ইলুমিনেশনে আছি। আমাকে দেখাবে পথ, পাথ অব ইলুমিনেশন... এখনো এটা অক্ষ...।

দক্ষিণ-পশ্চিম রোমের দিকে তাকিয়ে কোন একটা টাওয়ারকে খুজছে সে যাতে মনে পড়ে যায় বিখ্যাত কোন শিল্পকর্মের কথা। মনে পড়ে যায় কোন প্রখ্যাত গির্জার কথা। একটা ম্যাপ প্রয়োজন। এমন একটা ম্যাপ যেটা দিক দেখিয়ে দেবে। যেটা থেকে ঠিক ঠিক বোঝা যাবে দক্ষিণ-পশ্চিম রোমে কোন কোন প্রাচীণ চার্চ আছে। সেগুলোর নামের উপর একবার করে চোখ বুলিয়ে নিলেই আসল সমস্যাটার সমাধান চলে আসবে। মনে পড়ে যাবে সেটার কথা।

এয়ার! সে চাপ দিল, বায়ু, বার্নিনি, স্কাল্পচার, এয়ার। ভাবো, ভেবে বের কর।

ঘুরে দাঁড়াল ল্যাঙডন। ফিরে চলল চ্যাপেলের ভিতরে। সেখানে প্রবেশমুখেই দেখা হয়ে গেল ওলিভেট্টি আর ভিট্টোরিয়ার সাথে।

দক্ষিণ-পশ্চিম। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, পরের গির্জাটা এখান থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে।

ওলিভেট্টির ফিসফিসানি আগের চেয়েও শীতল। এবার আপনি নিশ্চিত?

কামড়টা অনুভব করতে পারল না ল্যাঙডন। সে উত্তেজিত। আমাদের একটা ম্যাপ লাগবে। এমন এক মানচিত্র যেটায় পুরো রোমের প্রাচীণ চার্চগুলোর খতিয়ান দেয়া আছে।

একই ভঙ্গিতে তাকে খুটিয়ে দেখল। এখনো তার হাবভাবে কোন উত্তেজনা নেই।

হাতের ঘড়ি পরীক্ষা করে দেখল ল্যাঙডন। আমাদের হাতে মাত্র আধঘণ্টা সময় আছে।

ওলিভেট্টি সোজা তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল তার গাড়ির দিকে। গাড়িটা সোজা চ্যাপেলের সামনে পার্ক করা। মনে মনে আশা জাগল ল্যাঙডনের একটু। আশা করা যায় লোকটা ম্যাপ আনতে গেছে।

ভিট্টোরিয়া এখনো উদ্যমী, তার মানে এ্যাঞ্জেল দক্ষিণ-পশ্চিমে দিক নির্দেশ করছে? সেদিকে কোন কোন চার্চ আছে সে বিষয়ে কোন ধারণা নেই?

আমি মরার বিল্ডিং ভেদ করে দেখতে পাই না। সখেদে বলল ল্যাঙডন, আর আমি রোমের হাজারটা গির্জার ব্যাপারেও যে সব জানি সে কথা.... থেমে গেল সে।

আরো তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে ভিট্টোরিয়াকে, কী?

পিয়াজ্জার দিকে আরেকবার দৃষ্টি ফেলল ল্যাঙডন। চার্চের সিঁড়িগুলো মাড়িয়ে আসায় এবার সে আরো একটু উঁচু হয়ে গেছে। আরো একটু বেশি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বাইরের দৃশ্যগুলো। এখনো সে খুব একটা বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু এ কথাটা নিশ্চিত, একটু নির্দেশনা পাচ্ছে এখান থেকে। সামনে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা ভবন। অনেকগুলোই গির্জাটার চেয়ে উঁচু। তারপরও সে ঠিক ঠিক বুঝে ফেলল কোনদিকে তার দৃষ্টি।

বিবিসি ভ্যানের ভিতরে, পিয়াজ্জার অপর প্রান্তে, বসে আছে গ্লিক আর চিনি। একেবারে আঠার মত লেগে আছে সিটের সাথে। আর তাদের শকুন দৃষ্টি আটকে আছে গির্জাটাকে ঘিরে গজিয়ে ওঠা বিচিত্র ঘটনার দিকে।

পাচ্ছ এগুলো? প্রশ্ন করল গুন্থার গ্লিক।

ম্যাক্রি তার নজর ধরে রেখেছে বাইরে থেকে ছাদের দিকে উঠতে থাকা লোকটার

দিকে। স্পাইডার ম্যান-স্পাইডার ম্যান খেলার তুলনায় লোকটার সাজ-পোশাক একটু বেশি ভদ্র বলা চলে।

আর মিস স্পাইডিটা কে?

চিনিতা তাকাল নিচের অপরূপ মেয়েটার দিকে। আমি নিশ্চিত, তুমি খুঁজে বের করার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী।

কী মনে হয়? এডিটোরিয়ালকে কল করব?

এখনো না। আরো একটু খতিয়ে দেখতে দাও। এখনো ঝোলাতে আরো কিছু থাকতে হবে যদি জানাতে হয় যে কনক্লেভের সময়টা পার করছি আমরা এখানে বসে বসে এ্যাডভেঞ্চার দেখতে দেখতে।

তোমার কী মনে হয়? আসলেই কেউ ওই হদ্দ বুড়োদের একজনকে এখানে পটল তুলিয়ে দিয়েছে?

হাসল চিনিতা, তুমি নিশ্চিত নরকে যাবে।

কিন্তু সাথে করে পুলিৎজার পুরস্কারটাও বগলদাবা করে নিয়ে যাব।

যত উপরে উঠছে ল্যাঙডন, ততই স্পষ্ট হচ্ছে বাইরের দৃশ্য। উপরে ওঠা তার থামছে না।

উপরের দিকে চলে যাবার পর সে আশার চেয়েও বেশি হারে হাঁপাচ্ছিল। শেষ ধাপে উঠে সে নিজেকে কোনমতে টেনে তুলল। তারপর ঝাড়ল গায়ে লাগা ধুলি ময়লা। এই উচ্চতা তাকে মোটেও ভীত করছে না। বরং ভালই লাগছে।

সামনের দৃশ্যের কোন তুলনা নেই। যেন কোন সাগরে আগুন লেগে গেছে। আগুন লেগে গেছে বাড়িগুলোর ছাদে ছাদে। শেষ বিকালের সূর্য কৃপণভাবে কিরণ পাঠাচ্ছে সাত পাহাড়ের শহরের উপর। জীবনে প্রথমবার সে দেখতে পেল দূষণমুক্ত, স্বর্গীয় সিটা ভিডিওকে—দ্য সিটি অব গড।

এই ভবন সমুদ্রে ল্যাঙডন খুঁজে বের করার চেষ্টা করল ঘন্টি বাধা গির্জাগুলোকে। কিন্তু সে যতই দূরে... আরো দূরে দেখতে লাগল, ততই তার দৃষ্টি হতবিহ্বল হয়ে উঠল। চার্চের এত অভাব রোম শহরে! এখানে শত শত গির্জা আছে। ভাবছে সে। আর দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে দু-একটা না থেকে পারে না। চার্চটাকে এখনো দেখা যাবে, যদি সেটা এখনো দাঁড়িয়ে থেকে থাকে।

চোখকে একবিন্দু বিশ্রাম না দিয়ে সে আবার খতিয়ে দেখতে শুরু করল পুরনো দৃশ্যগুলো। সে জানে, অবশ্যই, সব চার্চের বাইরে যে দৃশ্যমান মিনার থাকবে এমন কোন কথা নেই। বিশেষত ছোট স্যাঙচুয়ারিগুলোতে তা আশা করা যায় না। বলার অপেক্ষা রাখে না, সপ্তদশ শতকে সাঁই সাঁই করে রোমের আকৃতি বড় হয়ে যায় কারণ নিয়মানুযায়ী, গির্জার চেয়ে উঁচু করে কোন বাসা বানানো যেত না। কিন্তু অনেক আগেই সে কাল চলে গেছে। এখন যখন ল্যাঙডন তাকায় সেদিকে, দেখতে পায় অনেক অনেক এ্যাপার্টমেন্ট, হাই-রাইজ, টিভি টাওয়ার।

আরো একবার দূরতম প্রান্তে ল্যাঙডনের দৃষ্টি কিছু একটা খুঁজে ফিরল। দূরে দেখা যাচ্ছে মাইকেলেঞ্জেলোর কীর্তি। সেদিকেই কোথাও আছে সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা, আছে ভ্যাটিকান সিটি। ভেবে সে কূল পায় না কী অবস্থায় আছে কনক্লেভের ভিতরের মানুষগুলো, পাওয়া গেছে কি এ্যান্টিম্যাটারের ক্যানিস্টারটা? যদ্দূর মনে হয়, পাওয়া যায়নি... যাবেও না।

তার মাথায় আবার চক্কর কাটতে শুরু করল কবিতাটা। মন্ত্রের মত আউড়ে গেল সে। একের পর এক লাইন। অতি সাবধানে। ফ্রম শানজিস আর্থি টম্ব উইথ ডেমনস্ হোল। তারা শানজির টম্ব খুঁজে পেয়েছে। ক্রস রোম দ্য মিস্টিক এলিমেন্টস আনফোল্ড। মিস্টিক এলিমেন্ট হল আর্থ, এয়ার, ফায়ার, ওয়াটার। দ্য পাথ অব লাইট ইজ লেইড, দ্য সেক্রেড টেস্ট। পাথ অব ইলুমিনেশন তৈরি হয়েছে বার্নিনির স্কাল্পচার থেকে। লেট এ্যাঞ্জেল গাইড ইউ অন ইউর লফটি কোয়েস্ট।

এই এ্যাঞ্জেল দিক নির্দেশ করছে ঠিকই।

দক্ষিণ-পশ্চিমে।

সামনের সিঁড়ির দিকে, বলল গ্লিক চড়া গলায়। কিছু একটা হচ্ছে সেখানে!

মূল এন্ট্রান্স থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ম্যাক্রি তাকাল সেদিকে। অবশ্যই, কিছু একটা হচ্ছে সেখানে। একদল মিলিটারি সদৃশ লোক একটা আলফা রোমিওকে এগিয়ে এনেছে একেবারে সিঁড়ির কাছে। খুলে ফেলেছে ট্রাঙ্ক।

একজন চোখ বুলাচ্ছে চারদিকে। প্রথমে ম্যাক্রির মনে হয়েছিল লোকটা তাকে দেখছে। তারপর দেখল, না, ঘুরে গেছে দৃষ্টি। আশপাশে কেউ নেই, এ সিদ্ধান্তটা পাকা হবার পর সে একটা ওয়াকি-টকি বের করে কথা বলতে শুরু করল।

এমন সময় সত্যি সত্যি একটা সৈন্যদলকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। ঠিক যেভাবে আমেরিকান ফুটবল খেলায় প্লেয়াররা দেয়াল তৈরি করে এগিয়ে আসে সেভাবে। সিঁড়ির একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত।

একটা মানবপ্রাচীরের মত এগিয়ে আসছে তারা। তাদের পিছনে, একেবারে অদৃশ্য কিছু একটাকে তুলে আনছে চারজন সৈনিক। ভারি কিছু। ভেবে পাচ্ছে না গ্লিক কী হতে পারে ওটা।

পিছনে তাকাল সে, তারা কি গির্জা থেকে কিছু চুরি করছে?

জবাব দেয়ার ধাত নেই ম্যাক্রির। সে তার জুম ক্যামেরায় দৃশ্যগুলো ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছে। তার মনে এখন অন্য চিন্তা। একটা ফাঁক-ফোঁকর! একটা মাত্র ফ্রেম! তাতেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। লোকজন একটা প্রাণীর মত এগিয়ে আসছে। অবিচ্ছিন্ন। কাম অন! লেগে আছে ম্যাক্রি, কিন্তু তাতে কিছুই-বোঝা যাচ্ছে না। তারপর, অবশেষে, সৈন্যরা যখন কিছু একটা তোলার চেষ্টা করছে ট্রাঙ্কে, তখনি সুযোগটা মিলে গেল ম্যাক্রির।

অবশেষে, পাওয়া গেল ফ্রেম। আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবার মত সুযোগ। তারপরও তেমনি পাথর পাথর ভাব ধরে বসে আছে ভিডিওগ্রাফার। একটা নয়, মোটামুটি খান দশেক ফ্রেম ঠিক ঠিক তুলে আনা গেছে।

এডিটোরিয়ালকে কল কর! অবশেষে বলল সে, আমরা একটা ডেডবডি পেয়ে গেছি।

অনেক দূরে, সার্নে, ম্যাক্সিমিলিয়ান কোহলার এগিয়ে গেল লিওনার্দো ভেট্রার স্টাডিতে। হুইল চেয়ারে ভর করে। দক্ষ হ্যাকারের মত সে দেখতে লাগল প্রতিটা ফাইল-পত্র। যা পাবার চেষ্টা করছে তা না মিলে যাওয়াতে সে তড়িঘড়ি করে এগিয়ে গেল ভেট্রার বেডরুমে। তার পাশের টেবিলটার উপরের ড্রয়ার তালা আটা। কিচেন থেকে একটা চাকু তুলে এনে সে সহজেই সেটার রহস্য উন্মোচন করল।

ভিতরে, কোহলার ঠিক সেটাই খুঁজে পেল যেটার জন্য তন্ন তন্ন করছিল লিওনার্দো ভেট্রার স্টাডি।

ল্যাঙডন নেমে পড়েই ধুলাবালি ঝাড়ার কাজে লেগে পড়ল।

কপাল মন্দ? জিজ্ঞেস করল ভিট্রোরিয়া।

মাথা নাড়ল ল্যাঙডন।

তারা কার্ডিনালকে ট্র্যাঙ্কে পুরে দিয়েছে।

তারপর তাকাল সে ওলিভেট্টি আর তার সৈন্যদলের দিকে। তারা একটা ম্যাপ মাটিতে বিছিয়ে কাজে লেগে পড়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমের খোঁজ করছে নাকি?

নড করল মেয়েটা। কোন চার্চ নেই। এখান থেকে সোজা সেদিকে গেলে তুমি ধাক্কা খাবে সেন্ট পিটার্সের সাথে।

গজগজ করল ল্যাঙডন। সে এগিয়ে গেল ওলিভেট্টির দিকে। সৈন্যরা তাকে পথ ছেড়ে দিল।

তাকাল ওলিভেট্টি, চোখ তুলে, কিছু নেই। এটা দিয়ে সব চার্চ অবশ্য দেখা যায়। শুধু বড়গুলো। মোটামুটি পঞ্চাশটা।

আমরা কোথায়? জিজ্ঞেস করল ল্যাঙডন।

ওলিভেট্টি পিয়াজ্জা ডেল প্রোপোলোর দিকে আঙুল রেখে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে দিক নির্দেশ করল। সেদিকে রোমের অনেকগুলো বড় বড় গির্জা আছে। কালো স্তম্ভ দিয়ে সেগুলোকে নির্দেশ করার হয়। কপাল মন্দ, রোমের বড় চার্চ বলতে রোমের প্রাচীণ চার্চগুলোকেই বোঝানো হয়। সবই ষোলশো সালের দিকে বানানো।

আমার কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে, বলল ওলিভেট্টি, আপনি কি দিকের ব্যাপারে নিশ্চিত?

ল্যাঙডন আবার মনে মনে দেখে নিল এ্যাঞ্জেলের নির্দেশিত দিকটার কথা। ইয়েস, স্যার। পজিটিভ।

শ্রাগ করল ওলিভেট্টি, তারপর এর উপর দিয়ে আরো একবার সোজা দাগ কেটে গেল। পথে পড়ল মার্গারিটা ব্রিজ, ভিয়া কোলা ভিরিয়েজো আর পাশ কাটিয়ে গেল পিয়াজ্জা ডেল রিসোর্জিমেন্টোকে। কিন্তু সোজা পথে তা কোন দিকেই আক্রমণ করল না।

কোনটার গায়েই লাগল না। শেষ পর্যন্ত তা গিয়ে ঠেকল সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে।

সেন্ট পিটার্সের দোষ কোথায়? বলল এক সাহসি সৈন্য, তার বা চোখের নিচে গভীর ক্ষত, এটাও একটা চার্চ।

মাথা নাড়ল সাথে সাথে ল্যাঙডন, না-না। একটা পাবলিক প্লেস হতে হবে। পিটার্স তেমন কোন সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত জায়গা নয়।

কিন্তু সেটা সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের ভিতর দিয়েও গিয়েছে। সেটা পাবলিক প্লেস। বলল ভিট্রোরিয়া, এরই মধ্যে সে চলে এসেছে।

এরই মধ্যে ল্যাঙডন এটাকে বিবেচনায় এনেছে, কোন স্ট্যাচু নেই।

ঠিক মাঝখানে একটা মনোলিথ আছে না?

মেয়েটার কথা ঠিক। সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে একটা মিশরিয় একশিলাস্তম্ভ আছে। ল্যাঙডন সেটাকে দেখেছিল। মাথায় নানা চিন্তা এসে এসে বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

না। ভ্যাটিকান মনোলিথটা বার্নিনির কীর্তি নয়। ক্যালিগুলা এটাকে এনেছিলেন। আর এর সাথে এয়ারের কোন সম্পর্ক নেই। আরো একটা কথা আছে। কবিতায় বলা হয়েছে নিশানাগুলো ছড়িয়ে আছে রোমে। ভ্যাটিকান সিটির কথা নেই সেখানে।

নির্ভর করছে আপনি কাকে জিজ্ঞেস করছেন তার উপর। নাক গলাল একজন গার্ড।

কী? চোখ তুলে তাকাল ল্যাঙডন।

সব সময়ই কাবাবের ভিতর হাড্ডি। বেশিরভাগ ম্যাপেই সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারকে ভ্যাটিকান সিটির ভিতরে দেখানো হয়। কিন্তু এখানে আরো একটা ব্যাপার আছে। বেশিরভাগ রোমান প্রশাসক মনে করে এটা যেহেতু ভ্যাটিকানের আর সব জায়গার মত

দেয়াল ঘেরা নয়, তাই এটা রোমের অভ্যন্তরীণ এলাকা।

আপনি বাচ্চাদের মত কথা বলছেন। বলল ল্যাঙডন। এমন কথা সে কখনো শোনেনি।

আমি এটার কথা বলেছি একটামাত্র কারণে, তেতে উঠেছে গার্ড, কারণ মিস ভেট্রা আর কমান্ডার ওলিভেট্টি এয়ারের সাথে সম্পর্কের কথা বলছিলেন।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ল্যাঙডনের, আর আপনি জানেন সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে বায়ুর সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু আছে?

ঠিক তা নয়। এটা কোন স্কাল্পচার না। হয়ত এর সাথে আদৌ কোন সম্বন্ধ নেই।

শোনা যাক তোমার কথা। চাপ দিল ওলিভেট্টি।

শ্রাগ করল গার্ড। আমি এ সম্পর্কে জানি তার একমাত্র কারণ আমি পিয়াজ্জায় ডিউটিতে থাকি প্রায়ই। সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের প্রতিটা কোণা আমার নখদর্পণে।

স্কাল্পচার, খোদিত শিল্প, যুক্তি দেখানোর ভঙ্গিতে বলছে ল্যাঙডন, দেখতে কেমন?

এখনো ভেবে কূল পায় না ল্যাঙডন, এত বড় সাহস কি হবে তাদের? ইলুমিনেটি কি সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার ঠিক বাইরে তাদের দ্বিতীয় চিহ্ন রাখার সাহস পাবে!

এটার পাশ দিয়ে প্রতিদিন আমি ধর্ণা দেই। বলছে সোলজার, এটা একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত। ঠিক যেদিকে লাইনটা গেছে। এটাই আমাকে সে জিনিসটার কথা মনে করিয়ে দিল। যা বলেছিলাম, এটা আসলে কোন স্কাল্পচার নয়। বরং যেন কোন... ব্লক।

পাগলাটে দেখাচ্ছে ওলিভেট্টিকে, একটা ব্লক?

ইয়েস, স্যার। স্কোয়ারে বসানো একটা মার্বেল ব্লক। মনোলিথের ভিত্তি স্বরূপ। কিন্তু ব্লকটা কোন চতুষ্কোণ নয়, বরং অর্ধচন্দ্রাকার। আর এটা নিচু হয়ে গেছে বায়ু প্রবাহের মত। বাতাস... আমার মনে হয়, যদি আপনারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে চান।

অত্যাশ্চর্য চোখ নিয়ে তাকাল ল্যাঙডন সৈন্যটার দিকে। রিলিফ! বলল সে হঠাৎ করে।

সবাই তাকাল তার দিকে। রিলিফ, বলল ল্যাঙডন, স্কাল্পচারের অন্য পাশটা!

স্কাল্পচার ইজ দ্য আর্ট অব শেপিং ফিগার্স ইন দ্য রাউন্ড গ্র্যান্ড অলসো ইন রিলিফ। চকবোর্ডে এই সংজ্ঞা লিখে আসছে সে অনেক বছর ধরে। রিলিফ হল দ্বিমাত্রিক স্কাল্পচার। পেনিতে যেভাবে আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রোফাইল দেয়া আছে, সেভাবে। বার্নীনির চিগি চ্যাপেলের মেডেলগুলোও তেমনি উদাহরণ।

বাসোরেলিইভো? ইতালিয় শিল্প-কথা ব্যবহার করে গার্ড জানতে চাইল।

হু। বাস-রিলিফ! ল্যাঙডন আরো এগিয়ে গেল সামনে। আমি ঐ টার্মগুলো নিয়ে চিন্তা করছিলাম না। যে জিনিসটা নিয়ে আপনারা কথা বলছেন সেটার নাম আসলে ওয়েস্ট পোনেন্তে–দ্য ওয়েস্ট উইন্ড। এর আরো একটা নাম আছে। রেসপিরো ভিডিও।

ব্রিথ অব গড?

ঠিক তাই। এয়ার! আর একটাকে সেখানে বসানো হয়েছে সত্যিকার আর্কিটেক্টের দ্বারা!

ল্যাঙডন দেখল, ভিট্টোরিয়ার চোখেমুখে অনিশ্চয়তা, আমি ভেবেছিলাম মাইকেলেঞ্জেলো সেন্ট পিটার্সের নির্মাতা।

তোমার কথায় ভুল নেই। ব্যাসিলিকা গড়েছেন তিনি। কিন্তু সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের ডিজাইনার ছিলেন বার্নিনি!

যখন আলফা রোমিওর গাড়ির বহর এগিয়ে যাচ্ছে মহা ব্যস্ততায়, তখন প্রত্যেকে এত উত্তেজিত আর চিন্তিত ছিল যে কেউ খেয়াল করেনি তাদের পিছনে পিছনে পাততাড়ি গোটাচ্ছে বিবিসি ভ্যান।

গুন্থার গ্লিক হন্তদন্ত হয়ে চালাচ্ছে তার পেটমোটা ভ্যানটাকে। দ্রুত যেতে থাকা আলফা রোমিওর সারিকে অনুসরণ করতে করতে গলদঘর্ম হচ্ছে সে। কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র সে নয়। টাইবার নদীর তীর ধরে তারা ছুটছে তীরবেগে। পন্টা মার্গারিটা ধরে তারা পেরিয়ে গেল টাইবার।

সাধারণত গ্লিক অনুসরণ করার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে চলে। ধরি মাছ ছুঁই পানি গোছের দূরত্ব, যেন যাকে ফলো করা হচ্ছে সে ঠাহর না করতে পারে। কিন্তু আজকে তার ভিতরে সেসবের বালাই নেই। এই লোকগুলো উড়ালপঙ্খীতে চড়ে যাচ্ছে যেন!

লন্ডনের সাথে একটা ফোনকল শেষ করে পিছনের সিটে, নিজের কর্মক্ষেত্রে ম্যাক্রি আবার এ্যাকশনে নামার পুরোদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার সিরিয়াসনেস এতোক্ষণে উঠে এসেছে উপরে। ফিরে তাকাল সে গ্লিকের দিকে।

কোন খবরটা চাও? গুড নিউজ নাকি ব্যাড নিউজ?

ব্যাড নিউজ।

সম্পাদকীয় তেতে আছে, আমরা কাজ ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছি।

সারপ্রাইজ।

তারা আরো মনে করছে তোমার সংবাদদাতা একটা প্রতারক।

অবশ্যই।

আর বস এইমাত্র আমাকে বললেন যে তুমি হলে এমন এক লোক যাকে ক্ষণে ক্ষণে চা খেয়ে তরতাজা থাকতে হয় নাহলে একেবারে স্বপ্নে ডুবে থাক।

গ্রেট। আর সুসংবাদ?

তারা রাজি হয়েছে আমাদের এইমাত্র তোলা ফুটেজ দেখতে।

সাথে সাথে একটা আলাভোলা হাসি ছড়িয়ে পড়ল গ্লিকের সারা মুখ জুড়ে, এবার দেখা যাবে কোন ঘুমকাতুরে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা তাড়ানোর জন্য চায়ের প্রয়োজন আছে, তাহলে? উড়িয়ে দাও তোমার চিঠি।

ট্রান্সমিট করতে পারব না একটা স্থির জায়গা ছাড়া।

ভিয়া কোলা ডি রিয়েঙজোতে উঠে এল গ্লিক, এখন থামা অসম্ভব। সে আবারও আলফা রোমিও গুলোর কেরামতি দেখে হয়রান হয়ে যাচ্ছে। একটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে সেগুলো ঢুকে পড়েছে পিয়াজ্জা রিসোর্জিমেন্টোতে।

ম্যাক্রি সোজাসাপ্টা তার কম্পিউটারের কাজে নেমে পড়ল। আমার ট্রান্সমিটারটা একবার ভেঙে ফেল... বলল সে, সখেদে, আর তারপর আমি ফুটেজটুকু লন্ডন পর্যন্ত পায়ে হেঁটে পৌঁছে দিয়ে আসব।

শক্ত হয়ে বস, আমার ভালবাসা, কেন যেন মনে হচ্ছে আমরা শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি।

ম্যাক্রি সত্যি সত্যি কাঠ কাঠ হয়ে বসে পড়েছে, কোথায়?

সামনে ভোজবাজির মত হাজির হওয়া বিশাল গম্বুজের দিকে তাকিয়ে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল গ্লিক, প্রাণখোলা হাসি, যেখান থেকে আমাদের ভানুমতির খেল শুরু হয়েছিল সেখানেই।

সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে জড়ো হওয়া অনেক যান বাহনের মধ্যে মুহূর্তে জায়গা করে নিল আলফা রোমিও চারটে, তারা বিভক্ত হয়ে গিয়ে পিয়াজ্জার চারদিকে ঘিরে ফেলল। ঠান্ডা মাথায় সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে লোকজন। গার্ডরা সাথে সাথে সেখানে ভিড় করা ট্যুরিস্ট আর সাংবাদিকদের ভিতরে হারিয়ে গেল। কোন কোন গার্ড ঢুকে পড়ল পিলারের জঙ্গলের ভিতরে। সেখানেও মিশে গেল তারা মুহূর্তের মধ্যে। উইন্ড শিল্ডের ভিতরে বসে ল্যাংডন দেখতে শুরু করল সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের কান্ড কারখানা।

নেমেই, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওলিভেট্টি। আরো লোক আনার জন্য খবর পাঠিয়েছে

ভিতরে। কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিয়েছে সেই মনোলিথের গোড়ায়। ল্যাঙডন সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের ছড়ানো চত্বরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে যুদ্ধ করল। কী করে একজন ইলুমিনেটি এ্যাসাসিন এই দঙ্গলের মধ্যে ঢুকে, একজন কার্ডিনালকে বেমক্কা মেরে ফেলে সদর্পে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করে! কী করে সে লোকটাকে তুলে আনবে এখানে, তারপর সর্বসমক্ষে হত্যা করবে?

মিকি মাউসকে চেক করে দেখল আরেকবার ল্যাঙডন। আটটা চুয়ান্ন। আর মাত্র ছ মিনিট।

এগিয়ে এল আবার গাড়ির দিকে ওলিভেট্টি, ল্যাঙডন আর ভিট্টোরিয়াকে বলল, আপনারা দুজনে এখন বার্নিনি ইটের বা ব্লকের বা কোন্ জাহান্নামের জায়গা সেটা... সেখানে হাজির থাকবেন। একই কাজ। আপনারা ট্যুরিস্ট। আর ফোন ব্যবহার করবেন বেখাপ্পা কিছু দেখামাত্র।

ল্যাঙডন কিছু বলার বা বোঝার আগেই দেখতে পেল ভিট্টোরিয়া তার হাত চেপে ধরে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার শেষ প্রান্তে আর একটু হলেই ডুবে যাবে শরতের সূর্য। পিয়াজ্জাকে আড়াল করে একটা বোবা করে দেয়া আকারের ছায়া এলিয়ে পড়ছে। ল্যাঙডন একটা হিম শীতলতা অনুভব করে যখন সে আর ভিট্টোরিয়া যাচ্ছে ঠান্ডা পথ ধরে। মানুষের সমুদ্রে ডুবে যেতে যেতে ল্যাঙডন বারবার চোখ বুলিয়ে যায় প্রত্যেক দর্শনার্থীর মুখে। এর মধ্যে খুনিটা নেই তো! ভিট্টোরিয়ার হাত খুব উষ্ণ লাগছে তার কাছে।

সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের খোলা এলাকা পেরিয়ে যেতে যেতে ল্যাঙডন টের পেল একটা বিশালত্বের অনুভূতি তার মনকে দখল করে রাখছে। কী অবাক ব্যাপার, বার্নিনি সারা জীবন ভ্যাটিকানে কাটিয়েও চারশো বছর ধরে একেবারে অপরিচিত রয়ে গেছেন। বাইরের দুনিয়ার কাছে, ইলুমিনেটির গোপন মাস্টার হিসাবে।

ওবেলিস্কের দিকে? একশিলাস্তম্ভটার কাছে?

পিয়াজ্জার বামদিক ধরে যাবার সময় নড করল ল্যাঙডন।

সময়? জিজ্ঞেস করল ভিট্টোরিয়া। দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে, সতর্কভাবে।

পাঁচ।

কিছু বলল না ভিট্টোরিয়া। কিন্তু টের পেল ল্যাঙডন, হাতের উপর ঠিক ঠিক চেপে বসেছে মেয়েটার হাত, আরো শক্ত হয়ে। সে এখনো অস্ত্রটা বহন করছে। এখনো সে দুরু দুরু বুকে আশা করে ভিট্টোরিয়া জিনিসটাকে আবার ফেরৎ চাইবে না। সে চায় না সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে, সর্বসমক্ষে ভিট্টোরিয়া গানটা ব্যবহার করে কোন খুনির হাঁটুর হাড়ি উড়িয়ে দিয়ে খবরের পাতায় চলে আসুক। আবার এ কথাটা মনে পড়লেও তার অস্থির লাগে। একজন কার্ডিনালকে এখানে ব্র্যান্ডেড অবস্থায় পাওয়া যাবার কথা।

এয়ার... ভাবছে ল্যাঙডন, বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বস্তু... সে ব্র্যান্ডটার চিহ্ন বোঝার চেষ্টা করছে। কেমন হবে এ্যাম্বিগ্রামটা! কথা ভেবে এখনো কোন কূল কিনারা পাচ্ছে না সে। একটা বিশাল মরুভূমির উপরে বসানো গ্রানাইটের পাথরে যেন সে দাড়িয়ে আছে। চারধার ঘিরে আছে সুইস গার্ড। যদি হ্যাসাসিন ঠিক ঠিক চেষ্টাটা করে, তবু সে কীভাবে বেঁচেবর্তে যাবে তাই ভেবে পায় না সে।

পিয়াজ্জা গোলাপের একেবারে কেন্দ্রে কালিগুলার সাড়ে তিনশ টন ওজনের মিশরিয় ওবেলিস্কটা দাঁড়িয়ে আছে এক ঠায়। এটা একাশি ফুট উপরে উঠে গেছে, সেখানে একটা ফাপা ধাতব ক্রস মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বলছে, শির দেগা, নাহি দেগা আমামা। এটা এত উঁচুতে যে চারদিক আঁধারে ভরে গেলেও এটার মাথাকে ছুয়ে দিতে পারেনি বিকালের ছায়া।

চারদিকে ছায়া, তার মধ্যে একটু রোদের সামনে অপার্থিব মাহাত্মে ঝকঝক করছে সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের ধাতব ক্রস, যে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে যিশু প্রাণপাত করেছিলেন সেটারই এক

অনুকরণ।

চির উন্নত মম শির। একেবারে নিখুঁত দূরত্ব থেকে দুটো ঝর্ণা শোভিত করছে ওবেলিস্কটাকে। সাধারণের কাছে, এটা মনে হবে দেখতে সুন্দর, ব্যস। কিন্তু এর মধ্যে আরো গুপ্ত রহস্য রয়েছে যেগুলোর কিছু কিছু জানে চিহ্নবিদরা, আর যতটা জানে ল্যাঙডন, বর্তমানে তারচেয়ে বেশি মনে হয় কোন বিশেষজ্ঞ জানে না।

পুরো রোম জুড়ে মিশরিয় চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। পিরামিড, অর্ধচন্দ্র, অদ্ভুত জ্যামিতি... এর অর্থ পুরোটা জানতে পারবে না বিশেষজ্ঞরা যে পর্যন্ত না বার্নিনির পুরো রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে।

ওবেলিস্কের কাছাকাছি পৌঁছেই আরো ধীর হয়ে গেল ভিট্টোরিয়া। সে এমনভাবে থামল, যেন ল্যাঙডন অসুস্থ, তাকে একটু সুযোগ দিতে হবে আস্তে ধীরে একটু বিশ্রাম করার। সাথে সাথে বুঝে ফেলল ল্যাঙডন, সেও একটু কাশির মত শব্দ করে চোয়াল ঝুলিয়ে দিল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গির্জার বাইরে কোথাও... ওবেলিস্কের আশপাশেই সেকেন্ড অল্টার অব সায়েন্স লুকিয়ে আছে–বার্নিনির ওয়েস্ট পনেন্টে–সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের একটা ডিম্বাকার ব্লক।

গুন্থার গ্লিক সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের চারপাশে ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে। একটু যেন উদাস। অন্য যে কোন দিনে, টুইড জ্যাকেট পরা বাবু সাজা লোকটা আর তার সাথে সুন্দর, খাকি শর্টস পরা মেয়েটা তার নজর মোটেও কাড়ত না।

দেখে মনে হচ্ছে তারা সুখি দম্পতি অথবা বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড, রোম চষে ফেলার কাজে বেরিয়েছে পর্যটক হয়ে। কিন্তু আজকের দিনের সাথে আর কোন দিনের সম্পর্ক স্থাপন করা চলে না। আজ অচেনা ফোনকলের দিন, মরদেহ বের করার দিন, রোম জুড়ে তান্ডব তোলা কার রেসিংয়ের দিন, টুইড জ্যাকেট পরা ফুলবাবু সেজে থাকা লোকের তরতর করে প্রাচীণ গির্জার কার্নিশ ধরে ছাদে উঠে গিয়ে আল্লা মালুম কী যেন খোঁজার দিন, সর্বোপরি, নতুন পোপ নির্বাচনের দিন।

পিছু ছাড়ার পাত্র নয় গ্লিক।

সে স্কোয়ারের অন্য প্রান্তে দেখতে পেল ম্যাক্রিকে। সে ঠিক সেখানেই গেছে, যেখানে যেতে বলেছিল গ্লিক। অদ্ভুত সেই জুটির লেজ ধরে। সে প্রেস লেখা জ্যাকেট পরে আছে। আলতো হাতে ধরে রেখেছে ক্যামেরা। জায়গা করে নিচ্ছে ভিড়ের মধ্যে। আশপাশে আর কোন সাংবাদিক নেই। তাই অনেক পর্যটকের দৃষ্টি কাড়ল বিবিসি লেখা ওয়ালা ম্যাক্রির পোশাক।

আলফা রোমিওর ট্রাঙ্কে ভরে দেয়া যে নাঙা লাশটার ফুটেজ ধরেছিল সে সেটা এখন সম্প্রচারিত হচ্ছে ভ্যানের ভি সি আর ট্রান্সমিটারে। গ্লিক জানে এই মুহূর্তে ছবিগুলো উড়ে চলেছে লন্ডনের উদ্দেশ্যে, তার মাথার উপর দিয়ে। সম্পাদকীয় কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না সে।

তার একটা কামনা ছিল। ম্যাক্রিকে নিয়ে কোনমতে যদি লাশটার কাছাকাছি ঘেঁষা যেত। কিন্তু কাবাবে হাড়ি হয়ে বসে ছিল সাদা পোশাকের সৈন্যদল।

সে জানে, এই মুহূর্তে সেই সৈন্যদলই মিশে গেছে ভিড়ের সাথে। বড়সড় কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে আজ।

প্রচারণার ডান হাত হল মিডিয়া, বলেছিল খুনি। সে আরেকবার চোখ ফেলল দূরপ্রান্তে পার্ক করা অন্যান্য মিডিয়া ভ্যানের দিকে। আবার তাকাল ম্যাক্রির দিকে। পিছন পিছন যাচ্ছে সে। রহস্যময় জুটির পিছনে।

ল্যাঙডন দেখল তার চোখ পড়ে আছে দশ কদম সামনে। ট্যুরিস্টদের ভিড়ের ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে বার্নিনির ওয়েস্ট পনেন্টে। দেখেছে ভিট্টোরিয়াও, তার হাত আরো শক্ত করে বসে গেল ল্যাঙডনের বাহুতে।

রিল্যাক্স! বলল ভিট্টোরিয়ার দিকে ফিরে ল্যাঙডন, ফিসফিস করে, তোমার ঐ পিরানহা না কী যেন... সেটা কর।

হাতের উপর চাপ কমিয়ে দিল ভিট্টোরিয়া সাথে সাথে।

তারা যত কাছে যাচ্ছে ততই যেন প্রতিটা ব্যাপার একেবারে নির্দোষ দেখাচ্ছে। সব স্বাভাবিক। ভ্রমণপিয়াসীরা দল বেঁধে হাল্কা হল্লা করছে। অপেক্ষা করছে ভক্তরা, নতুন পোপের জন্য। একটা বাচ্চা মেয়ে মনোলিথের গোড়ায় খাবার দিচ্ছে কবুতরের ঝাঁককে।

হাতঘড়ি আর একবার চেক করা থেকে কোনক্রমে বিরত করল নিজেকে ল্যাঙডন। সে জানে।

দ্য টাইম হ্যাথ কাম।

সময় চলে এসেছে।

পায়ের তলায় চলে এল ডিম্বাকার এলাকা। ভিট্টোরিয়া আর ল্যাঙডন একটা টেনশন ফ্রি মুডে থামতে শুরু করল। যেন কোন ট্যুরিস্ট-জোড়া সামনের জিনিসটা দেখার জন্য থেমেছে।

ওয়েস্ট পনেন্টে, বলল ভিট্টোরিয়া, পাথরের উপরে খোদাই করে দেয়া লেখাটা পড়তে পড়তে।

কতবার এখানে এসেছে ল্যাঙডন, কতবার রোমে এসেছে, কত বইতে এসব নিয়ে নিখুত লেখাজোকা পড়েছে সে সতৃষ্ণ চোখে। কিন্তু এখনো এর পুরো ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায়নি।

বড়জোর ফুট তিনেক হবে আকার-আকৃতিতে। পশ্চিম-বাতাসের জন্য মুখিয়ে আছে যেন পাথরটা। বার্নিনি পুরো রোমের দিকে একটা বাতাস বইয়ে দিয়েছেন..কত সূক্ষ্মভাবে! কোথায় ব্রিদ অব গড আর কোথায় সেকেন্ড এলিমেন্ট অব সায়েন্স! এয়ার... বার্নিনি বাতাসকে পাঁচটা দমকা হাওয়ায় বিভক্ত করেছেন। পাঁচ... ল্যাঙডনের বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে গ্যালিলিওর কথা। দুটো তারকা, পাঁচটা ঝাঁপ্টা, ডিম্বাকৃতি, সাযুজ্য... খালি খালি লাগছে তার। ফাঁকা লাগছে ভিতরটা।

ভিট্টোরিয়া তাকে সরিয়ে নিল দূরে। আস্তে করে নিজে যেতে থাকায় সরে এল ল্যাঙডনও। বলল মেয়েটা ফিসফিসিয়ে, মনে হয় আমাদের কেউ ফলো করছে।

ঝট করে তাকাল ল্যাঙডন, কোথায়?

কথা না বলে আরো ত্রিশ কদম এগিয়ে গেল ভিট্টোরিয়া। সে ভ্যাটিকানের দিকে আঙুল নির্দেশ করল, যেন কিছু দেখাচ্ছে ল্যাঙডনকে গম্বুজের চূড়ায়। স্কোয়ারের শুরু থেকে যে আমাদের অষ্টপ্রহর অনুসরণ করে আসছে সে-ই। বলেই আলতো করে সে তাকাল পিছনে, এখনো লেগে আছে টিকটিকিটা। চলতে থাকো।

কী

কী মনে হয়? এ-ই হ্যাসাসিন?

মাথা নাড়াল ভিট্টোরিয়া, মনে হয় না ইলুমিনেটি বিবিসির কোন ক্যামেরাসুদ্ধ সাংবাদিককে ভাড়া করবে।

সেন্ট পিটার্সের ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভিট্টোরিয়া আর ল্যাঙডন দুজনেই। সময় চলে এসেছে। সময় চলে এসেছে। তারা এড়িয়ে চলছে ওয়েস্ট পনেন্টেকে, খসানোর চেষ্টা করছে রিপোর্টারকে। কিন্তু বিধি বাম। আঠার মত লেগে, আছে সংবাদদাতা।

ঘণ্টার শব্দ ছাড়া পুরো স্কোয়ার একেবারে নিরেট, ঠান্ডা। শান্ত পর্যটকের দল ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অপেক্ষা করছে নতুন পোপের জন্য। ওবেলিস্কের গোড়ায় ধাক্কা খেল এক

মাতাল, ছোট্ট একটা মেয়ে খাবার দিচ্ছে কবুতরের ঝাককে। ভেবে পাচ্ছে না এই ফেউ কী করে পিছনে পিছনে জুটল। অবশ্যই, মনে পড়ে গেল তার। আমি আপনাদের কার্ডিনালদের ভুবনজোড়া খ্যাতি এনে দেব, বলেছিল খুনি, মিডিয়ার মাধ্যমে।

নবম ঘণ্টার শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই একটা শান্তিময় নিরবতা নেমে এল পুরো স্কোয়ার জুড়ে।

আর তার পর পরই, চিৎকার জুড়ে দিল ছোট্ট মেয়েটা।

ল্যাঙডন সবার আগে চিৎকার করতে থাকা মেয়েটার দিকে এগিয়ে যায় বিনা দ্বিধায়।

আতঙ্কিত মেয়েটা তাকিয়ে আছে ওবেলিস্কের গোড়ার দিকে, যেখানে এক মাতাল পড়ে আছে। বোঝাই যায় নেশায় চুর হয়ে আছে সে। পাঁড় মাতাল। এমন দৃশ্য দেখলে কার না করুণা জাগে... রোমের বাস্তুহারাদের কেউ হবে। তার মাথা জুড়ে এলোমেলো চুল, সারা গা নোংরা একটা চাদরে আবৃত। মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যেতে যেতে মেয়েটা চিৎকার করতে থাকে।

এরপর জমে গেল ল্যাঙডনও। সে এমন দৃশ্য কল্পনা করেনি। সামনের সিঁড়ির ধাপ থেকে কালচে কী এক তরল বেরিয়ে আসছে। নিশ্চিত রক্ত। খাঁটি রক্ত।

তার পরই, এক মুহূর্তে সব যেন ঘটে গেল।

বয়স্ক লোকটা আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, তার পরই পড়ে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে সামনের দিকে। উবু হয়ে, মুখ নিচের দিকে দিয়ে।

এগিয়ে গেল ল্যাঙডন প্রথমেই, চেষ্টা করল ধরতে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে অনেক।

পড়ে আছে শরীরটা, অনড়।

হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ল্যাঙডন, পাশে চলে এল ভিট্টোরিয়া। জমে যাচ্ছে ভিড়।

পিছন থেকে লোকটার গলায় আঙুল চেপে ধরল ভিট্টোরিয়া, তারপর বলল, এখনো পালস আছে। সোজা কর।

এরই মধ্যে কাজে নেমে পড়েছে ল্যাঙডন। কাঁধ আকড়ে ধরে সে সোজা করল লোকটাকে। কিন্তু এখন আর তেমন কোন সুযোগ নেই। লোকটা যেন নরম মাংসের একটা তাল। যেভাবে সোজা করল ল্যাঙডন সেভাবেই নেতিয়ে পড়ল শরীর।

তার বুকের অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা ক্ষত ফুটে উঠেছে। পোড়া মাংসের গন্ধ নাকে এসে লাগছে।

ভিট্টোরিয়া আরো সোজা করল।

বোধশক্তিহীন লাগছে ল্যাঙডনের। সিম্বলটা একেবারে সরল।



এয়ার! কোনক্রমে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ভিট্টোরিয়া, এই সেই লোক...।

সাজ সাজ রব পড়ে গেছে সুইস গার্ডদের মধ্যে। তারা এরই মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি আর আদেশ-নির্দেশের হল্লা বাঁধিয়ে ফেলে অদৃশ্য খুনির পিছনে উঠেপড়ে লেগে গেছে।

একজন টুরিস্ট বলল যে এই গরিব লোকটার পাশে বসেছিল এক কালো চামড়ার লোক, মিনিট কয়েক আগেও। এমনকি সে এই ভবঘুরে লোকটার পাশেও বসেছিল, সিঁড়িতে। তারপর হারিয়ে গেছে ভিড়ের মধ্যে।

কাজে লেগে পড়ল ভিট্টোরিয়া। লোকটার বুকে আঘাত দিয়ে সবটুকু বাতাস বের করে আনল। অবশ্যই, চিহ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে। তারপর মুখে মুখে শ্বাস দেয়া শুরু করল। এরপর কী ঘটবে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না ল্যাঙডনের। একদিকে মুখে মুখে বাতাস

দিচ্ছে ভিট্টোরিয়া আর অন্যদিকে রক্তের একটা ফোয়ারা ঠিক তিমির জল উগড়ে দেয়ার মত করে ছিটকে এসে ল্যাঙডনের চোখে-মুখে এসে পড়ল।

আঁৎকে উঠল ভিট্টোরিয়া, লোকটার লাঙস... বলল সে, ফুটো করে ফেলা হয়েছে।

সাথে সাথে চোখ বুজিয়ে দিল ল্যাঙডন। আর কিছু করার নেই। কার্ডিনালের ফুসফুস ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলা হয়েছে। আর বেঁচে নেই লোকটা।

সুইস গার্ড এসে পড়তে, ভিট্টোরিয়া শরীরটাকে ঢেকে দিল।

তারপর অসহায় দৃষ্টি মেলে ল্যাঙডন দেখতে পেল বিবিসি ক্যামেরা নিয়ে তাদের পিছনে পিছনে ফেউয়ের মত ঠিক ঠিক হাজির হয়েছে রিপোর্টার মূর্তীমতী আতঙ্কের মত। এখনো তার ক্যামেরা রোল করছে। তার চোখমুখ ঠিক ঠিক ক্যামেরায় রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। তারপর শিকারি বিড়ালের মত অলক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভিডিওগ্রাফার।

চিনিতা ম্যাক্রি এগিয়ে চলছে। তার জীবনেও অনেক কথা আছে।

সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে জড়ো হওয়া মানুষজনকে পাশ কাটিয়ে তার ক্যামেরা ঠিক একটা নোঙরের মত এগিয়ে গেছে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে।

কিছু একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে, টের পেল সে। সাংবাদিকতায় থাকতে থাকতে যে কারো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব দ্রুত সচল হয়ে যায়। সেও টের পাচ্ছে, টুইড জ্যাকেট পরা লোকটা দেখতে পায় তাকে আরো আগেই। থোড়াই পরোয়া করত সে, কিন্তু বাড়াভাতে ছাইয়ের মত আশপাশ থেকে আরো অনেক পাথরমুখো মানুষ ঘিরে ধরল তাকে।

ভেবে পাচ্ছে না এতক্ষণ যা সে রেকর্ড করল সেগুলো যদি সত্যি হয়। খুন হয়ে যাওয়া লোকটা যদি তেমন কেউ হয় যাকে সন্দেহ করা হচ্ছিল, তাহলে গ্লিকের কাছে আসা ভূতুড়ে কলের একটু হলেও সুরাহা হবে।

সে ঠিক ঠিক বাতাসে বিপদের গন্ধ পেয়ে গেছে। টের পাচ্ছে, সামনে কিছু একটা ওৎ পেতে আছে তার কপালে। সাত তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটিয়ে নিতে নিতে এগিয়ে যেতে থাকে বিবিসি ভ্যানের দিকে। কিন্তু বিধি বাম। হাওয়া থেকে উদয় হল একটা কমবয়েসি লোক, যার হাবভাবে-মুখভঙ্গিতে সামরিক কায়দা ফুটে উঠছে। তাদের চোখে চোখে কী যেন কথা হয়ে গেল। থেমে গেল দুজনেই।

বজ্রপাতের মত এক ঝলকে লোকটা পকেট থেকে ওয়াকিটকি বের করে কথা বলল। তারপর এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে। ম্যাক্রি সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। ঘুরে দাঁড়াল, তারপর সোজা মিশে গেল জনারণ্যে। ধ্বক ধ্বক করছে তার হৃদপিন্ড।

আরো কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে এ মুহূর্তে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। হারিয়ে গিয়েই সে বাকী কাজটা সেরে ফেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। বাঁচাতে হবে ফিল্মটাকে। কী করে? খুলে ফেলল সে। তারপর আলতো হাতে সেটাকে পিছনদিকে কোমরে গুঁজে দিয়ে উপরের কোট ছেড়ে দিল। সেটাই আড়ালে রাখবে ফিল্মটাকে। কোন চুলোয় পড়ে আছ গ্লিক?

তার বামে আরেক সোলজার দেখা দিল। কাছিয়ে আসার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে সেও। ম্যাক্রি জানে, হাতে সময় খুব অল্প। এর মধ্যে যা করার করে ফেলতে হবে। আবার ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল সে। আশপাশে আবারো হাত-পায়ের দঙ্গল। এবার মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে আরেকটা খালি ফিল্ম ভরে ফেলল সে। তারপর অপেক্ষার পালা।

সে বিবিসি ভ্যান থেকে মাত্র ত্রিশ গজ দূরে এমন সময় আবার সামনে থেকে দুজন সৈন্যকে দেখা গেল। পাহাড়ের মত দাঁড়ানো। হাত দুটো বুকে ভাঁজ করা। আবারও প্রমাদ গুণল ম্যাক্রি। আর কোথাও যাবার যো নেই। যা হবার এখানেই হবে।

ফিল্ম। একজন হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল খুব সহজেই, এখনি!

মাক্রি দু হাতে জড়িয়ে ধরল ক্যামেরাটাকে। যেন দেখতে দিতে চায় না। নো চান্স।

একটা সাইড আর্ম বের করে আনল দুজনের একজন।

তাহলে? আমাকে গুলি কর! নিজের কণ্ঠের ভারিক্কি চাল দেখে নিজেই ভড়কে গেছে ম্যাক্রি।

ফিল্ম! আবার বলল প্রথমজন।

কোন নরকে পড়ে আছে গ্লিক। পা ফাঁক করে দাঁড়াল সে। তারপর আরো সতেজে বলল, চিৎকার করে, আমি বিবিসিতে কর্মরত একজন প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফার! ফ্রি প্রেস এ্যাক্টের দ্বাদশ আর্টিকেল অনুসারে, এই ফিল্মটা ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের সম্পত্তি।

বিন্দুমাত্র কান দিল না লোক দুজন। একেবারে পাথরমুখো হয়ে রইল। সামনে এগিয়ে এল অস্ত্র হাতের লোকটা। আমি সুইস গার্ডের একজন লেফটেন্যান্ট। আমি পবিত্র অথরিটির পক্ষ থেকে বলছি আপনি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে থাকা অবস্থায় আপনাকে সার্চ করার এবং নিরাপত্তা হেফাজতে নেয়ার পূর্ণ অধিকার আছে আমাদের।

তাদের চারধারে এরই মধ্যে লোকজনের একটা জটলা পাকিয়ে যাচ্ছে।

চিৎকার করল ম্যাক্রি, আমার পক্ষে কোনমতেই এই ক্যামেরার ভিতরে থাকা ছবি দিয়ে দেয়া সম্ভব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি লন্ডনে আমাদের এডিটরের সাথে কথা বলছি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না...

তার কথা মাঝপথেই থেমে গেল। একজন সুইস গার্ড এগিয়ে এসে হাত থেকে ছিনিয়ে নিল ক্যামেরা। অন্যজন সোজা পাকড়াও করল তাকে। বিন্দুমাত্র দরদ না দেখিয়ে খপ করে ধরল তার বাহু। তারপর নির্দয়ভাবে ফিরিয়ে আনল ভ্যাটিকানের দিকে। লোকজনের ভিতর দিয়ে জায়গা করে নিল। মুখে বলল, গ্রাজি।

মনে মনে একটাই প্রার্থনা ম্যাক্রির। তারা যেন তাকে সার্চ না করে। তাহলেই থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়বে। যদি একবার বাঁচানো যায় লুকিয়ে রাখা ফিল্মটাকে। কোনমতে যদি ট্রান্সমিট করা যায় নয়-ছয় করে, তাহলেই কেল্লা ফতে

কিন্তু হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল। পিছন থেকে কে যেন হাত দিয়েছে কোটের নিচে। আবারো প্রমাদ গুণল সে মনে মনে। কী হচ্ছে এসব? হাতটার স্পর্শ পেয়ে বোঝা যায় কোন পুরুষের কারসাজি এটা। সে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে এবার আর রক্ষা নেই। চলে গেল জিনিসটা। চকিতে পিছন ফিরে তাকায় ম্যাক্রি। ঠিক যা ভেবেছিল। গ্লিক শ্বাস চেপে রেখে ফিরে যাচ্ছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ম্যাক্রি।

৭৭

রবার্ট ল্যাঙডন পোপের অফিসের সাথে লাগানো প্রাইভেট বাথরুমে যায়। চোখ-মুখ থেকে ধুয়ে ফেলে রক্তের দাগ। রক্তটা তার নয়, এ শোণিত আসলে কার্ডিনাল ল্যামাসের। এই একটু আগে তিনি মারা গেলেন এমন এক জায়গায়, যেখানে তার ফিরে আসার কথা ছিল পোপ হয়ে, আজ রাতেই। ভার্জিন স্যাক্রিফাইসেজ অন দ্য অল্টার্স অব সায়েন্স। কথা রেখেছে খুনি।

আয়নায় নিজের চেহারাই চিনতে পারছে না সে। আশ্চর্য, এরই মধ্যে ক্লান্তির একটা সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে উৎকন্ঠার একটা জলজ্যান্ত চিহ্ন, একই সাথে চিবুক জুড়ে জন্মেছে খোচা খোচা দাড়ি। সে, যে ঘরে আছে সেটার চারদিকে আভিজাত্য। চতুর্পাশে রাজকীয়তার আবেশ। কালো মার্বেল পাথরে বাঁধানো ঘরে সোনার প্রলেপ। সুতি তোয়ালের সাথে আছে সুগন্ধি সাবান।

এইমাত্র যে রক্তাক্ত ব্র্যান্ড সে দেখতে পেল সেটা নিয়ে চিন্তিত বোধ করছে। এয়ার! চিত্রটা যাচ্ছে না মন থেকে। সে প্রত্যক্ষ করেছে তিন তিনটা এ্যাম্বিগ্রাম... আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর। আর সে নিশ্চিত জানে, আরো দুটো বাকি আছে।

ঘরের বাইরে, মোটামুটি বলা চলে, ওলিভেট্টি, ক্যামারলেনগো আর ক্যাপ্টেন রোচার বাক-বিতন্ডা করছে কী করতে হবে পরে এ নিয়ে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত আবার জ্বালাচ্ছে এন্টিম্যাটার সমস্যার কোন সুরাহা না হওয়া। হয় ওলিভেট্টির লোকজন ঠিকমত ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি, সার্চ করতে পারেনি পুরোদমে, নয়তে আরো গহীন কোন জায়গায় সযত্নে বসিয়ে দেয়া হয়েছে সেটাকে।

ল্যাঙডন হাতমুখ শুকিয়ে নিয়ে একটা ইউরিনালের খোঁজে আশপাশে চোখ বুলাল। কোন ইউরিনাল নেই। একটা বোল আছে। সেটার ঢাকনাই তুলল সে।

কী করবে সে? আজ সারাটা দিন অসহনীয় সব চাপ সয়ে যেতে হয়েছে তাকে। পার করতে হয়েছে একের পর এক বাঁধা। খাটাতে হয়েছে ব্রেনটাকে। বিশ্রাম নেই। নেই কোন বিরাম। শুধু একের পর এক আতঙ্ক, একের পর এক রহস্য, একের পর এক সমস্যা। কী করা যায়? খাবার নেই, নেই পানীয় নেয়ার বালাই। একাধারে পাথ অব ইলুমিনেশনের খোঁজে তোলপাড় করে ফেলা। একের পর এক নৃশংস খুনকে অনুসরণ করা। আর চাপ নিতে পারছে না স্নায়ু। এই নাটকের শেষ কোথায়!

ভাব! বলছে সে নিজের মনকে। কিন্তু এটা কোন কাজেই আসছে না।

ফ্ল্যাশ করার সাথে সাথে আরো একটা চিন্তা তার মাথায় খেলে গেল। এটা পোপের টয়লেট। ভাবল সে। আমি এইমাত্র পোপের টয়লেটে প্রাকৃতিক কর্ম সারলাম।

হাসল সে মুচকে মুচকে।

পবিত্র সিংহাসন!

লন্ডনে একজন বিবিসি টেকনিশিয়ান স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া এক ভিডিও ক্যাসেট বের করল। মেয়েটা ঠান্ডা মাথায় টেপটাকে এডিটর ইন চিফের ভিসিআরে ঢুকিয়ে দিল, তারপর চালিয়ে দিল সেটাকে।

একদিকে টেপ চলছে আরেকদিকে গুন্থার গ্লিক ভ্যাটিকানে বসে কী কী বলেছিল একটু আগে সেই ফিরিস্তি বলে যাচ্ছে একাধারে। সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে এইমাত্র খুন হয়ে যাওয়া লোকটার একটা ছবি তুলে আনল বিবিসি আর্কাইভ থেকে।

এডিটর ইন চিফ অফিস থেকে বেরিয়ে এল। তার হাতে একটা গরুর গলায় বাঁধার মত ঘন্টি। টিনটিন করে বাজিয়ে যাচ্ছে সে। সাথে সাথে নিশ্চুপ হয়ে গেল পুরো এডিটরিয়াল।

পাঁচে পাঁচ! বোমা মারল লোকটা, অন এয়ার! মিডিয়া কো-অর্ডিনেটরগণ, আমি আপনাদের কন্টাক্ট শুরু করতে বলছি। বিকিকিনি করার মত একটা গরম গল্প আছে আমাদের ঝোলায়। সাথে আছে ভিডিও চিত্র!

যার যার রোলোডেক্স আকড়ে ধরল মার্কেট কো-অর্ডিনেটররা।

ফিল্ম স্পেক! হুঙ্কার ছাড়ল একজন।

ত্রিশ সেকেন্ড দৈর্ঘের! জবাব দিতে দেরি করল না চিফ।

বিষয়?

সরাসরি হত্যা।

আনন্দে আটখানা হয়ে গেল কো অর্ডিনেটর। ব্যবহার আর লাইসেন্স প্রাইজ কত হবে।

প্রতিটায় এক মিলিয়ন ইউ এস ডলার।

সাথে সাথে শক্ত হয়ে গেল প্রতিটা মাথা, কী!

আমার কথা আপনারা ঠিকই শুনতে পেয়েছেন! খাদ্য শৃঙ্খলের উপর থেকে শুরু করতে চাচ্ছি আমি। প্রথমেই সিএনএন, এমএসএনবিসি, তারপর বাকী তিন প্রধান খবরের জায়গা। তাদেরকে একটা ডায়াল অফার করুন, তারপর ভাবার সময় দিন পাঁচটা মিনিট। সবশেষে জানিয়ে দিন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে খবর চাউর করে দিচ্ছে বিবিসি।

কোন আজব ঘটনা ঘটল? জিজ্ঞেস করল একজন, জ্যান্ত অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর চামড়া ছিলে কেটে কেউ কি লবণ মাখিয়ে দিয়েছে?

মাথা ঝাঁকাল চিফ, এরচেয়েও বেশি কিছু!

এদিকে, ঠিক একই সময়ে, রোমের কোন এক গুপ্ত আড্ডায় আয়েশ করে হেলান দিয়ে বসে আছে হ্যাসাসিন। তার চোখেমুখে তৃপ্তির ছাপ। অনেক কাজ করা হয়ে গেছে ভালমত। অনেক কাজ করতে এখনো বাকি।

আমি চার্চ অব ইলুমিনেশনে বসে আছি। ভাবল সে, দ্য ইলুমিনেটি লেয়ার...

সে কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না যে এত শতাব্দি পরেও এখানে এটা বহাল তবিয়তে আছে।

দায়িত্বশীলের মত সে বিবিসির রিপোর্টারের কাছে ডায়াল করল। আরো অনেক চমক বাকি আছে। বাকি আছে আসল ঘটনা ঘটার। আর মাত্র কিছুক্ষণ।

ভিট্টোরিয়া ভেট্রা একটা জলের গ্লাসে একটু একটু করে চুমুক দিয়ে সামনের দিকে বসা সুইস গার্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। সে জানে কিছু না কিছু খেতে হবে এবার। খাওয়া উচিৎ। কিন্তু খিদে নেই মোটেও। পোপের অফিস এখন সরগরম। চারদিকে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের হল্কা। ক্যাপ্টেন রোচার, কমান্ডার ওলিভেট্টি এবং আরো আধ ডজন গার্ড তীক্ষ্ণ সুরে বাক-বিতন্ডা করছে কী করতে হবে সে বিষয়ে।

সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রবার্ট ল্যাঙডন। বিধ্বস্ত চোখে সে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

কোন আন্দাজ? এগিয়ে এল ভিট্টোরিয়া।

মাথা নাড়ল বিমর্ষভাবে ল্যাঙডন।

কেক?

খাবারের কথায় তার মন যেন চনমনে হয়ে উঠল, ওহ! অবশ্যই! ধন্যবাদ তোমাকে। বহুদিনের বুভুক্ষের মত খেয়ে চলল সে।

ক্যামারলেনগো ভেন্ট্রেস্কাকে এসকর্ট করে দুজন সুইস গার্ড যখন ভিতরে নিয়ে এল তখনি পুরো ঘরে নেমে এল একটা অসহ্য নিরবতা। চ্যাম্বারলিনকে আগে যদি ডুবন্ত মনে হয়ে থাকে তো এখন বিলকুল খালি দেখাচ্ছে তাকে। বুঝে নিল ভিট্টোরিয়া।

কী হয়েছে? ক্যামারলেনগো সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দিল ওলিভেট্টির দিকে। কিন্তু তার চোখমুখের ভাষা দেখেই বোঝা যায় সে যা জানার জেনে গেছে। এখন আর নতুন করে কিছু জানাতে হবে না।

ওলিভেট্টির সামরিক কায়দার রিপোর্ট দেয়ার হাল দেখে যে কেউ বলবে যুদ্ধক্ষেত্রে কোন জেনারেলের কাছে ফিল্ড অফিসার তার ফিরিস্তি জানাচ্ছে, সান্তা মারিয়া ডেল প্রোপোলোর চার্চে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় কার্ডিনাল ইনারকে রাত আটটার অব্যবহিত পরে। তিনি অত্যাচারিত হয়েছেন, মাটিতে পোঁতা অবস্থায় এবং মুখভর্তি মাটি থাকা অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করা হয় এবং তার বুকে দ্বিমুখী শব্দ একে দেয়া ছিল, আর্থ। কার্ডিনাল ল্যামাসে সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে নিহত হয়েছেন দশ মিনিট আগে। তার বুক ঝাঁঝরা করে দেয়া হয়, সেখানে বাতাস ধরে রাখার কোন উপায় ছিল না, এবং তার বুকেও একটা ব্র্যান্ড এঁটে দেয়া হয়েছে, এয়ার। এটাও এ্যাম্বিগ্রামাটিক। দুবারই গা ঢাকা দিয়েছে খুনি।

ক্যামারলেনগো সারা ঘরে একটা ক্রস একে দিয়ে ধপ করে বসে পড়ল পোপের ডেস্কের পিছনে। নিচু হয়ে আছে তার মাথা।

কার্ডিনাল গাইডেরা আর ব্যাজ্জিয়া এখনো জীবিত আছেন। চট করে উঠে গেল ক্যামারলেনগোর চোখ, এই আমাদের হাল কার্ডিনাল? দুজন কার্ডিনাল খুন হয়ে গেছেন। বাকী দুজনও খুন হবার পথে। আপনারা কী করছেন? সময় মত ধরতে পারবেন কি?

পারব আশা করি, বলল কমান্ডার ওলিভেট্টি, আমি উৎসাহিত।

উৎসাহিত? আমাদের কোন সাফল্য নেই। আছে শুধুই ব্যর্থতা।

ভুল। আমরা দুটো রণে ভঙ্গ দিয়েছি, হেরে গেছি সিনর। কিন্তু পুরো যুদ্ধে আমাদের জয়ই এগিয়ে আসবে। ইলুমিনেটি আজ সন্ধ্যার ব্যাপারটাকে একটা মিডিয়া সার্কাসে পরিণত করতে চায়। আমরা আশা করি সে সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিতে পেরেছি। কোন রকম দুর্ঘটনা ব্যতীতই দুজন কার্ডিনালের শরীর উদ্ধার করা গেছে। কাক-পক্ষীও টের পায়নি। বলে যাচ্ছে সে, ক্যাপ্টেন রোচার আমাকে আশ্বস্ত করেছে। যে এন্টিম্যাটারটা বের করার কাজে আরো নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে।

লাল ব্যারেটের নিচে থাকা ক্যাপ্টেন রোচার সামনে এক পা ফেলল। ভিট্টোরিয়ার মনে হল আর সব গার্ডের তুলনায় একে একটু বেশি মানুষ মানুষ লাগছে। সামরিকতা আছে পুরোদস্তুর, কিন্তু সেই সাথে কোমলতা এবং মানবিকতাও আছে। একটা বেহালার মত তীক্ষ্ণ, সুরেলা আওয়াজ বেরিয়ে এল রোচারের কণ্ঠ চিরে, আশা করছি আমরা আপনার কাছে

ক্যানিস্টারটাকে হাজির করতে পারব এক ঘণ্টার মধ্যে, সিনর।

ক্যাপ্টেন,বলল ক্যামারলেনগো, আমার কথা বেশি হতাশায় পূর্ণ হলে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু আমি যদ্দূর জানি, ভ্যাটিকান সিটিতে একটা পূর্ণ সার্চ চালাতে হলে অনেক অনেক বেশি সময়ের প্রয়োজন।

একটা পূর্ণ তল্লাশির জন্য প্রয়োজন। আপনার কথা ঠিক, সিনর। আমার মনে হচ্ছে জিনিসটা ভ্যাটিকানের হোয়াইট জোনে লুকানো আছে। এমন কোন জায়গায় যেখানে টুরিস্টরা সহজেই প্রবেশ করতে পারে। মিউজিয়ামগুলো, সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা... উদাহরণ হিসাবে বলা চলে। আমরা এরই মধ্যে সেসব জায়গার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছি। চালাচ্ছি স্ক্যান।

আপনারা ভ্যাটিকান সিটির মাত্র কয়েক শতাংশ এলাকা জরিপ করে দেখতে চাইছেন?

জ্বি, সিনর। একজন অর্বাচীণ লোক গটগট করে ভ্যাটিকানের সংরক্ষিত এলাকায় চলে যাবে সে আশা করা বোকামি। একটা ব্যাপার নিশ্চিত বলা যায়। চুরি যাওয়া ক্যামেরাটা খোয়া গিয়েছিল একটা পাবলিক প্লেস থেকেই। একটা জাদুঘরের সিঁড়ি থেকে। বোঝাই যাচ্ছে, হামলাকারি ভিতরের গোপন জায়গাগুলোতে বিচরণ করতে পারবে না। গাণিতিক হিসাবে এগুতে গেলে বলা চলে, আমরা মনে করছি সে এই ক্যানিস্টারটাকে অন্য কোন পাবলিক প্লেসে রেখে দিয়েছে। আমাদের শক্তি সেসব জায়গায় ফোকাস করা হচ্ছে।

আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন বারবার ক্যাপ্টেন। হত্যাকারি চারজন প্রেফারিতি কার্ডিনালকে অপহরণ করেছে। এ কাজ যে করতে পারে তার পক্ষে পাবলিক প্লেস ছাড়া আরো গোপন কোন না কোন জায়গায় যাওয়া মোটেও অসম্ভব। নয়।

বিচলিত হবার কিছু নেই। আমরা ভাল করেই জানি প্রেফারিতি কার্ডিনালগণ আজকের বেশিরভাগ সময় দিয়েছিলেন জাদুঘরগুলোতে, সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকাতে, এমন সব জায়গায় যেখানে লোকজনের ভিড়টা একটু কম থাকবে। আমরা তাই মনে করছি তাদের অপহরণ করা হয়েছে এমন কোন জায়গা থেকেই।

তারা কী করে আমাদের দেয়াল পেরিয়ে গেল?

আমরা এখনো এ ব্যাপারটা নিয়ে দ্বিধায় আছি।

আচ্ছা! দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল ক্যামারলেনগো, এগিয়ে গেল ওলিভেট্টির দিকে, কমান্ডার, আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইছি এলাকা জনশূণ্য করে ফেলার জন্য আপনি কী পদক্ষেপ নিয়েছেন।

আমরা এখনো এ নিয়ে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছি, সিনর। একই সাথে আমি আশান্বিত যে ক্যাপ্টেন রোচার জিনিসটাকে ঠিক ঠিক বের করতে পারবেন।

সাথে সাথে যেন ওলিভেট্টির কথার পক্ষে ভোট দেয়ার জন্যই পায়ের শব্দ করে রোচার, স্যালুট ঠুকে দেয়ার ভঙ্গিতে। আমাদের লোকজন হোয়াইট জোনের দুই তৃতীয়াংশ খোঁজা শেষ করে ফেলেছে। আর বেশিক্ষণ বাকি নেই। আমাদের আত্মবিশ্বাস চূড়ায়।

দেখে মনে হচ্ছে না যে ক্যামারলেনগো মোটেও আশান্বিত হয়েছে এই অগ্রগতির খবর শুনে।

চোখের নিচে একটা কাটা দাগ নিয়ে এগিয়ে এল এক গার্ড, তার হাতে একটা বোর্ড আর বোর্ডে ম্যাপ আটা। মিস্টার ল্যাঙডন? আমি শুনেছি যে আপনি ওয়েস্ট পনেন্টে বিষয়ক ম্যাপ দেখতে চাইছিলেন।

দারুণ। আসুন, দেখা যাক।

ভিট্টোরিয়া যখন রবার্ট ল্যাঙডনের সাথে যোগ দিয়েছে তখনো বাকিরা বকবক করেই যাচ্ছে। গার্ডও তাদের দিকে ফিরে এল। মানচিত্রটা বসানো হয়েছে পোপের ডেস্কে।

সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের দিকে আঙুল তাক করল সৈন্যটা, এখানে আছি আমরা। ওয়েস্ট পনেন্টের নির্দেশিত দিক সোজা পূবে। ভ্যাটিকান সিটির দিকে নয়। জোয়ানের, আঙুল এগিয়ে গেল টাইবার নদী পেরিয়ে গিয়ে পুরনো রোমের কেন্দ্রবিন্দুতে। আপনারা দেখতে

পাচ্ছেন। রেখাটা চলে গেছে রোমের বেশিরভাগ পেরিয়ে। এই লাইনের আশপাশে প্রায় বিশটা চার্চ পড়ে।

বিষম খেল ল্যাঙডন, বিশ?

বেশিও হতে পারে।

এর কোনটা কি সরাসরি রেখার মধ্যে পড়ছে?

কোন কোনটাকে বেশি কাছাকাছি মনে হয়। বলছে গার্ড, কিন্তু লাইন ধরে এগিয়ে যেতে গেলে একটু সমস্যায় পড়তে হয়।

বাইরের দিকে বিমর্ষ মুখে তাকিয়ে থাকল ল্যাঙডন, তারপর সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের দিকে মুখ রেখেই বলল, এর কোনটাতে কি বার্নিনির ফায়ার ওয়ার্কের চিহ্ন আছে?

নিরবতা।

ওবেলিস্কের ব্যাপারে কী বলা চলে? কোন গির্জা কি ওবেলিস্কের আশপাশে পড়ে?

সাথে সাথে আবার পরীক্ষা শুরু করল প্রহরী।

ভিট্টোরিয়া দেখতে পেল, ল্যাঙডনের চোখে ঝিকিয়ে উঠছে একটু আশার আলো। তার কথাই সত্যি। প্রথম দুটো ঘটনার সাথে ওবেলিস্কের সম্পর্ক আছে। হয়ত থিমটাই ওবেলিস্কের সাথে যুক্ত। পিরামিড দিয়ে বারবার পাথ অব ইলুমিনেশনের কথা মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে কি? ভিট্টোরিয়া ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবতে শুরু করে ততই তা ঠিক বলে প্রতিভাত হয়... রোমের চার কোণায় চারটে বাহু। সেগুলো সর্বক্ষণ একটা আরেকটাকে নির্দেশ করবে। কিন্তু পাথ অব ইলুমিনেশনের শেষ অধ্যায়, ইলুমিনেটি লেয়ার নির্দেশ করবে না। দেখা যাবে চার বাহুকে উপরের দিকে একত্র করে নিলে একটা পিরামিড গড়ে উঠছে আর সেটার ঠিক চূড়ার নিচেই পাথ অব ইলুমিনেশনের শেষ কুঠরি, গুপ্ত আস্তানা ঘাপটি মেরে আছে।

অনেক দূর দিয়ে ভাবছি, বলল ল্যাঙডন, কথা সত্যি। কিন্তু মিশরীয় স্থাপত্যগুলোর বেশিরভাগই নড়াচড়া করেছে বার্নিনির আমলে। এগুলোকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরানোর কাজে তিনি যে যুক্ত ছিলেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

অথবা, যোগ করল ভিট্টোরিয়া, বার্নিনি তার মার্কার বসিয়ে থাকতে পারেন ওবেলিস্কের আশপাশে।

নড করল ল্যাঙডন, ঠিক তাই।

খারাপ খবর, বলল গার্ড, রেখার আশপাশে কোন ওবেলিস্ক নেই। পুরো লাইন জুড়ে আরেকবার আঙুল বুলিয়ে নিল সে, এমনকি একটু দূরেও কোথাও নেই। নাথিং।

দীর্ঘশ্বাস চাপল ল্যাঙডন।

আড়ষ্ট হয়ে গেছে ভিট্টোরিয়ার কাঁধ। সে আশা করেছিল এতে কোন কাজ হবে। কিন্তু বাস্তবে তাদের আশার মত করে সহজ হয়ে ওঠেনি ব্যাপারটা। সে তবু পজিটিভ হবার চেষ্টা করল, রবার্ট, ভাব। তুমি অবশ্যই বার্নিনির গড়া কোন গড়নের কথা জান। যার সাথে আগুনের সম্পর্ক আছে। যাই হোক।

বিশ্বাস কর। আমি ভাবতে ভাবতে ঘেমে নেয়ে একাকার। বার্নিনির কাজের লেখাজোকা নেই। তার জীবনে অযুত কাজের ছড়াছড়ি ছিল। আমার একমাত্র আশা ওয়েস্ট পনেন্টে কোন চার্চের দিকে সরাসরি দিক নির্দেশ করবে। এমন কিছু যার মাধ্যমে ঘন্টি বেজে উঠবে।

ফুয়োকো! বলল মেয়েটা, ফায়ার। বার্নিনির কোন টাইটেল বেরিয়ে আসছে না?

শ্রাগ করল ল্যাঙডন, তার করা আগুন ভিত্তিক অনেক বিখ্যাত স্কেচ আছে। কিন্তু এ পর্যন্তই। কোন মূর্তির কথা মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না কোন দেয়ালে খোদাই করা কাজের কথাও। আর আরো হতাশার খবর হল, সেগুলো আছে জার্মানির লিপজিকে।

আরো মুষড়ে পড়ল মেয়েটা। আর তুমি নিশ্চিত যে এই ব্রিথ আসলে দিকনির্দেশ করছে?

সবই দেখেছ তুমি, ভিট্টোরিয়া। ভাল ভাবেই জান, আর কোন দিক নির্দেশের কোন সুযোগ নেই।

মেয়েটা জানে তার কথাই ঠিক।

আগের দুটো দিকই আমাদের অভ্রান্ত ছিল। এবারও আর কোন উপায় দেখছি না। আগের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে, এ নির্দেশনা ধরেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

নড করল ভিট্টোরিয়া। তার মানে আমরা ইশারা অনুসরণ করব। কিন্তু কোন পর্যন্ত? এগিয়ে এল ওলিভেট্টি। কী পেলেন আপনারা?

অনেক অনেক চার্চ। আগ বাড়িয়ে বলল প্রহরী, দু ডজনের মত গির্জা। আমার মনে হয় প্রতিটায় চারজন করে জওয়ান দাড় করিয়ে রাখা যায়।

ভুলে যাও, বলল ওলিভেট্টি, রোষ কষায়িত নয়নে তাকিয়ে, আমরা লোকটাকে দুবার হাতেনাতে পাকড়াও করতে করতে বিফল হয়েছি। তখন আমরা জানতাম ঠিক কোথায় সে আছে। এখন বিশাল সংখ্যায় সৈন্যকে সরিয়ে নেয়া মানে ভ্যাটিকান সিটিকে একেবারে নিঃস্ব করে বেরিয়ে যাওয়া। সার্চেরও বারোটা বাজবে।

আমাদের একটা রেফারেন্স বুক লাগবে, হঠাৎ যেন খেই ফিরে পেল ভিট্টোরিয়া, ডুবন্ত মানুষের মত খরকুটো আকড়ে ধরছে সে। এমন একটা বই যেটায় বার্নিনির সমস্ত কাজের ফিরিস্তি আছে। আমরা অন্তত টাইটেলগুলো দেখতে পেলে বাদবাকি ব্যাপার আন্দাজ করেও নিতে পারি।

আমি তেমন কোন আশা দেখতে পাচ্ছি না। বলল হতাশার সুরে ল্যাঙডন, যদি এটাকে শুধুমাত্র ইলুমিনেটির জন্য বার্নিনি গড়ে দিয়ে থাকেন তাহলে সেটার কোন রেফারেন্স বইতে না থাকার কথা।

একমত হতে পারল না মোটেও ভিট্টোরিয়া, আগের দুটো স্থাপত্যের কথা তুমি ঠিক ঠিক জানতে। সেগুলো মোটেও অখ্যাত ছিল না। তাহলে এবার সাহস হারানোর মত কিছু হচ্ছে কি?

শ্রাগ করল ল্যাঙডন, হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে। ইয়াহ্।

আমরা যদি তার সব কাজের নমুনা নিয়ে একটু দেখি, আগুনের সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দ পেয়েই যাব। সেটাকে আমাদের রেখার আশপাশে পেয়েও যেতে পারি। আর একবার পেয়ে গেলে কেল্লা ফতে।

এতক্ষণে একটু আশার সুর বেজে উঠল ল্যাঙডনের কণ্ঠে, আমরা বার্নিনির সমস্ত কাজের একটা নমুনা চাই। বলল সে ওলিভেট্টির দিকে তাকিয়ে। আপনার লোকজন এখানে কফি-টেবিলের পাতলা বইপত্রের মধ্যে এমন কিছু রাখতে পারে, তাই না?

কফি টেবিলের বই?

নেভার মাইন্ড। যে কোন বই। যে কোন লিস্ট। ভ্যাটিকান মিউজিয়ামের খবর কী? সেখানে নিশ্চয়ই বার্নিনির কাজের রেফারেন্স থাকবে।

চেহারায় ক্ষতচিহ্নওয়ালা লোকটা এবার এগিয়ে এল। জাদুঘরের পাওয়ার অফ করে দেয়া হয়েছে। আর রেফারেন্স রুম সুবিশাল। সেখানে কাজ করতে হলে অনেক লোকের দরকার হবে। নাহলে তল্লাশি শেষ হতে হতে সময় পেরিয়ে যাবে—

এবারও কমান্ডার তার অধীনস্থর কথার মাঝখানে কথা বলে উঠল, বার্নিনি ওয়ার্কস... হুম... বার্নিনি ভ্যাটিকানে কর্মরত থাকার সময় কি?

অবশ্যই। আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল ল্যাঙডন, তিনি তার পুরো ক্যারিয়ার জুড়েই এখানে ছিলেন। বিশেষত গ্যালিলিও নিয়ে বিভেদের সময়টায়।

নড করল ওলিভেট্টি, তাহলে এখানে আরো একটা রেফারেন্স আছে।

ভিট্টোরিয়ার কণ্ঠেও আশার প্রতিদ্ধ্বণি উঠল, কোথায়?

জবাব দিল না কমান্ডার। একজন প্রহরীকে দূরে সরিয়ে নিয়ে খুব দ্রুত নির্দেশ দিল। অনিশ্চিত দেখাল গার্ডের মুখভঙ্গি, একই সাথে সে সশ্রদ্ধ সম্মতি জানাল। ওলিভেট্টি কথা শেষ করার পর গার্ড ফিরল ল্যাঙডনের দিকে।

এ পথে প্লিজ, মিস্টার ল্যাঙডন। আমাদের দ্রুত করতে হবে। এখন শোয়া নটা বাজে।

অনুসরণ করল ল্যাঙডন। বিনা বাক্যব্যায়ে।

ভিট্টোরিয়া বাধা দিল তাদের, আমি সাহায্য করব।

খপ করে তার হাত ধরে ফেলল ওলিভেট্টি, তার ধরার মধ্যে কর্তৃত্বের ভাব সুস্পষ্ট। না, মিস ভেট্রা, আপনার সাথে আমার একটু কথা আছে।

চলে গেল ল্যাঙডন আর গার্ড। ভিট্টোরিয়াকে অন্য পাশে নিয়ে যাবার সময় কোন ভাব খেলা করল না ওলিভেট্টির চোখেমুখে। একেবারে পাথরে খোদাই করা মুখ। কিন্তু যাই সে বলার জন্য এগিয়ে গিয়ে থাক না কেন, হতাশ হতে হল তাকে। খড়খড় করে উঠল হাতের ওয়াকিটকি। কমান্ডান্টে!

ঘরের প্রত্যেকে ঘুরে দাঁড়াল।

অপ্রস্তুত কথা শোনা যাচ্ছে অপর প্রান্ত থেকে, আমার মনে হয় আপনি টেলিভিশন খুললেই ভাল করবেন।

ঘণ্টা দুয়েক আগে যখন ল্যাঙডন ভ্যাটিকান আর্কাইভ ছেড়ে যায় তখন সে কল্পনাও করেনি আর একটু পরে আবার এখানেই হাজির হবে। কিন্তু এখন গার্ডের সুগঠিত দেহের পিছনে পিছনে আসতে আসতে আবার সে টের পেল। ফিরে এসেছে। আর্কাইভে।

তার এসকর্ট, সেই ক্ষতচিহ্নওয়ালা গর্ড, তাকে হাজির করল কিউবিকলগুলের কাছে। এখানকার নিরবতা একেবার বুকে এসে লাগছিল তার। অসহ্য। আগে এমন লাগেনি। এবার গার্ড নিরবতা ভঙ্গ করায় বেশ কৃতজ্ঞ বোধ করল সে।

এখানে, আমার মনে হয়। বলল সে, নিয়ে গেল তাকে দেয়ালের কাছে যেখানে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট খুপরি বসে আছে। ছোট ভল্টগুলোর দিকে এগিয়ে এসে সে একে একে নামগুলো পড়তে শুরু করল। তারপর বলল, এখানেইতো! ঠিক যেমন বলেছিলেন কমান্ডার।

টাইটেল পড়ল ল্যাঙডন। এ্যাটিভি ভ্যাটিকানি। ভ্যাটিকানের সম্পদ? সে একে একে শিরোনামগুলো পড়ে গেল। রিয়েল এস্টেট... কারেন্সি... ভ্যাটিকান ব্যাঙ্ক... এ্যান্টিকুইটিজ... লিস্ট চলছে তো চলছেই। কোন থামাথামি নেই।

ভ্যাটিকানের সমস্ত সম্পদের কাগজে-কলমে লেখা তালিকা। বলল গার্ড।

কিউবিকলের দিকে তাকিয়ে আরো একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। জিসাস! এই অন্ধকারে, এই শীতলতায়ও তার কাল ঘাম ছুটে যাচ্ছে।

আমার কমান্ডার বলেছেন যে বার্নিনি ভ্যাটিকানের আওতায় থাকার সময় যা-ই করেছেন তার সব সম্পদ হিসাবে এখানে লেখা থাকবে।

নড করল ল্যাঙডন। কমান্ডারের দৃষ্টি ঠিক আছে। ভ্যাটিকানে থাকার সময়, পোপের অধীনে থাকার সময় বার্নিনি যত শিল্পকর্ম করে থাকুন না কেন, আইনত তার সবই ভ্যাটিকানের সম্পদ। তখনকার দিনে ব্যাপারটাকে এখনের মত অপমানজনক মনে করতেন না শিল্পীরা। এখানে কি ভ্যাটিকানের বাইরের গির্জাগুলোতে রাখা কাজের কথাও থাকছে?

যেন কোন বাচ্চাকে বোঝাচ্ছে, এমন বিরক্তি নিয়ে সে বলল, অবশ্যই, ভ্যাটিকানের বাইরের সব রোমান চার্চই ভ্যাটিকানের সম্পদ।

সব বাদ দিয়ে ল্যাঙডন মনে মনে প্রমাদ গুণছে। এই রেখার আশপাশে থাকা দু ডজন গির্জার প্রতিটাই ভ্যাটিকানের সম্পদ। এর যে কোনটায় আছে থার্ড অল্টার অব সায়েন্স। সেটা সময়মত বের করতে পারলে হয়। নাহলে কপাল চাপড়ানো ছাড়া কোন গতি থাকবে না। অন্য সময় হলে সে নির্দ্বিধায় প্রতিটা চার্চে সরেজমিন তদন্ত করতে পিছপা হত না। কিন্তু এখন তেমন কোন সময় নেই। বিশ মিনিটের মধ্যে সবগুলো চষে ফেলা সম্ভব নয় সমস্ত লোকবল কাজে লাগিয়েও।

ভল্টের ইলেক্ট্রনিক রিভলভিং ডোরের দিকে এগিয়ে গেল ল্যাঙডন। পিছনে পিছনে আসছে না গার্ড। ঠায় দাড়িয়ে আছে যেখানে ছিল। একটু অপ্রস্তুত হাসি দিল সে, বাতাস ভালই আছে। একটু পাতলা। তবে খুব একটা সমস্যা হবার কথা নয়।

আমার উপর নির্দেশ আছে, আপনাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে কমান্ড সেন্টারে সাথে সাথে ফিরে যেতে হবে।

চলে যাচ্ছেন আপনি?

জি। ভল্টের ভিতরে তো দূরের কথা, আর্কাইভেই আসার কোন অনুমতি নেই সুইস গার্ডের। আমি নিয়ম ভেঙেছি আপনাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে। কমান্ডার আমাকে এমন আদেশই করেছেন।

নিয়ম ভেঙেছেন? তোমার কি বিন্দুমাত্র ধারণা আছে আজ রাতে এখানে কী ঘটতে যাচ্ছে? আপনার মরার কমান্ডার কোন পক্ষে একটু বলতে পারেন কি আমাকে?

এবার একেবারে পাথুরে হয়ে গেল গার্ডের মুখ। তার চোখের উপরের কাটা দাগ আরো বেশি করে দেখা যাচ্ছে। তার ভিতরে যেন প্রকাশিত হচ্ছে ওলিভেট্টি।

মাফ চাচ্ছি! একটু লজ্জিত হয়ে বলল ল্যাঙডন, আমি... আমি আসলে এখানে আপনার কাছ থেকে একটু সহায়তা আশা করছিলাম। এই যা।

চোখের পলক ফেলল না গার্ড একবারও। আমি আদেশ মানার জন্য ট্রেইন্ড হয়েছি। কোন ব্যাপারে দ্বিরুক্তি করা আমার নিয়ম বহির্ভূত। আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেলে কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করবেন।

আর আপনার কমান্ডার কোথায় থাকবেন?

সাথে সাথে গার্ড তার ওয়াকিটকি বের করল। নামিয়ে রাখল টেবিলের উপর। বলল, চ্যানেল ওয়ান।

তারপর হারিয়ে গেল কালিগোলা অন্ধকারে।

পোপের অফিসের বিশাল-বপু হিটাচি টেলিভিশনটা লুকানো থাকে ডেস্কের বিপরীতে একটা কেবিনেটের ভিতরে। সবাই আশপাশে জড়ো হচ্ছে। এগিয়ে গেল ভিট্টোরিয়াও। কমবয়েসি এক রিপোর্টার উদিত হল স্ক্রিনের সামনে।

এম এস এন বি সি নিউজের পক্ষ থেকে, বলল মেয়েটা, দিস ইজ ক্যালি হরান জোন্স, লাইভ ফ্রম ভ্যাটিকান সিটি। তার পিছনে আলোয় ঝলমল করছে সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা।

তুমি সরাসরি সম্প্রচার করছ না। চিৎকার করে উঠল রোচার, ব্যাসিলিকার সব আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে আরো আগেই।

ওলিভেট্টি একটু হিসহিস করে তাকে থামিয়ে দিল।

রিপোর্টারের কথা চলছে। একটু যেন উত্তেজিত হয়ে আছে সে। অত্যন্ত শকিং একটা খবর বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া গেছে। আমরা খবর পেয়েছি যে কলেজ অব কার্ডিনালসের দুজন সদস্য নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন আজ রাতে। রোমে।

ভিরমি খেল ওলিভেট্টি।

রিপোর্টারের কথা চলার সময় গার্ড হাজির হল সামনের দরজায়। স্যার, সেন্ট্রাল সুইচবোর্ডের সব আলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা অনুরোধ করছে যেন আমরা...

ডিসকানেক্ট ইট! চোখ টিভি থেকে না সরিয়েই বলল কমান্ডার, তার চোখ বিস্ফারিত।

অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে গার্ডকে, কিন্তু, কমান্ডার—

যাও!

দৌড়ে চলে গেল গার্ড।

দেখল ভিট্টোরিয়া, কিছু একটা বলতে নিয়েও নিজেকে সামলে নিল ক্যামারলেনগো। তার বদলে সে ওলিভেট্টির কথার দিকে নজর দিল।

এম এস এন বি সি এবার ভিডিও ফুটেজ প্রচার করা শুরু করল। কার্ডিনালের ডেডবডি বহন করছে সান্তা মারিয়া ডেল প্রোপোলো গির্জা থেকে, সবাই মিলে আড়াল করে। ফ্রাঙ্কফুর্টের ঐ কার্ডিনালের মরদেহ বহন করা হল একটা আলফা রোমিও পর্যন্ত। গাড়ির ট্রাঙ্কে শরীরটা বসিয়ে দেয়ার আগে টেপ জুম করে তার বিবস্ত্র অবয়ব আরো স্পষ্টভাবে দেখা গেল।

কোন জানোয়ার এই ফুটেজ নিয়েছে? গর্জে উঠল ওলিভেট্টি।

এম এস এন বি সি রিপোর্টার এখনো কথা বলেই যাচ্ছে। বলা হচ্ছে এটা ফ্রাঙ্কফুর্টের কার্ডিনাল ইবনারের মৃতদেহ। তিনি একজন জার্মান। তার শরীর বয়ে আনছে যারা মনে করা হচ্ছে তারা ভ্যাটিকান সিটির সুইস গার্ড।

একটু যেন অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে রিপোর্টারকে। তারপর মেয়েটা সামলে নিতে নিতে জুম করা হল তার মুখের দিকে ক্যামেরা।

এম এস এন বি সির দর্শকদের জন্য আরো একটা দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে। একটা সতর্কতা। ছবিগুলো আরো অন্যরকম লাগবে। কোন কোন দর্শকের কাছে তা ভাল নাও লাগতে পারে।

খেই হারিয়ে ফেলছে ভিট্টোরিয়া। বুঝে উঠতে পারছে না কী বলবে বা কী বলবে না।

আবারও বলছি। দৃশ্যগুলো সবার কাছে সহনীয় নাও হতে পারে।

আবার কী ফুটেজ? তেতে উঠছে ওলিভেট্টি ক্রমেই, এইমাত্র মরার ফুটেজ দেখানো শেষ হল তোমাদের।

এবার যে দৃশ্য দেখা গেল সেটা খুব পরিচিত। সেখানকার মানুষ দুজনও পরিচিত। সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের দুজন মানুষ। দেখতে সাদাসিধা ট্যুরিস্ট। সাথে সাথে চিনে ফেলল ভিট্টোরিয়া। এই দুজন সে আর ল্যাঙডন। স্ক্রিনের উপরে ছোট লেখা উঠলঃ বিবিসির সৌজন্যে।

একটা ঘন্টি বেজে উঠল কোথাও।

ওহ.. নো! জোরে চিকার করে উঠল ভিট্রোরিয়া। ওহ, নো!

বিভ্রান্ত দেখাল ক্যামারলেনগোর চোখমুখ। তাকাল সে সুইস গার্ডের প্রধানের দিকে। আপনারা বলেছিলেন যে এই ফুটেজটা দখল করে নেয়া হয়েছে।

হঠাৎ টিভিতে দেখা গেল একটা বাচ্চা চিৎকার করছে। মেয়েটা একটা লোকের দিকে আঙুল তাক করে আছে আপাতত যাকে একজন রক্তাক্ত ঘরহীন লোক বলে ভুল হয়। রবার্ট ল্যাঙডন ফ্রেমের ভিতরে চলে এল। চেষ্টা করল মেয়েটাকে সামলানোর। শটটা আরো কাছিয়ে এল।

পোপের অফিসের প্রত্যেকে এক নিঃশ্বাসে তাকিয়ে থাকল টিভির দিকে যখন অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা দেখানো হচ্ছে। পেভমেন্টের উপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল শরীরটা আর ফ্রেমে এবার চলে এল ভিট্রোরিয়া। চারধার রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বুকে একটা নকশা আকাঁ।

এই অবাক করা ফুটেজ, আবার কথা বলছে রিপোর্টার, মাত্র কয়েক মিনিট আগে ভ্যাটিকানের বাইরে ধারণ করা হয়। ফ্রান্সের কার্ডিনাল ল্যামাসের মৃতদেহ এটা, এমনই দাবি আমাদের সোর্সের। কেন তিনি এমন সাজে সজ্জিত হয়ে এখানে এলেন এবং কেন তিনি কনক্লেভের ভিতরে নেই সেটা এখনো এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মত দাড়িয়ে আছে আমাদের সামনে। এখন পর্যন্ত কোন মন্তব্য দিতে রাজি হয়নি ভ্যাটিকান।

আবার টেপটা রোল করা শুরু করল।

মন্তব্য দিতে রাজি হইনি! চিৎকার করে উঠল রোচার, আমাদের একটা মিনিট সময় দাও!

এখনো কথা বলে যাচ্ছে রিপোর্টার। উত্তেজনায় কুচকে গেছে তার। এ এ্যাটাক সম্পর্কে এখনো এম এস এন বি সি খুব বেশি কিছু জানে না কিন্তু আমাদের সোর্স বলছে যে এই খুনগুলো হয়ে যাবার পিছনে অন্যরকম কিছু ইশারা আছে। এমন এক গ্রুপ এই হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছে যারা নিজেদেরকে ইলুমিনেটি হিসেবে দাবি করে।

ফেটে পড়ল ওলিভেট্টি, কী!

... ইলুমিনেটি সম্পর্কে আরো জানতে পারবেন আমাদের ওয়েবসাইট ঘাটলে। আমাদের ঠিকানা—

ননে পসিবলে! উত্তেজনায় ইতালিয় এসে পড়েছে কমান্ডারের কণ্ঠে। সাথে সাথে সে চ্যানেল পাল্টে দিল।

সেখানে কথা বলছে এক পুরুষ রিপোর্টার।—একটা শয়তানি সংঘ, ইলুমিনেটি নামে পরিচিত, অনেক ইতিহাসবেত্তা মনে করেন তারা।

সাথে সাথে আরো ভাল করে রিমোট বাটন চাপতে শুরু করল। বেশিরভাগ খবরই ইংরেজিতে প্রচারিত হচ্ছে।

-আজ সন্ধ্যায় একটা চার্চ থেকে সুইস গার্ডরা একটা মরদেহ তুলে এনেছে। মনে করা হচ্ছে সেটা কার্ডিনাল-

-ব্যাসিলিকা আর মিউজিয়ামের আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে

-কথা বলব কন্সপিরেসি থিওরিস্ট টেইলর টিঙ্গলের সাথে, এই দুঃখজনক ঘটনার ব্যাপারে

—গুজব উঠেছে আজ রাতেই আরো দুটো হত্যাকান্ড ঘটতে যাচ্ছে—

—প্রশ্ন হচ্ছে, পাপাল কার্ডিনাল বা প্রেফারিতিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় ব্যক্তি, কার্ডিনাল ব্যাজ্জিয়া কি হারানো লোকদের মধ্যে আছেন-

ঘুরে দাঁড়াল ভিট্রোরিয়া। সব এত দ্রুত ঘটে যাচ্ছে যে ঠিখ তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না সে। মনে হচ্ছে বাইরের এলাকায় মানুষের ভিড় অনেক বেশি বেড়ে গেছে। মজা দেখতে আসা লোকজন, কৌতুহলী লোকজন, পোপ ও ভ্যাটিকানকে ভালবাসা লোকজন, সংবাদপত্রের লোকজনে ছয়লাপ হয়ে যাবে আশপাশ।

চারধারে থিকথিক করতে শুরু করেছে মানুষ। জড়ো হয়েছে অনেকেই। আরো কয়েকটা মিডিয়া ভ্যান তাদের মাল-সামান নামাতে নামাতে চিৎকার করছে ভিতরে ঢোকার জন্য।

হাত থেকে রিমোট নামিয়ে রেখে ওলিভেট্টি তাকাল ক্যামারলেনগার দিকে, সিনর, আমরা জানি না কী করে সম্ভব হল এ ব্যাপার। আমরা ক্যামেরা থেকে টেপটা ঠিকই বের করে নিয়েছি।

মুহূর্তকালের জন্য মনে হল স্থাণু হয়ে গেছে ক্যামারলেনগো। কিছু বলতে পারছে না।

কেউ কিছু বলল না। সুইস গার্ড একেবারে এ্যাটেনশন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে সামনে।

দেখে মনে হচ্ছে, অবশেষে রা ফুটল ক্যামারলেনগোর মুখে, আমরা আর এই ক্রাইসিসের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছি না। আগে যা ভেবেছিলাম ব্যাপারগুলো সেভাবে এগুচ্ছে না।

বাইরের দিকে তাকাল সে, তাকাল উদ্বিগ্ন জনতার দিকে, আমার মনে হয় এবার মুখ খোলার সময় এসেছে।

না, সিনর, বলল সাথে সাথে কমান্ডার, ঠিক এ ব্যাপারটাই চাইছে ইলুমিনেটি। এ মুহূর্তের অপেক্ষায় আছে তারা। জয় হবে তাদেরই। চুপ থাকতে হবে আমাদের।

আর এই লোকজন? ক্যামারলেনগো আঙুল নির্দেশ করল বাইরের দিকে, এখন এখানে আছে অযুত লোক, এরপর সংখ্যা বেড়ে যাবে। দাঁড়িয়ে থাকবে শত সহস্র মানুষ। চুপ করে থাকার আরেক নাম এই লোকগুলোকে বিপদে ফেলা। তাদের সতর্ক করে দিতে হবে। হাল ছেড়ে দিচ্ছি আমরা, কমান্ডার। তাদের সরিয়ে নিতে হবে এক্ষুণি। সরাতে হবে কলেজ অব কার্ডিনালসকে।

এখনো সময় আছে। এন্টিম্যাটারটা খুঁজে বের করার সুযোগ দিন ক্যাপ্টেন রোচারকে।

ঘুরে দাঁড়াল ক্যামারলেনগো, তার চোখ দিয়ে অগ্নিবাষ্প ঠিকরে বের হচ্ছে, আপনি কি আমাকে নির্দেশ দেয়ার চেষ্টা করছেন?

না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি। আপনি যদি বাইরের লোকজনের উদ্বেগ নিয়ে চিন্তিত থাকেন তাহলে আমাদের হাতে উপায় আছে। আমরা বলতে পারি গ্যাস লিক করেছে। পরিষ্কার করে ফেলতে পারি চত্বরটা মুহূর্তে। কিন্তু আমরা যে পণবন্দি সে কথা ফাঁস করা যাবে না।

অনেক হয়েছে, কমান্ডার, আমরা এ অফিসকে সারা দুনিয়াজুড়ে মিথ্যা কথার ফুলঝুরি ছোটানোর কাজে ব্যবহার করতে পারি না। আমি যদি কিছুই ঘোষণা না করি তো সেটাই সবদিক থেকে শ্রেয় হয়। এটাই হয় সত্যি।

সত্যি? ভ্যাটিকান সিটিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে যাচ্ছে একটা শয়তানি সংঘ এ সত্য জানিয়ে দিতে চাইছেন আপনি? এর ফলে আমাদের পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে যাবে।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল ক্যামারলেনগো, ঘোলাটে হয়ে যাওয়া? আর কত ঘোলাটে হবে। আমাদের পরিস্থিতি?

রোচার হঠাৎ করে চিৎকার জুড়ে দিল। হাত থেকে কেড়ে নিল রিমোটটা। বাড়িয়ে দিল আওয়াজ, শুনতে পাচ্ছে প্রত্যেকে।

সেই মেয়ে রিপোর্টারের সামনে এবার নতুন গল্প ফাঁদছে এম এস এন বি সি। সংবাদদাতার পাশে বিদেহি পোপের একটা ছবি। ... ব্রেকিং ইনফরমেশন। খবরটা এইমাত্র বিবিসি থেকে আসছে...

মেয়েটা চোখ ফিরিয়ে নিল ক্যামেরা থেকে, যেন নিজের সাথে যুদ্ধ করছে এই খবর প্রকাশের জন্য। বেশ কয়েকটা মুহূর্ত সময় নিয়ে সে যুঝল নিজের সাথে, তারপর চোখ ফিরাল দর্শকদের দিকে। এইমাত্র ইলুমিনেটি একটা দায়িত্ব স্বীকার করেছে... আরো একটু দ্বিধান্বিত দেখাল তাকে, পনের দিন আগে পোপের মৃত্যুর দায় তারা স্বীকার করেছে।

একেবারে ঝুলে পড়ল ক্যামারলেনগোর চোয়াল।

হাত থেকে রিমোটটা ফেলে দিল রোচার।

খবরটা হজম করতে পারছে না ভিট্টোরিয়া।

ভ্যাটিকান নিয়ম অনুসারে, বলছে মেয়েটা হড়বড় করে, কোন পোপের মরদেহ ময়না

তদন্ত করা যাবে না। তাই ইলুমিনেটির এই দাবির সত্যতা যাচাই করার কোন উপায় থাকছে না। ইলুমিনেটি জোর গলায় দাবি করছে যে বিগত পোপের মৃত্যুর কারণ স্ট্রোক নয়, বরং পয়জনিং।

পুরো ঘর জুড়ে আবারও নেমে এল নিরবতা।

ফাঁক বুঝে কথা বলে উঠল ওলিভেট্টি, নির্জলা মিথ্যাচার!

আবার চ্যানেল পাল্টানো শুরু করল রোচার। খবরটা চাউর হয়ে যেতে এক বিন্দু সময় নিল না। প্লেগের মত তা ছড়িয়ে পড়ল চ্যানেল থেকে চ্যানেলে। সবখানে এক কথা, এক গুজব।

ভ্যাটিকানে খুন।

পপাপ বিষপ্রয়োগে দেহান্তরিত

শয়তান তার পাখা বিস্তার করেছে ঈশ্বরের আবাসভূমিতে

চোখ ফিরিয়ে নিল ক্যামারলেনগো, গড হেল্প আস।

পরাচার এখনো হাল ছেড়ে দেয়নি। সে হাজির হল বিবিসিতে।—এইমাত্র আমাকে সান্তা মারিয়া ডি পোপোলোতে ঘটে যাওয়া খুনের ব্যাপারে বিস্তারিত জানাল

থাম! বলল ক্যামারলেনগো, ব্যাক।

পিছনে নিয়ে গেল রোচার। স্ক্রিনে দেখা গেল একটা হোৎকা লোক ডেস্কের পিছনে বসে আছে। লোকটাকে ঠিক মানাচ্ছে না। তার দাড়ি লাল। নিচে লেখাঃ।

গুন্থার গ্লিক-লাইভ ইন ভ্যাটিকান সিটি

রিপোর্টার গ্লিক কথা বলছে ফোনে। তাই তার ইমেজ নড়াচড়া করছে না। একটু ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠছে লাইন থেকে। ... চিগি চ্যাপেল থেকে নেয়া ফুটেজটা আমার ভিডিওগ্রাফার গ্রহণ করে।

ব্যাপারটা আবার আমাদের দর্শকদের জন্য দেখাতে দিন। বিবিসিতে বসা লোকটা বলল, বিবিসি রিপোর্টার গুন্থার গ্লিকই প্রথম ব্যক্তি যে এ খবর আনেন। তিনি ইলুমিনেটির খুনির সাথে ফোনে দুবার কথা বলেছেন। গুন্থার, একটু আগে তুমি বলছিলে যে ইলুমিনেটির এ্যাসাসিন একটু আগেও তোমাকে কিছু খবর জানিয়েছিল।

ঠিক তাই।

আর তার মেসেজটা এমন যে পোপের মৃত্যুর জন্য তারাই দায়ি? লোকটার কথাবার্তা একেবারে কঠিন।

সঠিক। লোকটা এইমাত্র আমাদের জানায় যে পোপের মৃত্যু মোটেও কোন স্ট্রোক থেকে হয়নি। ভ্যাটিকান ভুল বুঝেছে। তার মৃত্যুর জন্য দায়ি পয়জনিং। আর সেই বিষ প্রয়োগ করা হয় ইলুমিনেটির পক্ষ থেকে।

পোপের অফিসের প্রত্যেকে জমে বরফ হয়ে গেল।

বিষ দেয়া হয়েছে? যেন খাবি খাচ্ছে বিবিসিতে বসে থাকা লোকটা, কিন্তু কীভাবে?

তারা কোন ব্যাখ্যা দেয়নি। জবাব দিল গ্লিক, শুধু এটুকুই বলেছে যে তারা এক ধরনের ড্রাগ প্রয়োগ করে খুন করে। এর নাম হেপারিন বা এমন কিছু একটা।

ক্যামারলেনগো, ওলিভেট্টি আর রোচার সবার চোখে বিভ্রান্তির দৃষ্টি।

হেপারিন? বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে রোচারকে, কিন্তু আমরাতো জানি...

সাথে সাথে জবাব দিল ক্যামারলেনগো, পোপের ওষুধ।

চোখ ফিরিয়ে তাকাল ভিট্টোরিয়া, পোপ হেপারিন নিচ্ছিলেন?

তার থ্রম্বোফ্লিবিটিস ছিল, বলল ক্যামারলেনগো, দিনে একটা করে ইঞ্জেকশন নিতে হত তাকে।

এখনো ঘোর কাটেনি রোচারের, কিন্তু হেপারিন মোটেও কোন বিষ নয়। ইলুমিনেটির দাবি অনুযায়ী বলা চলে...

ডোজে সমস্যা হলে হেপারিন প্রাণঘাতি হতে পারে। তথ্য জানাতে পেরে একটু তৃপ্তি

বোধ করছে ভিট্টোরিয়া, হেপারিন একটা শক্তিশালী এন্টিকোএল্যান্ট। একটা ওভারডোজ প্রচন্ড ইন্টারনাল ব্লিডিং ঘটাতে পারে, হতে পারে ব্রেন হেমারেজ।

ওলিভেট্টি সন্দেহের চোখে তাকাল ভিট্টোরিয়ার দিকে, এ খবর আপনি জানেন কোত্থেকে?

মেরিন বায়োলজিস্টরা এই একই ওষুধ ব্যবহার করে সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর উপর। তারা যেন পরিবেশের তারতম্যের কারণে কোন প্রকার সমস্যায় না পড়ে, রক্ত যেন জমাট বেধে না যায় সেজন্যে। ড্রাগটার উল্টাপাল্টা ব্যবহারের কারণে অনেক প্রাণী মারা পড়েছে। এই ড্রাগের অসঠিক মাত্রায় প্রয়োগ হলে মানুষ মারা যেতে পারে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে। এর ফলে সহজেই ব্যাপারটাকে স্ট্রোকের সাথে তুলনা করা যায়। বিশেষত কোন ময়না তদন্ত না হলে বোঝার বা ধরার কোন উপায় থাকে না।

এবার সত্যি সত্যি যেন খাদে পড়ে গেছে ক্যামারলেনগো।

সিনর, বলল ওলিভেট্টি, এটা নিশ্চয়ই ইলুমিনেটির কোন চালবাজি। কেউ পোপকে ওভারডোজ দিচ্ছে সে কথা চিন্তাই করা যায় না। কারো প্রবেশাধিকার থাকে না। এমনকি আমরাও তার সামনে সব সময় আসতে পারি না। আর পাপাল নিয়ম অনুসারে, কখনোই মারা যাবার পর পরীক্ষা করা যাবে না। আর যদি পরীক্ষা আমরা করতাম, সেখানেও ঘাপলা থাকছে। আমরা জানতেই পারতাম না। প্রতিদিন তিনি এই ড্রাগ নেন। রক্তে এটার চিহ্ন পেতাম, এইতো? তাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না।

সত্যি। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে ক্যামারলেনগোর কণ্ঠ, এখনো একটা অন্য ব্যাপার আমাকে ভাবাচ্ছে। বাইরের কেউ জানত না হিজ হোলিনেস এ ওষুধ নিচ্ছেন।

আবার নিরবতা নেমে আসে ঘর জুড়ে।

তার গায়ে যদি বাড়তি হেপারিন থেকে থাকে তাহলে সে চিহ্নও থাকবে। গডগড করে বলল ভিট্টোরিয়া।

তেতে উঠল ওলিভেট্টিও, মিস ভেট্রা, আপনি হয়ত ভুলে যাচ্ছেন যে আমি আগেই বলেছি যে পাপাল ল অনুসারে কখনোই কোন পোপের মৃতদেহের উপর পরীক্ষা চালানো যাবে না। এটাই ভ্যাটিকানের রীতি। আমরা কোন শত্রুর করা দাবির কথা রাখতে গিয়ে হিজ হোলিনেসের দেহ কাটাছেঁড়া করতে পারি না?

একটু লজ্জিত দেখাচ্ছে ভিট্টোরিয়াকে। আমার কথার উদ্দেশ্য এমন নয়। আমি আপনাদের সম্মানিত পোপের মরদেহ কাটাছেঁড়ার কথা বলছি না...

কোন ধরনের সিগন্যাল? জিজ্ঞেস করল ক্যামারলেনগো।

ভয়ে দুরুদুরু করছে ভিট্টোরিয়ার বুক, ওভারডোজ হলে একটা চিহ্ন থেকে যায়। ওরাল মিউকোসায় রক্তক্ষরণ হতে পারে।

ওরাল কী?

ভিকটিমের মুখের ভিতর রক্তক্ষরণ হবে। পোস্ট মর্টেম করলে দেখা যাবে মুখের ভিতরে রক্ত এসে জমাট বেঁধে কালো বর্ণ ধারণ করেছে।

ভিট্টোরিয়ার মনে পড়ছে লন্ডন এ্যাকুরিয়ামসের একটার মধ্যে একজোড়া কিলার তিমিকে বাড়তি ডোজ দেয়ার কারণে তাদের ট্রেইনারের হাতে মরণ হয়। তিমিগুলো মরে ভেসে ওঠে, ঝুলে ছিল তাদের চোয়াল, আর ভিতরে কালো রক্তের রঙ।

কোন জবাব দিল না ক্যামারলেনগো। সে ঘুরে দাঁড়াল, মুখ ফিরিয়ে নিল জানালার দিকে।

রোচারের কণ্ঠ গমগম করে উঠল, সিনর, এই খুনের কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে...

সত্যি নয়, আবারও নিজের কথায় অটল ওলিভেট্টি, পোপের কাছে ধারে একটা মশাও আসতে পারে না। বাইরের মানুষ তো দূরের কথা।

যদি এই দাবি সত্যি হয়, নিজের কথায় ফিরে গেল রোচার, এবং আমাদের হোলি ফাদার পয়জন্ড হয়ে থাকেন, তাহলে এন্টিম্যাটার খুঁজে বের করার কাজে আমাদের অনেক অনেক

গুণ বেশি সতর্ক হতে হবে। আমরা যা ভাবছি তারচেয়ে অনেক অনেক গভীরে প্রোথিত তাদের মূল। হোয়াইট জোনে সার্চ করার কথা ভুলে যেতে হবে আমাদের। আমরা যদি এ হারে এগিয়ে যই, ভয় হচ্ছে, সময় মত খুঁজে নাও পেতে পারি।

ওলিভেট্টির শীতল চোখের দৃষ্টি আরো উষ্ণতা হারল, ক্যাপ্টেন, আমি আপনাকে বলব কী ঘটতে যাচ্ছে।

না। বলল ক্যামারলেনগো, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে, আমি আপনাদের বলছি কী ঘটতে চলেছে। সরাসরি সে তাকাল ওলিভেট্টির দিকে। অনেক হয়েছে, অনেকদূর পর্যন্ত হয়েছে, আর বিশ মিনিটের মধ্যে আমি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি কনক্লেভ চলবে কি চলবে না, ভ্যাটিকানে কোন মানুষ থাকবে কি থাকবে না সে বিষয়ে। আমার সে সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?

চোখের পলক ফেলল না ওলিভেট্টি, জবাবও দিল না কোন।

এবার কথা বলল ক্যামারলেনগো, আরো জোরের সাথে। তার ভিতরে এমন তেজদীপ্তি আছে তা আগে বোঝা যায়নি। ক্যাপ্টেন রোচার, আপনি হোয়াইট জোনের সার্চ শেষ করবেন এবং রিপোর্ট করবেন আমার কাছে। সরাসরি আমার কাছে।

নড করল ক্যাপ্টেন সাথে সাথে, একটা অপ্রস্তুত দৃষ্টি হানল ওলিভেট্টির দিকে।

এবার ক্যামারলেনগো ফিরল দুজন সুইস গার্ডের দিকে। আমি সেই বিবিসি রিপোর্টারকে, মিস্টার গ্লিককে, এই পাপাল অফিসে চাই। ইমিডিয়েটলি। তার সাথে যদি সত্যি সত্যি ইলুমিনেটি এ্যাসাসিন যোগাযোগ করেই থাকে, তাহলে সে হয়ত আমাদের কোন না কোন ভাবে সাহায্য করতে পারবে। যাও।

উবে গেল দুজন সৈন্য।

এবার ক্যামারলেনগো ঘুরে দাঁড়াল আবার, তাকাল অন্য সৈনিকদের দিকে, জোয়ানগণ, আমি আর কোন প্রাণঘাতি ঘটনা দেখতে চাই না এই সন্ধ্যায়। রাত দশটার মধ্যে তোমরা সেই দানবটাকে ধরবে, দুজন কার্ডিনালকে উদ্ধার করবে। আমি কি পরিষ্কার করে বলতে পারছি আমার কথা?

কিন্তু সিনর, বলল ওলিভেট্টি, আমরা মোটেও জানি না কী করে

মিস্টার ল্যাঙডন এ নিয়ে কাজ করছেন, দেখে মনে হচ্ছে তার উপর ভরসা রাখা যায়। আমি রাখছি।

এই কথার সাথে সাথে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ক্যামারলেনগো, তার পদক্ষেপে কী এক সৌকর্য ভর করেছে। বেরিয়ে যেতে যেতে তিনজন প্রহরীর দিকে আঙুল নির্দেশ করে সে, তোমরা তিনজন, এসো আমার সাথে।

আদেশ পালন করল গার্ডরা।

দোরগোড়ায় গিয়ে ফিরে দাঁড়াল ক্যামারলেনগো। তাকাল ভিট্টোরিয়ার দিকে, মিস ভেট্রা, আপনিও, দয়া করে আসবেন আমার সাথে?

একটু অপ্রস্তুত বোধ করে ভিট্টোরিয়া, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

একটু অস্বস্তি যেন বোধ করে ক্যামারলেনগোও, এক পুরনো বন্ধুকে দেখতে।

সার্নে, সেক্রেটারি সিলভিয়া বোডেলক ক্ষুধার্ত। তার একটা মাত্র আশা, কখন বাসায় হাজির হওয়া যায়। কোনমতে কোহলারের শরীরটা টিকে গেছে। সে ফোন করেছিল। সরাসরি জানিয়েছে, সে চায় যেন সিলভিয়া থাকে। কোন ব্যাখ্যা নেই, নেই কোন ইশারা।

আজ অনেক বছর ধরে সিলভিয়া কোহলারের অনাকাক্ষিত আচার-ব্যবহারের তোয়াক্কা না করতে শিখেছে। তার নিরব ট্রিটমেন্ট, গোপন মিটিংগুলোতে হুইল চেয়ারের ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করার চিন্তাধারা-সবই অনেকটা অসুস্থ মনে হয় সিলভিয়ার কাছে। সে আশা করে, একদিন বদমেজাজি লোকটা সার্নের বিনোদনমূলক স্যুটিং রেঞ্জে নিজেকেই গুলি করে বসবে। সে দিন আর আসে না।

এখন, ডেস্কে একা একা বসে থেকে সে টের পায় পেটের ভিতর ছুচো ছোটাছুটি করছে। কোহলার না তাকে কোন কাজ দিয়ে গেছে, না কোন উপদেশ। শুধু বসে থাক, ব্যস! ফিরেও আসেনি লোকটা। এখানে একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে মাছি মারার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো, ভাবে সে। অবশেষে তার আর তর সয় না। সে একটা নোট রেখে যায় কোহলারের জন্য, তারপর স্টাফ ক্যান্টিনে গিয়ে দু-চার গ্রাস গোগ্রাসে গিলে নেয়ার জন্য পা বাড়ায়।

আফসোস, তা আর করা হয় না।

সে যখন সার্নের রিক্রিয়েশন এরিয়া, সুইটস্ ডি লোইজার পেরিয়ে যেতে থাকে তখনি থমকে দাঁড়ায় বিশাল হলওয়েটার সামনে। যাদের এখানে এখন থাকার কথা নয়, এমন সব লোকজনের উপচে পড়া ভিড় সেখানে। সবাই তাকিয়ে আছে টেলিভিশনের দিকে। খাবার-দাবারের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে। বড় কিছু না কিছু ঘটছে। সিলভিয়া খাবারের কথা বাদ দিয়ে ঢুকে পড়ে প্রথম স্যুটটায়। এখানে তরুণ কম্পিউটার প্রোগ্রামারার আসর মাতাচ্ছে। টিভিতে হেডলাইন দেখে একটা ভিরমি খেল সে সাথে সাথে।

মনোযোগ দিয়ে সিলভিয়া খবরটা দেখে। বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের কানকেও। কোন এক পুরনো দিনের ব্রাদারহুড কিনা হত্যা করেছে কার্ডিনালদের! এ দিয়ে কী প্রমাণিত করতে চায় তারা? তাদের ঘৃণা? তাদের ক্ষমতা? তাদের অবজ্ঞা?

আর এখনো, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এ ঘরের আবহাওয়া খুব বেশি শোকাতুর নয়।

দুজন তরুণ স্পেশালিস্ট তাদের হাতের টি শার্ট নাড়াচ্ছে যেখানটায় বিল গেটসের ছবি আঁকা আর সেই সাথে লেখাঃ- এবং গ্রিকরাই পৃথিবীতে শাসন করবে।

ইলুমিনেটি! চিৎকার জুড়ে দিল একজন, আমি বলেছিলাম না এরা বাস্তব?

অসম্ভব! আমি মনে করেছিলাম এটা সামন্য এক গেম।

তারা পোপকে খুন করেছে, ম্যান! দ্য পোপ!

জিজ! ভেবে পাই না এ দিয়ে তুমি আর কত বাহাদুরি দেখাবে।

হাসতে শুরু করল তারা।

ক্যাথলিক মত প্রচার করে সিলভিয়া এখানে। যে কোন ধর্মে অবিশ্বাসীর সাথে তর্ক জুড়ে দেয়। কিন্তু এখানে ওরা কী করছে? কারো কারো এমন অসুস্থ মানসিকতা কী করে হয়? আরে, ক্যাথলিক চার্চ অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বলে নেচে কুঁদে বাড়ি মাথায় তুলতে হবে নাকি?

সিলভিয়ার কাছে চার্চ মানে অনেক বড় এক ব্যাপার। সামাজিক সৌহার্দ্যের কেন্দ্রবিন্দু... কখনো কখনো এটা এমন এক জায়গা, যেখানে খোলা গলায় গান গাইলেও কেউ আড়চোখে তাকাবে না। গির্জাই তার জীবনের বড় বড় ব্যাপারগুলো জুড়ে দিয়েছে জীবনের সাথে... শেষকৃত্য, বিয়ে, ব্যাপ্টিজম, ছুটির দিন... আর তার বদলে চার্চ আর কিছুই চায়নি। এমনকি চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারটাও একেবারে ঐচ্ছিক। তুমি যদি চাঁদা দাও তো ভাল, খ্রিস্টবাদের উপকার হচ্ছে, আর যদি না দাও তো আরো ভাল, তুমি এসো। তার সন্তানেরা সানডে স্কুল থেকে হাসিখুশি মনে বাড়ি এসে পৌছায়, তাদের হাত থাকে মাথার উপরে

তোলা, মন থাকে প্রফুল্ল, অন্তরে গেঁথে যায় হৃদ্যতা, যা আজকাল খুব একটা দেখা যায় না। এর সাথে এমন কান্ড বাঁধিয়ে দেয়ার মানে কী!

সে ভেবে খুব একটা অবাক হয় না যে পৃথিবীর সেরা সেরা প্রতিভাবান তরুণ তুর্কীর মধ্যে বেশিরভাগই নাক সিঁটকায় চার্চের ব্যাপারে। এটা এখন একটা ফ্যাশন। তারা কি আসলেই মনে করে কোয়ার্ক আর মেসনই মানব জীবনের সব? কিম্বা সেই ইকুয়েশনগুলো, যা কিনা মানুষের আত্মিক আর আধ্যাত্মিক সব প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলতে পারে?

স্তম্ভিত মনে সিলভিয়া এগিয়ে যায়, পেরিয়ে যায় হলওয়ে। সব টিভি রুমেই উপচে পড়া ভিড়। এবার তার মাথায় অন্য পোকা জাঁকিয়ে বসেছে। ভ্যাটিকান থেকে কেন কোহলারের কাছে ফোন আসবে, কেনই বা সে এমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে, তাকে অফিসে থাকতে বলবে বাড়তি সময় সহ এবং সবশেষে নিজেই উধাও হয়ে যাবে। এগুলো কি কোইনসিডেন্স? হয়ত।

ভ্যাটিকান এমনিতেও সার্নের সাথে মাঝে মাঝেই যোগাযোগ করে, প্রতিষ্ঠানটার নতুন নতুন আবিষ্কারের কারণে সাধুবাদ জানায়। এই কিছুদিন আগেও ন্যানো টেকনোলজির ব্যাপারে তারা যোগাযোগ করেছে সার্নের সাথে। যোগাযোগ করেছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যাপারে। কখনো কেয়ার করেনি সার্ন। কোহলার সাধারণত চার্চের সাধুবাদের খবর শোনার পরই ঝুলিয়ে দিত ফোনটাকে। কারণ একটু পরই চটকদার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অযুত নিযুত ফোন আসতে শুরু করবে। তারা নানা ধরনের প্রলোভন দেখাবে নতুন আবিষ্কারটাকে নিজেদের ঝোলায় পুরে নেয়ার ধান্ধায়। তিতিবিরক্ত হয়ে একটা কথাই বারবার বলে কোহলার, খারাপ সংবাদপত্রের মত খারাপ আর কিছু নেই।

ভেবে পাচ্ছে না সিলভিয়া কী করবে। কোহলারকে একটা ফোনকল কি করবে? তাকে কি বলবে টিভি খুলতে? সে কি কেয়ার করবে? শুনেছে কি এর মধ্যে? অবশ্যই শুনতে পেয়েছে। সে হয়ত তার শয়তানি হাত ব্যবহার করে ক্যামকর্ডারে পুরো রিপোর্টটা গলাধকরণ করছে, বছরে একবার মুচকি হেসে।

সামনে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তার জন্য। সেখানে জড়ো হয়েছে সার্নের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আবিষ্কারকরা। সে যখন কাচুমাচু হয়ে একটা সিট দখল করল তখন কেউ চোখ তুলে তাকাল না তার দিকে।

ভেট্রার বেডসাইড টেবিল থেকে জার্নালটা তুলে এনে পড়ছে ম্যাক্সিমিলিয়ান কোহলার। জায়গাটা লিওনার্দো ভেট্রার এ্যাপার্টমেন্ট। হিমশীতল। এখন আর পড়তে ভাল লাগছে না। তুলে রাখল সে সেটাকে। দেখতে শুরু করল টেলিভিশন। তারপর সে পাট চুকিয়ে বন্ধ করল যন্ত্রটাকে। বেরিয়ে এল এ্যাপার্টমেন্ট থেকে।

অনেক দূরে, ভ্যাটিকান সিটিতে, কার্ডিনাল মর্টাটি আরো একটা ট্রে তুলে আনলেন, তারপর সেই ব্যালটভর্তি ট্রে টা নিয়ে গেলেন চিমনির দিকে। পুড়িয়ে দিলেন সেগুলো। বেরুল কালো ধোঁয়া, সিস্টিন চ্যাপেলের বিখ্যাত চিমনি দিয়ে।

দুবার ব্যালটিং হয়েছে, কোন পোপ নির্বাচিত হয়নি।

সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় আঁধারের ছড়াছড়ি। উপর থেকে অন্ধকার নেমে এসেছে তারাহীন রাতের মত। সেখানে আলোর উৎস নেই। এক সিমাহীন বিষণ্নতা জেঁকে বসছে ভিট্টোরিয়ার সারা অস্তিত্বে! এক একাকী মহাসাগরের মত। ক্যামারলেনগো আর সুইস গার্ড এগিয়ে যাবার সময় সে কাছাকাছি থাকে কী এক অব্যক্ত আতঙ্কে। অনেক উঁচুতে কোথাও একটা একলা ঘুঘু মন উদাস করে দেয়া আওয়াজ তোলে। শব্দ ওঠে তার অস্থির ডানা ঝাঁপটানোর।

অস্বস্তি টের পেয়েই যেন একটা হাত রাখে ক্যামারলেনগো তার কাঁধে। যেন জাদুমন্ত্রের মত একটা নিশ্চয়তা আর নির্ভরতা চলে আসে স্পর্শের সাথে সাথে। যা করার তা করতে হবে। হাল ছাড়া যাবে না।

কী করতে যাচ্ছি আমরা? ভাবে সে, এই পাগলাটে অবস্থার অবসান হচ্ছে কখন?

এখানে কী করে যেন একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে তার মনে। আমি যা মনে করছি তাই কি করতে যাচ্ছি আমরা? সত্যি সত্যি কি পোপকে ইলুমিনেটি খুন করেছে? তাদের হাত কি এত লম্বা? আমিই কি কোন পোপের মৃতদেহের উপর পোস্ট মর্টেম করা প্রথম মানুষ?

সে ভেবে পায় না অবশেষে এই আঁধার কেটে যাবে কিনা। আবার সে খোলা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে কিনা, মনের আনন্দে ব্যারাকুড়ার সাথে সাতরে বেড়াতে পারবে কিনা। প্রকৃতির সাথে তার একটা গ্যাটছড়া বাধা হয়ে গেছে, সেটাকে আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। আর প্রকৃতিকে দূরে ঠেলা যাবে না একবারও। সে প্রকৃতিকে বোঝে, প্রকৃতি বোঝে তাকে। কিন্তু এখন যে দিকটা নিয়ে খতিয়ে দেখতে হচ্ছে, তা পুরো ভিন্ন প্রকারের। এখানে মানব আর ধর্ম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে যার কোনটাকেই সে কোনদিন বুঝে উঠতে পারেনি। খুনে মাছ তিমি যেমন মুখ ব্যাদান করে থাকে ঠিক তেমনি হা করে আছে বাইরের মিডিয়া আর প্রেস ভ্যান, সেসবের মানুষ। ব্র্যান্ডেড মৃতদেহের কথা যতবার মনে পড়ে, যতবার মনে পড়ে টিভি ফুটেজের কথা ততবার বাবার শরীরের কথাটা জাপ্টে ধরে তাকে... মনে পড়ে যায় হত্যাকারির গা জ্বালানো হাসির কথা। লোকটা বাইরে কোথাও আছে। আশপাশেই। ভয়কে পার করে, যে বীভৎস রাগ উঠে আসে রি রি করে, সেটাকে ভয় পেতে থাকে ভিট্রোরিয়া।

এগিয়ে যেতে যেতে আলোর একটা রেশ উঠে আসে উপরে। টের পায় সে, কেমন অধিভৌতিক এক আলো। ব্যাসিলিকার ঠিক মধ্যখান থেকে। কাছে এসে সে চিনতে পারে, এটাই সে স্যাঙ্কেন স্যাঙচুয়ারি। সেই গোপন চেম্বার যেখানে ভ্যাটিকানের সবচেয়ে বড় বড় রথী-মহারথীরা শুয়ে আছেন শান্তিতে। সামনেই সেই তেলের বাতি জ্বলছে নিভু নিভু হয়ে।

সেন্ট পিটারের হাড়? প্রশ্ন তোলে সে। যদিও জানে এখানে আসা সবার জানা আছে সেই সোনালি সিন্দুকে কী আছে।

আসলে, না। বলল ক্যামারলেনগো, এ ভুলটা প্রায় সবাই করে। সেটার ভিতরে আছে প্যালিয়াম। নতুন কার্ডিনালদের পোপ যে পশমী বস্ত্র দান করেন তা।

কিন্তু আমি মনে করেছিলাম—

সবাই তাই মনে করে। গাইডবুকে এটাকে সেন্ট পিটারের টম্ব হিসাবে অভিহিত করে। কিন্তু সত্যিকার কবরটা আমাদের দোতলার নিচে অবস্থিত। মাটির গভীরে। ভ্যাটিকান সেখানেই পুঁতে রেখেছে তাকে। কারো যাবার অনুমতি নেই সেখানে।

একটু ধাক্কামত খেল ভিট্রোরিয়া। সে কতশত মানুষের মুখে শুনেছে একথা! কত মানুষ হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আসে একটা বারের জন্য এ জায়গা দেখতে! কত মানুষ এই সোনালি বাক্সটাকে সেন্ট পিটারের শেষ আশ্রয় ভেবে আবেগে আপ্লুত হয়! ভ্যাটিকানের কি উচিৎ নয় সত্য কথাটা জানানো?

আমরা সবাই এর ফলে একটা সুযোগ পেয়ে যাই। ঐশ্বরিকতার এক মহান স্পর্শ অনুভব করে সবাই।

ভিট্টোরিয়া, একজন বিজ্ঞানী হিসাবে কথাটাকে ঠিক মেনে নিতে পারল না। সে ভাল করেই জানে মানসিক শক্তি কত বড় শক্তি। কত মানুষ এ্যাসপিরিনকে ক্যান্সারের অষুধ মনে করে ব্যবহার করে! অবাক হলেও সত্যি, তাদের অনেকেই বিশ্বাসের জোরে টিকে যায়। আসলে বিশ্বাস ব্যাপারটা কী?

পরিবর্তন, বলল ক্যামারলেনগো, এমন একটা ব্যাপার যা আমরা ভ্যাটিকান সিটির ভিতরে দেখতে পছন্দ করি না। আমাদের ভুলগুলোকে মেনে নিয়ে সবার সামনে সব সত্যি সব সময় উপস্থাপিত করতে পারি না। অনেক সমস্যা আছে তাতে। তার পরও, কেউ যে সে চেষ্টা করেনি তা নয়। হিজ হোলিনেস এমন প্রচেষ্টা দেখিয়েছিলেন। তার আরো অনেক পরিকল্পনা ছিল। একটু থমকে দাঁড়াল ক্যামারলেনগো, আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে তাল মেলাতে চাই, আসলে আমরা সবাই যে চাই এমন নয়, চাইতেন হিজ হোলিনেস। তিনি ঈশ্বরের সাথে মিশে যাবার নতুন, বিজ্ঞান সম্মত চেষ্টা করতেন।

আঁধারে একটু হোচট খেল ভিট্টোরিয়া, যেমন আধুনিক বিজ্ঞান?

সত্যি বলতে গেলে, বিজ্ঞানের কোন ঠিক ঠিকানা নেই। প্রতিনিয়ত এর পথ বদলে যাচ্ছে। আজ আমরা বিজ্ঞানে যাকে ঠিক বলে ধরে নিই সেটা পরদিনই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, বিজ্ঞান ঠিক স্থিত নয়।

স্থিত নয়?

ঠিক তাই। বিজ্ঞান বাঁচাতে জানে, বিজ্ঞান জানে কী করে খুন করতে হবে আরো নিখুতভাবে। আমি আত্মার ডাকে বিশ্বাসী।

প্রথম ডাকটা কখন পান আপনি? একটু যেন শ্লেষ মিশে ছিল ভিট্টোরিয়ার কণ্ঠে।

আমার জন্মের আগে।

চোখ তুলে তাকাল মেয়েটা ক্যামারলেনগোর দিকে।

আমি দুঃখিত। ব্যাপারটা সব সময় একটু বেখাপ্পা ঠেকে। আসলে জ্ঞান হবার আগে থেকেই আমি জানতাম ঈশ্বরের সাথে সেবার একটা সম্পর্ক হয়ে যাবে আমার। চিন্তার প্রথম মুহূর্ত থেকেই। এটা সুপ্ত ছিল। তারপর প্রথমবারের মত আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দেই। তখনি ভেসে ওঠে মনে, কী হতে চাই আমি, কী হওয়া আছে আমার ভাগ্যে-তা বুঝে উঠতে শুরু করি।

ভিট্টোরিয়া বোঝার চেষ্টা করছে একজন তরুণ প্রিস্ট কী করে একটা হেলিকপ্টার চালানোর চেষ্টা করছে। অবাক হলেও সত্যি কথা, সে চোখ বন্ধ করে ঠিক ঠিক দেখতে পেল ক্যামারলেনগো ভেন্ট্রেস্কাকে, বসে আছে দীপ্ত ভঙ্গিতে, হেলিকপ্টারের কন্ট্রোলের পিছনে। আপনি কি কখনো পোপকে নিয়ে উড়েছেন?

হায় ভগবান! না। সে কাজ আমরা ছেড়ে দিতাম প্রফেশনালদের হাতে এমন ঝুঁকি নিতে রাজি হইনি কোনদিন। তবে ছুটির সময়, অবকাশযাপনের সময় মাঝে মাঝে আমাকে কপ্টার চালাতে দিতেন তিনি। থামল একটু ক্যামারলেনগো, মিস ভেট্রা, সত্যি সত্যি আমরা আপনার কাছে এই দিনের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞ। আপনার পিতার ব্যাপার আন্তরিকভাবে দুঃখিত। সত্যি।

থ্যাঙ্ক ইউ।

আমি কখনো বাবাকে দেখিনি। আমার জন্মের আগেই তিনি মারা যান। দশ বছর বয়সে হারাই মাকেও।

চোখ তুলে আবার তাকাল ভিট্টোরিয়া, তার চোখ মায়ায় আর্দ্র। আপনিও এতিম হয়ে পড়েছিলেন?

আমি একটা দুর্ঘটনা থেকে কোনক্রমে বেঁচে যাই। এমন এক দুর্ঘটনা যেটা আমার মাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়।

আপনার দেখভাল করত কে?

ঈশ্বর। নির্দ্বিধায় বলল ক্যামারলেনগো, যেন এতে কোন সন্দেহ নেই, নেই কোন

নাটকীয়তাও, সাথে সাথেই তিনি আরেক বাবার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দেন। পালার্মো থেকে একজন বিশপ এগিয়ে আসেন। আমার বিছানার কাছে বসেন। তুলে নেন। আমাকে। সে সময়টাতেও আমি মোটেও অবাক হইনি। আমি যেন জানতাম, ঈশ্বর এমনই চাইছেন। বিশপকে দেখে আমি চমকাইনি, ভয় পাইনি, উত্তেজিত হইনি। আমি জানতাম, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন তার সেবার জন্যই।

আপনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর আপনাকে বেছে নিয়েছেন?

আমি করতাম। আজো আমি তাই বিশ্বাস করি। ক্যামারলেনগোর কণ্ঠে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই, অহংকার নেই, শুধু আছে অপার কমনীয়তা, আমি সেই বিশপের কাছে অনেক বছর ছিলাম। আস্তে আস্তে তিনি একজন কার্ডিনাল হন। সে সময়টাতেও তিনি। আমাকে একটুও ভুলে যাননি। আমার স্মৃতিতে তিনিই আমার পিতা। আলোর একটা ঝলক পড়ল লোকটার মুখে, আর সেখানে কী এক অচেনা একাকীত্ব ধরা পড়ল, বুঝতে পারছে ভিট্টোরিয়া।

একটা উঁচু পিলারের নিচে পৌছে গেল দলটা। তাদের আলো পড়ল নিচের দিকে একটা পথে। নিচের নিঃসীম আঁধারের দিকে এক পলক ফেলেই ভিট্টোরিয়া পিছু ফিরতে চায় সাথে সাথে। এরই মধ্যে ক্যামারলেনগোর দুহাত ধরে গার্ডরা তাকে নিচে নামতে সাহায্য করছে।

কী হয়েছিল তার? নামতে নামতে অন্যমনস্কতার ভান করে ভয় ঢাকার চেষ্টা করছিলো ভিট্টোরিয়া, অবিরত, যে কার্ডিনাল আপনাকে গ্রহণ করলেন?

তিনি কলেজ অব কার্ডিনালসে গেলেন, বলল ক্যামারলেনগো। অন্য একটা পদের জন্য।

বিস্ফারিত নয়নে তাকাল ক্যামারলেনগোর দিকে ভিট্টোরিয়া।

আর তারপর, আমার বলতে কষ্ট হচ্ছে, তিনি চলে গেলেন আমাদের সবাইকে ছেড়ে।

লে মি কন্ডোগলিয়াঞ্জে! বলল ভিট্টোরিয়া, সম্প্রতি?

ঘুরে দাঁড়াল ক্যামারলেনগো। তার চোখমুখের অপার বেদনা ঢেকে দিল আশপাশের অন্ধকার। আজ থেকে ঠিক পনের দিন আগে। এখনি আমরা তাকে দেখতে যাচ্ছি।

আর্কাইভাল ভল্টের ভিতরে নিভু নিভু আলো কেমন এক ভূতুড়ে ছায়া তৈরি করছে। আগের যে ভল্টটায় ল্যাঙডন ঢুকেছিল সেটার তুলনায় এটা অনেক ছোট। বাতাস কম। কম সময়। সে ভাবছে ওলিভেট্টিকে রিসার্কুলেশন ফ্যান ছাড়তে বলবে কিনা।

ব্যালে আর্টি লেখা শাখাটা নিয়ে সে উঠেপড়ে লেগেছে। সেকশনটাকে হারানোর কোন উপায় নেই। এখানে আটটা তাক জুড়ে শুধু দলিল-দস্তাবেজ সাজানো। থরে বিথরে। ক্যাথলিক চার্চের হাতে অযুত নিযুত শিল্পকর্ম আছে সারা দুনিয়া জুড়ে।

সেলফগুলোতে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে ল্যাঙডন, গিয়নলরেঞ্জো বার্নিনি লেখা আছে কিনা কোথাও তা নিয়ে সব উলট পালট করছে সে। প্রথম সেলফের মাঝামাঝি থেকে দেখা শুরু করল সে। আন্দাজ করল, এখানেই বি শুরু হবে। কিন্তু দেখা গেল তা ঠিক নয়। ফাইলগুলো অক্ষর অনুসারে সাজানো নয়। মহাবিপদ। তার পরও তার বিস্ময়ের কারণ অন্য। কেন সে এটা দেখেও অবাক হচ্ছে না?

উপরের দিকে উঠে গেল একটা মই বেয়ে। দেখতে পেল, প্রথম দিকের দলিলগুলো অনেক বেশি মোটা। সেগুলোতে রেনেসার আমলের সব অগ্রবর্তী শিল্পীর কাজের কথা লেখা। মাইকেলেঞ্জেলো, রাফায়েল, দা-ভিঞ্চি, বত্তিচেল্লি। বোঝা যাচ্ছে, ভ্যাটিকান তাদের সবচেয়ে মূল্যবান শিল্পীদের কাজ আগে এগিয়ে রাখছে। এভাবেই সাজাচ্ছে লেজার বুকগুলোকে। রাফায়েল আর মাইকেলেঞ্জেলোর বিশাল কর্মের মাঝখানে স্যান্ডউইচ হয়ে আছে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ফাইল। বার্নিনি। এটাও পাঁচ ইঞ্চির চেয়েও বেশি মোটা।

এখনি বাতাস ফুরিয়ে আসছে ছোট্ট বদ্ধ কামরায়। গলদঘর্ম হচ্ছে সে মোটা বই হাতে নিয়ে। একলাফে নিচে নেমে এল সে। তারপর ছোট্ট বাচ্চার হাতে কমিক থাকলে যা হয় তেমনি হল। সোজা সে শুয়ে পড়ল মেঝেতেই, মেলে ধরল বার্নিনির বর্ণিলতার কাহিনী। বইটা কাপড়ে বাঁধানো। পুরো বইটা হাতে লেখা। ইতালিয়ানে। প্রতি পৃষ্ঠায় একটা করে কাজের স্বাক্ষর। ছোট্ট বর্ণনা আছে, আছে স্থান, তারিখ, বস্তুর মূল্য আর কোথাও কোথাও শিল্পকর্মের একটা রাফ স্কেচ। সবগুলো পাতা উল্টেপাল্টে দেখল সে। সব মিলিয়ে আটশোর বেশি পাতা। বার্নিনি ব্যস্ত লোক ছিল। বোঝাই যাচ্ছে।

আর্টের নবীন ছাত্র হিসাবে ল্যাঙডন সব সময় ভিরমি খেত এত এত কাজ একজন শিল্পী এক জীবনে কী করে করে সেটা ভেবে। তারপর অত্যন্ত হতাশ হয়ে সে লক্ষ্য করে আসলে শিল্পীরা তাদের কাজের খুব কম অংশই নিজহাতে করে। তাদের হাতের নিচে থাকত স্টুডিও, সেখানে শিখতে আসা তরুণ উদীয়মান শিল্পীরা তাদের শিক্ষকের গড়ে দেয়া ধারণা এবং সামান্য কাজের উপর বাকীটা সেরে ফেলত। শিক্ষানবীশদের উপর ভর করে খ্যাতনামারা তাদের ঝান্ডা উড়িয়ে দিতেন।

বার্নিনির মত শিক্ষকেরা কাজগুলো গড়ে নিতেন নিজহাতে, তবে তিনি অনুসরণ করতেন ভিন্ন পন্থা। কাজটার ছোট একটা মডেল গড়তেন কাদামাটি দিয়ে। তারপর ছাত্ররা সোৎসাহে সেটাকে মার্বেল পাথরের রূপ দিত। আজ ভাল করেই জানে ল্যাঙডন, বার্নিনির মত জগদ্বিখ্যাত আর্টিস্টরা এখনো সব কাজ নিজের হাতে করতে থাকতেন যদি পুরোটা তাদেরই গড়তে হত।

ইনডেক্স! বলল সে ছোট ছেলের মত। দেখতে হবে সেটা। সেখান থেকে আগুনের স্পর্শ পেতে হবে। ফায়ার-ফিউসো-পেতে হবে। দেখতে হবে এফ। কিন্তু এখানেও হতাশ হতে হচ্ছে। এফ একত্রে নেই। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার। কোন দুঃখে এই লোকগুলো এ্যালফাবেটিক্যালি সাজায় না লেখাকে। কী দোষ করল বর্ণক্রম?

এখানেও ভ্যাজাল বাধিয়ে বসেছে কাজ। বর্ণক্রম নয়, পর্যায়ক্রমে সাজানো আছে কাজগুলো। প্রথমে কোনটা গড়লেন তিনি, তারপর কোনটা... তারিখ অনুযায়ী সাজানো আছে সব। এতে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

লিস্টের দিকে তাকিয়ে আরো হতাশা আকড়ে ধরল তাকে। যে কাজটার খোঁজ সে

করছে সেটায় যে ফায়ার থাকবে এমন কোন কথাও নেই। আগের দুটো কাজ হাব্বাকাক এ্যান্ড দ্য এ্যাঞ্জেল এবং ওয়েস্ট পনেন্টে- কোনটাতেই আর্থ ও এয়ারের নাম-গন্ধ ছিল না।

দু-এক মিনিট সে বিরাট হতাশা নিয়ে উল্টে গেল পাতাগুলো। যদি চোখে পড়ে যায়! কিন্তু এটা খড়ের গাদায় সুঁচ খোজার নামান্তর। ডজন ডজন অচেনা কাজের উপর তার চোখ পড়ল। চোখ পড়ল অনেক জানা কাজের উপরও... ড্যানিয়েল এন্ড দি লায়ন, এ্যাপোলো এ্যান্ড ড্যাফানে, একই সাথে হাফ ডজন ঝর্ণার উপরও চোখ পড়ল তার।

সাথে সাথে চোখে একটা আশার আলো ঝিঁকিয়ে উঠল। এই ঝর্ণাগুলো দিয়ে কি ফোর্থ অল্টার অব সায়েন্সের কোন আশা পাওয়া যায়? ওয়াটার? একটা ঝর্ণা দিয়ে ঠিক ঠিক বোঝানো যায় জলকে। কিন্তু এতে একটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে, পাওয়া যাবে খুনিকে। বার্নিনি ডজন ডজন স্থাপত্যে ঝর্ণা রেখেছেন। বিশেষত চার্চের বাইরে অনেক ঝর্ণা আছে খোদ রোমে।

আবার চোখ ফেরাল সে হাতের ইয়া মোটা বইটার দিকে। একটা কথাই তাকে সান্তনা দিচ্ছে। ভিট্টোরিয়া বলেছিল, তুমি দুটো শিল্পকর্মই চিনতে। সুতরাং তৃতীয়টাও তোমার চেনা কাজের মধ্যে পড়তে পারে...

আবার বইটার দিকে সোৎসাহে চোখ ফেরাল সে। একটা দুটো পরিচিত নাম আসছে না যে তা নয়। কিন্তু তার উপর খুব বেশি ভরসা রাখা যায় না।

এবার ল্যাঙডন ঠিক ঠিক বুঝতে পারছে এত অল্প সময়ে সব দেখে শেষ করা যাবে না। ভিতরের বাতাস ফুরিয়ে আসছে, ক্ষীণ হয়ে আসছে হাতের সময় বের করতে হবে বইটাকে ভল্ট থেকে। সাথে করে নিয়ে যেতে হবে। এটা নামমাত্র একটা লেজার, বলল নিজেকে, আশ্বাসের মত করে, এটা কোন গ্যালিলিয়ান মাস্টারপিস নয় যে ভল্ট থেকে বের করে আনলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। আবার বুকপকেটে সেই বইটার অস্তিত্ব অনুভব করল ল্যাঙডন। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল, যাবার আগে এটাকে জায়গামত বসিয়ে রাখতে হবে।

এবার লেজারটাকে তুলে আনার সময় চট করে এক জায়গায় চোখ আটকে গেল তার। একটা ব্যাপারে খটকা লাগল। যদিও এ বইতে এমন অনেক কিছুর নিদর্শন আছে, তবু এটা কেমন যেন বেমক্কা লাগে।

দ্য এক্সটাসে অব সেন্ট টেরেসা তার চোখ আটকে নিয়েছে। কী এক ব্যতিক্রমী ব্যাপার এখানে আছে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ল্যাঙডন। এটাকে প্রথমে বসানো হয়েছিল ভ্যাটিকানে। তারপর বাধ সাধলেন পোপ আরবান এইট। অস্টম আরবান বললেন, এটা এত বেশি যৌন আবেদনময় যে ভ্যাটিকানে এটাকে রাখার কোন যুক্তি নেই। শহরের কোন এক অখ্যাত চ্যাপেলে সেটাকে স্থানান্তরিত করেন তিনি। অন্য কোন প্রান্তে। যে ব্যাপারটা বেশি ভাবাচ্ছে তা হল, তার লিস্টের পাঁচ চার্চের কোন একটায় সেটা অবস্থিত। সেখানে খটকা লাগানোর মত আরো একটা ব্যাপার আছে।

আর্টিস্টের সাজেশন অনুযায়ী সেটাকে স্থানান্তর করা হয়।

ল্যাঙডন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে একটু। এটা একেবারে বেমক্কা লাগছে। বার্নিনি তার মাস্টারপিসগুলোর মধ্যে একটাকে নিজেই কোন অখ্যাত চ্যাপেলের অন্ধকুঠুরীতে সরিয়ে নেয়ার কথা বলবেন। তা কী করে হয়! সব শিল্পী তার আসল আসল কাজকে প্রদর্শিত করতে চায় আসল আসল জায়গায়।

এখনো দোনামনা করছে ল্যাঙডন। যদি...

এমন কি হতে পারে যে বার্নিনি ইচ্ছা করেই তার সবচেয়ে সেরা কাজগুলোর একটা বেশি বেশি উত্তেজনা রেখে সেটাকে ভ্যাটিকানের দ্বারা দূরে কোথাও সরিয়ে নেয়ানোর চাল চেলেছিলেন? এমন কোথাও যেখানে বার্নিনি সহজেই পাথ অব ইলুমিনেশন গড়ে তুলতে পারবেন? আসলে কি ওয়েস্ট পনেন্টে ব্রিথের সাথে সোজা পথে সেটাকে বসানো তার পক্ষে অসম্ভব?

যত বেশি বিশ্বাস করার চেষ্টা করছে ল্যাংডন ততই আহত হতে হচ্ছে তাকে। এর সাথে আগুনের কোন সম্পর্ক আছে কি? নেই। এটা আর যাই হোক কোন সায়েন্টিফিক ব্যাপার নয়। পর্নোগ্রাফিক হতে পারে, বৈজ্ঞানিক নয়। একবার এক ব্রিটিশ সমালোচক বলেছিলেন, এই শিল্পকর্মটা আর যাই হোক না কেন, কোন ক্যাথলিক চার্চে জায়গা পাবার মত পবিত্রতা রাখে না। বরং তাতে সবচেয়ে খোলামেলা যৌনতা প্রকাশ পায়।

তাইতো, ভেবে পায় না ল্যাংডন, সেন্ট টেরেসার যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তিনি সেটা নিতান্তই কদর্য বলা চলে। সেন্ট টেরেসা যৌন স্থলনের সময় বেঁকে আছেন এমন একটা স্কাল্পচারকে আর কোথাও রাখা যাক না যাক, ভ্যাটিকান সিটিতে রাখা সম্ভব নয়।

খুব দ্রুতহাতে লেজারের পাতা উল্টে শিল্পকর্মটার ব্যাখ্যার দিকে নজর দেয় ল্যাংডন। কিন্তু চোখ চলে যায় স্কেচের দিকে। আবারো আশার একটা ক্ষীণ রেখা দেখা দেয়। সেন্ট টেরেসা সত্যি সত্যি মুহূর্তটাকে উপভোগ করছেন, সেইসাথে আরো একটা ব্যাপার তার চোখে ধরা পড়ে।

একজন ফেরেস্তা।

সেই বিখ্যাত কথা হঠাৎ ফিরে আসে...

একবার সেন্ট টেরেসা বলেছিলেন যে রাতে তার সাথে এক এ্যাঞ্জেলের দেখা হয়। তার পরই বিশ্লেষকরা জোর গলায় বলে, এই দেখা হওয়াটা যত না স্পিরিচুয়াল তারচেয়ে অনেক বেশি সেক্সুয়াল। তার সাথে আছে বর্ণনা। সেন্ট টেরেসার নিজের বর্ণনাঃ

... তার বিশাল সোনালি বর্শা... আগুনের লেলিহান শিখায় অত্যুজ্জ্বল... আমার ভিতরে প্রবেশ করে কয়েকবার... এমন এক তৃপ্তি, যা কেউ হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যেতে দিতে রাজি হবে না।

মুচকে হাসল ল্যাংডন।

এটা যদি কোন সত্যিকার যৌন মিলনের বর্ণনা না হয় তবে কীসের বর্ণনা তা আর বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। আরো আশার আলো দেখা দেয় বারবার। যদিও লেখাটা ইতালিয়তে, তবু ঠিক ঠিক বোঝা যায় এখানে আগুনের কথাটা কয়েকবার এসেছে।

... এ্যাঞ্জেলের বর্শা আগুনের শিখায় ভাস্বর...

.. এ্যাঞ্জেলের মাথা থেকে অগ্নি আভা ঠিকরে বেরুচ্ছে...

... মেয়েও আগুনে আগুনে হতবিহ্বল হয়ে যায়, আগুন ধরে যায় তার অন্তরাত্মায়...

আবার স্কেচটার দিকে চোখ না ফিরিয়ে ল্যাংডন নিশ্চিত হতে পারে না। এ্যাঞ্জেলের আগুনে বর্শা উঠে আছে উপরের দিকে। দেখাচ্ছে কোন এক অদেখা পথ।

... তোমার পথের দ্বিধায় এ্যাঞ্জেলের নির্দেশিত পথেই এগিয়ে যাও...

এর নাম, সারাফিম। যার অর্থ অগ্নিপুরুষ।

আবারও পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয় রবার্ট ল্যাংডন। যখন সে দেখতে পেল আসল ব্যাপারটা, ম্রিয়মান হয়ে গেল। যে চার্চে আছে কাজটা সেটার নাম জ্বলছে তার চোখের সামনে।

সান্তা মারিয়া ডেলা ভিট্টোরিয়া।

ভিট্টোরিয়া! ভাবল সে, পারফেক্ট।

পায়ের উপর ভর করে এ্যাঞ্জেলের শিল্পকর্মটার দিকে চোখ রেখে আলতো করে তুলে ধরল সে বইটাকে। তাকাল সিড়ির দিকে। সেখানে আবার সেটাকে রাখা উচিৎ হবে কিনা তা ভাবছে।

এত ভাবাভাবির কিছু নেই, বলল সে মনে মনে, ফাদার জ্যাকুই কাজটা নিজের গরজেই করবে।

তারপর রেখে দিল বইটাকে সেই তাকের ঠিক নিচে।

কপাল কী ভাল তা ভাবতে ভাবতে সে এগিয়ে যেতে থাকে ভল্টের ইলেক্ট্রনিক এক্সিটের দিকে।

কিন্তু সেখানে পৌঁছার আগেই কপূরের মত উবে যায় তার সৌভাগ্য।

এক কদম এগুলেই যাওয়া যাবে বহির্গমন পথের দিকে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ফিকে হয়ে গেল আলো। তারপর কালিগোলা অন্ধকারে ডুবে গেল তামাম আর্কাইভ।

কেউ একজন পাওয়ার অফ করে দিয়েছে।

বিদেহী পোপদের শেষ আশ্রয় হচ্ছে সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার তলা।

ভিট্টোরিয়া সেখানে পৌঁছল এবং গোট্টোতে প্রবেশ করল গোলাকার সিঁড়ি বেয়ে। এই অন্ধকার আর বিশাল ঘরের দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে যায় সার্নের অতিকায় হ্যাড্রন কলিডারের কথা। অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং শীতল। সুইস গার্ডের ফ্ল্যাশলাইটে আলোকিত হয়ে আছে এ জায়গাটা।

কেমন একটা অস্থিরতা ভর করে ভিট্টোরিয়ার মনের উপরে। তাদের দেখা হচ্ছে। না, কোন গোপন ক্যামেরায় নয়, নয় কোন মানুষের দ্বারা। দেখছেন ক্ষমতাবান কয়েকজন অশরীরী।

সামনে আছে পোপদের সেই বিখ্যাত সব কফিন। যেগুলোতে শুয়ে আছেন তারা। সেখানে আছে একটা করে ছবি। মৃত পোপের ছবি। সেগুলোতে তারা সবাই বুকে হাত ভাঁজ করা অবস্থায় শুয়ে আছেন। পাশেই পাথুরে কফিন। একে একে তাদের উপর সুইস গার্ডের আলো পড়ছে। আবার চলেও যাচ্ছে। যেন আলো পেয়ে তারা যার পর নাই আনন্দিত। যেন বেরিয়ে আসতে চাইছেন খাচা ভেঙে। এই জীবন যেন আর তাদের ভাল লাগে না। এগিয়ে চলল ভিট্টোরিয়াদের মিছিল। এগিয়ে চলল পোপদের উপর আলো পড়ে আবার অন্ধকারে ডুবে যাবার পালা।

একটা নিরবতা জেঁকে বসেছে চারধারে। শ্বাসরোধ করার মত করে চেপে বসেছে তাদের উপর। ভিট্টোরিয়া ভেবে পায় না এই নিরবতার অপর নাম শ্রদ্ধা, নাকি বিচিত্র পরিবেশে চলে আসা গাম্ভীর্য। বন্ধ চোখে এগিয়ে চলেছে ক্যামারলেনগো। যেন প্রতিটা পদক্ষেপ তার অতি চেনা। যেন ঠিক ঠিক সে জায়গামত চলে যেতে পারে না দেখেই। বোঝাই যাচ্ছে সে ফাঁক পেলেই গত পনেরদিনে অনেকবার এসেছে এই জায়গাটায়... সম্ভবত তার এই দিন পনেরর কঠিন পথচলার জন্য আশীর্বাদ কামনা করতে।

আমি এই কার্ডিনালের সাথে অনেকদিন কাজ করেছি। বলেছিল ক্যামারলেনগো, তিনি আমার কাছে ছিলেন বাবার মত। ভিট্টোরিয়ার মনে পড়ে যায় বারবার বলেছিল ক্যামারলেনগো যে তাকে সেনাবাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন এই কার্ডিনাল। বাকীটা এমনিতেই বুঝে নিতে পারে ভিট্টোরিয়া। কালক্রমে সেই কার্ডিনাল হয়ে ওঠেন খ্রিস্টবাদের দন্ডমুন্ডের বিধাতা। তারপর নিজের স্নেহের সন্তানতুল্য লোকটাকে দেন চ্যাম্বারলেইনের কঠিন দায়িত্ব। সুযোগ করে দেন সত্যিকার অর্থেই ঈশ্বরের সেবা করার।

এ দিয়ে অনেক ব্যাপারের ব্যখ্যা করা যায়, ভাবে ভিট্টোরিয়া। সে প্রথম থেকেই দেখে আসছে মুষড়ে পড়া ক্যামারলেনগোর কীর্তিকলাপ। লোকটার ভিতরে পোপকে হারানোর চেয়েও বড় কোন ব্যথা দানা বেঁধেছিল। এমনকি এখনকার এই অবিশ্বাস্য ক্রাইসিসের চেয়েও বড় কোন ব্যাপার ঘটছিল তার ভিতরে। তার ধার্মিক নিরবতার বাইরেও রক্তক্ষরণের মত বিশাল কিছু চলছিল। ঠিক বুঝে ওঠা যায় না ব্যাপারটা। ঠিক ঠিক ভেবেছিল ভিট্টোরিয়া, আর আজ সত্যি সত্যি প্রমাণিত হচ্ছে তার যোগ্যতা। সত্যি সত্যি দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর তাকে কোন না কোন বড় বিপদের মুখে কাজ করার জন্যই বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। ভ্যাটিকানের হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিপদের মুখে লোকটা বীরদর্পে এগিয়ে যাচ্ছে। উড়ে বেড়াচ্ছে অনেকটা একলা পাখির মত।

এবার একটু ধীর হয়ে যায় গার্ডরা। যেন ইতস্তত করছে কোথায় থামতে হবে সে বিষয়ে। অন্ধকারে আর সব কবরখানার চেয়ে বেশি উজ্জ্বলতায় ভাস্বর হয়ে আছে যেটা, সেটার সামনে গিয়ে থামল ক্যামারলেনগো। সেখানে খোদিত আছে বিগত পোপের চেহারা। মৃত্যুতে মলিন। একটা কেমন যেন অচেনা ভয় জাপ্টে ধরল ভিট্টোরিয়াকে। কী করতে যাচ্ছি আমরা?

আমি জানি, হাতে একদম সময় নেই। বলল ক্যামারলেনগো, কিন্তু তবুও আমি আশা করি একটা মুহূর্ত জুড়ে আমরা সবাই এখানে ছোট একটা প্রার্থনায় যোগ দেব।

যার যার জায়গায় দাড়িয়ে থেকে সুইস গার্ডরা বো করল। ধুকপুক করছে ভিট্টোরিয়ার

অন্তরাত্মা। এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটবে এখন। সম্ভবত ভ্যাটিকানের ইতিহাসে প্রথমবারের মত। ক্যামারলেনগো হাঁটুতে ভর করে বসল। তারপর শুরু করল ইতালিয়তে প্রার্থনা করা।

কান্নার একটা বাষ্প উঠে আসে ভিট্টোরিয়ার ভিতর থেকে। শুধু মৃত পোপের জন্য নয়, সেই প্রার্থনা যেন আসছে তার নিজের পবিত্র পিতার জন্যও, যার এখন থাকার কথা ছিল সার্নে।

সর্বপিতা, কাউন্সেলর, বন্ধু, গমগম করে উঠছে ক্যামারলেনগোর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর। ধ্বণিত প্রতিধ্বণিত হচ্ছে বিশাল কক্ষের কোণায় কোণায়। আমার তারুণ্যে আপনি বলেছিলেন যে আমার হৃদয়ে ঝংকার তোলে যে আওয়াজ তা আমার নয়, ঈশ্বরের। আপনি বলেছিলেন, আমাকে অবশ্যই এটাকে অনুসরণ করে চলতে হবে যে পর্যন্ত না বিপদ এসে গ্রাস করে নেয়। হাজার বিপদেও আপনি সেই ঐশ্বরিক স্পর্শ মেনে চলার আদেশ দিয়েছিলেন। আজ আমি সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমার ভিতরে। শুনতে পাচ্ছি, অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। আশীর্বাদ করুন আমাকে, শক্তি দিন, আমি যা করব তাই যেন করতে থাকি সারাক্ষণ। আপনি যা বিশ্বাস করতেন তাই যেন পালন করতে পারি বিনা দ্বিধায়। আমেন।

আমেন। সাথে সাথে বলল গার্ডরা। ফিসফিস করে।

মনে মনে বলল ভিট্টোরিয়া, চোখের জল মুছতে মুছতে, আমেন, ফাদার।

একটু ধীর হয়ে এগিয়ে গেল ক্যামারলেনগো, সরে এল, তারপর তাকাল টম্বের দিকে, কভারটাকে অন্যদিকে সরাও। বলল সে সুইস গার্ডদের।

ইতস্তত করল সুইস গার্ডরা। সিনর, বলল অবশেষে একজন, আমতা আমতা করে, আইন অনুযায়ী আমরা আপনার আদেশ মানতে বাধ্য; আইন অনুসারে, আমরা আপনার অধীন... থামল সে, আমরা তাই করব যা করতে বলবেন আপনি...

তরুণ লোকটার মন পড়ার চেষ্টা করল ক্যামারলেনগো। কোন একদিন তোমার আর আমার এই কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইব আমি। করব। কিন্তু আজ আমি তোমার কাছে আনুগত্যের নিদর্শন চাই। ভ্যাটিকান ল বানানো হয়েছে রোমান ক্যাথলিক চার্চকে রক্ষা করার জন্য। সোজাসাপ্টা আমি তোমাকে সেই আইন ভাঙার আদেশ দিচ্ছি, ভালর জন্য।

একটা দীর্ঘ মুহূর্ত জুড়ে অস্বস্তির হল্কা বয়ে গেল। তারপর চিফ গার্ড আদেশ করল। গার্ড তিনজন ফ্ল্যাশলাইট নামিয়ে রাখল মাটিতে, তাদের ছায়া লাফিয়ে উঠে গেল মাথার উপরে।

এগিয়ে গেল তারা। হাত লাগাল। পাথরের ঢাকনাটা সরানো যাচ্ছে না। কালোঘাম ছুটে যাচ্ছে তাদের। গার্ডদের মধ্যে যে সিনিয়র সে তেমন গা করল না। ভিতরে কী দেখবে সে বিষয়ে একটু চিন্তায় পড়ে গেল ভিট্টোরিয়া।

আরো জোর খাটাল লোকগুলো। কাজের কাজ কিছুই হল না।

এ্যাঙ্কোরা! বলল ক্যামারলেনগো, গুটিয়ে নিচ্ছে আস্তিন। ওরা! প্রত্যেকে এগিয়ে গেল পুনরোদ্যমে।

ভিট্টোরিয়াও হাত লাগানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল এমন সময় নডতে শুরু করল স্ল্যাব। দেখা যাচ্ছে পোপের বাঁকা হয়ে থাকা মুখাবয়ব, দেখা যাচ্ছে পা।

প্রত্যেকে সরে দাঁড়াল।

একজন গার্ড নিচু হয়ে তুলে নিল তার ফ্ল্যাশলাইট, তাক করল টম্বের দিকে। তুলে নিল অন্যরাও। সাফল্যের ক্ষীণ রশ্মি দেখা যাচ্ছে সবার চোখেমুখে। ক্রস করল তারা নিজেদের।

ক্যামারলেনগো চোখ ফিরিয়ে নিল টম্বের দিকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সেদিকে।

ভিট্টোরিয়ার একটু ভয় হচ্ছিল। লাশের মুখ রিগর মর্টিস হয়ে থাকলে কী করতে হবে ভেবে পাচ্ছিল না সে। তাহলে হয়ত ভেঙে ফেলতে হবে চোয়াল। এবার সে দেখতে পেল ভিতরটা। মুখটা খোলাই ছিল। আর তার ভিতরের দিকটায়, ভয় নিয়ে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা।

কালো। মৃত্যুর মত কালো।

কোন আলো নেই। নেই কোন শব্দ।

অন্ধকারে ডুবে আছে সিক্রেট আর্কাইভস।

ভয়, ভাবল ল্যাংডন, এক বিচিত্র ব্যাপার। এমনিতেই বদ্ধ জায়গা সম্পর্কে ল্যাংডনের একটু একটু ভয় আছে। অনেকটা মানসিক রোগের মত। তার উপর এখানে বাতাস একেবারে পল্কা। রিভলভিং ডোরের দিকে হতাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে সে।

দেয়ালের পাশে সুইচটাকে কোনমতে দেখতে পেল সে, চাপ দিল, খুলল না সেটা। অনড় দাঁড়িয়ে আছে দরজা।

চারধারে তাকাতে তাকাতে সে চেষ্টা করল আওয়াজ তোলার, কিন্তু তাতে লাভের লাভ নেই কোন। কেউ শুনতে পাবে না। আর্কাইভ একেবারে জনমনুষ্যহীন। এ শব্দ আর্কাইভের ভল্টের বাইরেই যাবে না, আর বাইরে যাবার তো কোন প্রশ্ন নেই। টের পেল সে, কেউ একজন যেন বুকে পাথর চাপা দিয়েছে। বাতাস পাচ্ছে না ফুসফুস, শক্তি পাচ্ছে না হৃদপিন্ড।

প্রথমবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে তার মনে হল নড়াতে পারছে একটু একটু। কিন্তু পরের বার সে চেষ্টাও যেন বৃথা মনে হল। চরমপন্থা অবলম্বন করবে, ভাবল সে, পুরো শরীর ছুঁড়ে দিল দরজার গায়ে। ঘাম হচ্ছে খুব। এবার চেষ্টা করল মইটা দিয়ে দরজা ভাঙার। হাত বাড়াল মইয়ের জন্য।

পেল জিনিসটাকে হাতের কাছে। আশা করেছিল এটা কাঠ বা লোহার মত শক্ত কিছু দিয়ে গড়া হবে। কিন্তু বিধি বাম, মইটা বানানো হয়েছে এ্যালুমিনিয়াম দিয়ে। এগিয়ে গেল সর্বশক্তি দিয়ে। কিন্তু এবারো কোন উপায় নেই। অনেক আগেই লাগল কাচের গায়ে মইটা। কাজ হল না। ভাঙতে হলে এ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে ভারি কিছুর প্রয়োজন পড়বে, ভাল বুঝতে পারছে সে।

মনে পড়ে যাচ্ছে তার পোপের অফিসের কথা। সেখানে দরজা ভাঙার মত অনেক কিছু আছে। আর কিনা এখানে, সামান্য কাঁচের একটা দরজা ভাঙা যাচ্ছে না!

আবার চিৎকার করল ল্যাংডন। এবারকার শব্দটা আগের চেয়ে অনেক কম শক্তি নিয়ে বেরুল।

তারপর তার মনে পড়ল ওয়াকি-টকিটার কথা। গার্ড সেটাকে ভল্টের বাইরে নামিয়ে রেখেছিল। কোন দুঃখে সেটাকে ল্যাংডন ভিতরে আনেনি সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ল সে। রক্তিম তারা তার চোখের চারধারে নেচে বেড়াতে শুরু করার সাথে সাথে ল্যাংডন মনে মনে জোর আনল। ভাবতে হবে। তুমি আগেও ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলে। সেবার পরিস্থিতি ছিল আরো ভয়ানক। সেটা থেকে বেঁচে গেছ তুমি। সেসময় তুমি ছিলে ছোট্ট এক ছেলে। কিন্তু পথটাকে ঠিক ঠিক বের করতে পারছিলে সে সময়। জোর দিল সে। এবার ভেবে বের কর!

সোজা চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ল সে মেঝেতে। এবার সবার আগে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

রিল্যাক্স, নিজের নিয়ন্ত্রণ আন।

ল্যাংডনের হৃদপিন্ড রক্ত সঞ্চালনের কাজে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসছে। এ পথে সাঁতারুরা তাদের দম বাড়িয়ে নেয়।

এখানে অনেক অনেক বাতাস আছে, বলল সে নিজেকে, অনেক বাতাস। এখন ভাব। পড়ে থাকল মড়ার মত। একটা আশা, কোনক্রমে যদি বাতাস ফিরে আসে। ফিরে আসে কারেন্ট, তাহলেই হল। একটা শীতলতা এগিয়ে আসছে সামনে। কেমন একটা শান্তির ভাব অনুভব করছে সে নিজের পরতে পরতে। যুদ্ধ করল ল্যাংডন এই অনুভূতির বিরুদ্ধে।

তুমি কোন না কোন পথ খুঁজে পাবে। হায় খোদা! কী করে? কোথায়?

তার হাতে, টকটকু করে এগিয়ে চলেছে চিরসুখী মিকিমাউস। যেন নটা তেত্রিশ বাজাটা খুব সুখের একটা ব্যাপার। ফায়ার আসতে আর আধঘণ্টাও বাকি নেই। তার মনে হাজারটা

প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। পাওয়ার অফ করল কে? সার্চের এলাকা কি বাড়িয়েছে রোচার? ওলিভেট্টি কি রোচারকে বলেনি যে আমি এখানে? ল্যাংডন জানে, তা জানানো আর না জানানোর মধ্যে তেমন কোন ফারাক নেই আর।

চোখমুখ গোলা পাকিয়ে, যত বড় সম্ভব তত বড় করে একটা দম নিল ল্যাংডন। প্রতি শ্বাসে আগের চেয়ে একটু করে কমে আসছে স্বস্তির পরশ। তার মাথা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে আসছে। এবার আর সহ্য করা যাবে না। উঠে দাঁড়াতে হবে, উপায় বের করতে হবে।

কাঁচের দেয়াল! বলল সে নিজেকে, কিন্তু মরার দেয়াল অনেক অনেক মোটা!

এখানে কি কোন ফাইল কেবিনেট নেই যেটাকে ফায়ারপ্রুফ করার জন্য ধাতব আকৃতি দেয়া হয়েছে? থাকার কথা। মনে পড়ছে না তার। এমন কিছু পেলে একটা সমঝোতায় আসা যেত নিজের সাথে। দরজা ভাঙার কাজে হাত দেয়া যেত। বর্তমান সময়ে সে কিছুতেই চিন্তাকে একত্রে রাখতে পারছে না।

একজামিনেশন টেবিলের ব্যাপারে কী বলা যায়? ভাবছে সে, প্রতিটা ভল্টেই একটা একজামিনেশন টেবিল থাকবে। একেবারে মধ্যখানে। কিন্তু এখানেও আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। এই মরার টেবিলগুলো এত বেশি ভারি যে একজনে টেনে আনার আশার গুড়ে বালি। কিন্তু যদি নাড়ানো যায়, তবু কিছু কথা থেকে যাবে। কী করে সেটাকে এখানে আনা সম্ভব? স্ট্যাকগুলো একেবারে একত্রে মিলে মিশে আছে। একটার সাথে আরেকটার দূরত্বও অনেক কম। সেটাকে এখানে টেনে আনা সম্ভব হলেও আঘাত করে কাচ ভেঙে ফেলা মুখের কথা নয়।

দুটো স্ট্যাকের মাঝখানের পথ খুব সরু...

হঠাৎ একটা পথ পেয়ে গেল সে।

একলাফে উঠে দাঁড়াল সে। সোজা এগিয়ে গেল স্ট্যাকের দিকে। ধরল একটা বইয়ের গাদা, তারপর নাড়ানোর চেষ্টা করল। কাজ হলে হতেও পারে। কিন্তু সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

যদি একবার এটাকে সরানো যায়! ভাবছে সে। সর্বশক্তি দিয়ে নাড়ানোর চেষ্টা করল। হাঁটু গেড়ে ফুটবল খেলোয়াড়ের মত জোর একত্র করে ধাক্কা দিল সেদিকে। কিন্তু একচুল নড়ল না বিশাল বিশাল বইয়ের বিশাল তাক। একটু কেপে উঠল শুধু। অপরদিকে তার পা পিছলে গেল অনেকটা।

তার আরো শক্তির প্রয়োজন। প্রয়োজন ধৈর্যের।

আরো শক্তি জড়ো করে সে পুনরোদ্যমে কাজে লেগে পড়ল। পিছনের কাঁচের দেয়ালই তার লক্ষ্য। গালাগালি দিতে দিতে ল্যাংডন আবারও স্ট্যাকের চারপাশে ঘুরল, তারপর চোখের লেভেলের সমান সমান জায়গায় বইয়ের ঘাটিটাকে আকড়ে ধরল। তারপর একদিক দিয়ে ধরে সে চেষ্টা করল উপরে ওঠার। তার চারধারে বইয়ের স্তুপ পড়া শুরু করল, অন্ধকারে ভূলুণ্ঠিত হতে লাগল মহামূল্যবান বইয়ের তাল। কিন্তু ....

সে মোটেও কেয়ার করে না। বাঁচার তাগাদা অনেক অনেক বেশি মূল্যবান। এখানে একটা আর্কাইভের কী ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে ভাবার সময় নেই। এবার আর তার চারধারের নিরবতা এবং বাতাসের অভাব কাবু করে ফেলছে না। বরং অন্ধকার কেমন যেন আঘাত হানছে তার গায়ে। কোন পরোয়া না করে সে বই ফেলতে লাগল একাধারে। তারপর অনেক কষ্টে উঠতে পারল উপরের তাকের কাছাকাছি। কেমন একটা আত্মবিশ্বাস কাজ করছে তার ভিতরে।

এখন অথবা কখনো নয়। সাহস দিল সে নিজেকে।

আরো আরো চাপ দিতে থাকল সে বইয়ের তাকটায়। আরো বেশি করে নাড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কাজের কাজ এখনো কিছু হচ্ছে না।

আর মাত্র তিনবার আঘাত হানা হবে। নিজেকে আবার সাহস দিচ্ছে সে। তারপরই কেল্লা

ফতে হয়ে যাবে।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন পড়ল না। দুবার চেষ্টা করতেই সাফল্য ধরা দিল।

প্রথম মুহূর্তে একটা ওজনহীনতার অনুভূতি, তারপর পড়ে যাবার।

এবার সাফল্য ধরা দিল। একটা একটা করে বই পড়ে যাচ্ছে। সে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে একে একে। এগিয়ে চলছে সে আর বইয়ের স্ট্যাক। সামনের দিকে। দেয়ালের দিকে। কাঁচের দেয়ালের দিকে।

এবার অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে স্ট্যাকটা, পরের ধাপকে আঘাত করল। সেটা আঘাত করল তার পরেরটাকে। একটা মুহূর্ত ভয়, তারপর সেগুলোও একে একে পড়তে শুরু করল। আবার পড়ে যাবার অনুভূতি হচ্ছে।

অনেক বড় কোন খেলনার মত একে একে পড়তে শুরু করল স্ট্যাকগুলো। এখনো তার মনে অন্য চিন্তা খেলা করছে, কতগুলো স্ট্যাক আছে? শেষ পর্যন্ত কতটুকু ওজন হবে সবগুলোর? কতটা ভরবেগ নিয়ে সেগুলো আঘাত করবে কাঁচের উপর? কাচটা অনেক মোটা...

এবার আর ধাতব আকৃতির ধাতব আকৃতিকে আঘাত করার আওয়াজ নয়, দূরপ্রান্তে সে শুনতে পেল কাঁচের গায়ে আক্রমণ আসার শব্দ। কেঁপে উঠল সমস্ত ভল্ট। অনেক অনেক ওজন নিয়ে ভল্টের শেষপ্রান্তে হামলে পড়েছে বইয়ের তাকগুলো। কিন্তু হতাশ হতে হল ল্যাঙডনকে।

নিরবতা।

মড়ার মত আবারও পড়ে আছে ল্যাঙডন, দূরপ্রান্তে। তার চোখমুখ বিস্ফারিত। এরচেয়ে বেশি কিছু করার মত মানসিক বা শারীরিক শক্তি অবশিষ্ট নেই।

এরপর শুধুই অপেক্ষার পালা। এক সেকেন্ড, দু সেকেন্ড...

একটু পরে একটু একটু করে ভাঙনের শব্দ পেতে শুরু করল সে। আর কত! এরচেয়ে বেশি কিছু করার নেই। আর শুধু একটু কাঁচ ফাটার শব্দ শুনেই তুষ্ট থাকতে হচ্ছে তাকে! এরপর, যখন সে আশা ছেড়ে দিয়েছে এমন সময় একটা শব্দ উঠল বাইরের দিক থেকে। বোঝা গেল, কিছু একটা ঘটছে। আর কিছু ঘটার আগেই, একেবারে হঠাৎ করে কাঁচে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। ল্যাঙডনের নিচের স্ট্যাকগুলো পড়ে গেল মাটিতে।

মরুভূমির তৃষিত বুকে প্রথম বৃষ্টিপাতের মত শব্দটা কী আনন্দ এনেছে সেটা বলে বোঝানো সম্ভব না ল্যাঙনের পক্ষে।

ত্রিশ সেকেন্ড পরে, ভ্যাটিকান গ্রোভেট্রাসে, ভিট্টোরিয়া দাঁড়িয়ে ছিল একটা লাশের সামনে। এমন সময় নিরবতা ভাঙল একটা ওয়াকিটকি। বলে উঠল সেটা, দিস ইজ রবার্ট ল্যাঙডন, আমার কথা কি কেউ শুনতে পাচ্ছেন?

সাথে সাথে তাকাল ভিট্টোরিয়া, রবার্ট! সে ভেবে পাচ্ছে না কী ব্যাকুলতা ছিল তার। মনে তাকে এখানে পাবার আশায়।

অপ্রস্তুত দৃষ্টি বিনিময় করল দুজন গার্ড। তারপর একজন কোমর থেকে ওয়াকিটকি বের করল, মিস্টার ল্যাঙডন? আপনি চ্যানেল থ্রিতে আছেন। চ্যানেল ওয়ানে কমান্ডার আপনার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমি জানি তিনি চ্যানেল ওয়ানে অপেক্ষা করছেন। ড্যাম ইট! আমি চাই ক্যামারলেনগোকে। এই মুহূর্তে। কেউ কি তার ধারেকাছে আছেন? এই মুহর্তে?

আর্কাইভের বিশ্রী একাকীত্ব আর অন্ধকারে একপাশে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে ল্যাঙডন তার দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। হাতের একপাশে গরম তরলের স্পর্শ তাকে মনে করিয়ে দিল যে কেটে গেছে সেখানটা। রক্তপাত হচ্ছে। বাম হাতে।

সাথে সাথে ক্যামারলেনগোর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল। চমকিত করে দিল ল্যাঙডনকে।

দিস ইজ ক্যামারলেনগো ভেন্ট্রেস্কা। কী হয়েছে?

একটা বাটন প্রেস করার চেষ্টা করল সে। পারল। তারপর বলল, আমার মনে হয় এইমাত্র কেউ একজন আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে।

লাইনে নিরবতা বিরাজ করছে।

একটু থামল ল্যাঙডন। নিজেকে শান্ত করে নিয়ে বলল, আমি এ-ও জানি, পরের হত্যাকান্ডটা কোথায় ঘটতে যাচ্ছে।

এবার যে কণ্ঠটা বাদ সাধল সেটা ক্যামারলেনগোর নয়। কমান্ডার ওলিভেট্টির। মিস্টার ল্যাঙডন, আর একটা অক্ষরও আপনি বলবেন না।

ল্যাঙডনের মিকি মাউস টিকটিক করছে এখনো। কোন বিরাম নেই তার। পার্থক্য একটাই, রক্তে ভেসে গেছে মিকি। এখনো জ্বলছে। নটা একচল্লিশ মিনিট। বেলভেদ্রের কান্ট্রিইয়ার্ড দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে সে। সামনেই সুইস গার্ড সিকিউরিটি সেন্টার। হাতের রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কিন্তু বিকট আকার ধারণ করেছে আঘাতটা। সে এগিয়ে গিয়ে দেখল সবাই হাজির হয়েছে–ওলিভেট্টি, রোভার, ক্যামারলেনগো, ভিট্টোরিয়া, জনা কয়েক গার্ড।

ভিট্টোরিয়া এগিয়ে গেল ল্যাঙডনের দিকে, রবার্ট! তুমি আহত!

কথা বলে ওঠার কোন সময় পেল না সে। চোখের সামনে চলে এল ওলিভেট্টি। মিস্টার ল্যাঙডন, আপনার চোট লেগেছে দেখে আমি দুঃখিত। একই সাথে স্বস্তি পাচ্ছি মোটামুটি ঠিক আছেন তা দেখে। আর্কাইভের ক্রস সিগন্যালের ব্যাপারে আমি সত্যি দুঃখিত।

ক্রস সিগন্যাল? দাবি করল ল্যাঙডন, আপনি ঠিক ঠিক জানতেন

ভুলটা আমার। বলল রোচার। এগিয়ে গেল সে সামনে, একটু বিব্রত দেখাচ্ছে তাকে, একই সাথে সামরিকতার একটা লেশ আছে যেখানে বিব্রতবোধের কোন জায়গা নেই, আমার কোন ধারণাই ছিল না যে আপনি আর্কাইভসের ভিতরে ছিলেন। আমাদের হোয়াইট জোনের ক্রস ওয়্যারে পড়ে গেছে সিক্রেট আর্কাইভস। আমাদের আরো অনেক জায়গায় ব্যাপক সার্চ করার প্রয়োজন পড়ে যায়। আমিই নিজের হাতে সেখানকার পাওয়ার অফ করে দিয়েছি। আমি যদি আগেভাগে জানতে পারতাম...।

রবার্ট! ভিট্টোরিয়া বলল, হাতে আহত হাতটা তুলে নিতে নিতে, পোপকে সত্যি সত্যি পয়জন দেয়া হয়েছিল। ইলুমিনেটি তাকে হত্যা করে।

একটু স্থাণুর মত হয়ে গেছে ল্যাঙডন। সে কথাগুলো শুনতে পায়, কিন্তু তার মর্ম ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। শুধু অনুভব করে ভিট্টোরিয়ার উষ্ণ স্পর্শ।

ক্যামারলেনগো তার পকেট থেকে একটা সিল্কের রুমাল বের করে দেয় যেন সেটা দিয়ে ল্যাঙডন নিজেকে পরিষ্কার করে নিতে পারে। মুখে লোকটা কিছুই বলল না। তার সবুজ চোখে অচেনা আগুনের হল্কা দেখা যাচ্ছে।

রবার্ট, বলল ভিট্টোরিয়া, তুমি বলেছিলে জান কোথায় পরের কার্ডিনালকে হত্যা করা হবে?

আমি জানি। জায়গাটা হল–

না। বাধা দিল ওলিভেট্টি, মিস্টার ল্যাঙডন, আমি যখন আপনাকে ওয়াকিটকিতে আর একটা অক্ষরও না বলতে বলেছিলাম, সেটার পিছনে একটা কারণ ছিল। সে হাত দেখাল আর সব সুইস গার্ডের দিকে, জেন্টলমেন, এক্সকিউজ আস।

সাথে সাথে সব গার্ড চলে গেল সুইস গার্ড সিকিউরিটি সেন্টারে। কোন বাক্যব্যায় করা তাদের রীতিতে নেই।

এবার আর একবার তাকাল সে আর সবার দিকে। আমি বলতে অত্যন্ত দুঃখ পাচ্ছি যে যেহেতু আমাদের হোলি ফাদার খুন হয়েছেন সেহেতু এই দেয়ালের ভিতরেই বিষ দানা বেঁধেছে। সবার কল্যাণের জন্যই আমরা কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমাদের গার্ডদের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য।

তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে কথাগুলো বলতে কত কষ্ট হচ্ছে তার। রোচারের বাদানুবাদে একটু অস্থিরতার চিহ্ন। ভিতরের বেঈমানী প্রমাণ করে....

ইয়েস, বলল ওলিভেট্টি, তোমার সার্চের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে। এখন এটা জুয়া ছাড়া আর কিছু নয়। পাবার আশা এত তাড়াতাড়ি করা যায় না। তবু, একটু বাড়তি নিরাপত্তার জন্য এই সার্চ চলবে।

দেখে মনে হল রোচার কিছু একটা বলতে চায়। তারপর নিজের সাথে বুঝে ফিরে গেল।

বড় করে দম নিল ক্যামারলেনগো। সে এখনো ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। কিম্বা পেরেছে, কিন্তু নিজেকে সামলে উঠতে পারেনি। একটা কথাও বলেনি সে এখন পর্যন্ত।

আর ল্যাঙডন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার ভিতরেও আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে।

কমান্ডার? অবশেষে কথা বলল ক্যামারলেনগো, আমি কনক্লেভ ব্রেক করতে যাচ্ছি। নিজের ঠোঁট চেপে ধরল ওলিভেট্টি, আমি এর বিপরীতে আমার মত দিচ্ছি। এখনো আমাদের হাতে দু ঘণ্টা বিশ মিনিট সময় আছে।

একটা হার্টবিট।

আপনি তাহলে কী করতে চান? কার্ডিনালদের খালি হাতে বের করে আনতে চাইছেন?

আমি এই চার্চকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি সে সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। আমি কীভাবে এগুব সেটা আর আপনার চিন্তার বিষয় নয়।

একটা ঝগড়া বেঁধে যাবার উপক্রম হল ওলিভেট্টির কথায়, আপনি যাই করার চেষ্টা করেন না কেন... থামল সে একটু, আপনাকে থামানোর কোন ক্ষমতা আমাকে দেয়া হয়নি। আমি বলছি, আমার নিজের এ্যাপার্টমেন্টের সুরক্ষার খাতিরে, আপনি আর মিনিট বিশেক... রাত দশটার পর পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। মিস্টার ল্যাঙডনের কথা সত্যি হলে এখনো খুনীকে ধরার একটা সুযোগ আমার থাকছে। এখনো প্রটোকল এবং সৌজন্যবোধ রক্ষার একটা সুযোগ থেকে যাচ্ছে।

সৌজন্য? একটা তিক্ত হাসি কোনমতে ঝুলে পড়ল ক্যামারলেনগোর ঠোঁটে, আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, অনেক আগে থেকেই এখানে আর কিছু নেই।

অবশিষ্ট কিছুই নেই। আছে শুধু যুদ্ধ। এটা এখন স্রেফ একটা যুদ্ধ, কমান্ডান্ট।

একজন গার্ড বেরিয়ে এল ভিতর থেকে, সেও সরাসরি ক্যামারলেনগোর দিকে তাকিয়ে বলল, সিনর, এইমাত্র আমরা সেই বিবিসি রিপোর্টারের খোঁজ পেয়েছি।

মিস্টার গ্লিককে কব্জা করতে পেরেছি।

তাকে আর তার মহিলা ক্যামেরাম্যানকে আমার সামনে হাজির কর। সিস্টিন চ্যাপেলে।

বড় বড় হয়ে গেল ক্যামারলেনগোর চোখ, কী করতে যাচ্ছেন আপনি?

বিশ মিনিট, কমান্ডার, এটুকু সময়ই দিচ্ছি আপনাকে আমি। বলল সে। তারপর সোজা চলে গেল।

ভ্যাটিকান সিটি থেকে যখন ওলিভেট্টির আলফা রোমিও গর্জন তুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন আর তার পিছনে পিছনে আলফা রোমিওর কোন সারি ছিল না। গ্লাভ বক্সে পাওয়া একটা ফার্স্ট এইড কিট থেকে জিনিসপত্র বের করে ল্যাঙডনের হাত বেঁধে দিচ্ছিল ভিট্টোরিয়া সযত্নে, পিছনের সিটে বসে।

সোজা সামনে তাকিয়ে ছিল ওলিভেট্টি, ওকে, মিস্টার ল্যাঙডন, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

এমনকি মাথায় আলো জ্বালিয়ে পুরনো রোমের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে যাওয়া রকেট বেগের গাড়িটাকে খুব বেশি মানুষ ঠিকমত দেখতেও পায়নি। আর সব গাড়িঘোড়া যাচ্ছে বিপরীতে। ভ্যাটিকানের দিকে। যেন রোমের সবচেয়ে বড় দর্শনীয় এলাকা হয়ে উঠেছে ভ্যাটিকান সিটি। যেন এটার চেয়ে আমোদের জায়গা আর কোথাও নেই।

ভেবে পাচ্ছে না ল্যাঙডন, যদি তারা খুনিকে ধরে ফেলতেও পারে, যদি তাকে জ্যান্ত পাওয়া যায়, যদি সব সাফল্য আসে, তবু, অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে। কতক্ষণ আগে ক্যামারলেনগো ভ্যাটিকানের চত্বরে জড়ো হওয়া মানুষের দিকে তাকিয়ে তাদের ঝুঁকিতে থাকার কথা বলেছে? একটা ভুল।

সান্তা মারিয়া ডেলা ভিট্টোরিয়ার দিকে যাবার সময় একবারো ব্রেকে পা দেয়নি কমান্ডার ওলিভেট্টি। ঝড়ের বেগে উড়িয়ে নিয়েছে গাড়িটাকে। আর যে কোন দিন হলে, ঠিক ঠিক জানে ল্যাঙডন, তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যেত, কাপত হাঁটু। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। আজ তার মনে হচ্ছে তার উপর কেউ অজ্ঞান করার ওষুধ প্রয়োগ করেছে।

মাথার উপর সাইরেন বাজিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। মনে মনে একটা আশা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সান্তা মারিয়া ডেলা ভিট্টোরিয়ার কাছাকাছি পৌঁছানর পর তাদের এই শব্দ করার অভ্যাসটা কেটে যাবে।

এতক্ষণে তার মনে উদয় হচ্ছে পোপের হত্যাকান্ডের ব্যাপারটা। কথাটাকে কোনমতেই মেনে নেয়া সম্ভব নয়। আবার এটা যে সত্যি তাও প্রমাণিত হয়েছে। ব্যাপারটা এমন নয় যে আর কোনদিন কোন পোপকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়নি। এমন ব্যাপার রোজ ঘটছে। কোন পোপ নিহত হননি এমনও নয়। কিন্তু ইলুমিনেটির হাত যে এত লম্বা সেটা আগেভাগে ভেবে রাখতে পারেনি কেউ। সমস্যাটা বেঁধে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে। পোপ সেলেস্টিন পঞ্চম নিহত হয়েছিলেন তার অগ্রগামী অষ্টম বোনিফেসের হাতে। ভ্যাটিকানে এক্স রে আনার অনুমতি দেয়ার পর দেখা যায় বেশিরভাগ পোপের টম্বই পরীক্ষা করা হচ্ছে। তার হাড়ের উপর পরীক্ষা করার সময় একটা আশা ছিল সবার, কোন না কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে, হাড়গোড় হয়ত ভাঙা থাকবে। কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে প্রমাণিত হয় যে তার খুলিতে একটা দশ ইঞ্চি গভীর ক্ষত ছিল।

কয়েক বছর আগে তার কাছে আসা একাধারে কয়েকটা আক্রমণের কথা তার মনে পড়ে যায়। প্রথমে আর্টিকেলগুলোকে মোটেও পাত্তা দেয়নি সে। সোজা হার্ভার্ডের আর্কাইভে ধর্ণা দিয়েছে এগুলোর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য। সে অবাক হয়ে দেখতে পায়, সত্যি সেগুলো অথেন্টিক। আর কী, সাথে সাথে সেগুলোকে নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেয়া হয় একথা জানানোর জন্য, এমনকি বড় বড় সংবাদ মাধ্যমগুলোও মাঝে মাঝে ঘোলা জলে খাবি খায়। ইলুমিনেটির জুজুবুড়ির কাহিনীতে ডুবে যায়। তার মনে পড়ে যায় অনেকগুলো কাহিনী। অনেকগুলো রিপোর্ট ছিল।

দ্য ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন
জুন, চৌদ্দ, উনিশো আটানব্বই

পোপ প্রথম জন পল, যিনি উনিশো আটাত্তরে মারা যান, পিটু মেসনিক লজের বাঁধনে জড়িয়ে পড়েন তিনি... পিটু সিক্রেট সোসাইটি তার উপর হামলে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয় যখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে আমেরিকান আর্চবিশপ পল মার্সিনকাসকে ভ্যাটিকান ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। ব্যাঙ্কটা অন্ধকারে মেসনিক লজের সাথে লেনদেন করত...

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস
আগস্ট, চর্বিশ, উনিশো আটানব্বই

কেন মৃত পোপ প্রথম জন পল তার বিছানাতেই দিনের বেলা ব্যাবহার করার শার্ট পরে

ছিলেন? প্রশ্নগুলো সেখানেই থেমে নেই। কোন মেডিক্যাল ইনভেস্টিগেশন করা হয়নি। কার্ডিনাল ভিলট একটা বাধা দেন এই বলে যে কোন পোপের কোনকালে মৃত্যুর পর ময়নাতদন্ত করা হয়নি। আর জন পলের ওষুধগুলো তার বিছানার পাশ থেকে হাপিস হয়ে যায়। হাপিস হয়ে যায় তার গ্লাস, শেষ ইচ্ছা, শেষ পত্র।

লন্ডন ডেইলি মেইল
আগস্ট, সাতাশ, উনিশো আটানব্বই

...একটা চক্রান্ত চলছে। ভিতরে আছে শক্তিমান এবং অবৈধ এক দল। তারা মেসনিক। ছড়াচ্ছে ভ্যাটিকানের ভিতরেই।

ভিট্টোরিয়ার পকেটের সেলুলারে রিঙ হচ্ছে। ল্যাঙডনের মন থেকে চিন্তাগুলো হাপিস হয়ে যাওয়ায় সে যার পর নাই খুশি।

জবাব দিল ভিট্টোরিয়া। তার আগেই দেখে নিয়েছে কলার কে। ল্যাঙডন ফোনের ভিতরের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে কয়েক ফুট দূর থেকেই।

ভিট্টোরিয়া? ম্যাক্সিমিলিয়ান কোহলার বলছি। এখনো এন্টিম্যাটারটা পাওয়া যায়নি?

ম্যাক্স? ঠিক আছেনতো আপনি?

খবর দেখেছি। সেখানে সার্ন বা এন্টিম্যাটারের নাম-গন্ধ নেই। ভালই। কী হচ্ছে চারপাশে?

এখনো আমরা ক্যানিস্টার খুঁজে পাইনি। পরিস্থিতি ক্রমেই আরো জটিল আকার ধারণ করছে। রবার্ট ল্যাঙডন না থাকলে কী হত কে জানে। কার্ডিনালদের খুন করার লোকটাকে খুঁজে বের করার কাজে লেগেছি আমরা। এখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

মিস ভেট্রা, শীতল কণ্ঠ ওলিভেট্টির, আপনি অনেক বলেছেন।

বিরক্ত হল ভিট্টোরিয়া, কমান্ডার, কথা বলছেন সার্নের প্রেসিডেন্ট। অবশ্যই তার একটা অধিকার আছে।

তার একটা অধিকার আছে, কথার মাঝখানে বাঁধা দিল ওলিভেট্টি, এখানে থেকে এ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার অধিকার আছে। আপনারা একটা ওপেন সেলুলার লাইনে আছেন। সে তুলনায় যা বলা হয়েছে তাই যথেষ্ট।

বড় করে একটা শ্বাস নিল ভিট্টোরিয়া, ম্যাক্স?

তোমার জন্য আমার কাছে কিছু খবর আছে, বলল ম্যাক্স, তোমার বাবার ব্যাপারে... আমি সম্ভবত জানতে পারব কাকে কাকে তিনি এন্টিম্যাটারের ব্যাপারটা বলেছেন।

ভিট্টোরিয়ার সারা মুখে আঁধারের ছায়া পড়ল, স্যার, আমার বাবা আমাকে বলেছেন যে কাউকে জানানো হচ্ছে না ব্যাপারটা।

ভয় হচ্ছে, ভিট্টোরিয়া, তোমার বাবা কাউকে না কাউকে বলেছেন সেটার কথা। কিছু সিকিউরিটি রেকর্ড খতিয়ে দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে জলের মত। আমি নিয়মিত যোগাযোগ রাখব।

বন্ধ হয়ে গেল লাইন।

পকেটে ফোনটা রাখার সময় ভিট্টোরিয়াকে মোমের পুতুলের মত দেখাল।

ঠিক আছতো? জিজ্ঞেস করল ল্যাঙডন।

নড করল ভিট্টোরিয়া। তার কাঁপতে থাকা আঙুল অন্য কথা বলছে।

চার্চটা আছে পিয়াজ্জা বার্বারিনিতে। বলল ওলিভেট্টি, সাইরেনের গলা টিপে ধরে সেটাকে বধ করে হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখতে দেখতে, আমাদের হাতে সময় মাত্র ন মিনিট।

দূরে কোথাও চার্চের ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে। সেইসাথে কোন এক অচেনা কথা গোত্তা দিচ্ছে তার মনের ভিতরে। পিয়াজ্জা বাবারিনি। এ নামটার সাথে কীভাবে পরিচিত ল্যাঙডন? হিসাব

মিলছে না। এবার বোঝা গেল। পিয়াজ্জা আসলে একটা সাবওয়ে লাইনের স্টেশন।

মনে পড়ছে, বছর বিশেক আগে যখন নিচ দিয়ে ট্রেন লাইন বানানোর কথা তখন আর্ট হিস্টোরিয়ানরা হৈ চৈ করে দুনিয়া মাথায় তুলছিল। তারা বলছিল সমস্বরে, যদি, সত্যি সত্যি লাইনটা খোদাই করা হয় তাহলে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। পিয়াজ্জার কেন্দ্রে অবস্থিত কয়েক টনের ওবেলিস্ক নড়ে যেতে পারে। নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। সিটি প্ল্যানাররা কূল রাখি না শ্যাম রাখি অবস্থায় পড়ে যায়। তারা না পেরে অবশেষে ওবেলিস্কটা সরিয়ে সেখানে ট্রাইটন নামের ছোট একটা ঝর্ণা বসিয়ে দেয়।

বার্নিনির দিনগুলোয়, কল্পনার চোখে দেখে নিল ল্যাঙডন, পিয়াজ্জা বার্বারিনিতে একটা ওবেলিস্ক ছিল! এটাই সেই স্থাপত্য কিনা কে জানে!

পিয়াজ্জা থেকে এক ব্লক দূরে ওলিভেট্টি একটা গলি ধরল। গুলির মত গাড়ীটাকে চালিয়ে নিয়ে চট করে দাঁড়িয়ে যায় একটা জায়গায়। সে খুলে ফেলল তার ভদ্রোচিত স্যুটটাকে, গুটিয়ে নিল আস্তিন, তারপর একহাতে লোড করল গানটাকে।

আপনাদের দুজনকে কেউ চিনে ফেলুক সে ঝুঁকি আমরা নিতে পারব না। আপনারা দুজনেই টিভিতে এসেছেন। আপনারা পিয়াজ্জা ধরে এগুবেন। আলাদা আলাদা। যেন দেখা না যায়। আমি যাচ্ছি পিছন দিয়ে।

সে একটা পিস্তল তুলে দিল ল্যাঙডনের হাতে, বিশেষ প্রয়োজন পড়লে।

কোনক্রমে তুলে নিল সেটাকে ল্যাঙডন। আজকে দ্বিতীয়বারের মত সে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে নিল। তারপর নিশ্চিন্তে সেটাকে চালান করে দিল বুক পকেটে। এবং একই সাথে আবারও তার মনে পড়ে গেল গ্যালিলিওর ডায়াগ্রামা ফোলিওটা এখনো সেখানে চুপ মেরে পড়ে আছে। সে ভেবে পেল না কেন তখন সেটাকে সেখানে ফেলে চলে আসেনি!

অনেক ঝামেলা পাকিয়ে এসেছে সে আর্কাইভে। প্রথমত, ডায়াগ্রামাকে সেখানে ফেলে আসা হয়নি। সেটা এখন এক অর্থে নিখোঁজ। আবার তার উপর সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা ভ্যাটিকানের সম্পদের খতিয়ানকে উল্টে পাল্টে বিনাশ করেছে। ফেলে দিয়েছে স্ট্যাকগুলো। নষ্ট করেছে একটা কাচের ভল্ট এবং, কিউরেটরের কপালে অনেক অনেক ভোগান্তি আছে... যদি আজ রাতটা কোনক্রমে টিকে যায় ভ্যাটিকান, তাহলে...।

গাড়ি থেকে বের হল ওলিভেট্টি, পিয়াজ্জায় ঐপথে যাওয়া যায়। চোখকান খোলা রাখুন। আর খেয়াল রাখুন যেন আপনাদের কেউ চিনে না ফেলে। তারপর সে ভিট্টোরিয়ার দিকে তাকিয়ে নিজের সেলফোনটা তুলে আনল, মিস ভেট্রা, চলুন আমরা আরেকবার আমাদের অটো ডায়াল চেক করে নিই।

প্যান্থিয়নে সে আর ওলিভেট্টি যেভাবে অটো ডায়াল নাম্বারটা বসিয়েছিল সেভাবে আরেকবার চেক করে দেখল ভিট্টোরিয়া। ওলিভেট্টির বেল্টের ফোনটা ভাইব্রেট করল তার বেল্টে থেকেই। কোন শব্দ তুলল না। সাইলেন্ট মোডে আছে তার সেল।

তুষ্ট দেখাল ওলিভেট্টিকে, গুড, আশা করি আপনি যদি বেখাপ্পা কিছু দেখেন তাহলে আমাকে জানাবেন। সে তার আগ্নেয়াস্ত্র কক করল, আমি ভিতরে অপেক্ষা করব। এবারের দানটা আমার।

একই মুহূর্তে, আরেক কোণায় আরেকটা ফোন বেজে উঠল। সাইলেন্ট এ্যালার্টে।

জবাব দিল, হ্যাসাসিন স্পিক।

আমি বলছি, বলল অপরপ্রান্ত, জ্যানাস।

হাসল হ্যাসাসিন, হ্যালো, মাস্টার।

তোমার পজিশন কীভাবে যেন জানাজানি হয়ে গেছে। কেউ না কেউ আসছে তোমাকে ধরার জন্য।

বেশি দেরি করে ফেলেছে তারা। আমি এর মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে বসেছি।

ভাল। জীবিত বেরিয়ে এসো। আরো অনেক কাজ করতে হবে।

আমার পথে যারা বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে, স্রেফ মারা পড়বে।

তোমার পথে যারা বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে তারা গোণায় ধরার মত লোক।

আপনি কি কোন আমেরিকান স্কলারের কথা বলছেন?

তার কথাও জান তুমি?

মুখ ভেংচে হাসল হ্যাসাসিন, ঠান্ডা মস্তিষ্কের, কিন্তু সেকেলে। সে আগেই আমার সাথে ফোনে কথা বলেছে। তার সাথে আরেক মহিলা আছে, তার চরিত্র আবার একেবারে বিপরীত।

থামল খুনি! সে আবার মনে মনে স্বাদ নিল লিওনার্দো ভেট্রার মেয়ের তেজদীপ্ত কথার।

লাইন এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। তার সেই জ্যানাস কর্তা হয়ত নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে। অবশেষে কথা বেরুল মাস্টারের কণ্ঠ চিরে, মেরে ফেল তাদের, যদি প্রয়োজন মনে কর।

হাসল আবার হ্যাসাসিন, অন্ধকারের হাসি, ধরে রাখুন কর্ম সারা। তার মনটা কী করে যেন একটা বিচিত্র তৃপ্তি পাচ্ছে। আমি অবশ্য মেয়েটাকে রেখে দিতে পারি একটা বাড়তি উপহার হিসাবে....

সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ছে।

পিয়াজ্জায় সবাই দৌড়াদৌড়ি করছে আলুথালু বেশে। এগিয়ে আসছে মিডিয়া ভ্যানগুলো ক্ষুধার্ত হায়েনার মত দল বেঁধে। হাজারটা বিচিত্র আর শক্তিশালী যন্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে রিপোর্টারের দল, যেমন করে প্রস্তুতি নেয় সেনাবাহিনী। তারা সবাই স্কোয়ারের সামনের সারিতে জায়গা পাবার আশায় পাগল হয়ে গেছে। হাতে তাদের নানা প্রকার আর আকারের যন্ত্র। কিন্তু কম যায় না কেউ। সবার কাছেই আছে বিজ্ঞানের সর্বশেষ আশীর্বাদ, ফ্ল্যাট স্ক্রিন।

এগুলো অনেক কাজে লাগে। সাজানো থাকে ভ্যানের উপরে বা লাগানো থাকে পোর্টেবল কোন যন্ত্রের সাথে। হরেক কাজে লাগার মধ্যে অন্যতম হল, ভ্যানের সামনে তাদের নেটওয়ার্কের নাম লাগানো থাকবে, কখনো সেটা বাদ দিয়ে ভিডিও প্রচার করা হবে সেখানে, এ্যাড যাবে তাদের নেটওয়ার্কের কিম্বা রিপোর্টার এবং ভিডিওগ্রাফার কী করছে সেসবও জানানো চলে। সেগুলোকে জায়গামতই বসানো হয়। ভ্যানের সামনে। বলা চলে প্রতিদ্বন্দী দলগুলোর সামনে নিজেদের ক্ষমতা জাহির না করে তারা থাকতে জানে না।

স্কোয়ারের অবস্থা শোচনীয়। প্রথমেই ভিড় করল মিডিয়া ভ্যানগুলো। তার সাথে আছে ভ্যান বিহীন খুচরা সাংবাদিক, ফ্রি-ল্যান্সার, আগ্রহী মানুষ আর খবর সরাসরি শুনতে চাওয়া লোকজন। এলাকাটা একেবারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কারখানায় পরিণত হল।

শত গজ দূরে, সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার মোটা দেয়ালের ভিতরে, পৃথিবী একেবারে শান্ত। লেফটেন্যান্ট চার্ট্রান্ড আর তিনজন গার্ড অন্ধকারের ভিতরে এগিয়ে চলছে। চোখে তাদের ইনফ্রারেড গগলস, হাতে ডিটেক্টর। দুলে চলেছে সেটা এখান থেকে সেখানে। ভ্যাটিকান সিটির যেসব অঞ্চলে সাধারণ মানুষ চলাচল করতে পারে এমন সব জায়গার সার্চ শেষ, কোন সুফল বয়ে আনেনি সে কাজ।

এখানে গগলস খুলে ফেললেই ভাল, সিনিয়র গার্ড বলল।

চার্ট্রান্ড এর মধ্যেই কাজটা করে ফেলেছে। নিসে অব প্যালিয়ন্সে তারা প্রবেশ করেছে– ব্যাসিলিকার ডুবে থাকা এলাকায়। এখানে আলো আনা হয় নিরানব্বইটা তেলের বাতি দিয়ে। ফলে এখানে ইনফ্রারেড যে আলো আসবে সেটা ধাঁধিয়ে দেবে চোখ।

ভারি গগলস চোখ থেকে খুলে ফেলে বেশ তৃপ্ত বোধ করছে চার্ট্রান্ড। সে তার ঘাড়ের একটু ব্যায়াম করে নেয় এলাকায় প্রবেশের আগে। ঘরের সৌন্দর্য অনিন্দ্য... সোনালি এবং দীপ্তিময়। এর আগে সে এখানে কখনো আসেনি।

ভ্যাটিকানে প্রবেশের পর থেকে প্রতিনিয়ত, প্রতিদিন সে নতুন কিছু না কিছু শিখেছে। জানতে পেরেছে ভ্যাটিকানের নতুন নতুন গুপ্ত রহস্য। তেলের বাতিগুলো সেসবের অন্তর্ভুক্ত। সব সময় এখানে ঠিক নিরানব্বইটা বাতি জ্বলতে থাকে। এটাই ঐতিহ্য। ক্লার্জি নিয়মিত এখানে সংগোপনে তেল দিয়ে যায়। গোপনীয় তৈল। বলা হয় এই বাতিগুলো জ্বলছে আদ্যিকাল থেকে, জ্বলবে সময়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত।

অথবা আজ মধ্যরাত পর্যন্ত, নিজেকেই শোনাল সে ফিসফিস করে।

চার্ট্রান্ড তেলের বাতিগুলোর উপর দিয়ে তার ডিটেক্টর চালাল। এখানে কিছুই লুকানো নেই। তার তেমন কোন দ্বিধা নেই। জানে সে ভাল করেই। ক্যানিস্টারটা লুকানো আছে ছায়াময় কোন স্থানে। অন্তত ভিডিও ফুটেজ সে কথাই বলে।

সে নিসের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মেঝেতে একটা মোটামুটি অতিকায় গর্ত দেখতে পায়। ঢাকা। সরাসরি নিচের দিকে সেটার সিঁড়ি চলে গেছে। এখানকার কত গল্প শুনেছে সে! ভাগ্য ভাল, সেখানে যাবার প্রয়োজন পড়ছে না। রোচার সুস্পষ্ট আদেশ দিয়েছে। শুধুমাত্র পাবলিক এক্সেসগুলোতে ঢুঁ মার। হোয়াইট জোনের কথা ভুলে যাও।

গন্ধ কিসের! বলল সে। একটা অসহ্য মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে আছে আশপাশে।

বাতিগুলো থেকে যে বাষ্প উঠে আসে সেটার গন্ধ। বলল একজন।

অবাক হল চার্ট্রান্ড, গন্ধ পেয়ে তো মনে হচ্ছে কেরোসিন থেকে আসছে না। এটা কলোজেনের গন্ধ।

তেলটা কেরোসিন নয়। পাপাল এরিয়ার কাছাকাছি অবস্থিত বাতিগুলো। তাই সেগুলোতে কেরোসিন দেয়া হয় না। বদলে দেয়া হয় একটা মিশ্রণ। ইথানল, শুগার, বিউটান, পারফিউম।

বিউটান?

নড করল গার্ড, ঠিক তাই। সুঘ্রাণ স্বর্গীয়, জ্বলে নরকের মত।

ওয়াকিটকি বন্ধ হয়ে যাবার সময়টায় গার্ডরা প্যালিয়াম সার্চ করা শেষ করে হাত বাড়িয়েছে ব্যাসিলিকার আর সব জায়গায়।

তারপর একটা আপডেট পেয়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ে প্রহরীরা।

একটা আহত করে দেয়ার মত সংবাদ। ক্যামারলেনগো নিয়ম ভঙ্গ করার প্রতিজ্ঞা করেছে। সে এগিয়ে গিয়ে কনাক্লেভে প্রবেশ করবে। তারপর কথা বলবে কার্ডিনালদের সাথে। এমন কোন ঘটনা ঘটেনি ইতিহাসে কখনো। একই সাথে টের পায় চার্ট্রান্ড, আসলে এর আগে কখনো পারমাণবিক বোমার উপর বসে ছিল না ভ্যাটিকান।

ভেবে একটু স্বস্তি পায় চার্ট্রান্ড যে, ক্যামারলেনগো দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছে। ভ্যাটিকান সিটির ভিতরে ক্যামারলেনগোই সেই লোক যার জন্য চার্ট্রান্ড এত সম্মান পাচ্ছে। সবাই জানে, চারদেয়ালের মধ্যে ঈশ্বরভক্ত এমন আর একটা লোকও নেই। নমনীয়, সৎ, নিবেদিতপ্রাণ। এক কথায়, আদর্শ। আবার সবাই এ-ও জানে, যদি কখনো ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হয়, সবার আগে যে এগিয়ে যাবে তার নাম ভেন্ট্রেস্কা, ক্যামারলেনগো ভেন্ট্রেস্কা।

গত সপ্তাহখানেক ধরে ক্যামারলেনগোর অন্যরূপ দেখতে পাচ্ছে ভ্যাটিকান সুইস গার্ড। আর তারা একমত হয়েছে, কাজের ক্ষেত্রে সে পাথর-কঠিন। একটু রাফ। তার সবুজ চোখের এত দীপ্তি আগে কখনো ধরা পড়েনি। সবাই এক কথায় মেনে নেয়, ক্যামারলেনগো শুধু কনক্লেভের কাজে দক্ষতার পরিচয় প্রকাশ করেনি, একই সাথে ঢেকে রেখেছে তার সত্যিকার পালক পিতার জন্য মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা শোক। পোপের জন্য শোক।

এখানে আশার কয়েক মাস পরে চার্ট্রান্ড জানতে পারে ক্যামারলেনগোর কাহিনী। তার চোখের সামনে টম্বে তার মায়ের প্রাণ হারানোর কথা। চার্চের ভিতরে কোন টম্ব,.. এবং একই ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে আবার। দুঃখজনক হলেও সত্যি, বোমা বিস্ফোরণের জন্য দায়ী বেজন্মাটাকে ধরার কোন উপায় পায়নি গির্জা। তারা বলেছে, সম্ভবত খ্রিস্টবাদের কোন শত্রুর কাজ এটা, এমন কোন গ্রুপের কাজ... তারপর চুপ মেরে গেছে। কোন সন্দেহ নেই, জীবনের শিক্ষাগুলো, খ্রিস্টবাদের শিক্ষাগুলো আর সবার চেয়ে বেশি হারে, বেশি বাস্তবতা দিয়ে শিখতে পেরেছে ক্যামারলেনগো।

মাস কয়েক আগে, চার্ট্রান্ড একবার উঠোন পেরিয়ে যাবার সময় ক্যামারলেনগোর মুখোমুখি পড়ে যায়। ক্যামারলেনগো সাথে সাথে চিনে ফেলে নবীন সুইস গার্ডকে। ডেকে নেয় তাকে, তার সাথে একটু সময় কাটানোর জন্য। তারা কোন ব্যাপারে গুরুগম্ভীর আলোচনা করেনি অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু তাদের সেই হাল্কা আলাপচারিতায় চার্ট্রান্ড বেশ স্বস্তি বোধ করে। মুহূর্তে ভ্যাটিকানকে তার আপন বলে মনে হয়।

ফাদার, বলেছিল চার্ট্রান্ড, আমি কি আপনাকে একটা কিম্ভুত প্রশ্ন করতে পারি?

হেসেছিল ক্যামারলেনগো, স্বর্গীয় হাসি, তখনই, যখন আপনাকে আমি একটা বিচিত্র উত্তর দিতে পারব।

হাসল চার্ট্রান্ড, আমি আজ পর্যন্ত যত প্রিস্টের মুখোমুখি পড়েছি, প্রশ্ন করেছি সবাইকে। কেউ জবাবটা ঠিক ঠিক দিতে পারেননি।

কোন ব্যাপারটা আপনাকে বিরক্ত করছে? পথ দেখিয়ে দিতে দিতে বলেছিল

ক্যামারলেনগো, তার ফ্রক সামনে সামনে দুলছিল হাটার চালে চালে। কালো জুতা এগিয়ে যাচ্ছিল সামনে সামনে। চার্ট্রান্ড বুঝতে পারছিল, লোকটা আধুনিক, কিন্তু প্রাচীণত্বের কোন কণা ছেড়ে দেয়নি,...

বড় করে দম নিল চার্ট্রান্ড, আমি এই ওমনিপটেন্ট-বেনিভোলেন্ট ব্যাপার স্যাপার গুলো বুঝি না।

ম্লান একটা হাসি ঝুলল ক্যামারলেনগোর ঠোঁটে, আপনি স্ক্রিপচার পড়েন?

চেষ্টা করি।

পবিত্র লেখা, গোপনীয় লেখা পড়ার চেষ্টা করেন?

হুঁ।

আপনি দ্বিধায় আছেন কারণ বাইবেল ঈশ্বরকে ওমনিপটেন্ট-বেনিভোলেন্ট হিসাবে আখ্যায়িত করে?

ঠিক তাই।

ওমনিপটেন্ট মানে অত্যন্ত ক্ষমতাবান, সর্বশক্তিমান। বেনিভেলেন্টের অর্থ একটু কঠিন। সহজ কথায়, নিস্পাপ, সরল... ঠিক কথায় বোঝানো যাবে না।

আচ্ছা!

ওমনিপটেন্ট-বেনিভোলেন্ট মানে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং সর্বকল্যাণময়তার অধিকারী।

আমি ধারণাটার মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারি। ব্যাপারটা... দেখে মনে হয় একটু বৈপরীত্য আছে কোথাও।

ঠিক তাই। আসলে দ্বন্দটা অন্য কোথাও। ব্যাথা। মানুষ তাহলে কেন খারাপ কাজ করে, কেন যুদ্ধ হয়, রোগ কেন আসে...

একজাক্টলি! চার্ট্রান্ড জানত ঠিক ঠিক ধরতে পারবে ক্যামারলেনগো, কত ভয়ানক ব্যাপার প্রতিনিয়ত ঘটছে এই পৃথিবীতে! মানুষের ভোগান্তি দেখে বারবার একটা কথাই মনে হয়, একই সাথে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান এবং সর্বকল্যাণময় হওয়ার মধ্যে কোথাও ফাঁক আছে। যদি তিনি আমাদের ভালবাসেন এবং আমাদের সমস্ত কল্যাণের চিন্তাই থাকে তার মধ্যে, আর যদি সর্বশক্তিমানই হয়ে থাকেন, সব কাজে হাত দেয়ার ক্ষমতা থাকে কল্যাণের চিন্তার সাথে, তাহলে আমাদের সমস্ত দুঃখ আর জ্বরা তিনি মুহূর্তেই নষ্ট করে দিতেন। পারতেন না কি?

ক্যামারলেনগো বলল সাথে সাথে, পারতেন, কিন্তু করতেন কি?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায় চার্ট্রান্ড, সে কি তার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে? এটা কি এমন কোন ধর্মীয় প্রশ্ন যা উপস্থাপিত করার মধ্যে পাপ আছে, আছে নিষেধাজ্ঞা? যাক... যদি ঈশ্বর আমাদের ভালবেসেই থাকেন, আর তিনি আমাদের রক্ষা করতে জানেন, তার অবশ্যই এমন কিছু করার কথা। তাই বোঝা যায়, তিনি হয় সর্বশক্তিমান কিন্তু কেয়ার করেন না, অথবা প্রেমময় কিন্তু পরিস্থিতিতে হাত দেয়ার মত শক্তি তার নেই।

আপনার কি সন্তান আছে, লেফটেন্যান্ট?

না, সিনর।

কল্পনা করে নিন, আপনার একজন আটবছর বয়েসি ছেলে আছে... আপনি কি তাকে ভালবাসবেন?

অবশ্যই।

আপনি কি তার জীবন থেকে সমস্ত দুঃখ আর ভোগান্তি দূর করার চেষ্টা করবেন?

অবশ্যই।

আপনি কি তাকে স্কেটবোর্ড কিনে দেবেন?

এবার একটু দ্বিধায় পড়ে যায় চার্ট্রান্ড। বুঝতে পারছে সে, আশপাশ থেকে খুব আলতো করে একটা জাল তার চারধারে ছড়িয়ে দিয়ে সেটাকে কাছিয়ে আনা হচ্ছে। ক্যামারলেনগোর সব কাজ কারবার দেখলেই বোঝা যায় লোকটা একান দক্ষ ধার্মিক, ধর্মীয় মানুষ। আসলেই।

আমি তাকে একটা স্কেটবোর্ড কিনে দিতাম, একই সাথে সাবধানে থাকতে বলতাম সব সময়।

তাহলে, এই ছোট্ট ছেলেটার পিতা হিসাবে আপনি তাকে কিছু বেসিক দেবেন। তারপর তাকে নিজের মত চলতে দিয়ে ভুল করতে দেবেন, তাই না?

আমি তার পিছনে সত্যি সত্যি সর্বক্ষণ ছুটতাম না। আপনি যদি সে কথাই বলে থাকেন,..

কিন্তু যদি সে পড়ে যায়, তারপর ব্যাথা পায় হাঁটুতে?

সে আরো বেশি কেয়ারফুল হতে শিখবে।

হাসল ক্যামারলেনগো, একটা নির্মল হাসি, যদিও আপনার সে ক্ষমতা থাকে, ছেলেকে আগলে রাখার ক্ষমতা, তবু আপনি তা করবেন না অষ্টপ্রহর। তার নিজের শিক্ষা নিজেকে নিতে দিতে বেশি ইচ্ছুক থাকবেন, তাই না?

অবশ্যই, ব্যথা বেড়ে ওঠার অঙ্গ।

আবার হাসল ক্যামারলেনগো, আমরা সবাই যতদিন দুনিয়ায় থাকছি, বেড়ে উঠছি। তারপর এক সময় সেই শিক্ষা নেয়ার দিন শেষ হবে। তখন আমরা থাকব স্বর্গে, সেখানে কিন্তু জ্বরা নেই। দুঃখ নেই। কিন্তু এই বেড়ে ওঠার সময়টাতে ঈশ্বর চান আমরা যেন নিজেরা শিখে নিতে পারি।

৯০

ল্যাঙডন আর ভিট্টোরিয়া পশ্চিম কোণা ধরে পিয়াজ্জার দিকে এগিয়ে গেল। তাদের বিপরীত দিকে চার্চ অবস্থিত। দেখতে পেল তারা অবাক হয়ে, চত্বরে কেউ নেই। লোকজন সব হাপিস হয়ে গেছে। নেই কোন জনমনুষ্যের ছোয়া আশপাশে। উপরের ভবনগুলোর দিকে তাকিয়ে টিভির আলো ঠিকরে বেরুতে দেখে ঠিক ঠিক তারা বুঝে নেয় কোথায় হাওয়া হয়ে গেল লোকজন সব।

... ভ্যাটিকান এখনো কোন মন্তব্য করেনি... ইলুমিনেটি দুজন কার্ডিনালকে হত্যা করেছে... রোমে শয়তানের ছায়া... পরের তথ্য খুব দ্রুত জানানো হবে সার্বক্ষণিকভাবে...।

রাতটা হাল্কা শীতের। যেন ঠান্ডা তাদের শীতল অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

সম্রাট নিরো তার প্রিয় শহরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যেভাবে বসে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিল সেভাবেই যেন বসে আছে ভ্যাটিকান। আর সংবাদটা ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসের বেগে, নিরোর লাগানো আগুনের মত। হতবাক হয়ে পড়েছে রোম, থমকে গেছে পুরো বিশ্ব।

ভেবে কুল পায় না সে, এই এক্সপ্রেস ট্রেনকে থামানোর উপায় আছে কি কোন! কে জানে!

আশপাশের আধুনিক ভবনের মাঝখানেও পিয়াজ্জা এখনো মধ্যযুগকে হারিয়ে যেতে দেয়নি। এখনো সেখানে প্রাচীণত্বের ছায়া। আধুনিকতার প্রমাণস্বরূপ, উপরে, অনেক উপরে একটা নিয়ন সাইন জ্বলজ্বল করছে। বিরাট, বিলাসবহুল এক হোটেলের চিহ্ন সেটা। ভিট্টোরিয়া আগেই ল্যাঙডনকে সেটা দেখিয়েছে।

হোটেল বার্নিনি

দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি, বলল ভিট্টোরিয়া, তার বিড়ালচোখ সারা চত্বর সার্চ করছে সতর্কভাবে। কথাটা শেষ করার পর পরই মেয়েটা তার হাত সরিয়ে নেয়। টেনে নেয় একটা অন্ধকার কোণায়। পিয়াজ্জার কেন্দ্রস্থলে কেমন এক নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে।

ল্যাঙডন তার দৃষ্টি অনুসরণ করল। তারপর জমে গেল ঘটনা দেখে।

তাদের ক্রস করে দুটো অবয়ব এগিয়ে গেল সামনে। কালো অবয়ব। দুজনের পরনেই গা ঢাকা আলখাল্লা, মাথা ঢেকে আছে হুডে। ক্যাথলিক বিধবাদের পোশাক। ধরে নিতে পারত ল্যাঙডন, তারা মহিলা। কি এখান থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। একজন, অসুস্থের মত এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। অন্যজন, দেখলে বোঝা যায়, একটু বেশি শক্তিমান, সাহায্য করছে তাকে।

আমাকে গানটা দাও। দাবি করল ভিট্টোরিয়া।

তুমি আন্দাজের উপরে–

বিড়ালের মত প্রায় তরলভাবে সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। তারপর বের করে আনল পিস্তলটা। তারপর, যেন হাওয়ায় ভর করে, তার পা এগিয়ে চলল তাদের দিকে। একেবারে নিঃশব্দে। ছায়ায় ছায়ায়। তাদের পিছনদিকে।

এক মুহূর্ত থমকে থাকল ল্যাঙডন। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে এগিয়ে চলল পিছনে পিছনে।

মানুষ দুজন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। আর তারপর মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড লাগল ল্যাঙডন আর ভিট্টোরিয়ার তাদের পিছনে যেতে। সে যেন এখনো উড়ে উড়ে যাচ্ছে পিছনে পিছনে। একটুও শব্দ উঠছে না পা ফেলার। তার সাথে তাল মিলিয়ে যেতে যেতে গলদঘর্ম হল ল্যাঙডন। তার পা যখন একটা নুড়িকে আঘাত করে একটু শব্দ করল তখন কটমট করে তার দিকে তাকাল ভিট্টোরিয়া। কিন্তু দেখে মনে হয় না দুজন কোন শব্দ পেয়েছে। একমনে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। কোনদিকে নজর নেই। কথা বলছে ফিসফিস করে।

ত্রিশ ফুট দূর থেকে ল্যাঙডন শব্দ শুনতে পেল। কোন অক্ষর নেই। শুধু ধীর শব্দ। অস্পষ্ট, অস্ফুট। প্রতি পদক্ষেপে পায়ের গতি বেড়ে যাচ্ছে ভিট্টোরিয়ার।

তার হাত আরো শক্ত হচ্ছে, উঠে যাচ্ছে হাতের গান।

বিশ ফুট।

এখনো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে গুনগুন শব্দ। একটু যেন রাগান্বিত। ল্যাঙডন মনে করছে এটা কোন বৃদ্ধা মহিলার কণ্ঠ। বোঝা যাচ্ছে, নিঃশব্দে কথা বলছে সে। অন্যজন কোন কথা বলছে না।

মি স্কুসি! ভিট্টোরিয়ার কোমল কণ্ঠ চিরে দিল স্কোয়ারের নিরবতা।

থমকে গেল ল্যাঙডনের হৃদস্পন্দন, যখন সে দেখল ধীরে ধীরে মানুষ দুজন পিছন ফিরে তাকাচ্ছে।

আরো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ভিট্টোরিয়া, আগের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত। যে কোন সময় তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হতে পারে। তাদের হাতে কোন সময় নেই। হঠাৎ টের পেল ল্যাঙডন, তার পা থেকে যেন শিকড় গজিয়েছে। এগিয়ে যেতে পারছে না সে।

দেখতে পেল সে ঠিক ঠিক, ভিট্টোরিয়ার দু হাত প্রসারিত হচ্ছে, উঠে আসছে হাতের আগ্নেয়াস্ত্র। তারপর, তার কাঁধের উপর দিয়ে, একটা মুখাবয়ব দেখা যাচ্ছে স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোয়।

একটা আতঙ্ক তার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল। বলল, ভিট্টোরিয়া, না!

দেখে মনে হয় ভিট্টোরিয়া তারচেয়ে এক সেকেন্ডও এগিয়ে নেই। সামলে নিল মেয়েটা নিজেকে। ঠাণ্ডা রাতে ডেটিংয়ে বেরুনো জোড়ার মত আচরণ করল তারা একে অন্যের প্রতি। হাত ছড়িয়ে দিল ভিট্টোরিয়া দুপাশে। হাতে কোন পিস্তল নেই। তাদের সামনেই ঘোমটা দেয়া জোড়া।

বুনা সেরা, বলল সে, ফিরে আসছে নিজের পথে।

দুজন মহিলা দাড়িয়ে পিছন ফিরল। তাদের চোখেমুখে বিস্ময় এবং খানিকটা বিরক্তি। এখনো তারা বুঝতে পারছে না কোথা থেকে ভোজবাজির মত উদিত হল এই জোড়া। মহিলা দুজনই বয়েসি। তার মধ্যে একজন ঠিকমত দাঁড়াতেই পারে না। অন্যজন তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করছে।

কোনক্রমে একটা হাসি যোগাড় করল ভিট্টোরিয়া। ডোভে লা চেসিয়া সান্তা মারিয়া ডেলা ভিট্টোরিয়া? কোথায় সান্তা মারিয়া ডেলা ভিট্টোরিয়া?

ই লা। বলল একজন।

গ্রাজি, বলল ল্যাঙডন। ভিট্টোরিয়ার কাধে একটা হাত রেখে বলল সে। টেনে নিল তাকে প্রেমিকের মত। সে ভেবে পাচ্ছে না আর একটু হলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ত দুজন বয়েসি মহিলার উপর।

নন সি পুয়ো এন্টারে, সতর্ক করল মহিলা, হা চিউসো প্রেসততা।

আগেই বন্ধ হয়ে গেছে! দেখে মনে হবে ভিট্টোরিয়া বিষম খেল, পার্সে?

এবার দুজন মহিলাই একত্রে অনর্গল কথা বলা শুরু করল। ঝাঝালো ইতালিয়র মধ্যে খুব একটা বুঝে উঠতে পারল না ল্যাঙডন।

এটুকু বোঝা যায়, তারা দুজন মনেপ্রাণে চার্চে গিয়ে ভ্যাটিকানের বিপদের সময়ে প্রার্থণা করতে বসেছে এমন সময় এক লোক এসে তাদের বলল যে গির্জা খুব দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে।

হ্যান্নো কনোসিয়েস্তা লিউমো? দাবি করল ভিট্টোরিয়া, লোকটাকে আপনারা চেনেন?

এবারও দুজন একত্রে তাদের মাথা নাড়তে শুরু করল। সে তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাড়িয়ে দিয়েছিল তরুণ প্রিস্টকেও। সে বলেছিল যে পুলিশের খোঁজে যাচ্ছে তারা। তখন লোকটা বলে যে পুলিশ যে ক্যামেরা আনবে সে ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে হবে।

ক্যামেরা?

একটু রাগান্বিত হয়ে উঠল মহিলা বলল যে লোকটা একটা অসভ্য। তারপর এগিয়ে চলল তাদের পথে।

অসভ্য? জিজ্ঞেস করল ভিট্টোরিয়াকে ল্যাঙডন।

বার্বারিয়ান নয়। অসভ্য নয়। বার আরাববা... এরাবিয়ান।

সাথে সাথে একটা ঝাঁকি খেল ল্যাঙডন। এক ঝটকায় চোখ ফেরাল চার্চের দিকে। সে একদৃষ্টে তাকাল গির্জার দিকে। তারপরই হিম শীতল হয়ে উঠল তার রক্ত। সেখানে কোন এক জানালায় একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখা যাচ্ছে।

খেয়াল করেনি ভিট্টোরিয়া। সেলফোন বের করে সে বলল, আমি ওলিভেট্টিকে সতর্ক করে দিচ্ছি।

বোবা হয়ে তার হাত ধরল ল্যাঙডন। কোন কথা না বলে চার্চের দিকে তার চোখ ফিরিয়ে নিল।

কোনমতে একটা ধাক্কা সামলাল ভিট্টোরিয়া।

চার্চের জানালায় চোখ দিয়ে নির্বাক হয়ে গেল সে। তাকাল ভাল করে। ঘষা কাঁচের ভিতর দিয়েও ঠিক ঠিক দেখা যাচ্ছে একটা অগ্নিকুন্ডের শিখা।

সাথে সাথে ভিট্টোরিয়া আর ল্যাংডন এগিয়ে গেল সান্তা মারিয়া ডেলা ভিট্টোরিয়া চার্চের দরজার দিকে। সেখানে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। ভিতর থেকে সেটা বন্ধ। ওলিভেট্টির সেমি অটোমেটিক দিয়ে দরজার লকের উপর তিনটা গুলি চালাল মেয়েটা।

ভিতরে ঢোকার পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। হাট হয়ে খুলে গেল দরজা।

আশা করেনি কেউ এমন দৃশ্য। চোখ ধাঁধিয়ে গেল ল্যাংডনের। ভিতরের সবকিছু সোনালি আলোয় জ্বলজ্বল করছিল। দুপাশের সারিবদ্ধ বেঞ্চ, বর্ণিল দেয়াল, তাক, সব।

আর ঠিক মাঝখানে একটা আগুনের লেলিহান শিখা লকলক করছিল, উঠে যাচ্ছিল উপরের দিকে, উপরের গম্বুজের দিকে।

মাথার উপরে, দুটো জিনিস ঝুলছে, এগুলো অনেক গির্জায় থাকে। এগুলোতে করে দোলানো হয় বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ বস্তু। কিন্তু এসব এখন অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে...

সেখানে একজন বিবস্ত্র মানুষ ঝুলছে। লোকটার দু হাতে দুই লোহার শিকল আটকানো। আর ছিড়ে পড়ে যেতে চাইছে তার দেহ। ঈশ্বরের ঘরে আরো একজন সেবক অসহায় অবস্থায় ঝুলে আছে উপর থেকে, নিচে আগুনের লেলিহান শিখা।

উপরের দিকে তাকিয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল ল্যাংডন। যেন প্যারালাইজড হয়ে গেছে তার সারা শরীর। অসাড়।

বৃদ্ধ লোকটা এখনো জীবিত! অসহায়ভাবে সে তার চোখ মেলল, তুলল মাথা! তাকাল নিচের মূর্তিমান বিভীষিকার দিকে। লোকটার বুকে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে একটা এ্যাম্বিগ্রাম।

এখান থেকে তেমন দেখতে পাচ্ছে না ল্যাংডন বুকের লেখাটা। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, সে বুঝতে পারছে কী লেখা আছে সেখানে।

ফায়ার।

আগুনের শিখা আরো আরো উপরে উঠে যাচ্ছে। অগ্নিশিখার স্পর্শ ছুয়ে দিচ্ছে লোকটার পা। একটা বিচিত্র, অশ্রুতপূর্ব, রক্ত জমাট করা চিৎকার বেরুল লোকটার বুক চিরে। কাঁপছে তার সারা শরীর।

কোন এক অচেনা শক্তির সাহায্যে ল্যাংডন টের পেল তার শরীর গতি ফিরে পেয়েছে। মূল পথের দিকে তাকিয়ে সে বিনা দ্বিধায় এগিয়ে যেতে শুরু করল। ফুসফুস ভরে উঠল ধোয়ায়। কিন্তু চলা থামাল না সে। আগুনের শিখা থেকে দশফুট দূর থেকেই তাপের একটা দেয়ালের মুখখামুখি হল সে। কুঁচকে গেল তার মুখমন্ডলের চামড়া, এক ঝটকায় পিছিয়ে গেল অনেকটা। চোখে আগুনের হল্কা লেগেছে। দ্বিধান্বিতভাবে সে পড়ে যায়। হাত দিয়ে চোখ রক্ষা করে এগুতে থাকে।

সাথে সাথেই টের পায়, আগুন অনেক অনেক উত্তপ্ত।

পিছিয়ে গিয়ে সে চ্যাপেলের দেয়ালগুলোয় চোখ বুলাতে শুরু করে। কোন ঢাল পেলেই হয়ে যায়... ভাবছে সে, তারপর নিজের চিন্তা দিয়ে নিজেই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। এটা একটা চ্যাপেল। কোন জার্মান দুর্গ নয় যে ঢাল তলোয়ার পাওয়া যাবে। কিছু একটা কর! ভেবে বের কর কী করা যায়!

খুন হয়ে যেতে থাকা লোকটার দিকে আবার দৃষ্টি ফেলে সে।

লোকটা সেখানে অনেক কষ্টে ভেসে আছে। উঠে আসছে কুন্ডলী পাকানো আগুনের হল্কা, ধোঁয়া, গরম বাতাস। লোহার চেনগুলোতে আটকে আছে জ্যান্ত একটা মানুষ। মারা যাচ্ছে আগুনে একটু একটু করে পুড়ে।

আশপাশে চোখ বোলাল ল্যাংডন। না, তার কাছাকাছি পৌঁছানর যে উপায়গুলো আছে সেগুলো অনুসরণ করতে গেলে তার পোড়া মৃতদেহ নামানো যাবে। ব্যস। কাজের কাজ কিছু হবে না।

আগুনের আরো একটা শিখা উঠে গেল উপরে লকলক করে। আর ল্যাংডন শুনতে পেল জান্তব চিৎকার। পায়ে ফোস্কা পড়তে শুরু করেছিল আগেই। এখন চামড়া পুড়ে যাচ্ছে। কালো হয়ে যাচ্ছে। লোকটা রোস্ট হচ্ছে জ্যান্ত। উপরে তাকাল ল্যাংডন। তার কাছাকাছি পৌঁছতে হবে যে করেই হোক।

চার্চের পিছনে ভিট্টোরিয়া তড়পাচ্ছে কিছু করতে না পেরে। সে সোজা উপরের দিকে তাকায় একবার, হতাশায় চোখ ফিরিয়ে নেয় সাথে সাথে। কিছু একটা কর, কর কিছু একটা!

সে ভেবে পায় না কোথায় গিয়ে লুকিয়ে আছে ওলিভেট্টি। সে কি হ্যাসাসিনকে ধরতে পেরেছে? দেখতে পেয়েছে লোকটাকে? অন্তত কার্ডিনালকে দেখতে পাবার কথা। কী করছে সে? সামনে এগিয়ে গেল সে, ল্যাংডনকে সাহায্য করবে। কিন্তু একটা শব্দ থামিয়ে দিল তাকে।

আগুনের পটপট আওয়াজ বেড়ে গেছে হঠাৎ করে। তবু, তার সাথে সাথে একটা ধাতব শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নিয়মিত, অনিয়মিত। কীভাবে যেন এই শব্দটার সাথে পরিচিত সে। কীভাবে ভেবে পাচ্ছে না। তাকাল ঝট করে। একটা র‍্যাটল সাপের শব্দ। আসছে পিছন থেকে। এগুলোর লেজটা নিয়মিত বিরতিতে ঝুনঝুনির মত কাঁপে। আওয়াজ উঠছে ফোনের রিং বাজার মত। ভাইব্রেশনের মত। একবার আওয়াজ উঠছে, আরেকবার থামছে। নিয়মিত বিরতিতে।

সামনে এগিয়ে গেল সে, দেখেনি, আড়ালে সাপটা আছে কিনা। তার এক হাতে গান, আরেক হাতে অন্য কিছু ধরা। টের পেল সে, সেলফোন। উত্তেজনার চোটে সে ভুলেই গেল যে বাইরে থাকার সময় সে এটাকে ব্যবহার করেছিল কমান্ডার ওলিভেট্টিকে ফোন করার কাজে।

কানের কাছে ফোনটাকে ধরল ভিট্টোরিয়া। বোঝার চেষ্টা করল ওলিভেট্টি সেটাকে ধরেছে কিনা। না এখনো রিং হচ্ছে, ধরছে না কমান্ডার। ব্যাপার কী! তারপর হঠাৎ করেই সে বুঝতে পারল কী থেকে এই শব্দটা আসছে।

তারপর, হঠাৎ তার সমস্ত দুনিয়া দুলে উঠল তার। যেন ডুবে গেল সমগ্র চার্চ। মেঝের দিকে তাকাল সে। শরীর থেকে কোন তরলের বন্যা চলছে না। তার মাংসে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। শুধু কমান্ডারের মস্তকে একটা বৈপরীত্য দেখা দিচ্ছে। তার মাথাকে একশো আশি ডিগ্রি বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে জোর খাঁটিয়ে।

সাথে সাথে পাথর হয়ে গেল ভিট্টোরিয়া। মনে পড়ে গেল তার বাবার কথা।

মেঝেয় পড়ে আছে ওলিভেট্টির ফোনটা। ঠান্ডা মেঝেতে কেঁপে চলেছে একাধারে। ভিট্টোরিয়া তার নিজের ফোনটা তুলে রাখল। কেটে দেয়ায় ফলে থেমে গেল। সেলফোনটার কম্পন। শব্দ থেমে গেল।

কিন্তু সাথে সাথে নতুন একটা আওয়াজ উঠল। পিছন থেকে।

কেউ একজন শ্বাস নিচ্ছে তার পিছনে।

ঘুরতে শুরু করল সে। একই গতিতে ঘুরিয়ে নিতে থাকল পিস্তলটাকে। কিন্তু ভালভাবেই জানে, দেরি হয়ে গেছে। অনেক দেরি। আলোর একটা রেখা বিস্ফোরিত হল তার মাথায়। মাথার উপর থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত ব্যথার একটা স্পর্শ এগিয়ে গেল শিরশির করে। তার গলা জাপ্টে ধরল খুনির কনুই।

এবার... তুমি আমার। বলল সে হিসহিস করে।

এরপর, আঁধার ঘনিয়ে এল চারধারে।

***

স্যাংচুয়ারি পেরিয়ে, সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল ল্যাংডন। গির্জাগুলোয় এমন অবস্থা থাকে। এখনো চেনটা মাথার ছফিট উপরে। ল্যাংডন জানে, এগুলোর দিকে এগিয়ে যায় প্রিস্টরা কাঠের সিঁড়ি ব্যবহার করে। মইগুলোর নাম পিউওলি। লোকটাকে ফাঁসিয়ে দিতে নিশ্চয়ই

খুনি ঐ মই ব্যবহার করেছে। কোন সন্দেহ নেই। তাহলে কোন চুলোয় এখন গিয়ে আছে ল্যাডারটা!

নিচে তাকাল ল্যাঙডন। আঁতিপাতি করে খুজছে একটা মই। নেই, কোথাও নেই। এক মুহূর্ত পরই টের পেল সে কোথায় আছে সেটা। আর কোথায় থাকতে পারে! অগ্নিকুন্ডের ঠিক মধ্যখানে। আগুন লকলক করে এগিয়ে যাবে এটার সাহায্যে।

এবার মরিয়া হয়ে সারা গির্জায় চোখ বুলাল ল্যাঙডন। উপরের স্তরে উঠে যাবার কাজে লাগবে এমন যেকোন কিছু পাওয়া দরকার। এখনি প্রয়োজন। সারা চার্চে চোখ বুলাতে বুলাতে সে টের পেল, কিছু একটা ঘটছে আশপাশে।

কোন চুলোয় গিয়ে আছে ভিট্টোরিয়া? একেবারে ভোজবাজির মত উবে গেছে মেয়েটা। সে কি সাহায্যের জন্য গেল কোথাও? এবার না পেরে সে ভিট্টোরিয়ার নাম ধরে ডাকাডাকি করল। কিন্তু কোথাও কোন জবাব ধ্বণিত প্রতিধ্বণিত হল না। আর কোন মরা মরেছে ওলিভেট্টি?

এখনি উপর থেকে যাতনার একটা বীভৎস কাত্নানি শোনা যাচ্ছে। অনেক অনেক দেরি হয়ে গেল। উপরের দিকে চোখ চলে গেল তার। দেখতে পেল, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেছে বয়েসি লোকটা। ধীরে ধীরে একেবারে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটা কথাই মনে হল তার বারবার। জল। অনেক অনেক জল। আগুন নিভিয়ে ফেলতে হবে। অন্তত কমিয়ে আনতে হবে লকলকে শিখার উচ্চতা।

আমার জলের দরকার, ড্যাম ইট! চিৎকার করল সে জোরে জোরে।

এটাই পরের কাজ। বলল একটা কণ্ঠ।

চমকে তাকাল ল্যাঙডন নিচে। কেউ একজন অন্ধকার থেকে কথা বলে উঠেছে। তাকাল সে সেই অন্ধকারে থাকা অবয়বের দিকে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে নেকটা। বিশালদেহী। এবং অত্যন্ত স্থুল। না। সে তেমন স্থুল নয়। তার হাতে ধরা আছে আরেকজন মানুষ।

ভিট্টোরিয়া!

পিচকালো চোখ খুমির চকচক করছে। একহাতে জড়িয়ে রেখেছে ভিট্টোরিয়াকে, অন্যহাতে তারই বুক পকেট থেকে তুলে নেয়া অস্ত্র।

সাথে সাথে ভয়ের একটা ঘুমভাঙা স্রোত নেমে এল শিরদাঁড়া বেয়ে। অন্ধ ক্রোধও টের পেল সে তার ভিতরে ভিতরে। কী করেছে জানোয়ারটা ভিট্টোরিয়ার সাথে? সে কি আহত? নাকি তারচেয়েও বেশি কিছু?

একই মুহূর্তে ল্যাঙডন টের পেল, মাথার উপরের লোকটার চিৎকারে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। জান্তব গোঙানি বেরিয়ে আসছে তার গলা চিরে। কার্ডিনাল হয়ত সত্যি সত্যি মারা পড়বেন। তাকে আর বাঁচানোর কোন উপায় বাকি থাকল না।

তারপর, খুনি যখন তার অস্ত্রটা তাক করল ল্যাঙডনের বুকের দিকে, আরো একটা অপরিচিত অনুভূতিতে শিরশির করে উঠল সে। চার্চের বেঞ্চগুলোয় লাথি দিয়ে নিচু হয়ে গেল। প্রাণ বাচানোর তাগিদে যেতে থাকল এগুলোর নিচ দিয়ে।

বেঞ্চগুলোয় আঘাত করার সময় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জোর প্রয়োগ করেছিল। সাথে সাথে সেগুলো পড়ে যেতে যেতে মেঝেতে বিচিত্র ধাতব ঘষটানোর শব্দ তুলল।

চ্যাপেলের মেঝের অনেক উপরে, কার্ডিনাল গাইডেরা তার সজ্ঞানতার শেষ বীভৎস মুহূর্তগুলো পার করছিলেন। নিজের চোখে নিম্নাঙ্গের দিকে চোখ দিলেন। দেখতে পেলেন, পায়ের পোড়া চামড়া উঠে আসছে। আমি নরকে আছি, সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ঈশ্বর, কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত এটা!

তিনি জানেন, তিনি এখন সত্যি সত্যি নরকে আছেন। তাকালেন বুকের দিকে। সেখানে ঠিক ঠিক কুঁদে দেয়া হয়েছে একটা শব্দ। টের পেলেন। এর একটা অর্থ আছে। একেবারে

স্পষ্ট অর্থ।

৯২

তিনবার ব্যালটিং হয়েছে, কোন পোপ নির্বাচিত হয়নি।

সিস্টিন চ্যাপেলের ভিতরে কার্ডিনাল মর্টাটি একটা অলৌকিক ব্যাপারের জন্য প্রার্থণা করছে। আমাদের কাছে প্রার্থীদের পাঠিয়ে দাও ঈশ্বর!

অনেক অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। কেউ আসেনি। একজন প্রার্থী না থাকলে মনকে কোন না কোন উপায়ে সান্তনা দেয়া যায়। কিন্তু চার চারজনই গায়েব! কী করে হয়! দুই তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া একেবারে অসম্ভব। ঈশ্বর নিজে সাহায্য না করলে কোন আশা নেই।

বাইরের বোল্টে আঘাতের শব্দ ওঠায় মর্টাটি এবং আর সব কার্ডিনাল একই সাথে প্রচন্ড আশা নিয়ে ঘুরে তাকালেন। মর্টাটি জানেন, এই আনসিলিং এর একটা অর্থ আছে। কনক্লেভ ভঙ্গ হয়নি কখনো, কখনো হবে না। শুধুমাত্র প্রেফারিতিরা আসলেই এমন কিছু হতে পারে। এই দরজা আর মাত্র দুটো কারণে খোলা যায়, একঃ কোন প্রচন্ড অসুস্থ কার্ডিনালকে বের করার জন্য অথবা অনুপস্থিত প্রেচারিতিদের প্রবেশ করানোর জন্য।

প্রেফারিতিরা আসছেন!

নেচে উঠল মর্টাটির হৃদপিন্ড। কনক্লেভকে বাঁচানো গেছে।

কিন্তু দরজা হাট করে খুলে যাবার পর, পুরো ঘরে যে আশার একটা আলো দেখা দিয়েছিল- সেখানে বড় একটা আঘাত এল।

ভিতরে এসে যাচ্ছে একজন ক্যামারলেনগো!

ভ্যাটিকানের ইতিহাসে প্রথমবারের মত কনক্লেভ সিল করার পর পোপ নির্বাচিত হবার আগে কনক্লেভকে ভঙ্গ করল কোন ক্যামারলেনগো।

কী ভাবছে লোকটা?

এগিয়ে গেল ক্যামারলেনগো, হাজির হল সবার সামনে। তারপর ভাঙা মন নিয়ে তাকাল হতাশ লোকগুলোর দিকে। সিনরি, বলল সে, আমি যতক্ষণ সম্ভব অপেক্ষা করেছি। এমন একটা ব্যাপার আছে যা আপনাদের জানার অধিকার রয়েছে...

ল্যাঙডন জানেই না কোথায় যাচ্ছে সে। রিফ্লেক্সের উপর নির্ভর করে সে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। কোথায় জানে না। জানে, বাঁচাতে হবে নিজেকে।

বেঞ্চগুলোর নিচে নিচে এগিয়ে যেতে যেতে তার কনুই আর হাঁটু ব্যাথায় জরজর হয়ে যাচ্ছে। কেউ একজন তাকে ডানে যেতে বলছে। তুমি যদি ডানে যেতে পার, তাহলে চম্পট দেয়ার একটা সুযোগ থেকে যাবে।

সে জানে, ব্যাপারটা অসম্ভব। তার আর মূল প্রবেশপথের মধ্যে একটা আগুনের দেয়াল আছে। সে মনকে সচল রাখতে চায়। এরপর কী করার সুযোগ থাকে সেটা। নিয়ে ভাবতে চায়। কিন্তু সে যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই পায়ের শব্দ আসছে এগিয়ে।

কিন্তু অবশেষে ধাক্কা খেল সে। ধারণা ছিল, আরো দশ ফুট বেঞ্চি পেরিয়ে তারপর চার্চের সামনে চলে যেতে পারবে।

বিধি বাম।

কোন রকম আগাম সতর্কতা ছাড়াই তার মাথার উপরের এতক্ষণ থাকা ছাউনি উবে গেল। যেজন্য সে এখানে এসে হাজির হয়েছে সেটার দেখা পেল সে এবার। এক্সটাসে অব সেন্ট টেরেসা। নগ্নতা আর যৌনতার মূর্তিমান চিত্র। মেয়েটা আনন্দে, শিহরণে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে আছে, তার পিছন থেকে আগুনের বর্শা তাক করে রেখেছে একজন এ্যাঞ্জেল।

ল্যাঙডনের মাথার উপর একটা বেঞ্চে বুলেট লেগে চলে গেল। সে টের পেল, একজন স্প্রিন্টার দরজার বাইরে যেভাবে দৌড় দেয় সেভাবে পড়িমরি করে ছুটে যাচ্ছে তারই নিজের শরীর। নিজের অজান্তেই সে দেখতে পেল সামনের দিকে শরীর ঝুঁকিয়ে দিয়ে সমস্ত একাগ্রতা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে চার্চের সামনের দিকে, বিন্দুমাত্র খেয়াল না করে। ডানদিকের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ পিছলে পড়ার সময় সে টের পেল, আরো একটা বুলেট এগিয়ে যাচ্ছে তার দেহ ঘেষে।

এরপর সে মেয়েটাকে দেখতে পেল। চার্চের পিছনে। ভিট্রোরিয়া! মেয়েটার নগ্ন পা কেমন করে যেন প্যাচানো। এখনো বেঁচে আছে সে। বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু তাকে সাহায্য করার মত কোন সময় নেই হাতে।

টের পাচ্ছে ল্যাঙডন, সময় ফুরিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। বাতাসের বেগে এগিয়ে এসেছে খুনি, বেঞ্চগুলো টপকে, হাতে তার উদ্যত পিস্তল, এমন মুহূর্তে যা করা উচিৎ এবং যা লোকে করে তাই করছে ল্যাঙডন।

এক ঝটকায় নেমে গেল সে নিচের দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা স্তম্ভের আড়ালে। সেখানে পড়তে না পড়তে টের পেল যেখানে একটু আগেও দাঁড়িয়ে ছিল সেখানটা বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

কোণঠাসা জানোয়ারের মত অনুভূতি হচ্ছে তার। সামনে মঞ্চ, এটার নিচে কোনমতে জায়গা করে নিল সে। এগিয়ে গেল উপবৃত্তাকার নিচটার দিকে। আর কোন পথ নেই। যে কোন দিক দিয়ে সে এগিয়ে আসুক না কেন, মুখোমুখি হতে হবে খুনির। উপায়ান্তর না দেখে চোখ বোলাল পুরো তলাটায়। আড়াল পাবার মত কিছু নেই। তারপরই, ঝিকিয়ে উঠল তার চোখের তারা, আনন্দে, সেখানে একটা পাথরের তৈরি কফিনের মত বাক্স রাখা। মাটি থেকে একটু উপরে। নিচের দুটো স্তম্ভ জিনিসটাকে মেঝে থেকে উঠিয়ে রেখেছে। আশার ছোট্ট একটা রেখা দেখতে পেয়েই প্রস্তুত হল সেটার ভিতরে যাবার জন্য। আটবে কি? আটতেই হবে।

ঠিক পিছনে, পদধ্বণি শোনা যাচ্ছে।আর কোন উপায়ান্তর না দেখে সোজা সামনের দিকে নিজেকে ঠেলে দিল। কোনক্রমে ঢাকনার ভারি পাথুরে গড়নটাকে সরিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। গোলাগুলির তীব্র আওয়াজ কমে এল মুহূর্তে।

কিন্তু শেষ পলে একটু বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তার জন্য। একটা বুলেট ছুটে এল ঠিক ঠিক। ঘেঁষে গেল গা। তপ্ত সীসার স্পর্শ পেল গায়ে টের পেল—গরম তরলের একটা প্রবাহ

বেরিয়ে আসছে। একই সাথে সেটা বিস্ফোরিত হল মার্বেলের কফিন-সদৃশ বাক্সের গায়ে।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত্রি হয়।

তার শরীরকে জায়গা করে দেয়ার মত ফাঁকা স্থান নেই সেটার ভিতরে।

মরিয়া হয়ে উঠে এল ল্যাংডন। পিছিয়ে গেল। ঠেকল গিয়ে মঞ্চের শেষ প্রান্তে। আর কিছু করার নেই।

কোন সন্দেহ নেই, এটাই তার কবরখানা। এবং, তা হবে খুব দ্রুত... উপলব্ধি করতে পারছে সে, কারণ একটা আগ্নেয়াস্ত্রের ভয়াল, কালচে নল উঁকি দিচ্ছে পিছন থেকে। ঠিক তার দিকে। খুনি আগ্নেয়াস্ত্রটাকে মাটির সাথে সমান্তরালে ধরে রেখে তাক করেছে ল্যাংডনের শরীরের মাঝামাঝি।

মিস করার কোন সুযোগ নেই।

মনের কোন গভীর থেকে, যাকে লোকে অবচেতন মন বলে, সেখান থেকে নিজেকে রক্ষা করার এক অদৃষ্টপূর্ব, অপ্রতিরোধ্য ভাবনা আছড়ে পড়ল তার সচেতন মনে। কীভাবে যেন বুঝে গেল, এখন লম্বা হয়ে থাকলে গুলি লাগার সম্ভাবনা অনেক বেশি, তারচেয়ে গুলির দিকে হাত দিয়ে হাতের পিছনে শরীর এগিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে থাকলে বাঁচার সম্ভাবনা অনেক বাড়বে। তাই করল সে। হাতের যেখানটা আর্কাইভের, ভাঙা কাঁচ লেগে ছড়ে গিয়েছিল সেটা ব্যাথা করছে। আমল দিল না ব্যাপারটাকে। এরপরই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে গেল, সাঁতারুর মত সামনের দিকে নিজেকে ছুঁড়ে দিল সে, গায়ের পাশে বিদ্ধ হওয়া গুলির ঝাঁপ্টা শেষ হবার সাথে সাথে তারপর চোখ বন্ধ করে প্রার্থণা করল যেন গুলি করাটা থেমে যায়।

অবশেষে তাই ঘটল।

খালি চেম্বারে পড়ল আঘাত, থেমে গেল গর্জন। আর কোন গুলি নেই সেখানে।

অত্যন্ত ধীরে ধীরে চোখের পাতা মেলল ল্যাংডন। ভয় পাচ্ছে, পাতা খোলার কোন শব্দ হবে নাতো! না কোন শব্দ নেই। নিরবতা চারদিকে। শুধু ঝা ঝা করছে কানের পর্দাদুটো। গুলির আওয়াজে আওয়াজে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছে। জোর করে একটা শ্বাস নেয়ার সম্ভাবনাকেও নাকচ করে দিতে চায় সে। কোন সুযোগ দেবে না। খুনিকে।

এরপর অপেক্ষার পালা।

কখন পালাবে হ্যাসাসিন? তারতো আরো কাজ আছে। না, যাবার কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

মন এতক্ষণে অন্যান্য কথা ভাবার ফুরসৎ পেল। মনে পড়ল তার ভিট্টোরিয়ার কথা। তাগিদ পেল ভিতর থেকে, সহায়তা করতে হবে মেয়েটাকে।

এরপর এক অতিমানবীয় শব্দ শুনতে পেল সে।

বুঝে উঠতে পারল না প্রথমে, হচ্ছেটা কী। তারপর একে একে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। যে ভারি মঞ্চের নিচে সে শুয়ে আছে, কোন এক বিচিত্র কারণে সেটা ভেঙে পড়ছে। আৎকে উঠল সে। সরে যাবার চেষ্টা করল। বাঁচানোর চেষ্টা করল মাথাটাকে, একই সাথে প্রত্যক্ষ করল সাক্ষাৎ যমদূতকে! আর কোন ভয় নেই, নেই কোন ভুল, যমরাজ চলে এসেছে। মৃত্যুদূত মুখ ব্যাদান করে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

অবাক হয়ে ল্যাংডন লক্ষ্য করল, ব্যাথা পাওয়া হাতে যতটা অনুভূতি হবার কথা তেমন কিছু হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত কফিনের মত বাক্সটার কল্যাণে কোনক্রমে বেঁচে গেল সে। একেবারে অক্ষত।

শক্ত একটা হাত এগিয়ে এল বাইরে থেকে। পেশীবহুল, কালো, প্রচন্ড শক্তিশালী। এগিয়ে এল সেটা ল্যাংডনের মাথার দিকে। মাথা থেকে শক্ত করে ধরে রেখে এগিয়ে এল আরো নিচে। খুঁজে নিল গলা। ক্ষুধার্ত অজগরের মত নির্দ্বিধায় পেঁচিয়ে ধরল খুনির হাতটা ল্যাংডনের গলাকে। প্রতি পলে পলে চাপ আরো বাড়ছে। চোখে সর্ষেফুল দেখল ল্যাংডন। আর কোন উপায় নেই। অন্ধকার হয়ে আসছে চোখ দুটো।

কিন্তু কী মনে করে যেন সে পা বাড়াল সামনে। ভাঁজ করে টের পেল, বাক্সটার ভারি পাল্লার নিচে পা দিতে পারছে। জোর খাঁটিয়ে, হাতের মত করে ব্যবহার করে পা দুটো ঢুকিয়ে নিল ভিতরে, তারপর জান্তব শক্তি পেয়ে গেল পা দুটো। সোজা করে নিল সে ঢাকনাটাকে। অমানুষিক শক্তি প্রয়োগ করল, ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে।

সেটা যে মাথাতেও পড়তে পারত, গুঁড়ো করে দিতে পারত তার বুক, সে চিন্তার তোয়াক্কা না করে কাজটা করতে পারায় সাফল্যও ধরা দিল তৎক্ষণাৎ।

উড়ে গেল ভারি পাল্লাটা, তারপর পড়ল সোজা খুনির হাতের উপর। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল খুনি।

সাথে সাথে হাতের করাল গ্রাস থেকে বেঁচে গেল ল্যাঙডন। হাত বের করে আনার জন্য কসরৎ করল লোকটা। পারল না প্রথমে কিছু করতে। অবশেষে যখন হাতটা বের করা গেল, টেনে নিল লোকটা সেটাকে। সশব্দে বাক্সের ঢাকনা পড়ে গেল মেঝেতে।

নিরেট অন্ধকার। আবারো।

এবং পিনপতন নিরবতা।

বাইরে কোন তাড়াহুড়োর চিহ্ন নেই, নেই ভিতরে ঢোকার কোন প্রচেষ্টা। আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ল্যাঙডন আবারো মনযোগ দিতে পারল মেয়েটার চিন্তায়।

ভিট্টোরিয়া! বেঁচে আছতো তুমি?

সত্যিটা যদি জানতে পারত সে–যে ভয় আর আতঙ্ক গ্রাস করবে মেয়েটাকে, তাহলে প্রার্থনা করত, যেন মারা যাওয়াও এরচেয়ে অনেক ভাল।

সিস্টিন চ্যাপেলের ভিতরে বসে, আপন সারথিদের সাথে নিয়ে, কার্ডিনাল কোনক্রমে শুনতে থাকা শব্দগুলোকে গলাধঃকরণ করছিলেন কষ্টেসৃষ্টে। চোখের সামনে, শুধুই মোমের আলোয় আলোকিত হয়ে, ক্যামারলেনগো যে কাহিনী শোনাচ্ছে তা বিশ্বাস করা খুব কষ্টের; সে কাজটা করতে গিয়ে কাঁপছে তার সারা গা। টের পেলেন তিনি। স্পষ্ট।

ক্যামারলেনগো বলছেন কিডন্যাপ করে নেয়া কার্ডিনালদের কথা, বুকে কুঁদে দেয়া চিহ্নের কার্ডিনালদের কথা, খুন হয়ে যাওয়া কার্ডিনালদের কথা।

সে এমন এক গোত্রের কথা বলছিল, যার নাম শোনার সাথে সাথে ভিতর থেকে পাক খেয়ে ওঠে এক বীভৎস ভয়। চার্চের বিরুদ্ধে শত্রুতার একটা ভয়াল রূপ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে নিমিষে।

কণ্ঠে বাষ্পরুদ্ধ কষ্ট নিয়ে ক্যামারলেনগো বিগত পোপের কথা বলে... ইলুমিনেটির বিষপ্রয়োগে যিনি প্রাণত্যাগ করেছেন।

এবং সবশেষে, কণ্ঠে এক অচেনা ফিসফিসানি নিয়ে তিনি বলেন এক আনকোরা, নূতন প্রযুক্তির কথা, যেটা শুনলেই রূপকথা বলে মনে হয়। এন্টিম্যাটার। আর দু ঘণ্টাও বাকি নেই, প্রাচীণ পবিত্র নগরী ভ্যাটিকানকে ধূলার সাথে আক্ষরিক অর্থেই মিশিয়ে দিতে যাচ্ছে সেটা।

যখন সে কথা বলে যাচ্ছিল—যেন স্বয়ং শয়তান হাজির হয়ে ঘরের সমস্ত বাতাস শুষে নিয়েছিল এক পলকে। কেউ নড়তে পারেননি। বাতাসে বাতাসে ধাক্কা খেয়ে ফিরছিল ক্যামারলেনগোর কণ্ঠ, দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বণিত হচ্ছিল।

আর যে ব্যাপারটা সবাইকে অবাক করছিল, তা হল, ইতিহাসে প্রথমবারের মত কোন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র প্রবেশ করেছে কনক্লেভে। একটা ক্যামেরা এবং তার সাথে আনুষাঙ্গিক যন্ত্র। ফ্ল্যাশলাইট, রিফ্লেক্টর ইত্যাদি। ক্যামেরাটা কখনো ঘুরছিল ঘরের চারধারে, কখনো স্থির হচ্ছিল ক্যামারলেনগোর চেহারায়। সাথে বিবিসির দুজন রিপোর্টার। একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা ক্যামেরাম্যান। এই ঘোষণা এই মুহূর্তেই সারা দুনিয়ায় জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। লাইভ।

এবার, সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে বলতে থেমে গেল ক্যামারলেনগো, তারপর বলতে শুরু করল, ইলুমিনেটির প্রতি... আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসছে তার কথা, এবং তথাকথিত বিজ্ঞানের লোকদের প্রতি... থামল সে আবারও, আপনারাই জিতে নিয়েছেন এ যুদ্ধ।

চ্যাপেলের কোণায় কোণায় এবার খেলে গেল নিরবতার এক নিষ্ঠুর তরঙ্গ। মর্টাটি তার নিজের হৃদপিন্ডের ধ্বক ধ্বক শব্দ ঠিক ঠিক শুনতে পাচ্ছিলেন।

সময়ের চাকা ঘুরছে অনেকক্ষণ ধরে। বলছে ক্যামারলেনগো, আপনাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। এর আগে এমন নিশ্চয়তা আর কেউ দিতে পারেনি। কেউ আর কখনো এত নিশ্চিত হতে পারেনি। সায়েন্স ইজ দ্য নিউ গড!।

কী বলছে সে বিষম খেলেন মর্টাটি। পাগল হয়ে গেল নাকি! পুরো দুনিয়া এই ঘোষণা শুনতে পাচ্ছে।

মেডিসিন, ইলেক্ট্রনিক কমুনিকেশন্স, স্পেস ট্রাভেল, জেনেটিক ম্যানিপুলেশন... এগুলোই আজকের মিরাকল, এই জাদুর কথাই আমরা আমাদের সন্তানদের বলি। এ রহস্যগুলো নিয়ে আমরা মেতে উঠি, উঠি তেতে, এবং বিজ্ঞান এসবের সঠিক জবাব বের করে দেয়। আদ্যিকালের যত মিথ, যত লোককথা, যত কাহিনী, জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের • কথা, সাগর দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবার ঘটনা এখন আর প্রমাণিত সত্য নয়। হেরে গেছেন ঈশ্বর। জিতেছে বিজ্ঞান। হার মানছি আমরা।

চ্যাপেলে বয়ে গেল একটা অস্থিরতার হল্কা।

কিন্তু বিজ্ঞানের এই জিতে যাওয়াটা, যোগ করল ক্যামারলেনগো, তার কণ্ঠ আরো তীক্ষ্ণ হচ্ছে। আমাদের সবাইকে বলির পাঁঠা বানিয়ে নিয়ে তারপর অর্জিত হল। অর্জিত হল

আমাদের সবার নিবেদিতপ্রাণ মানসিকতা, সারা জীবন ধরে রক্ষা করা ধৈর্য, রূপকথাতুল্য সততার সাথে পাল্লা দিয়ে।

নিরবতা।

বিজ্ঞান হয়ত আমাদের জীবনের সমস্ত রহস্যের দ্বার খুলে দিয়েছে, রক্ষা করেছে। দুরারোগ্য অসুখের হাত থেকে, দূর করে দিয়েছে জ্বরা, কিন্তু একই সাথে আমাদের জীবনকে করে তুলেছে রহস্যহীন, একঘেয়ে।

আমাদের অনিন্দ্যসুন্দর সন্ধ্যাগুলোর অপরূপ আলোছায়ার খেলাগুলো আজ আর রহস্যময় নেই, সেখানে আছে তরঙ্গদৈর্ঘের খেলা।

পুরো সৃষ্টিজগতের সমস্ত জটিলতা রহিত করে দেয়া হয়েছে একটা মাত্র ইকুয়েশনে।

এমনকি আমাদের মানব হয়ে থাকার অপরূপতাও মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায় কঠিন বৈজ্ঞানিক তথ্যের সামনে।

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে আমাদের এই পৃথিবী গ্রহটায় প্রাণের উন্মেষ একটা নিছক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়, থামে ক্যামারলেনগো, এমনকি যে টেকনোলজি আমাদের এক সুর লহরীতে আবদ্ধ করে সেটাই বিভক্ত করছে আমাদের বিনা দ্বিধায়। আমাদের প্রত্যেকেই পুরো দুনিয়ার সাথে একেবারে এক সুরে আবদ্ধ হই ইচ্ছা হলেই, একই সাথে, আমাদের মত একলা আর কেউ নেই। আমরা বোমার মুখে পড়ে যাই প্রতিহিংসায়, জিঘাংসায়, বিভক্তিতে, বেঈমানিতে।

এতে আর অবাক হবার মত কী আছে যে আজকের দিনে আমরা, মানুষেরা সবচেয়ে বেশি একা, সবচেয়ে বেশি হিংস্র, সবচেয়ে বেশি অসহায়, সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট, মানব ইতিহাসে আর কখনো এমন চরম বিন্দুতে মানুষ কখনো দাঁড়ায়নি সেটা ভেবে অবাক হবার আর কী আছে?

বিজ্ঞান কি কোন ব্যাপারকে আর সব কিছুর বাইরে, পবিত্র রেখেছে? বিজ্ঞান শুধু উত্তর খুঁজে যায়, ছিড়েখুড়ে জানতে চেষ্টা করে সবটা। বিজ্ঞান এমনকি আজকের দিনে আমাদের সমস্ত রহস্যের আধার ডি এন এ কে তন্ন তন্ন করে আবার আমাদের সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। অর্থ খোঁজার ধাঁধায় পড়ে গিয়ে ঈশ্বরের রহস্যগুলোকে আরো অযুত নিযুত ভাগে বিভক্ত করে আমরা শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছি জবাব... আর এত প্রাপ্তি আমাদের শুধুই অপ্রাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যা পাচ্ছি তার নাম আরো, আরো প্রশ্ন।

ব্যথা নিয়ে দেখছেন মর্টাটি। ক্যামারলেনগোর কণ্ঠে যেন স্বয়ং ঈশ্বর ভর করেছেন। যেন সে সম্মোহিত করছে সারা দুনিয়াকে, শুধু কথার জাদু দিয়ে, আর সেটা যেন তার নয়, যেন অন্য কারো কাছ থেকে ধার করে আনা। তার নড়াচড়ায় এমন এক দৈহিক শক্তির প্রকাশ যেটা দেখে যে কেউ মিইয়ে যাবে; এমন এক ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে তার বাচনভঙ্গিতে, যেটা কোনকালে কোন ক্যামারলেনগোর কথায় প্রস্ফুটিত হয়নি। যেটা আর কখনো দেখা যায়নি কোন ভ্যাটিকান প্রতিনিধির ভিতরে। মানুষটার কণ্ঠে অন্য কোন জগতের শক্তি, অন্য কোন ভুবনের শোক।

বিজ্ঞান আর ধর্মের মধ্যে চলা সেই সুপ্রাচীণ যুদ্ধের এখানেই ইতি, বলছে ক্যামারলেনগো, জিতে গেলেন আপনারা। জিতলেন ঠিকই। জিততে পারলেন না ন্যায্য কাজ করে, ন্যায়ের পথে থেকে। সার্বিক আদর্শ তো দূরের কথা, আজ আর আপনারা আপনাদের আদর্শে থেকেও জিততে পারলেন না। দিলেন না কোন প্রশ্নের জবাব।

ধর্মের আর থেকে কী লাভ? কোন লাভ নেই। ক্ষয় শুরু হয়ে গেছে। অবশ্যম্ভাবী ক্ষয়। বিজ্ঞান এক স্বভোজী ভাইরাসের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। বেশি দেরি নেই। প্রতিটা ধ্বংস, প্রতিটা রূপ-বদল নতুন ধ্বংস এবং আরো নূতন রূপ-বদলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের।

চাকা থেকে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে মানবজাতির হাজার হাজার বছর লেগে গেছে। কিন্তু গাড়ি থেকে স্পেস ক্রাফটে পরিণত হতে সময় লেগেছে মাত্র এক শতাব্দি, আর এখন

আমরা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে হিসাব করছি প্রতি সপ্তাহে। পুরো পাশার ছক উল্টে যাচ্ছে প্রতিটা মিনিটে। পলকে পলকে নতুনত্ব এসে আমাদের আরো আরো পিছিয়ে দিচ্ছে, আমরা ঘুরে চলেছি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। আমাদের অগ্রগতি হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রমেই শুধু আমাদেরকে, অন্য কিছু নয়। আত্মকেন্দ্রীকতা ঘনীভূত হচ্ছে, আদর্শহীনতায় পড়ে গিয়ে মানুষ হয়ে পড়ছে অস্থির, অতৃপ্ত, অর্জন বলতে থাকছে শুধুই শূণ্যতা।

আমরা অর্থের জন্য কেঁদে উঠি, এবং বিশ্বাস করুন, আমরা কেঁদে উঠি। আমরা ইউ এফ ও দেখি, আটকে যাই চ্যানেলের ফাঁকগুলোয়, আত্মিক সম্পর্ক টের পেয়ে ভীত চোখে তাকাই, অশরীরীর দেখা পেয়ে ভড়কে যাই, মনের গভীরে জেগে ওঠা প্রশ্ন দেখে আৎকে উঠি-এই সব ব্যাপারেরই কোন না কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, আর সত্যি বলতে গেলে, এই সব ব্যাখ্যাই নির্লজ্জভাবে আমাদের সামনে আরো রহস্যের দুয়ার খুলে দেয়।

আমাদের ভিতরে সব সময়, অহর্নিশি, অষ্টপ্রহর যে ভাবনা গুমরে মরে সেটার নাম একাকীত্ব আর অসহায়ত্ব। আধুনিক নিঃসঙ্গতা, টেকনোলজির হাত থেকে, সব পাবার জগতের হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা।

টের পাচ্ছেন মর্টাটি, নিজের সিটে বসে থেকেই সামনের দিকে ঝুঁকে চলে এসেছেন। তিনি, তার চারপাশের যাজকদল, সারা দুনিয়ার তাবৎ মানুষ ঝুঁকে এসেছে, এ লোকটার অস্পৃশ্য শক্তির সামনে। নিজেদের অজান্তেই। ক্যামারলেনগো কোন ধার্মিকতার আশ্রয় নিচ্ছে না তার কথা শেষ করার কাজে। কোন পবিত্র গ্রন্থ থেকে শ্লোক আউড়ে যাচ্ছে না, বলছে না জিসাস ক্রাইস্টের কথা। তার কথায় ঝরে পড়ছে আধুনিক বাচনভঙ্গি; তার পরও, কণ্ঠে ধ্বণিত হচ্ছে সুপ্রাচীণ ঐশ্বরিকতা। যেন... যেন স্বয়ং ঈশ্বর এ লোকের কণ্ঠ দিয়ে বলে যাচ্ছেন কথা, আধুনিক স্বরে... প্রচার করে যাচ্ছেন সেই অদেখা ভুবনের আহ্বান, যা প্রচারিত হচ্ছে যুগ-যুগান্ত ধরে।

হঠাৎ করে টের পাচ্ছেন মর্টাটি কেন সদ্য মৃত পোপ এই তরুণ তুর্কীকে তার কাছাকাছি রেখেছেন সব সময়। টের পাচ্ছেন তিনি, এই পরিবর্তনের যুগে চার্চ চায় এমন কণ্ঠ, এমন তেজধারা, এমন অমিত অজেয় বাণী, এমন যুগশ্রেষ্ঠ কথা, এমন বাস্তবতা ঘেঁষা বাণী। এ-ই চার্চের আশা।

এখন ক্যামারলেনগো আরো অনেক তেজদীপ্ত কণ্ঠে কথা বলে যাচ্ছে অবিরল বারিধারার মত, সায়েন্স, আপনারা বলেন, রক্ষা করবে আমাদের। সায়েন্স, আমি বলি, ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের। গ্যালিলিওর যুগ থেকেই গির্জা চেষ্টা করছে, বিজ্ঞানের বল্গবিহীন ঘোড়ার অবাধ্য শিরে লাগাম পরানোর। কখনো কখনো সেই চেষ্টার কোথাও কোথাও ভুল পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে, কোথাও কোথাও ব্যাপারটা হয়েছে ভুল ভাবে। কিন্তু আমাদের চেষ্টার পবিত্রতা আর আন্তরিকতার কোথাও কোন খাদ ছিল না।

আজ আমি আপনাদের জানিয়ে দিতে চাচ্ছি, একবার, মাত্র একবার আপনার চারপাশে দৃষ্টি রাখুন, চোখ মেলে তাকান চারধারে, বিজ্ঞান, অজেয় বিজ্ঞান তার কথা রাখেনি। সারল্যের ছলনায় আমরা পাচ্ছি অসহ্য জটিলতা, অবিরাম সমস্যা উঠে এসেছে আমাদের ঘাড়ে। আমরা আজ এক ভেঙে পড়া, বিনষ্ট প্রজাতি... ধ্বসের অন্ধকূপে পতিত হওয়া এক দল।

লম্বা একটা মুহূর্তের জন্য থামল ক্যামারলেনগো, তারপর তার সবুজ চোখে ঠিকরে বেরুল অপার্থিব আলো।

এই ঈশ্বর বিজ্ঞান কে? কে তিনি, যিনি ক্ষমতার অসীম সমুদ্রে অবহাগন করাচ্ছেন আমাদের, কিন্তু জানিয়ে দিচ্ছেন না কী করে সেটাকে ব্যবহার করতে হয়? কেমনধারা পিতা তিনি যিনি সন্তানের হাতে আগুন তুলে দেন কিন্তু বলেন না কী করে সেটাকে ব্যবহার করতে হয়? বিজ্ঞানের সাইনবোর্ডে, সায়েন্সের ভাষায় ভাল আর মন্দকে আলাদা করা হয়নি। বিজ্ঞানের বই আমাদের শেখায় কী করে একটা নিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন করতে হয়। এখানেই খালাস বিজ্ঞানের ঐশ্বরিকতা। সে বইতে কোথাও লেখা থাকে না এ শক্তিকে কীভাবে

ব্যবহার করতে হবে। কী করে সেটাকে কল্যাণের পথে চালিত করতে হবে।

বিজ্ঞানের প্রতি, বলছি আমি এ কথা। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে গির্জা। আপনাদের দিকপাল থাকার চেষ্টা করতে করতে আজ আমরা নিঃস্ব। ভালমন্দের কথা বলতে বলতে আমাদের প্রাণ অতিষ্ট হয়ে উঠছে, যেখানে আপনাদের একমাত্র লক্ষ্য কী করে আরো ছোট একটা চিপ বানানো যায়, কী করে লাভের অঙ্কটাকে আরো মোটা করা যায়। আপনাদের নিজেদের শাসন করার মত কেউ থাকছে না, এটুকুই আপনাদের আনন্দ। এ জগত এত দ্রুত ঘুরছে যে একটা, মাত্র একটা মুহূর্তের জন্যও পিছনে ফেরার সময় নেই; ভাবার, সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় নেই। একটা ব্যাপারই এখানে তুলাদন্ডে পরিমাপ করা হবে, আপনার চেয়ে বেশি গতির কেউ আপনার ঝান্ডাটা তুলে নিয়ে যাবে, ব্যস।

তাই আপনি অহর্নিশি ছুটে চলেছেন। অবিরাম। কিন্তু পোপ সেই ব্যক্তি যিনি আপনার কৃতকাজের দিকে তাকাতে বলেন। আপনার তৈরি করা আরো আরো আরো ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের রাশ টেনে ধরতে বলেন। ব্যালেন্সের বাণী শোনান তার নির্দেশিত নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে। আজ আপনারা সবাই ক্লোন প্রাণীতে পরিণত হয়েছেন, আধুনিক সভ্যতার অভিন্ন একক। কিন্তু চার্চ বলে চলেছে আদ্যিকাল থেকে, আপনি আলাদা একজন মানুষ, এবং কর্মফল সম্পর্কে আপনাকে সজাগ থাকতে হবে। পুরনো দিনের কথা আরকী!

আপনারা পোপকে বাধ্য করেন ফোনে আলাপচারিতা করার জন্য, টিভি স্ক্রিনে উঠে আসার জন্য, কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য... কিন্তু চার্চ সেই প্রতিষ্ঠান যা আপনাদের আলাদা আলাদা মানুষ হিসাবে, একজন প্রাণী হিসাবে থাকতে বলে যেমনটা আমাদের থাকার কথা। গবেষণার নাম নিয়ে আপনারা পৃথিবীর আলো না দেখা শিশুর ভ্রূণ নষ্ট করে দেন। কিন্তু চার্চ বলে, তারও একটা আলাদা অধিকার ছিল।

আর এত কথার পরও, আপনারা বলেন, বিজ্ঞান বলে, গির্জা অবজ্ঞার পাত্র। কে বেশি অবজ্ঞার পাত্র? যে লোকটা বজ্রপাতের আলোকে দেখতে পায় না, নাকি সে ব্যক্তি যে অত্যুজ্বল ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করতে জানে না?

এই চার্চ আপনার দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যায়, পৌঁছে যায় প্রত্যেকের কাছে। আর এখনো, যতই আপনাদের কাছে আমরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যাই, ততই আপনারা আমাদের অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলে দেন। একটা প্রমাণ দেখাও যে ঈশ্বর বলে কেউ আছে, বলেন আপনি। আর আমি বলছি, আপনাদের আকাশ ছত্রখান করা অতিকায় টেলিস্কোপগুলো দিয়ে স্বর্গভেদ করুন, তারপর আমাকে জানান যে সেখানে ঈশ্বর বলে কেউ নেই।

এবার জলে ভরে গেল ক্যামারলেনগোর চোখ, বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল তার কণ্ঠ, প্রশ্ন তোলেন আপনারা চায়ের কাপে ঝড় তুলে, দেখতে কেমন তোমার ঈশ্বর? আমি জিজ্ঞেস করি, কোত্থেকে এই প্রশ্নটা এল? দু প্রশ্নের জবাব এক ও অভিন্ন। আপনারা কি বিজ্ঞানের আধুনিক খোলস না ছাড়িয়েই ঈশ্বরকে দেখতে পান না? টের পান না তার অজেয় মূর্তিমান উপস্থিতি? কী করে তার অস্তিত্ব না দেখেন আপনি বিজ্ঞানের একচক্ষু আয়নায়!

বিজ্ঞান, সর্বেশ্বর বিজ্ঞান, আপনি বলেন, প্রচার করেন, মাধ্যাকর্ষণের ভিতরে, এমনকি একটা মাত্র পরমাণুর ভরের ভিতরে দেখা যায় পুরো সৃষ্টি জগৎ। আসলে নিপ্রাণ একটা ধোঁয়াশা ছাড়া কিছুই নেই, কোথায় গেল স্বর্গ, কোথায় তার প্রাণসাগর? আমরা বলি, এই স্তম্ভিত করে দেয়া ব্যাপারটার ভিতরে কি ঈশ্বরের হাতের কাজ দেখা যায় না? আমরা কি এতই ক্ষমতাবান হয়ে গেলাম যে বিলিয়নের ভিতর থেকে সঠিক কার্ডটাকে এক তুড়িতে তুলে আনতে পারব? আমরা এতই সংকীর্ণ কী করে হই যে গাণিতিক একটা হিসাবের বেড়াজাল তৈরি করে দিয়ে ভেবে আপ্লুত হই যে আমাদের চেয়ে শ্রেয় আর কোন অস্তিত্ব নেই। কী সংকীর্ণমনা আমরা মেনে নিতে জানি না যে আমাদের চেয়ে ক্ষমতাবান কেউ থাকতে পারে।

আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হচ্ছে

ক্যামারলেনগোর কণ্ঠ, আপনাকে অবশ্যই একটা ব্যাপার বিশ্বাস করতে হবে। যখন আমরা, একটা প্রজাতি হিসাবে আমাদের চেয়ে শ্রেয়তর শক্তির উপস্থিতি অস্বীকার করি, আমরা আমাদের হিসাব করার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলি আত্মগরিমাময় হয়ে পড়ি। একচোখা দানব, যে নিজেকেই সবচেয়ে বড় বলে জানে।

বিশ্বাস... সকল বিশ্বাস... একটা কথাই জোর দিয়ে বলে, আমরা জানতে পারি, বুঝতে পারি না এমন কিছু একটার অস্তিত্ব ঠিক ঠিক আছে। আমরা সবাই গণ্য, একে অন্যের কাছে গণ্য, উচ্চতর বিশ্বাসের কাছে গণ্য। আজ ধর্ম হালকা হয়ে গেছে, একমাত্র কারণ, মানবজাতিই হালকা হয়ে গেছে। হয়ে গেছে পল্কা। যদি বাইরের লোকজন, ভ্যাটিকানের দেয়ালের বাইরের লোকজন আমাদের দেখতে পায়, দেখতে পায় এই গির্জাকে যেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি... একটা আধুনিক মিরাকল তারা দেখতে পাবেন... অপূর্ণ একটা ব্রাদারহুড, সাধারণ আত্মার একটা দল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলতে থাকা একটা বিশ্বের ক্ষমতা কজা করার চেষ্টা করছে।

চোখ ফেলল ক্যামারলেনগো সারা কলেজ অব কার্ডিনালসের উপরে। বিবিসি ক্যামেরাম্যান ঠিক তাই করল। ঘোরাল ক্যামেরা সিস্টিন চ্যাপেলের প্রান্তে প্রান্তে।

আমরা কি দানব? প্রশ্ন তুলল ক্যামারলেনগো, এই লোকগুলো কি ডায়নোসর? আমি? সত্যি সত্যি কি এই পৃথিবীর প্রয়োজন আছে এমন কোন কণ্ঠের যা দরিদ্রের প্রতিনিধি হবে; দুর্বল, প্রতারিত, জন্ম না নেয়া শিশুর পক্ষে কণ্ঠ মিলিয়ে আওয়াজ তোলার মত কোন প্রতিষ্ঠানের কি আদৌ প্রয়োজন আছে? এমন কোন মানুষের আদৌ কোন দরকার কি আছে আমাদের যারা, একেবারে দক্ষ না হলেও তাদের জীবনটা উৎসর্গ করবে মানুষকে নৈতিকতার সাইনবোর্ড দেখানোর কাজে, মূল পথ অনুসরণ করার কাজে, তাদের কোন প্রয়োজন কি পড়ে?

মর্টাটি টের পাচ্ছেন, ক্যামারলেনগো সজ্ঞানে হোক বা অচেতনতায়, একটা চমৎকার কাজ করে ফেলেছে। কার্ডিনালদের দেখিয়ে সে চার্চের উপর প্রাণ প্রতিষ্ঠা। করছে। গির্জাকে দেখাচ্ছে মানব কেন্দ্রীক প্রতিষ্ঠান রূপে। এখন আর ভ্যাটিকান সিটি কোন বিল্ডিং নয়, বরং কিছু মানুষের সমন্বয়। কিছু মানুষ, যারা সারাটা জীবন মানবজাতির জন্য উৎসর্গ করেছে, স্বীকার করেছে সবচেয়ে বড় ত্যাগ। ছুটে এসেছে সংসার জীবন থেকে। ঈশ্বরের জন্য ক্যামারলেনগোর মত মানুষগুলো অতিবাহিত করছে তার সারা জীবন।

আজ রাতে আমরা একটা চরম মুহূর্তে উপনীত হয়েছি। বলছে ক্যামারলেনগো, আমাদের কেউ জিঘাংসায় ভরা মানুষ নয়। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন–শয়তান, দুনীতি, অমরত্ব... দেখতেই পাচ্ছেন, তারা পাখা বিস্তার করেছে। বাড়িয়ে চলেছে তাদের শক্তি। অন্ধকারের শক্তি। এটাকে মোটেও হেলা করে দেখবেন না। মৃদু হয়ে গেল ক্যামারলেনগোর কণ্ঠ, আরো ক্লোজ-আপ নিল ক্যামেরা, সেই শক্তি, যত শক্তিমত্তই হোক না কেন, অজেয় নয়। শুভশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই। আপনার হৃদয়ের ধ্বক ধ্বক শব্দ শুনুন। শুনুন ঈশ্বরের বাণী। আমরা আবার এই ধ্বংসস্তুপের ভিতর থেকে নূতন রূপে আভির্ভূত হব।

এবার মর্টাটি বুঝতে পারলেন। এই হল সেই কারণ। কনক্লেভ ভেঙে ফেলা হয়েছে। কিন্তু তার পিছনে বড় কারণ ছিল। এ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই।

ক্যামারলেনগো এখন একই সাথে তার বন্ধুদের প্রতি এবং শত্রুদের প্রতি কথা বলছিল। সে বন্ধু-শত্রু সবার হৃদয়ে পৌঁছে গিয়ে আলোর সন্ধান দিয়ে পাগলামি বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছে উদাত্ত কণ্ঠে। এই ষড়যন্ত্রের নগ্নতা যে কেউ উপলব্ধি করবে এবং এগিয়ে আসবে।

তাকাল সামনে ক্যামারলেনগো, আমার সাথে প্রার্থণা করুন।

কলেজ অব কার্ডিনালস হাঁটু ভেঙে বসল। যোগ দিল তার প্রার্থণায়।

সিস্টিন চ্যাপেলের বাইরে, সেন্ট পিটারের চত্বরে, রোমে, রোমের বাইরে, সারা পৃথিবীতে, মানুষ নত হল। ভেঙে পড়ল হাঁটুতে। তারপর যোগ দিল প্রার্থণায়।

হ্যাসাসিন তার পুরস্কারকে ভ্যানে তুলল। তারপর মেয়েটার অনিন্দ্যসুন্দর রূপের একটু প্রশংসা না করে পারল না মনে মনে। মেয়েটার শরীর যে একেবারে কল্পনার মত, তা নয়, কিন্তু তার কোথায় যেন একটা শক্তিমত্তা আছে, টের পেয়েছে খুনি। এবং খুশি হয়ে উঠেছে তার মন।

পুরস্কারকে দেখতে দেখতে তৃপ্তিতে চোখ ভরে উঠছিল। হাতের ব্যাথার কথা মনেই নেই একদম। আর যেটুকু ব্যাথা হচ্ছে সেটাকে অবহেলা করা যায় সহজেই। একটা সান্ত্বনা আছে তার। যে লোকটা এই আঘাত দিল সে এখন হয়ত চিড়েচ্যাপ্টা হচ্ছে। তার বেঁচে থাকার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই।

দখলে নেয়া কয়েদিকে দেখে আরেকবার নেচে উঠল রক্ত। জামার নিচে হাত দিল। বুকে। ব্রার ভিতরে স্তনের আকৃতি একেবারে নিখুঁত। ইয়েস! দাঁত বের করে সে হাসে। চাওয়ার চেয়েও বেশি তুমি! সেখানে নিয়ে যাবে কিনা সেই চিন্তার সাথে যুঝতে যুঝতে অন্ধকারের ভিতরে হারিয়ে গেল খুনি ভ্যানটাকে চালিয়ে নিয়ে।

এবার আর প্রেসকে ঘটা করে জানাতে হবে না যে তৃতীয় খুনটা করা হয়ে গেছে। আগুনই যা জানানোর সব জানিয়ে দেবে।

***

সার্নে, সিলভিয়া আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে ক্যামারলেনগোর ঠিকানার সামনে। এর আগে সে কখনোই ক্যাথলিক হবার জন্য এত বেশি গর্বিত বোধ করেনি এবং সার্নে কাজ করার জন্য এত লজ্জিত হয়নি।

রিক্রিয়েশন উইং পেরিয়ে এসে সে দেখতে পেল প্রত্যেকে শোকাতুর এবং মোহাবিষ্ট। যখন সে কোহলারের অফিসরুমে ঢুকল, দেখতে পেল খাস কামরার সাত ফোনের প্রতিটাই তারস্বরে চিৎকার করছিল। এখানে মিডিয়ার ফোন আসবে না। এমন কোন নিয়ম নেই।

তাহলে কীসের ফোন এগুলো?

টাকা। এর মধ্যেই এন্টিম্যাটারের এই বিপুল পরিমাণ সৃজনের কথা জেনে গেছে সারা দুনিয়া। কাড়ি কাড়ি টাকা নিয়ে হাজার রকমের প্রতিষ্ঠান এখন একযোগে ভেঙে পড়বে সার্নের উপর।

সিস্টিন চ্যাপেলের ভিতরে, গুন্থার গ্লিক যেন হাওয়ায় ভেসে ভেসে এগিয়ে যাচ্ছিল ক্যামারলেনগোর পিছন পিছন। এই দশকের সবচেয়ে দামি লাইভ ট্রান্সমিশনটা শেষ করেছে গুন্থার গ্লিক আর ম্যাক্রি। আর কী ট্রান্সমিশন ছিল এটা। সম্মোহিত করে ফেলেছে ক্যামারলেনগো সারা দুনিয়াকে।

এখন, বাইরে বেরিয়ে এসে ক্যামারলেনগো, গ্লিক আর ম্যাক্রির দিকে ফিরে বলল, আমি সুইস গার্ডকে বলে দিয়েছি। ছবি সরবরাহ করবে তারা। ব্র্যান্ডেড কার্ডিনাল আর বিগত পোপের ছবিও থাকবে সেখানে। আগেই বলে রাখছি, ছবিগুলো মোটেও আনন্দদায়ক নয়। দগদগে পোড়া মাংসের চিত্র। কালো হয়ে যাওয়া জিহ্বার ছবি। কিন্তু আমি চাই আপনারা সেই ছবিগুলো বাইরে প্রচার করুন।

সিদ্ধান্ত নিল গ্লিক, অসময়ের ক্রিসমাস আসবে এখন ভ্যাটিকানের ভিতরে। মৃত পোপের ছবি দেবে সে আমাদের? এও কি সম্ভব?

আপনি কি শিওর? কণ্ঠ থেকে উত্তেজনাকে ঝেটিয়ে বিদায় করার চেষ্টা করতে করতে সে বলল।

নড করল ক্যামারলেনগো, সুইস গার্ড আপনাদের আরো বেশি কিছু দিতে যাচ্ছে। এন্টিম্যাটারের কাউন্ট ডাউনের লাইভ চিত্র।

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গ্লিক। ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছা করছে তার। কোন সাতজন্মের ভাগ্যে সে সাংবাদিকতায় যোগ দিয়েছিল?

ক্রিসমাস। ক্রিসমাস। ক্রিসমাস!

ইলুমিনেটি খুব দ্রুত জানতে পারবে যে, বলছে হিসহিস করে ক্যামারলেনগো, কিন্তু এখনো তার কণ্ঠে যাজক সুলভ কোমলতা, অনেক বেশি অতিরিক্ত করে ফেলেছে তারা।

এক রক্ত হিম করা নিঃসঙ্গতা নিয়ে নেমে এল কালিগোলা অন্ধকার। আলো নেই, বাতাস নেই, বেরুবার পথ নেই।

একটা অন্ধকূপের মত ফাঁদে পড়ে গেছে ল্যাঙডন। ফাঁদে আটকানো ইদুরের মত অনুভূতি তার। কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র নয় সে। এখনো, সরু হয়ে আসতে থাকা পথের নিচে শুয়ে শুয়ে চিন্তাকে সামনে প্রসারিত করার চেষ্টা করছে সে।

যে কোন যৌক্তিক কাঠামো নিয়ে ভাবার চেষ্টা করছে। যে কোন বিষয়। গণিত, মিউজিক, যে কোন বিষয়। একটা ব্যাপার থেকেই দূরে থাকতে চাইছে এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটাই তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে...।

আমি নডতে পারছি না। পারছি না দম নিতে।

একটু পর একটা ব্যাপার ভেবে যার পর নাই স্বস্তি পায় সে। হাত নডছে। দুহাতই নডছে। সাহস বেড়ে যায় অনেকখানি। হাতদুটো যথাসম্ভব উপরে তোলার চেষ্টা করে, নাড়ানো গেলো মাথার উপরে নেমে আসা ছাদটাকে। কিন্তু এ শুধুই অরণ্যে রোদন। বরং সে আশা করে, হাতটা যদি আটকে পড়ত,কী ভালই না হত! অন্তত কিছু বাতাস আসা যাওয়া করতে পারত সেখান দিয়ে। হাত হারানো দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার চেয়ে অনেক, অনেক শ্রেয়।

হাত উপরের দিকে তুলে দিতে গিয়ে সে এক পুরনো বন্ধুর হদিস পেল। মিকি তার সবজে মুখে চির অম্লান হাসি। টিকটিক করে যাচ্ছে ঘড়িটা ঠিকঠিক।

চারপাশের পিচকালো অন্ধকারে চোখ বুলায় সে, আর কোন আলোর উৎস কি আছে? নেই। এ হল গিয়ে গডড্যাম ইতালিয় স্থাপত্য। এর কোথাও কোন ফাঁক থাকবে না। একেবারে নিরেট, একদম নিখুঁত। এ ব্যাপারটা সগর্বে সে তার ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে এসেছে এ্যাদ্দিন। কারারা মার্বেলের শক্ত প্রাচীর।

কিন্তু উদ্যমের কাছে সবকিছু নতমুখ হয়ে যায়।

জিনিসটাকে উপরে তোল! বলল সে জোরে জোরেই, হাড্ডিতে চাপ অনুভব করেও উপরের দিকে বল প্রয়োগে তার বিন্দুমাত্র উৎসাহের কমতি নেই। বাক্সটা একচুল নডল। চোয়াল শক্ত করে আবার চাপ দিল। বোল্ডারের মত ভারি হয়ে থাকা জিনিসটা এবার উঠল এক ইঞ্চির চার ভাগের একভাগ। চারপাশ ভরে গেল আলোর পরশে। তার পরই ভারি পাল্লার মত নেমে গেল বাক্সের মুখ।

মাথা নিচু করে হাঁপাচ্ছিল সে। অন্ধকারে। পা দিয়ে চাপ দেয়ার বৃথা চেষ্টাও কম করা হল না। যেখানে হাঁটু সোজা করার যো নেই সেখানে পা দিয়ে ধাক্কা দেয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

দম বন্ধ করে দেয়া আতঙ্ক গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে। টের পাচ্ছে ল্যাঙডন, গুটিয়ে আসায় বিরাম নেই আশপাশটার। আতঙ্কে মুষড়ে গিয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বসল সে। সাধারণ বোধবুদ্ধিও আচ্ছন্ন হয়ে এল।

সার্কোফাগাস! জোরে জোরে বলছে সে, এলোমেলো হয়ে আসছে চিন্তাধারা।

সার্কোফাগাস এসেছে গ্রিক শব্দ সার্ক্স থেকে যার অর্থ মাংস। আর ফাগেইন মানে খাওয়া। আমি এমন একটা বাক্সে আটকা পড়ে গেছি যেটা তৈরি হয়েছে মাংস ভক্ষণের জন্য।

ভাবনা চিন্তা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। গুটিয়ে আসছে চারপাশ। মাংস কী করে খাওয়া হয় একটা হাড় থেকে, কী করে নগ্ন হয়ে যায় হাড়, খসে খসে পড়ে মাংস, সে চিন্তায় বিভোর হয়ে গেল সে। লোপ পেল কান্ডজ্ঞান। হয়ে পড়ল সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কিন্তু একই সাথে, একটু পর পর সে জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে। চলছে মাথা এ সময়টাতেই।

বন্ধ হয়ে আসা কফিনের চারধারে হাতড়াতে হাতড়াতে পেয়ে গেল সে দুটো হাড়। রিব কি? কে কেয়ার করে? যা ইচ্ছা তা হোক। একটা চিন্তাই মাথায় গিজগিজ করছে। কোনক্রমে ঢাকনাটা একটু আলগা করতে হবে, কোনক্রমে সেখানে একটা হাড্ডির টুকরা ঢুকিয়ে দিতে হবে, তাহলেই বগল বাজানোর মত বাতাস আসা যাওয়া করবে, টিকে যাবে সে এ যাত্রা।

কোনমতে যদি...

সর্বশক্তি দিয়ে সে এক হাত উপরে তোলে; নিচে, মেঝেতে রাখে অন্য হাত; তারপর ধাক্কা দেয় প্রাণপণে। কিন্তু পাথুরে কফিনের হৃদয় ভরে না। অরণ্যে রোদন করে যায় সে প্রচন্ড আক্রোশে। চেষ্টা করে যায় প্রাণপণে। একবার মনে হল কাজ হয়েছে, তারপর যে-সেই।

চারপাশ আরো আরো গুটিয়ে আসছে। বন্ধ হয়ে আসছে মহামূল্য অক্সিজেনের অভাবে। বুঝতে পারছে ল্যাংডন, এখন দু হাত কাজে লাগাতে হবে, ধাক্কা দিতে হবে উভয় হাত দিয়ে। এ-ও বুঝতে পারে, সময় শেষ হয়ে আসছে। পরে আর এ চেষ্টা করার মত দম থাকবে না বুকে।

আবার নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে প্রান্তটায় কোনমতে সে হাড়ের কোণাটা ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়, ঠেলে দেয় শরীরটাকে। কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিতে থাকে হাড়টাকে। তুলে আনে দু হাত উপরে, সতর্কভাবে।

ধাক্কা দিয়ে কাজ না হওয়ায় ঘেমে নেয়ে একাকার হয় সে। তার কাছে সবচেয়ে অতিষ্কের ব্যাপার হল বদ্ধ জায়গা; সাধারণ অবস্থায়ও এটা সহ্য হয় না, অথচ আজ এক দিনে এমন দুটো ঘটনা ঘটল। আটকে থাকতে হল দমবন্ধ জায়গায়।

সর্বশক্তি এক হয়ে জান্তব একটা ধাক্কা পৌঁছে যায় বাক্সটার প্রান্তে প্রান্তে, একটু লাফিয়ে ওঠে উপরের পাথুরে ঢাকনাটা, কাঁধের একটা ধাক্কায় অনেকটা সেঁধিয়ে যায় হাড়। ভারি পাথর নেমে আসে মুহূর্তে, ভেঙে যায় হাড়, কিন্তু আশার একটা ক্ষীণ আলো হয়ে বাইরের রঙ দেখা দেয় কফিনের প্রান্তে। ফাঁকা হয়েছে একটু।

খিতিয়ে পড়ে শ্রান্ত ল্যাংডন। একটাই আশা, চেপে আসা গলার চারপাশের দমবন্ধ আবহ কমে আসবে। অপেক্ষা করল সে। কিন্তু মুহূর্তগুলো উড়ে যাবার সাথে সাথে পরিস্থিতি আরো আরো সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। টের পাচ্ছে ঠিক ঠিক, বাতাস যে আসছে না, তা নয়, কিন্তু তাতে একজন মানুষের চাহিদা পূরণ হবে না।

ভেবে পায় না ল্যাংডন, এটুকুতে জীবন চলবে কিনা। আর যদি ব্যাপারটা তাই হয়, কতক্ষণ টিকে থাকা যাবে? আর যদি টিকেও যায়, কোন লোক ভাববে যে সে এখানে ফাঁদে পড়ে আছে?

হাতের ঘড়ি দেখার জন্য চোখ এগিয়ে নেয় সে, দেখে মিকি কী বলছে। দশটা বারো। শেষ খেলা খেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে ঘড়ির ছোট্ট ডায়ালের একটা বাটন চেপে ধরে।

আবার লুপ্ত হচ্ছে সচেতনতা, আবার গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে পুরনো আতঙ্ক, আবার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে। চেপে আসছে চারধারের দেয়াল। অনেকবার সে একটা খেলা খেলেছে এমন দমবন্ধ পরিবেশে, ট্যাক্সির ছোট ক্যাবে, ছোট কোন ঘরে, পিচ্চি লিফটে... দাঁড়িয়ে আছি কোন খোলা প্রান্তরে, চারপাশে খেলা করছে খোলা বাতাস।

কিন্তু এবার, কোন কাজেই লাগল না চিন্তাটা। যে দুঃস্বপ্ন তার তারুণ্য থেকে পিছু ধাওয়া করে আসছে সেটাই গ্রাস করে নিচ্ছে ল্যাংডনকে...

এখানকার ফুলগুলো দেখতে পেইন্টিংয়ের মত। সমভূমি ধরে ছোটাছুটি করতে করতে বাচ্চাটা চেষ্টা করল ভাবতে যে তার বাবা-মা এগিয়ে আসছে পিছনে পিছনে। কিন্তু বাবা-মা ব্যস্ত ক্যাম্পের খুঁটি পুঁতে দেয়ার কাজে।

বেশি দূরে যেও না। বলেছিল ছেলেটার মা।

বনের ভিতরে হারিয়ে যেতে যেতে মায়ের কথার থোড়াই পরোয়া করেছে সে।

সামনে অবারিত সবুজ ঘাসের সমভূমি দেখে থমকে যায় সে, এগিয়ে আসে একসাথে জবুথবু হয়ে পড়ে থাকা কতগুলো পাথরের সামনে। ভেবে ঠিক করল সে, এটা নিশ্চয়ই কোন প্রাচীণ ঘরে গাঁথুনি। এর কাছে যাবার তেমন কোন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এগিয়ে যেতে হল। সেখানে পড়ে আছে এক মহিলার চপ্পল। এগিয়ে গেল সামনে, এবং এমন এক ফুল দেখতে পেল যেটা আর কখনো দেখেনি। দেখেছে শুধু বইতে।

আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে গেল ছেলেটা ফুলের কাছে। বসল হাঁটু গেড়ে। তারপরই টের পেল, পায়ের নিচের মাটি কেমন যেন ফাঁপা ফাঁপা। তার পরই বুঝতে পারল, ফুলটা এক ভিন্ন জগতে জন্ম নিয়েছে, জন্ম নিয়েছে ফাঁপা মাটির উপরে, সেখানে থাকা এক কাঠের মেঝের উপর, পচা কাঠের মেঝে।

উত্তেজনায় চমকে গিয়ে, বাসায় তার পুরস্কার নিয়ে যাবার লোভে, এগিয়ে যায় বাচ্চা ছেলেটা সামনে, হাত বাড়ায় ফুলের গোড়ার দিকে।

কিন্তু কখনোই সেখানে পৌঁছতে পারেনি সে।

একটা প্রচন্ড কাঁপুনি দিয়ে দ্বিধা হয়ে গেল ধরণী।

তিন সেকেন্ড ধরে পড়তে পড়তে ছেলেটা ঠিক ঠিক বুঝে গেল, মরতে চলেছে সে। নামতে নামতে হাড় গুড়ো করে দেয়া সংঘর্ষ এগিয়ে এল। এরপর সে কোন ব্যথা টের পায়নি। টের পেয়েছে কেবল কোমলতা।

এবং ঠান্ডা।

নামল সে কাদাজলের উপরে। নরম কাদাজল। ব্যথা পেল না, কিন্তু পেল ভয়। হৃদপিন্ড কাঁপানো ভয়, আর সে সাথে শীতলতা। চারপাশ ঠান্ডা, চারপাশে দমবন্ধ করা সোদা গন্ধ, বাতাসের অভাব, আলোর অভাব।

আলো আসছে কেবল উপর থেকে।

অনেক মাইল উপর থেকে, মনে হল।

মেঝে হাতড়ে বেড়াল সে, উপরে উঠে যাবার মত কিছু একটা খুঁজে বের করার আসায়। কিন্তু কোন লাভ নেই, শুধুই নিরেট পাথর।

আস্তে আস্তে উপলব্ধি করল, এখানে জলীয়তা থেকে তৈলাক্ততা বেশি, পড়ে গেছে একটা পরিত্যক্ত তেলের ডিপোতে, পড়ে গেছে অন্ধকার এক কবরখানায়।

চিৎকার করল বাচ্চাটা।

চিৎকার করতেই থাকল।

শুনল না কেউ। খুব বেশি শব্দ যে বাইরে যেতে পারল তাও না। হীরে ধীরে উপরের আলোর রেখা ক্ষীণ থেকে ক্ষতির হয়ে এল।

নেমে এল রাতের অন্ধকার।

গুটিয়ে আসছে সময়, এগিয়ে আসছে আরো আরো আঁধার। হাতড়ে বেড়াল সে, চেষ্টা করায় কোন বিরতি ছিল না, চিৎকার করল, হল্লা করে মরল। সে ভয়ে আধমরা হয়ে গেল ব্যাপার দেখে, চারপাশ থেকে মাটি খসে খসে পড়ছে তার ছোঁয়া লাগার সাথে সাথে, জ্যান্ত কবর দিচ্ছে তাকে। আশা করে প্রতি মুহূর্তে, কোন না কোন আওয়াজ উঠবে তাকে উদ্ধারের আশায়, কিন্তু আশার গুড়ে বালি, কোন শব্দ নেই। কবরের নৈশব্দ। নিজের কণ্ঠ গুমরে মরল ভিতরে ভিতরে... স্বপ্নের মত।

রাত যত বাড়ল, গহীন হয়ে এল গর্ত, অন্তহীন হয়ে উঠল। দেয়ালগুলো চেপে এল এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে। চেপে ধরল ছেলেটা দেয়াল, সরিয়ে দিতে চাইল দূরে। হাঁপিয়ে উঠে হাল ছেড়ে দিল শেষে। একেবারে নিথর হয়ে পড়া পর্যন্ত তার জ্বলন্ত ভয়কে তাড়া করে ফিরল হিম শীতলজল।

উদ্ধারের দল হাজির হয়ে বাচ্চাটাকে একেবারে ভয়ে গুটিয়ে যাওয়া, অস্থির, হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য অবস্থায় পেল। হাতড়ে বেড়াচ্ছিল সে জল। দুদিন পরে বোস্টন গ্লোবে হেডলাইন এল, ক্ষুদে সাঁতারু যা পেরেছিল।

টাইবার নদীর পাড়ে দানবীয় পাথুরে বাসায় যখন হ্যাসাসিনের ভ্যান হাজির হল, পুরষ্কারকে সে সাথে করে উঠে এল উপরে... প্যাচানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল, একটাই আনন্দ তার, পুরস্কারের ওজন খুব একটা বেশি নয়।

হাজির হল সে দরজায়।

দ্য চার্চ অব ইলুমিনেটি, গোঁ গোঁ করল সে, ইলুমিনেটির আদ্যিকালের মিটিং রুম। কে কল্পনা করবে যে এটা এখানে আছে!

ভিতরে, একটা ডিভানের উপর রেখে দিল সে মেয়েটাকে। তারপর দক্ষহাতে তার হাত বেঁধে দিল পিছমোড়া করে, বেঁধে দিল পা। মনে মনে হিসাব কষে চলে খুনি, তার শেষ কাজটা করে তবে এই উপহারকে উপভোগ করা যাবে। ওয়াটার।

তার পরও, লোভের চিন্তা উন্নাষিক করে তুলল তাকে, হাত বাড়াল সে ভিট্টোরিয়ার কোমরের দিকে। কোমল, উঁচু। মেয়েটার শর্টসের ভিতর তার কালো হাতের আঙুলগুলো হাতড়ে বেড়াল। উঁচু।

থামল সে। বলল নিজেকে, আবেগ কমিয়ে এনে... কাজ। কাজ বাকি আছে, এখনো।

চেম্বারের উঁচু, পাথুরে ব্যালকনির দিকে এগিয়ে গেল সে। বিকালের মৃদু হাওয়া ঠান্ডা লাগিয়ে দিল তার হাড়ে। টাইবারের শান্ত বাতাসে একটু জিরিয়ে নেয় খুনি। মাত্র পৌনে এক মাইল দূরের সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার দিকে তাকায় সে, শত শত প্রেস লাইটের আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে সেখান থেকে।

তোমার শেষ ঘণ্টা, বলল সে নিজেকে জোরে জোরে শুনিয়ে, মনে মনে কল্পনা করে নিল ক্রুসেডের সময় শহীদ হওয়া হাজার হাজার মুসলমানের কথা, আজ মধ্যরাতে, তোমরা দেখা করবে তোমাদের গডের সাথে।

পিছনে মৃদু শব্দ তুলল মেয়েটা। ঘুরে দাঁড়াল হ্যাসাসিন। আশা করল মেয়েটা জেগে উঠবে। কোন মহিলার চোখে নগ্ন ভয় দেখার মত মজার আর কী আছে?

কিন্তু একটা ব্যাপার মনে খোঁচা দিচ্ছে। সে এখানে না থাকার সময়টায় মেয়েটা অজ্ঞান থাকলেই ভাল হয়। মেয়েটা শুয়ে আছে, তার মোটেও জোর নেই এমন কঠিন বাঁধন আলগা করার, কিন্তু তবু, সাবধানের মার নেই। আর শক্তি বেশি থাকলেই আনন্দ বেশি, সে মরা পার্টনার পছন্দ করে না। তেজ খুব ভাল জিনিস...

সোজা তার ঘাড় তুলে ধরল খুনি। উঁচু করল। তারপর যেভাবে অনেকবার অজ্ঞান করার কাজ করেছে, সেভাবে চাপ দিল মাথার নিচে। আবার নেতিয়ে পড়ল মেয়েটা।

বিশ মিনিট, অপেক্ষা কর আমার জন্য।

কাজটা শেষ হয়ে গেলে... অপেক্ষার পালা। তারপর, এগিয়ে আসবে সে, উপভোগ করবে। এবং তার চাহিদা মিটাতে মিটাতে মারা পড়লে, সে এগিয়ে আসবে চার্চ অব ইলুমিনেটির বারান্দায়, তাকিয়ে থাকবে সোজা ভ্যাটিকান সিটির দিকে। খ্রিস্টবাদের কারখানা। তাকিয়ে থাকবে সে অপলক। দেখবে স্বপ্ন সাকার হতে।

দেখবে, ভ্যাটিকান মধ্যরাতে কীভাবে আলোর ফুলকি ছোটায়।

কাউচে পুরস্কারটাকে রেখে এগিয়ে গেল হ্যাসাসিন নিচের দিকে। শেষ কাজ।

জল। ওয়াটার। শেষ কাজ।

আগের তিনবারের মত, দেয়াল থেকে একটা মশাল নিয়ে এগিয়ে গেল সে।

ভিতরে একজন বুড়োমত লোক দাঁড়িয়ে আছে। বয়েসি, একাকী।

কার্ডিনাল ব্যাজ্জিয়া, বলল সে, এখনো প্রার্থনা করেননি আপনি?

ইতালিয় লোকটার চোখে ঝরে পড়ল আগুন, নির্ভয়, শুধু তোমার আত্মার জন্য।

হ্যালোন গ্যাস দিয়ে সান্তা মারিয়া ডেলা ভিট্টোরিয়ার আগুন নিভাচ্ছে ছজন ফায়ারম্যান। তারা পম্পেইয়েরি। ভ্যাটিকান তাদের একটা বাড়তি বৃত্তি সব সময় দিয়ে আসছে যেন ভ্যাটিকানের সম্পদের সঠিক যত্ন আত্তি নেয়া হয়। জল ব্যবহার করা অনেক সহজ এবং খরচও কম। কিন্তু ভিতরের দেয়ালচিত্রগুলোর দিকে মনোনেবেশ করতে হবে। অক্ষত রাখতে হবে সেগুলোকে।

হররোজ পম্পেইয়েরি অনেক আগুন নিভায়, তাদের এ কাজ একেবারে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আজ তারা যা দেখল সেটার কথা কখনো ভুলবে না। এভাবে কোন হত্যাকান্ড সংঘটিত হতে পারে তা তাদের কল্পনাতেও ছিল না।

খানিক ঝুলে থাকা, খানিক ভেসে থাকা, খানিক সিদ্ধ হওয়া, খানিক পুড়ে যাওয়া লোকটার কথা তারা কোন দুঃস্বপ্নেও ভুলবে না।

আর দুঃখজনক হলেও সত্যি, আর সব বারের মত, প্রেস ভ্যানগুলো ফায়ার ডিপার্টমেন্টের আগেই হাজির হয়েছে। চার্চের সমস্যা মিটিয়ে ফেলার আগে তারা অযুত নিযুত ফ্রেম নিয়ে ফেলবে ভিতরের।

অবশেষে যখন ফায়ারম্যানরা লোকটাকে নামিয়ে আনল মেঝেতে, কারো কোন সন্দেহ ছিল না কে তিনি।

কার্ডিনাল গাইডেরা, ফিসফিস করল একজন, ডি বার্সেলোনা।

লোকটা নগ্ন, গায়ের নিম্নাংশ একেবারে কালো। সেখান থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। চুইয়ে পড়ছে ফাটাগুলো দিয়ে।

সাথে সাথে একজন ফায়ারম্যান বমি করে দিল। অন্যজন বাইরে গেল শ্বাস নিতে।

কার্ডিনালের বুকে আকা সিম্বলটা আসলেই সত্যিকার আতঙ্ক। স্কোয়াড চিফ রাজ্যের আতঙ্ক চোখে নিয়ে চারধারে ঘুরল। চক্কর দিল লাশটাকে। লালভারো ডেল ডিয়াভোররা, বলল সে নিজের মনে।

স্বয়ং শয়তান এ কাজ করেছে। সেই বাল্যকালের পর, প্রথমবারের মত নিজেকে ক্রস করল স্কোয়াড চিফ।

উন অল্টো কর্পো! কেউ একজন চিৎকার করল। আরেকজন ফায়ারম্যান আরো একটা মরদেহ উদ্ধার করতে পেরেছে।

পরের লোকটাকেও মুহূর্তে চিনে ফেলল চিফ। কমান্ডান্টে ওলিভেট্রিকে রোমের সব বাহিনীর সব হর্তাকতাই মোটামুটি চেনে। কল করল চিফ ভ্যাটিকানে। কিন্তু সেটার সব লাইনই ব্যস্ত। জানে সে, এতে কিছু যায় আসে না। সুইস গার্ড এক মিনিটের মধ্যেই এটা দেখতে পাবে টিভিতে।

সামনে আরো বিভৎস কিছু ব্যাপার লক্ষ্য করল। মঞ্চের নিচে বুলেটের অনেকগুলো দাগ! বিদ্ধস্ত হয়ে পড়েছে মঞ্চটা। সেখান থেকে নেমে আসছে পাথুরে মেঝে। তার নিচেই একটা কফিন।

এ কাজ আমাদের নয়। পুলিশ আছে, আছে গির্জার লোকজন। নিজেকে শোনায় লোকটা। ঘুরে দাঁড়ায়।

ঘুরে দাঁড়াল যখন সে, দাঁড়িয়ে পড়ল। কফিন থেকে আসতে থাকা একটা শব্দ শুনতে পেল। এমন কোন শব্দ কখনোই কোন ফায়ারম্যান শুনতে চায় না।

বোম্বা! চিৎকার করল সে আবার, টুভিফিওরি!

বোমার স্কোয়াড যখন কফিনটাকে উদ্ধার করল, একটা চিক্কার দিল তারাও।

মেডিকো! মেডিকো!

ওলিভেট্টির পক্ষ থেকে কোন সাড়া এসেছে? জিজ্ঞেস করল ক্যামারলেনগো, রোচার যখন তাকে পোপের অফিসে নিয়ে এসেছে।

না, সিনর, আমি সবচেয়ে ভয়ংকর সম্ভাবনার আশংকা করছি।

যখন রোচার তাকাল ক্যামারলেনগোর দিকে, ক্ষিপ্ত হয়ে বলল চ্যাম্বারলেইন, আজ রাতে এখানে করার মত আর কোন কাজ নেই আমার। মনে হয় অনেক বেশিই করে ফেলেছি। এখন এ অফিসে বসে বসে একটু প্রার্থনা করতে চাই। আশা করি কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না। বাকীটা ঈশ্বরের হাতে।

ইয়েস, সিনর।

সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, ক্যাপ্টেন। ক্যানিস্টারটা খুঁজে বের কর।

আমাদের সার্চ চলছে, ইতস্তত করল রোচার, মনে হচ্ছে এত সুন্দর করে কখনো কোন বোমা লুকিয়ে রাখা যায়নি।

ক্যামারলেনগো তাকাল বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে। তার ব্রেন আর কাজ করছে না। ঠিক তাই, ঠিক ঠিক এগারোটা পনের। এখনো যদি চার্চ ক্ষতির সম্ভাবনায় থাকে, আমি তোমাকে বলব, কার্ডিনালদের সরিয়ে নাও। তাদের নিরাপত্তা তোমার হাতে ন্যাস্ত করছি। একটা কথাই বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এই লোকগুলোকে এখান থেকে সরিয়ে নাও। সরিয়ে নাও তাদের সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে। আর পুরো দুনিয়ার সাথে দাঁড় করিয়ে দাও।

আমি চাই না এ চার্চের অন্তিম মুহূর্তে বয়োবৃদ্ধ লোকগুলো চোরের মত পিছনের খিড়কি দিয়ে পালিয়ে যাক।

খুব ভাল, সিনর। কিন্তু আপনি? শোয়া এগারোটায় আমি কি আপনার জন্যও আসব?

কোন প্রয়োজন নেই।

সিনর?

যখন স্পিরিট আমাকে সরাবেন, তখনি সরব আমি।

ভেবে পাচ্ছে না রোচার, ক্যামারলেনগো কি জাহাজের সাথে তলিয়ে যেতে চাইছেন?

পোপের অফিসের দরজা খুলল ক্যামারলেনগো, ফিরে তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে, আসলে... বলল সে, একটা ব্যাপার আছে এখানে।

সিনর?

আজ রাতে এ অফিসে একটা কেমন যেন শীতলতা ভর করেছে। শিউরে উঠছি আমি।

ইলেক্ট্রিক পাওয়ার অফ করে দেয়া হয়েছে। আমাকে আপনার জন্য একটু আলো জ্বেলে দিতে দিন।

ক্লান্ত হাসি দিল ক্যামারলেনগো, থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ, ভেরি মাচ।

***

পোপের অফিস থেকে বেরিয়ে গেল রোচার। মাতা মেরির একটা মোহনীয় মূর্তির সামনে আলোর জন্য প্রার্থনা করছে ক্যামারলেনগোর ঝকঝকে মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে একটা কালো মূর্তি, দেখতে কষ্ট হয়। খুব।

রোচার নিচের দিকে নেমে যাওয়ার সময় একজন গার্ড এগিয়ে এল। দৌড়ে আসছে। এমনকি মোমের আলোতেও ঠিক ঠিক চিনতে পারল ক্যাপ্টেন। এ হল তরুণ লেফটেন্যান্ট চার্ট্রান্ড। চির সবুজ, তরুণ, উদ্দাম।

ক্যাপ্টেন, বলল চার্ট্রান্ড, হাতে একটা সেলফোন ধরে রেখে, আমার মনে হয় ক্যামারলেনগোর প্রার্থনায় কাজ হয়েছে। আমরা একজন কলারকে পেয়েছি যে আমাদের সাহায্য করবে। ভ্যাটিকানের এক প্রাইভেট এক্সটেনশন থেকে ফোন করেছে সে। আমার কোন ধারণাই নেই কী করে সে নাম্বারটা পেল।

থেমে গেল রোচার, কী?

সে শুধু র‍্যাঙ্কিং অফিসারের সাথে কথা বলবে। ওলিভেট্টির কোন খবর?

না, স্যার।

রিসিভার নিল সে, দিস ইজ ক্যাপ্টেন রোচার। আমি এখানকার র‍্যাঙ্কিং অফিসার।

রোচার, বলল কণ্ঠটা, আমি আপনার কাছে আমার পরিচয় ব্যখ্যা করব। তারপর জানাব এরপর কী করবেন আপনারা।

তারপর কলার কথা বন্ধ করে দিল। ঝুলিয়ে দিল ফোন। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল রোচার। এবার সে ঠিক ঠিক বুঝতে পারল কার কাছ থেকে সে আদেশ নিচ্ছে।

সার্ন। কোহলারের ভয়েস মেইলে কোথা থেকে এত শত শত কেনাবেচার আবেদন আসছে সেটা ভেবে পায় না সিলভিয়া। ডিরেক্টরের ঘরের প্রাইভেট লাইন আবার যখন বাজতে শুরু করল, লাফ দিয়ে উঠল সিলভিয়া। কারো কাছে এ নম্বর নেই। উঠে এল সে।

ইয়েস?

মিসেস বডেলক? ডিরেক্টর কোহলার বলছি। আমার পাইলটের সাথে যোগাযোগ কর। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার জেট প্রস্তুত চাই।

রবার্ট ল্যাঙডনের কোন ধারণাই নেই সে কতক্ষণ যাবৎ অজ্ঞান ছিল, কোথায় আছে, কীভাবে আছে। শুধু চোখ মেলে দেখতে পেল উপরে আছে একটা গম্বুজ। এটাও কি একটা গির্জা? কিছু একটা তার মুখে চেপে বসে আছে।

অক্সিজেন মাস্ক?

টেনে তুলে ফেলল সেটাকে। ঘরের গন্ধ বীভৎস। যেন মাংস পোড়ানো হয়েছে।

মাথায় একটা দপদপ ব্যথা টের পায় সে। তাকায় আশপাশে। সাদা পোশাক পরা এক লোক হাঁটু গেড়ে বসে আছে তার পাশে, প্রার্থনা করছে।

রিপোসাটি! বলল লোকটা, সোনো ইল প্যারামেডিকো!

মাথা চক্কর দিচ্ছে তার, উপরের সাদা ধোঁয়ার মত। কোন জাহান্নামের ব্যাপার ঘটেছে? অসংলগ্ন ভাবনা আর ভয় জাপ্টে ধরল।

টোপো সালভাটোরে! বলল প্যারামেডিক, লোকটা তাহলে যাজক নয়! মাউস... বলছে!

মাউস বলছে!

মিকি মাউস ঘড়ির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল প্যারামেডিক। সাথে সাথে ল্যাঙডনের চিন্তাভাবনা গুছিয়ে আসতে শুরু করল। মনে পড়ে গেল, সে এ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল। ঘড়ির দিকে আলস্যে তাকাতে তাকাতে টের পেল সে, সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। দশটা আটাশ।

সাথে সাথে চট করে উঠে বসল সে।

আর ঠিক তখনি, সব ব্যাপার মনে পড়ে গেল এক ঝটকায়।

ফায়ারচিফ আর তার কয়েকজন লোকের সাথে দাঁড়াল ল্যাঙডন। প্রশ্নবাণে তাকে বিদ্ধ করছে লোকগুলো।

শুনছে না ল্যাঙডন। তার নিজের কাছেই প্রশ্নের কোন শেষ নেই। দুলছে তার সমস্ত শরীর। কিন্তু সে জানে, আলসেমি করে সময় কাটানোর মত পরিস্থিতি নেই।

একজন ফায়ারম্যান এগিয়ে এল গির্জার অপরপ্রান্ত থেকে, আমি আবারও চেক করেছি, স্যার। দুটো শরীর পাওয়া গেছে। কার্ডিনাল গাইডেরা আর সুইস গার্ড কমান্ডার। এখানে কোন মহিলার কেশাগ্রও নেই।

গ্রাজি, বলল ল্যাঙডন, আতঙ্কের একটা আবহ তার শিরদাঁড়া বেয়ে উপরে উঠে আসছে। মনে আছে স্পষ্ট, ভিট্টোরিয়ার অচেতন দেহ মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেছে সে। এখন কী করে উধাও হয়ে গেল মেয়েটা? কীভাবে হাপিস হয়ে গেল? একমাত্র যে ব্যাখ্যাটা উঠে আসে তার কোন আগাপাশতলা নেই। ফোনে যে কথাগুলো বলেছিল হ্যাসাসিন তা ভেবে আতঙ্কে শিউরে ওঠে ল্যাঙডন।

তেজি মেয়ে। ভালই লাগছে আমার। এ রাতটা ফুরিয়ে যাবার আগেই আমি হয়ত তোমার দেখা পাব। আর যখন পাব...

চারপাশে চোখ রাখল ল্যাঙডন, সুইস গার্ড কোথায়?

এখনো যোগাযোগ স্থাপন করা যায়নি। ভ্যাটিকানের সব লাইন জ্যাম হয়ে গেছে।

উত্তেজনার বাঁধভাঙা জোয়ারে ল্যাঙডন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। একই সাথে একাকী বোধ আড়ষ্ট করে তুলল তাকে।

মারা পড়েছে ওলিভেট্টি!

কার্ডিনাল নিহত।

পাওয়া যাচ্ছে না ভিট্টোরিয়াকে!

জীবনের আধঘণ্টা এক পলকে উধাও হয়ে গেল।

বাইরে প্রেসের কোলাহল ঠিক ঠিক টের পাওয়া যায়। তৃতীয় কার্ডিনালের হত্যাকান্ডের চিত্র যে ঠিক ঠিক তাদের হাতে চলে গেছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। হয়ত এখন পৃথিবীজুড়ে তা প্রচারিত হচ্ছে। মনে হয় এতোক্ষণে ক্যামারলেনগো ঠিক ঠিক করণীয় ঠিক

করে নিয়েছে।

খালি করে ফেল ড্যাম ভ্যাটিকান! অনেক খেলা হল! হেরে ভূত হয়ে গেছি আমরা।

ল্যাংডন ভেবে পায় না, এই এতটুকু সময়ের মধ্যে কী হয়ে গেল। কী কী ব্যাপার তাকে এখানে এনে জড়িয়ে ফেলল–ভ্যাটিকান সিটি রক্ষার কাজে সহায়তা করা, চার কার্ডিনালাকে উদ্ধারের অভিযান, বছরের পর বছর ধরে যা নিয়ে সে গবেষণা করে যাচ্ছে সেই প্রাচীণ ব্রাদারহুডের পিছু ধাওয়া করা, মুখোমুখি হওয়া এই সব ব্যাপার উবে গেছে তার মন থেকে। যুদ্ধ আর নেই। হেরে গেছে তারা। এক নতুন লক্ষ্য গড়ে উঠেছে তার ভিতরে। আর সব হয়ে গেছে হাওয়া।

খুঁজে বের কর ভিট্টোরিয়াকে!

ভিতরটায় কেমন যেন শূণ্যতা ভর করেছে। সে জানে, ঘটনাক্রম দুজন মানুষকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এত কাছে আনতে পারে যতটা সাধারণ সময়ে এক যুগ ধরেও হয় না। ব্যাপারটাতে ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে সে আজ। ভিট্টোরিয়ার অনুপস্থিতিতে সে এমন এক বোধ অনুভব করে ভিতরে ভিতরে, অনেক বছর ধরে যা তার ধারেকাছে ঘেঁষতেও পারেনি। একাকীত্ব! এই শোকই এনে দিল অপার শক্তি।

মাথা থেকে আর সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ল্যাংডন বিনা দ্বিধায় এগিয়ে গেল সামনে। তার মনে একটা চিন্তা বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে। উপভোগের চেয়ে বেশি হয়ে যেন খুনির মনে কাজটা দেখা দেয়। তা নাহলে... ল্যাংডন জানে, দেরি হয়ে গেছে বড়। না, বলে সে নিজেকে, তোমার হাতে আরো অনেক সময় আছে।

দ্য লাস্ট অল্টার অব সায়েন্স, ভাবে সে, বিভোর হয়ে, আরো একটা কাজ বাকি আছে খুনির 1 আর্থ। এয়ার। ফায়ার। ওয়াটার।

হাতের ঘড়ির দিকে মনোযোগ দেয় সে। ত্রিশ মিনিট। বার্নিনির এক্সটাসে অব সেন্ট টেরেসার সামনে থেকে ফায়ারম্যানকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। এবার, বার্নিনির মার্কারের দিকে তাকায় সে, ল্যাংডনের মনে কোন দ্বিধা নেই কিসের দিকে তাকাচ্ছে সে।

লেট এ্যাঞ্জেল গাইড ইউ অন ইউর লফটি কোয়েস্ট...

সাধুর আশপাশে, আগুনের শিখার পিছনে আছে এ্যাঞ্জেল। বার্নিনির ভেসে থাকা ফেরেশতা। আগুনের শিখা দেখায় তার হাতের বর্শা। চার্চের ডানপাশে দিক নির্দেশ করছে এ্যাঞ্জেলের বর্শা। সেখানে কিস্যু নেই। কিন্তু ঠিক ঠিক জানে ল্যাংডন, ঐশ্বরিক প্রাণীটা দেয়ালের দিকে তাক করেনি, সেটা ভেদ করে, রোমের অন্য কোন প্রান্তে অন্য কিছুকে দেখাচ্ছে সে।

কোন দিক এটা? সরাসরি ফায়ার চিফের দিকে তাকাল সে, ছুঁড়ে দিল প্রশ্ন।

দিক? বিভ্রান্ত দেখায় ফায়ারচিফকে। সে একটু চুপ থেকে বলে, পশ্চিম, আমার মনে হয়।

সেদিকে কোন কোন চার্চ আছে? চিফের কথায় এবার একটু বিরক্তি ঝরে পড়ে, কয়েক ডজন, কেন?

অবশ্যই, তাই হবে, আমার এক্ষুণি একটা সিটি ম্যাপ দরকার। এক্ষুণি।

সাথে সাথে চিফ চলে গেল তাদের ফায়ার ট্রাকের দিকে। ফিরে দাঁড়াল ল্যাংডন স্ট্যাচুর দিকে। আর্থ... এয়ার... ফায়ার... ভিট্টোরিয়া।।

শেষ মার্কারটা হল ওয়াটার। বলল সে নিজেকে, বার্নিনির ওয়াটার।

এটা বাইরে কোথাও, খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার যন্ত্রণা। বার্নিনির যত কাজের কথা মনে করা যায়, চেষ্টা করল সে মনে করার। আমি জলের একটা উৎস চাই।

ট্রাইটনের কথা মনে পড়ে গেল তার। বার্নিনি গ্রিক সমুদ্রদেবের জন্য একটা মূর্তি গড়েছিলেন। সাথে সাথে তার মনে পড়ে গেল, এ গির্জার বাইরেই সেটা অবস্থিত। উল্টোদিকে। কাজে লাগবে না জানাটা। চাপ দিল নিজেকে। জলের মহত্ত্ব বোঝাতে বার্নিনি কোন খোদাইয়ের কাজ করেছিলেন? নেপচুন এ্যান্ড এ্যাপোলো? দুর্ভাগ্যবশত সে কীর্তিটা

লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এ্যান্ড এ্যালবার্ট মিউজিয়ামে।

সিনর? একজন ফায়ারম্যান হাতে একটা মানচিত্র নিয়ে এগিয়ে এল।

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সাথে সাথে সেটাকে মেঝেতে বিছিয়ে ধরল ল্যাঙডন। তারপর মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিল। সৌভাগ্যবশত সে সবচেয়ে দক্ষদের শরণাপন্ন হয়েছে। দমকলের মত আর কোন ডিপার্টমেন্টে এত সূক্ষ্ম ম্যাপ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কোথায় আমরা?

নির্দেশ করল লোকটা, পিয়াজ্জা বার্বারিনির ঠিক পাশে।

দিক বোঝার জন্য ল্যাঙডন আবার তাকাল এ্যাঞ্জেলের বর্শার দিকে। চিফের ধারণা নির্ভুল। ম্যাপ অনুযায়ী, বর্শাটা পশ্চিম দিক নির্দেশ করছে। একটা রেখা তৈরি করল ল্যাঙডন সোজা পশ্চিমে। আর সেই সাথে সমস্ত আশা ভরসার সলিল সমাধি ঘটল। যত এগিয়ে যাচ্ছে তার আঙুল, ততই একটা করে কালো ক্রস দেখা যাচ্ছে মানচিত্রে। প্রতিটাই গির্জা। পুরো মহানগরী চার্চে ঠাসা। এক সময় গির্জার ঘনঘটা কমে এল, একই সাথে ফুরিয়ে এল পথচলা। সিটি শেষ। ড্যাম।

পুরো রোম চষে ফেলে ল্যাঙডনের চোখ পড়ল গিয়ে সেই তিন গির্জার উপর, যেখানে তিন কার্ডিনালকে বাধ্য হয়ে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল। চিগি চ্যাপেল... সেন্ট পিটার্স... এখানে...

সেই তিন চার্চকে এক নজর দেখে তাদের অবস্থানে একটা অসামঞ্জস্য দেখতে পেল। সে আশা করেছিল যে গির্জাগুলো রোমে এলোমেলো ছড়ানো থাকবে। কিন্তু প্রায় নির্ভুলভাবে সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, গাণিতিকভাবে সেগুলো ছড়ানো ছিটানো। সুচারু রূপে। পুরো সিটি জুড়ে একটা ত্রিভূজ গড়ছে সেগুলো। সাথে সাথে ল্যাঙডন আরো একবার চেক করে নিল। আর কিছু ভাবতে পারছে না সে এ মুহূর্তে। পেন্না, বলল সে, উপরের দিকে মুখ না তুলেই।

কেউ একজন তাকে একটা বল পয়েন্ট কলম ধরিয়ে দিল।

সাথে সাথে ল্যাঙডন তিনটা চার্চকেই বৃত্তবন্ধ করল বেড়ে গেল হৃদস্পন্দন। তৃতীয়বারের মত পরীক্ষা করল দিকগুলো। একেবারে নিখুঁত ট্রায়াঙ্গল।

প্রথমেই ল্যাঙডনের মনে পড়ে গেল এক ডলার নোটের উপর রাখা গ্রেট সিলের কথা। সর্বদ্রষ্টা চোখের সাথে যে ত্রিভূজটা অঙ্কিত হয়ে আছে সেটার কথা। কিন্তু এতে কোন কাজ হবে না। সে মাত্র তিনটা পয়েন্ট নির্দেশ করেছে; কিন্তু আদপে সেখানে চারটে থাকার কথা।

তাহলে কোন চুলোয় গেল ওয়াটার?

ল্যাঙডন জানে, যেখানেই সে কলম বসিয়ে চতুর্থ বিন্দু রাখতে যাক না কেন, ত্রিভূজটার সমান মাপ নষ্ট হয়ে যাবে। আর একটা মাত্র কাজ বাকি থাকে। চতুর্থ বিন্দুর জন্য এই ত্রিভূজের ভিতরেই কোথাও কলম বসানো। ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে। কিস্যু হবে না তাতে। ব্যাপারটা ভোগালো আরো। চারটে প্রাচীণ মৌলকে সমান ধরা হত। জলের তেমন কোন বিশেষত্ব নেই। জলে বাকীদের কেন্দ্রে থাকতে হবে তেমন কোন কথা নেই।

একটা ব্যাপার অবচেতন মন ঠিক ঠিক জানিয়ে দিচ্ছে। এই নিখুঁততা কোন দৈব ব্যাপার নয়। আমি এখনো পুরো ছবিটা দেখতে পাচ্ছি না। আর মাত্র একটা বিকল্প পথই খোলা থাকছে। চারটে বিন্দু মিলে আর যাই তৈরি করুক না কেন, কোন ত্রিভূজ তৈরি করছে না।

আবার চোখ রাখল সে নতুন করে, ম্যাপের উপর। যেন তার ফলে কিছু চোখে পড়ে যাবে। একটা স্কোয়ার? চতুর্ভূজ? যদিও চতুর্ভুজে কোন সেন্স পাওয়া যায় না, তবু ভাবতে তার দ্বিধাও হয় না। চোখ বোলাল সে। আবার। আবার। তারপর আঙুল রাখল এমন কোথাও যেখান থেকে একটা মোটামুটি নিখুঁত চতুর্ভুজ আকা যায়। সাথে সাথে এটাও বুঝতে পারল, নির্ভুল স্কোয়ার তৈরি করাও সম্ভব নয়।

ত্রিকোণের আশপাশে আরো একটু নজর বুলিয়ে নেয় সে। এবং তখনি, আশা না করা একটা ব্যাপার ঘটে যায়। একটু আগে সে যে পথে একটা রেখা কল্পনা করছিল। সেদিকে

চোখ ফেরায়। এবং সাথে সাথে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।

সে রেখাটাকে হিসাবে নিলে একটু গন্ডগোল হয় বৈকি! এমন একটা শেপ পাওয়া যায় যেটা দিয়ে নির্দ্বিধায় একটা ঘুড়ির মত গড়ন তোলা যাচ্ছে। অনেকটা কাটা হিরার মত।

চিন্তাটাকে বাতিল করে দিতে দেরিও করে না সে, ডায়মন্ড আর যাই হোক, ইলুমিনেটি সিম্বল নয়... এবং....

ইলুমিনেটির সাথে হিরকের কোন সম্বন্ধ নেই তা নয়, কিন্তু সেটাকে এমন দেখানোর কথাও নয়। নিখুন গড়ন থাকবে ইলুমিনেটি ডায়মন্ডের। একেবারে চতুষ্কোণ।

পিয়াজ্জা নাড়োনায় সেই বিন্দুটা পড়ছে। সে জানে, পিয়াজ্জায় একটা বড় চার্চ আছে। তার যদ্দূর মনে পড়ে, সেখানে বার্নিনির কোন কাজ নেই। চার্চের নাম সেন্ট এগনেস ইন এগোনি।

এ গির্জায় কিছু না কিছু আছেই, অবশ্যই আছে। বলল সে মনে মনে। চোখ বন্ধ করল সে, চেষ্টা করল ভিতরে দৃষ্টি দেয়ার। না। বার্নিনির এমন কোন কীর্তির কথা মনে পড়ছে না যা জলের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু এখানেই বিন্দু। একটা হিরক। হিরা হবার কোন কারণ আছে কি? নাকি এর সাথে ঘুড়ির কোন সম্বন্ধ আছে? এখনো ভেবে পাচ্ছে ল্যাংডন, সে কোন ভুল করেছে কি? করার কথা নয়। কী মিস করছি আমি বারবার?

কথাটা আরো আধ মিনিটের জন্য তার মাথাব্যাথার কারণ হয়ে থাকল, কিন্তু যখন সে আসল ব্যাপারটা দেখতে পেল, ক্যারিয়ারের আর সব উৎফুল্ল ভাবকে ছাড়িয়ে গেল তার চিন্তা।

মনে হচ্ছে ইলুমিনেটি জিনিয়াসের হার মানার কিছু নেই।

এবং ধপ করে মনে পড়ে গেল আসল ব্যাপারটা। ইলুমিনেটি তার মত করে ভাবেনি। তারা এরকম করে এক একটা রেখা একত্র করেনি কোণাকুণি করে। কোন ঘুড়ি গড়েনি তারা। গড়েছে দুটি রেখা যা ছেদ করে পরস্পরকে।

এভাবে বসাতে গিয়ে কেঁপে গেল ল্যাংডনের হাত। থরথর করে। এবং অবশেষে আসল ব্যাপারটা দেখতে পেল সে।

এটা এক নিখুঁত ক্রস! তিনটা রেখা সমান, নিচের রেখাটা অপেক্ষাকৃত বড়!

চোখের সামনে ভাসতে লাগল ফোর এলিমেন্ট অব সায়েন্স... সারা রোমের বুক ভেদ করে এক বিশাল, সুবিশাল ক্রস মাথাচাড়া দিচ্ছে....

অবাক বিস্ময়ে সে চেয়ে থাকে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে পদ্যের পুরনো পদ; নূতনতর অর্থ নিয়ে।

ক্রস রোম, দ্য মিস্টিক এলিমেন্টস আনফোল্ড...

ক্রস রোম...

কেটে যাচ্ছে ধোঁয়াশা। হঠাৎ টের পেল ল্যাংডন, সারা রাতই তার চোখের সামনে উত্তরটা ঝকঝক করছিল। এই কবিতা তাকে শোনাচ্ছিল কী করে অল্টারগুলো বসানো হয়। একটা ক্রসের মত করে।

ক্রস রোম, দ্য মিস্টিক এলিমেন্টস আনফোল্ড!

কী ভুলটাই করেছিল সে! ক্রস বলতে বুঝেছিল এ ক্রসকে ছোট করা হয়েছে। কবিতাকে আরো সুন্দর রূপ দিতে। কিন্তু না, এটাও এক ক্লু।

ম্যাপের ক্রুসিফর্মটা বিজ্ঞানের রসে জারিত ধর্ম! গ্যালিলিও তার কাজকে সত্যি সত্যি একই সাথে বিজ্ঞান আর ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছেন!

ধাঁধার বাদবাকি উত্তরটা মুহূর্তে সামনে চলে এল।

পিয়াজ্জা নাড়োনা।

পিয়াজ্জা নাড়োনার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে, সেন্ট এ্যাগনেস এগোনির একেবারে বাইরে সেই সূত্র বসে আছে। রোমে যে-ই আসে, একবার করে দেখে যায় দর্শনীয় জায়গাটাকে।

দ্য ফাউন্টেন অব দ্য ফোর রিভার্স!

জলের জয়জয়কার এরচেয়ে ভালভাবে আর কোথায় করা সম্ভব? বার্নিনির এই অজেয় কীর্তি প্রাচীণ পৃথিবীর সবচেয়ে দামি চার মহানদের জন্য উৎসর্গীকৃত—নীলনদ, গঙ্গা, দানিয়ুব আর রিও প্লাটা।

ওয়াটার, ভাবল ল্যাঙডন। একেবারে শেষ মার্কার। অসাধারণ।

আর কেকের মধ্যে যেভাবে চেরি থাকে, তেমনি করে সেখানে, বার্নিনির সেই ঝর্ণাগুলোর মধ্যে মাথা উঁচু করে আছে অহঙ্কারী এক ওবেলিস্ক।

বিমূঢ় ফায়ারম্যানকে একপাশে ফেলে রেখে ল্যাঙডন দৌড়ে যায় ওলিভেট্টির নিপ্রাণ দেহের কাছে।

দশটা একত্রিশ! হাতে অগাধ সময়। এই প্রথম ল্যাঙডন অনুভব করল, এগিয়ে আছে সে।

হাটু গেড়ে বসল সে কমান্ডান্টের সামনে, পিছনে তার উল্টে যাওয়া কয়েকটা বেঞ্চি, একপাশে পড়ে আছে সেমি অটোমেটিক, আরেকপাশে ওয়াকিটকি।

ল্যাঙডন জানে, এখন আর সহায়তা চাওয়ার কোন উপায় নেই। এখন সায়েন্সের শেষ অল্টারটাকে গোপন রাখতে পারলেই ভাল। ফায়ার ডিপার্টমেন্ট আর মিডিয়ার লোকজনকে নিয়ে সেখানে হুমড়ি খাওয়ার কোন মানেই হয় না।

আস্তে করে পিছলে গেল সে। তোয়াক্কাই করল না ফায়ার ডিপার্টমেন্টের। লোকজনকে বা মিডিয়ার ঢুকতে থাকা হর্তা কর্তাদের। কোনক্রমে পিয়াজ্জা বার্বারিনি পেরিয়ে গিয়েই অন করল ওয়াকিটকি। অন্ধকারে। কিন্তু কোন শব্দ নেই ওয়াকিটকিতে। হয় সে আউট অব রেঞ্জ, নয়ত এটাকে চালু করতে হলে কোন না কোন কোড ব্যবহার করতে হয়। বুঝতে পারল আরো কয়েকবার চেষ্টা করে, কোন লাভ নেই। তাকাল আশপাশে, কোন ফোন বুথ? না, নেই। আর পেলেও লাভ নেই, জানে সে, এখন ভ্যাটিকানের লাইনগুলো পুরোপুরি জ্যাম থাকবে।

সাহায্য পাবার আশার গুড়ে বালি। সে একা। একদম একা।

আত্মবিশ্বাস নিচু হতে দেখে সে নজর দিল শরীরের উপর। কম অত্যাচার হয়নি। ধূলা বালিতে সারা গা বিবর্ণ, তার উপর পেটে ছোটাছুটি করছে ছুঁচো।

ফিরে যাবে কি ধোঁয়া ওঠা চার্চের ভিতরে? সাহায্য চাইবে অদক্ষ লোকজনের কাছে? হিতে বিপরীত হতে পারে তাতে। আর যদি সাহায্য চায়ই... খুনি যদি একবার দেখে ফেলে তাদের... কেল্লা ফতে। ভিট্টোরিয়াকে পাবার কোন সম্ভাবনাই থাকছে না তাতে।

এগিয়ে যেতে হবে সেখানে। কিন্তু আশপাশে কোন ট্যাক্সির ছায়াটাও নেই। সব ট্যাক্সি ড্রাইভার কাজ বাদ দিয়ে টিভি সেটের সামনে বসে পড়েছে নিশ্চয়ই। মাত্র মাইলখানেক দূরে পিয়াজ্জা নাভোড়া। কিন্তু পদব্রজে সেখানে যাবার কসরৎ করার কোন ইচ্ছা নেই তার। গির্জার দিকে আবার চলে গেল তার দৃষ্টি। কারো কাছ থেকে একটা গাড়ি ধার করতে পারলে বর্তে যায়।

ফায়ার ট্রাক? প্রেস ভ্যান? বি সিরিয়াস।

এরপর সে এক লহমায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। বের করল পকেট থেকে সেমি অটোমেটিকটা। তাক করল একটা সেডানের খোলা জানালায়।

ফিউরি!

কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল ড্রাইভার।

সোজা হুইলের পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাবিয়ে দিল গ্যাস প্যাডেল।

গুন্থার গ্লিক বসে আছে সুইস গার্ডের অফিসে। তার জানা যত দেবতা আর ঈশ্বরের কথা মনে পড়ছে, সবার কাছেই কাকুতি মিনতি করছে সারাক্ষণ। প্লিজ, এটা যেন কোন স্বপ্ন না হয়, কাহিনী যেন এখানেই শেষ হয়ে না যায়!

এ সুযোগ যে কোন রিপোর্টারের কাছে পরম আরাধ্য। জেগে আছ তুমি, বলল সে নিজেকে, এবং তুমি একজন স্টার। এ মুহূর্তে ড্যান র‍্যাথারের চিৎকার কে শুনবে!

তার পাশেই আছে ম্যাক্রি। একটু স্থাণুর মত। গ্লিক দোষ দেয় না তাকে। এখনো ভিডিওগ্রাফারের মোহাবিষ্ট অনুভব কাটেনি। সে আর গ্লিক মিলে প্রচার করেছে ক্যামারলেনগোর লাইভ অনলবর্ষী বক্তৃতা। প্রচার করেছে কার্ডিনালদের মরদেহের ছবি, মৃত পোপের মুখাভ্যন্তরের চিত্র এমনকি যে ক্যানিস্টারটা এ মুহূর্তে ভ্যাটিকানের উপর খড়গহস্ত হয়ে আছে সেটার টিকটিক করে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার দৃশ্য। অবিশ্বাস্য!

একেবারে শেষ মুহূর্তে টেক্কা! বলল ম্যাক্রি। বসে আছে তারা সুইস গার্ডের অফিসে।

একটা হাসি যোগাড় করতে পারল গ্লিক, ব্রিলিয়ান্ট, তাই না?

বোবা করে দেয়ার মত ব্রিলিয়ান্ট।একটু কি হিংসা হচ্ছে ক্যামেরাম্যানের? হবেই হয়ত।

সোনায় সোহাগা হয়ে আরো কিছু ব্যাপার এখানে নূতন মাত্রা যোগ করছে। ক্যাপ্টেন রোচার কোন এক অজ্ঞাত শুভাকাঙ্ক্ষীর ফোন পেয়ে তার কথামত সার্চ চালানো শুরু করেছে। সুইস গার্ডের কয়েকজন অপেক্ষা করছে অতিথির আগমনের জন্য।

শুনেও না শোনার ভাণ করবে গ্লিক, সেটাই স্বাভাবিক। তারপর আর সব আদর্শ রিপোর্টার যা করে, নিরালা একটা জায়গা খুঁজে নেবে তারা, তারপর নির্দেশ দেবে ভিডিওগ্রাফারকে ক্যামেরা রোল করানোর জন্য, ফাঁস করে দেবে তড়িঘড়ি করে যতটা খবর সে জানে।

ঈশ্বরের মহানগরীতে আঁৎকে দেয়া খবর আসছে প্রতিনিয়ত, এর আগেই সে ঘোষণা করেছে উদার কণ্ঠে, অবশ্যই, মনে মনে, তারপর বলবে, আজকের দিনটাকে কোনক্রমে বাঁচিয়ে দিতে, গোপন এক অতিথি আসছেন এখানে।

একেবারে শেষ দানে টেক্কা। একজন লোক শেষ মুহূর্তে আসছে, সিটিকে বাঁচিয়ে দিতে। বারবার মনে মনে আউড়ে যাচ্ছে সে কথাটুকু।

আমি ব্রিলিয়ান্ট! বলে সে নিজেকে, নিশ্চয়ই পিটার জেনিংস এইমাত্র কোন ব্রিজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

তুমিই আমাদের এই নরকের সাথে যুক্ত করেছ, বলছে ম্যাক্রি, পুরো ব্যাপারটায় গোল বাধাচ্ছ তুমি।

কী আবোল তাবোল বকছ? আই ওয়াজ গ্রেট!

সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ আসছেন? একজন ইলুমিনেটাস?

কে না জানে? হাসল গ্লিক। যে জানে না সে অনেক ব্যাপারেই ওয়াকিফহাল নয়। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ছিল একজন থার্টি থ্রি ডিগ্রি মেসন। আর সে সি আই এর হেড ছিল সেই মুহূর্তে যে সময়টায় সি আই এ প্রমাণের অভাবে ইলুমিনেটি কেসে ধামাচাপা দেয়। আর সেখানে কয়েকটা অমর বাণীও প্রচারিত হয় অহর্নিশি।

আলোর হাজারটা উৎস... পৃথিবীর নূতন রীতি...

জর্জ বুশ অবশ্যই ইলুমিনেটি ছিল। কোন সন্দেহই নেই।

আর সার্নের সেই খবর ফাঁস করে দেয়ার ব্যাপারে কী হবে? তেতে আছে ম্যাক্রি, কাল সকালেই তোমার দুয়ারে ধর্ণা দেবে অনেক অনেক আইনজীবী।

সার্ন? ও, কাম অন! এটা হতই হত। একবার ভেবে দেখ! ইলুমিনেটি উনিশো পঞ্চাশের দশকে গায়েব হয়ে যায়, ঠিক যে মুহূর্তে সার্ন জন্ম নেয়। পৃথিবীর সবচেয়ে আলোকিত মানুষগুলোর জন্য সার্ন সব সময়ই স্বর্গ। সেখানে প্রত্যেকের পিছনে রাশি রাশি অর্থ খরচ করা হয় অহরহ। আর তারাই অবশেষে এমন এক শক্তিশেল আবিষ্কার করল যা পৃথিবীর বুক

থেকে ক্যাথলিক চার্চের নাম নিশানা গায়েব করে দেবে। হেরে গেল বেচারারা এই দান!

তার মানে তুমি গোটা দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে চাও যেন সার্নই ইলুমিনেটির নতুন আখড়া?

অবশ্যই! ব্রাদারহুড কখনোই একেবারে হাপিস হয়ে যায় না। কখনো যায়নি। ইলুমিনেটির কোন না কোন জায়গায় আশ্রয় নিতে হবেই। আমি বলছি না যে সার্নের প্রত্যেকেই ইলুমিনেটি, কিন্তু এটা বিশাল মেসনিক স্তুপে পরিণত হয়ে থাকতে পারে। এখানে প্রায় প্রত্যেকেই একেবারে তুলসি পাতায় ধোয়া হলেও উপরের দিকে রাঘব বোয়াল....

তুমি কি কখনো দায়িত্বজ্ঞানের কথা শুনেছ গ্লিক? দায়িত্ববোধের কথা?

কখনো তুমি বাস্তব সাংবাদিকতার কথা শুনেছ?

সাংবাদিকতা? পাতলা বাতাস থেকে তুমি গোবর তুলে আনছ। আমার ক্যামেরাটা বন্ধ করে দেয়া উচিৎ ছিল! আর সার্নের কর্পোরেট লোগোতে কিসের গন্ধ পেয়েছ? স্যাটানিক লোগো? মাথা খুইয়ে বসেছ একেবারে!

হাসল গ্লিক। কোমল করে। ম্যাক্রির হিংসা একেবারে তেড়েফুঁড়ে বের হচ্ছে। ক্যামারলেনগোর জ্বালময় ভাষণের পর সবাই সার্ন আর এন্টিম্যাটার নিয়ে তেতে আছে। কোন কোন চ্যানেলের খবরের পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে সার্নের লোগোও দেখানো হচ্ছে। অনেকটা আধুনিক। দুটো পরস্পরছেদী বৃত্তের মধ্যে দুটো পার্টিকেল এ্যাক্সিলারেটর, আর পার্টিকেল ইঞ্জেকশন টিউবের উপর পাঁচটা রেখা।

তাবৎ দুনিয়া এই লোগো দেখছে গত আধঘণ্টা ধরে, কিন্তু এই গ্লিক, যে নিজেকে একটু সিম্বলজিস্টও ভাবে, সর্বপ্রথম এর ভিতরে ইলুমিনেটির গন্ধ পাচ্ছে।

তুমি মোটেও কোন সিম্বলজিস্ট নও। দাঁত কিড়মিড় করছে ম্যাক্রি, তুমি একেবারে ছাই উড়াতে গিয়ে হিরের খনি পেয়ে গেছ, ব্যস। একজন্ ছা পোষা রিপোর্টার। তোমার বরং সিম্বলজির ব্যাপারটা হাভার্ডের লোকটার উপরে ছেড়ে দেয়াই ভাল।

হাভার্ডের লোকটা ধরতে পারেনি এ গুপ্ত ব্যাপার...

এই লোগোতে ইলুমিনেটির গন্ধ এত প্রকট!

হাজারটা কারণ বের করতে থাকে সে। সার্নের কাছে অনেক অনেক এ্যাক্সিলারেটর থাকলেও তারা মাত্র দুটোকে প্রকাশিত করেছে। দুই হল ইলুমিনেটির একটা প্রতীক। যদিও বেশিরভাগ যন্ত্রেই একটা মাত্র টিউব থাকে, এখানে প্রকাশিত হচ্ছে পাঁচটা। পাঁচ! পাঁচ হল ইলুমিনেটির আরেক সংখ্যা। ইলুমিনেটি পেন্টাগ্রাম।

সবচেয়ে বড় চমকটা এখনো বাকি রয়ে গেছে। প্রথমে এই রেখাগুলো দিয়ে একটা সিক্স দেখা যায়, তারপর এটাকে আরো একটু ঘোরালে আরো একটা, সবশেষে আরো একটা। তিনটা সিক্স! শয়তানের সংখ্যা।

গ্লিক আসলেই এক জিনিয়াস!

ম্যাক্রি তাকে কাঁচা খেয়ে ফেলার জন্য প্রস্তুত।

তার হিংসা এক সময় না এক সময় ঠিক ঠিক চলে যাবে। গ্লিক তা নিয়ে চিন্তা করে না। তার চিন্তা, সার্ন যদি সত্যি সত্যি ইলুমিনেটি হেডকোয়ার্টার হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে ইলুমিনেটির সেই হিরকটা থাকার কথা নয় কি? একটা জার্নালে পড়েছিল গ্লিক, এক অনিন্দ্যসুন্দর ডায়মন্ড, প্রাচীণ পদ্ধতিতে এমন করে কাটা হয়েছে যে যে-ই দেখুক, তাকিয়ে থাকবে সবিস্ময়ে।

ভেবে পুলকিত হয় গ্লিক, এই হিরে নিয়েও বেশ কিছু করার আছে তার। আজ রাতেই।

পিয়াজ্জা নাভোনা। ফাউন্টেইনস অব দ্য ফোর রিভারস।

গরম দিনের পরও রোমের রাতগুলো মরুভূমির মত হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে যায়। দাঁড়িয়ে আছে ল্যাংডন পিয়াজ্জা নাভোনায়। জ্যাকেটটাকে আরো জড়িয়ে নিয়ে। একটু উষ্ণতার জন্য প্রাণ আইঢাই করছে তার। হাতে সময় পনের মিনিট। একটু বিশ্রাম নিতে পারবে ভেবে বেঁচে বর্তে যায় সে।

পিয়াজ্জা একেবারে জনশূণ্য। বার্নিনির ঝর্ণা সাদা ফেনার উপর জলের প্রবাহ। বইয়ে চলছে। আলো আসছে ঝর্ণার নিচ থেকে। মোহময়।

ঝর্ণাটা আসলেই সুন্দর। জলের ধারা উঠে গেছে বিশ ফুট পর্যন্ত। সেখানে পাথুরে অবয়ব। অবয়বে পাগান দেবদেবীদের মূর্তি। সব ছাড়িয়ে উঠে এসেছে একটা বিশাল ওবেলিস্ক। চল্লিশ ফুট পর্যন্ত। তাকাল ল্যাংডন বিনা দ্বিধায়। উপরে একটা একলা পায়রা উড়ে চলেছে উদাসভাবে।

প্যান্থিয়নে কয়েক ঘণ্টা আগেও ভাবছিল সে, পাথ অব ইলুমিনেশন কালের বিবর্তনে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু অবাক হলেও সত্যি, এত শতাব্দি পর্যন্ত অক্ষত আছে সেটা। পুরোটাই সে অনুসরণ করতে পেরেছে।

কিন্তু চারেই খেলাটা শেষ নয়। এরপর আছে আসল গন্তব্য। চার্চ অব ইলুমিনেশন। ভেবে পায় না সে, সেটা এখনো অক্ষত আছে কিনা। ভেবে পায় না সেখানেই পাওয়া যাবে কিনা ভিট্টোরিয়াকে।

লেট এ্যাঞ্জেলস গাইড ইউ অন ইউর লফটি কোয়েস্ট।

কোন দেবদুত আছে কি এ ঝর্ণায়? সেই কি দেখিয়ে দেবে পাথ অব ইলুমিনেশনের শেষ ধাপটা? এটা পাগান শিল্পকর্ম। এখানে আছে মানব, জন্তু, এমনকি আর্মাডিলো। এখানে পথনির্দেশটা তাকে পেতেই হবে।

পিয়াজ্জার দূরপ্রান্তে একটা কালো ভ্যান এল দশটা ছিচল্লিশে। ল্যাংডনের এর দিকে দ্বিতীয়বার তাকানোর কথা নয়। তবু তাকাল সে হেডলাইটের দিকে। ভ্যানটা পিয়াজ্জার চারপাশে একবার চক্কর দিল।

সাথে সাথে গা ঢাকা দিল ল্যাংডন। পিয়াজ্জার শেষপ্রান্তে সেন্ট এ্যাগনেস ইন এ্যাগোনি গির্জার সিঁড়ির আড়ালে। বেড়ে যাচ্ছে তার নাড়ির গতি।

দু চক্কর দিয়ে এগিয়ে এল ভ্যান। থামল সোজা ঝর্ণার পাশে। এর স্লাইডিং ডোরের একেবারে কাছেই ঝর্ণা। জলের কণা ভেসে বেড়াচ্ছে চারপাশে।

দৃষ্টিপথ আড়াল করে দাঁড়াল কুয়াশার মত জল।

তার আশা ছিল খুনি আসবে, তারপর হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে ভিকটিমকে, যেমনটা সে করেছিল সেন্ট পিটার্সে। খোলা একটা শট নেয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু যদি ভ্যানটাতেই সে থেকে থাকে, গডবড় হয়ে যাবে হিসাবে।

হঠাৎ করে, ভ্যানের স্লাইড ডোর খুলে গেল।

ভ্যানের ফ্লোরে পড়ে আছে যন্ত্রণাকাতর এক নগ্ন মানুষ। তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে ভারি লোহার শিকল দিয়ে। চেষ্টা করে সে নড়ার, কিন্তু শিকলটা আসলেই ভারি। শিকলটার এক অংশ ঘোড়ার লাগামের মত করে তার মুখের ভিতরে ঢোকানো যন্ত্রণার শব্দ করতে পারবে না ভিকটিম। এবার দেখতে পেল ল্যাংডন, দ্বিতীয় একটা গড়ন এগিয়ে আসছে। তার চূড়ান্ত কাজ হাসিল করার জন্য।

ল্যাংডন জানে, প্রতিক্রিয়ার জন্য হাতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় আছে।

সাথে সাথে পিস্তলটাকে মাটিতে রেখে সে প্রস্তুত হল। খুলে ফেলল টুইড জ্যাকেট। সেখানেই নিরাপদ থাক গ্যালিলিওর ডায়াগ্রামা।

ভ্যানের সরাসরি পিছন থেকে যাবে সে।

এগিয়ে গেল। গেল দৌড়ে ! আশা একটাই, ঝর্ণার কলকল শব্দে ঢাকা পড়ে যাবে পায়ের আওয়াজ। হলও তাই, টের পেল না খুনি। এগিয়ে গিয়ে ঝর্ণার ভিতর লাফিয়ে পড়ল ল্যাঙডন।

জল বরফ-শীতল। কাঁপছে হাড়। কাঁপছে দাঁত। পায়ের তলাটা পিচ্ছিল। সেইসাথে জমে আছে সৌভাগ্যের জন্য ফেলে দেয়া কয়েন। সেগুলোও জ্বালাচ্ছে। আশা করে সে, সৌভাগ্য আসছে তার জন্যও। চারপাশে জলের কণা। বুঝতে পারে না ল্যাঙডন, কাঁপছে কোন কারণে, শীতে, নাকি উত্তেজনায়। ভয়েও হতে পারে। কাঁপছে তার হাতের গানটা।

নিজেকে লুকিয়ে ফেলল সে বিশাল ঘোড়ার পিছনে। তারপর উঁকি দিল সেখান থেকে। পনের ফুট দূরেও নেই ভ্যানটা। আবার ঢুকে গেছে হ্যাসাসিন। শিকলে বাঁধা কার্ডিনালকে বের করে আনছে টেনে। নামাবে সোজা ঝর্ণায়।

হাত সামনে নিল ল্যাঙডন, তাক করল খুনির দিকে। যেন কোন ওয়াটার কাউবয় ড্র করল পিস্তল। ডোন্ট মুভ! বলল সে।

চোখ তুলে তাকাল হ্যাসাসিন। এক মুহূর্তের জন্য সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। মনে করে কোন ভূতের মুখোমুখি হয়েছে। তারপর ক্রুর হাসি ফুটে ওঠে তার ঠোঁটে। হাত তোলে উপরের দিকে। এ্যান্ড সো ইট গোজ।

ভ্যান থেকে বেরিয়ে এস।

ভিজে চুপসে গেছ তুমি।

সময়ের আগে চলে এসেছ।

আমি পুরস্কারের কাছে ফিরে যেতে উদগ্রীব।

সোজা করল ল্যাঙডন গানটাকে, একটা গুলি করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না মিস্টার।

তুমি এর মধ্যেই দ্বিধায় পড়ে গেছ।

টের পেল ল্যাঙডন, তার আঙুল চেপে বসছে ট্রিগারের উপর। কার্ডিনাল একেবারে স্থির থেকে তাকিয়ে আছে। নড়াচড়া করছে না।

বাঁধন খুলে দাও তার।

তার কথা ভুলে যাও। তুমি মেয়েটার জন্য এসেছ। আর কিছু ভেব না।

কথা না বাড়িয়ে মনে মনে স্বীকার করে নেয় ল্যাঙডন ব্যাপারটাকে। কোথায় সে?

নিরাপদ কোন জায়গায়। আমার ফিরে যাবার অপেক্ষায় আছে।

বেঁচে আছে সে!

আশার আলো দেখতে দেখতে বলল ল্যাঙডন, চার্চ অব ইলুমিনেশনে?

হাসল খুনি, তুমি কখনোই এটার লোকেশন জানতে পারবে না।

তার মানে এখনো চার্চ অব ইলুমিনেশন টিকে আছে। কোথায়?

জায়গাটা শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে গুপ্ত। এমনকি আমার কাছে জায়গাটা সম্প্রতি উন্মোচিত হয়েছে। সেই বিশ্বাস ভাঙার আগে মরে যাব আমি।

তোমাকে ছাড়াই খুঁজে বের করার মুরোদ আমার আছে।

খুব আত্মবিশ্বাসী চিন্তা। ঝর্ণার দিকে তাকাল ল্যাঙডন, এদূর কী করে এলাম?

বাকীগুলোও পেরিয়ে এসেছ। কিন্তু চূড়ান্তটা অনেক বেশি কঠিন।

এগিয়ে গেল ল্যাঙডন। মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে খুনিটা। গুলি করবে কি সে?

না, হ্যাসাসিন জানে কোথায় আছে ভিট্টোরিয়া। জানে কোথায় এন্টিম্যাটার লুকানো। তাকে প্রয়োজন।

একটু দয়া অনুভব করল খুনি আমেরিকানের প্রতি। লোকটা সাহসী। কিন্তু তার কোন ট্রেনিং নেই। এটাও প্রমাণিত হয়েছে। দক্ষতা ছাড়া সাহসের অপর নাম আত্মহত্যা। বেঁচে থাকার নিয়ম আছে কতগুলো। প্রাচীণ নিয়ম। আর সে তার সবগুলোই ভেঙেছে।

তোমার হাতে সুযোগ ছিল। কিন্তু চমকে দেয়ার পরও সে সুযোগটা কাজে লাগাওনি।

আমেরিকান এগিয়ে আসছে... যথা সম্ভব চেষ্টা করছে ব্যাকআপ দেয়ার... কিন্তু সে অদক্ষ।

শিকারকে নখদন্তহীন না করে কখনো জিজ্ঞাসাবাদ করোনা। কোণঠাসা শত্রু ভয়ানক শত্রু।

আবারো কথা বলছে আমেরিকান। বাক্যবাণ ঝাড়ছে। করছে জিজ্ঞাসা।

প্রায় জোরে হেসে ফেলল খুনি।

এটা তোমাদের হলিউডের ছবি নয়... ফাইনাল শুট আউটের আগে গানপয়েন্টে লম্বা আলোচনা চলতে পারে না বাস্তব জীবনে। এই শেষ। এখনি।

আস্তে আস্তে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে নিল খুনি তার হাতটাকে। ভ্যানের দিকে। তারপর উপরে পেয়ে গেল যা খুজছিল।

সাথে সাথে শুরু করল শিকার।

মুহূর্তের জন্য মনে হল, পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলো নিছক, নিমিষে চলে গেল সে ভিতরে। উড়ে গেল তার পা সহ বাকি শরীর। ঢুকে গেল ভিতরে। ঠেলে বের করে দিল কার্ডিনালকে। শিকল সহ। তারপর চট করে চলে গেল আড়ালে। ফেলে দিল তাকে ঝর্ণার কিনারায়।

এক মুহূর্তে বেরিয়ে এল হ্যাসাসিন। হাতে তার একটা রড। উড়ে চলল সামনের দিকে। ল্যাংডনের চোখেমুখে জলের ঝাঁপ্টা লাগায় বিমূঢ় হয়ে গেল সে।

বিনা দ্বিধায় ট্রিগার টেনে দিল ল্যাংডন, বেরিয়ে গেল গুলি। লাগল হ্যাসাসিনের বাঁ পায়ের বুটের একটু দূরে গিয়ে। একই সাথে টের পেল সে, খুনির বুটজোড়া ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে, বুকের উপর ফ্লাইং কিক ছুঁড়েছে খুনি। পিছিয়ে যাচ্ছে ল্যাংডন প্রতিনিয়ত।

রক্ত আর জলের ধারায় পড়ে গেল দুজনেই।

টের পেল ল্যাংডন, হাত থেকে ছুটে গেছে গান। নিচু হল সে, ব্যাথা ভুলে গিয়ে হাত ডুবিয়ে দিল জলে। ধাতব কিছু ঠেকতেই সোজা তুলে আনল হাতটা। না, কয়েন। ফেলে দিল সাথে সাথে। আবার চেষ্টা করার আগে মেলল চোখজোড়া।

পরের আঘাত কোথেকে আসবে জানেনা সে। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অস্ত্রটা তুলে আনার।

তোমার এ্যাডভান্টেজ আছে, বলল সে নিজেকে, তুমি একজন সুইমার এবং ওয়াটারপোলো প্লেয়ার। জল তোমার এলাকা।

আরো একটা কিছু টের পেল হাতে। এবার কয়েন উঠে আসেনি।

কিন্তু একই সাথে আরো একটা ব্যাপার ঘটছে। তলিয়ে যাচ্ছে কার্ডিনাল। ভারি লোহার শিকল টেনে নামাচ্ছে তাকে নিচে। তাকাল সে নিচে, সাথে সাথে মমতায় আর্দ্র হয়ে গেল মনটা। সব আশা জলাঞ্জলি দিয়ে কেমন যেন চোখ করে তাকিয়ে আছে কার্ডিনাল জলের তলা থেকে।

সাথে সাথে চিন্তা ছেড়ে দিল সে। ডুব সাঁতার দিল জলের নিচে। টেনে তোলার চেষ্টা করল লোকটাকে। তার চোখে এখনো প্রাণ আছে। উঠে এল অবশেষে ভারি শরীরটার মাথা। কিন্তু তার পরই, মাত্র কয়েকটা শ্বাস নিয়ে আবার তলিয়ে গেল দেহ। না, পিচ্ছিল ছিল শিকলটা। হাত ফস্কে গেছে। হারিয়ে গেল কার্ডিনাল জলের তলায়। উপরে ফেনিল তরঙ্গ।

আবার ডুব দিল ল্যাংডন। তলিয়ে গেল। পেল তাকে। দেখতে পেল শিকলে জড়ানো বুকটা... সেখানে দুর্বলতার একটা চিহ্ন আছে... মাংসের ভিতরে খোদিত হয়ে আছে একটা শব্দ।



এক মুহূর্ত পরেই, দুটো বুট এগিয়ে এল। একটা থেকে বেরিয়ে আসছে রক্ত।

জলের নিচের যুদ্ধে অনেক এগিয়ে আছে ল্যাংডন। ওয়াটার পোলো খেলার যে কোন দক্ষ খেলোয়াড় এ কাজে একেবারে সিদ্ধহস্ত। সবচেয়ে নোংরা ম্যাচগুলোয় এমন ব্যাপার কখনো কখনো ঘটে। মাঝে মাঝে সে ডিফেন্সম্যানের কাছ থেকে লাথি খেয়েছে, পেয়েছে আঘাত, এমনকি কখনো কখনো কামড়েও ধরেছে কেউ কেউ।

এখন, বার্নিনির কীর্তির বরফ শীতলজলে ডুবে গিয়ে ল্যাংডন টের পেল হার্ভার্ডের পুল থেকে সে অনেক দূরে অবস্থান করছে। সে খেলার জন্য লড়ছে না, লড়ছে প্রাণ বাঁচানোর জন্য। এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মত যুদ্ধ চলবে তাদের মধ্যে। কোন রিম্যাচ নেই। নেই কোন ফলাফল। প্রাণ বাঁচানো, ব্যাস। টের পেল সে, একজোড়া শক্তিমত্ত হাত এগিয়ে আসছে সামনে। তারপর সেটা যেভাবে আঁকড়ে ধরে মেঝের দিকে নিয়ে গেল তাকে তাতে কোন সন্দেহ নেই, লোকটা খুনই করতে চাইছে।

সাথে সাথে টর্পেডোর মত এগিয়ে গেল সে। উঠে যেতে চাইল উপরে। আবার টেনে নামাল খুনি ঘাড় ধরে। এখানে এমন এক সুবিধা আছে তার যা আর কোন ডিফেন্সম্যানের নেই। তার পা দুটো আটকে আছে শক্ত মাটির উপর। একটা চেষ্টা চালাল ল্যাংডন, তার নিজের পা দিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল খুনির গায়ে। কিন্তু খুনির এক হাত জড়িয়ে রেখেছে তার গলা।

তারপর হঠাৎ করেই টের পেল ল্যাংডন, সে উপরে উঠছে না। উপরে উঠে আসার চেষ্টা বাদ দিয়ে অন্য চিন্তা ধরল।

যদি তুমি উত্তরে যেতে না পার, পূর্বে যাও।

সমস্ত শরীর একত্র করে ডলফিনের মত সে হাত দুটো পিছনে নিয়ে গেল। তারপর এগিয়ে চলল জলের ভিতর দিয়েই, দ্রুতগতিতে। অবিশ্বাস্য শক্তিতে। বাটারফ্লাই স্ট্রোকে।

কাজ হল তাতে। তলিয়ে যেতে পারল সে হ্যাসাসিনকে সঙ্গে নিয়ে। এগিয়ে এল একপাশে। ছুটে গেছে খুনির হাতের বাঁধন। তারপর ল্যাংডন উঠে গেল উপরে। দম নিল মাত্র একটা। আবার এসে পড়েছে খুনি। হাত রেখেছে তার কাধে। চেষ্টা করল সে পা ব্যবহার করার। কিন্তু কাজ হল না। আবার তলিয়ে গেল হ্যাসাসিন তাকে নিচে নিয়ে।

তলিয়ে যেতে যেতে ল্যাংডন চেষ্টা করছে গানটা খুঁজে বের করার। কিন্তু কাজ হল না তাতে। নিচের দিকে বুদ্বুদ অনেক বেশি। দেখা যায় না তেমন কিছু। আরো নিচে নিয়ে যাচ্ছে খুনি। আরো অসহায় হয়ে পড়ছে ল্যাংডন।

নিচে তাকিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ল্যাংডনের মনটা। কালো নল। ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে ওলিভেট্টির গান। সেটার নল দেখা যাচ্ছে। বিনা দ্বিধায় হাত বাড়াল মুখের সামনে। একটানে তুলে আনতে গিয়ে বুঝতে পারল ভুল। না, গান নয়, এই ঝর্ণার অনেক বাবলমেকারের মত এটাও একটা প্লাস্টিকের নল।

মাত্র কয়েক ফুট দূরে, কার্ডিনাল ব্যাজ্জিয়া টের পাচ্ছিল তার শরীরের খাচা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে প্রাণবায়ু। মনে মনে একটা কথাই ভাবছে কার্ডিনাল। জিসাস যে কষ্ট পেয়েছেন তার তুলনায় এটা কিছুই নয়।

অনেক পাপের স্খলন ঘটানোর জন্যই তার মৃত্যু হয়েছিল...

দূরে কোথাও যুদ্ধক্ষেত্রের দামামা বাজছে। কান দিল না বাজ্জিয়া। মনে পড়ে গেল খুনিটা আরো একজনকে শেষ করে দিতে চাইছে। কোমল চোখ আর সাহায্য করার মন আছে এমন একজনকে।

যন্ত্রণায় ছত্রখান হয়ে গিয়ে বাজ্জিয়া তাকাল উপরের দিকে। কালো আকাশের দিকে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল, তারকা দেখতে পাচ্ছে সে কালো আকাশের বুকে।

সময় চলে এসেছে।

উপরের দিকে মুখ করে, হাঁ করল কার্ডিনাল। মুখে ঢুকে গেল অনেকটা জল। বেরিয়ে

এল ছোট ছোট স্বচ্ছ বুদ্বুদ। জলের কণাগুলো যেন ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা। কয়েক সেকেন্ড সময়ের জন্য যন্ত্রণা হল।

তারপর... শান্তি।

পায়ের যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে হ্যাসাসিন মনোযোগ দিল ডুবতে থাকা আমেরিকানের উপর। চাপ দিল তার ঘাড়ে। ধরে রাখল জলের নিচে। জানে, এবার আর বেচারার বেঁচে যাবার কোন সুযোগ নেই... দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে এল ল্যাঙডনের শরীর।

হঠাৎ করে কী যেন হয়ে গেল ল্যাঙডনের শরীরে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেল। কাঁপতে শুরু করল বন্যতা নিয়ে।

ইয়েস! মনে মনে বলল খুনি, রিগর! প্রথমবার ফুসফুসে জলের ধাক্কা লাগলে শরীরটা এমন করে কাঁপতে থাকে। রিগর চলবে পাঁচ সেকেন্ডেরও বেশি সময় ধরে।

ছ সেকেন্ড চলল ব্যাপারটা।

তারপরও, ত্রিশ. সেকেন্ড ধরে ধরে রাখল সে নিথর শরীরটাকে। পালমোনারি টিস্যুর প্রান্তে প্রান্তে চলে যাক জলের বন্যা। এরপর শরীরটাকে ছেড়ে দিল সে। আস্তে করে ডুবে গেল সেটা। মিডিয়ার লোকজন ডবল সারপ্রাইজ পাবে।

তাব্বান! চিৎকার করে উঠল খুনি উপরে ভেসে উঠে। না, পায়ের অবস্থা মোটেও ভাল নয়। বুড়ো আঙুলটা গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পা। ব্যাথা উঠে আসছে উপরে। পা বেয়ে। ইবন আল-কুলব!

কাপড় জড়িয়ে দিল ক্ষতস্থানটায়। রক্তপড়া বন্ধ হতে হবে।

ব্যাথা আর সুখের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সে উঠে এল ভ্যানের কাছে। রোমের কাজ শেষ।

কিন্তু এখনো একটা ব্যাপার বাকি রয়ে গেছে। টের পায় সে। এই শীতে এবং বেদনার মধ্যেও একটা উষ্ণতা টের পায়।

আমি আমার উপহার অর্জন করেছি।

যন্ত্রণাকাতর হয়ে জেগে উঠল ভিট্টোরিয়া, শহরের অন্যপ্রান্তে। উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল সে। সারা শরীরের পেশিগুলো যেন পাথর হয়ে গেছে। শক্ত। যন্ত্রণাময়। সারা গায়ে ব্যাথা। হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। মাথা তুলতে পারছে না।

কোথায় আছে বুঝে উঠতে পারছে না। তাকাল চারদিকে। একটা পাথুরে ঘরে বসে আছে। বড় এবং ভালভাবে সাজানো। প্রাচীণ। মশালের আলোয় আলোকিত। আদ্যিকালের কোন মিটিং হল। সামনেই সারি সারি সাজানো আছে বেঞ্চ।

বাইরের দিকে একটা ব্যালকনির দরজা খোলা। উন্মত্ত হাওয়া আসছে সেটার ভিতর দিয়ে। বাঁধা অবস্থায়ই দেখতে পেল সে ভ্যাটিকান সিটিকে।

রবার্ট ল্যাঙডন শুয়ে আছে ফাউন্টেনস অব ফোর রিভার্সের তলায়। ছড়ানো ছিটানো পয়সার ভিতরে। হাতের কাছেই সেই নলটা। আর আছে অকল্পনীয় অসাড়তা।

বেঁচে আছে সে।

জলে ডুবে মরার সময় মানুষের ঠিক কেমন বোধ হয় তা সে জানে না। কিন্তু টের পাচ্ছে, যন্ত্রণা ছড়িয়ে আছে সারা দেহে। ঠোঁটটা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। তার একটাই ভরসা, ভুল বুঝেছে হ্যাসাসিন। ছেড়ে গেছে। আরো কিছুক্ষণ এখানে, জলের তলায় থাকতে হবে। উঠে আসার যো নেই, তবু, এখন উঠলে মরণ হবে নিশ্চিত।

এগিয়ে আনল সে নলটাকে মুখের কাছে। আড়ষ্ট হাতে। তারপর সবচেয়ে দামি ব্যাপারটা খুঁজে পেল সেখানে। বাতাস। মুখে দিল সে। অপেক্ষা করল আরো আরো।

ভেসে উঠল অবশেষে।

না, ভ্যানটা চলে গেছে। আবার ডুব দিল সে একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে। নামল নিচে। দেখতে পেল শিকলে মোড়া শরীরটাকে তুলে আনার চেষ্টা করল একটা হ্যাচকা টানে। পারল না। এখনো কার্ডিনালের অজ্ঞান হয়ে থাকার সম্ভাবনা আছে।

না, সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। চোখ উপরের দিকে উল্টে আছে। নেই নাড়ির স্পন্দন, নেই শ্বাস প্রশ্বাস নেয়ার প্রক্রিয়া। যেখানে জল একটু অগভীর সেদিকে টেনে নিল সে উলঙ্গ শরীরটাকে। খুব বেশি এগিয়ে আনা গেল না।

এরপরই কাজে নেমে পড়ল সে। আগেই সরিয়ে নিয়েছে শিকল। চাপ দিল নগ্ন বুকে, চেষ্টা করল ফুসফুস থেকে সবটুকু জল বের করে দেয়ার। এরপর শুরু করল সি পি আর। হিসাব করে করে। তিনটা মিনিট ধরে চাপ দিয়ে গেল, দিয়ে গেল বাতাস। আরো পাঁচটা মিনিট ধরে যুঝল সে। তারপর বুঝল, সুযোগ আর নেই।

এল প্রেফারিতো! যে লোকটা পোপ হতে পারত, শুয়ে আছে তার সামনে, অসহায়। অনড়।

একজন সৎ মানুষ। মানুষের জন্য যে সারাটা জীবন ধৈর্য ধরেছে, সারাটা জীবন অবলম্বন করেছে অসম্ভব ব্রত, সে আজ এখানে একেবারে অসহায়ভাবে পড়ে আছে। যেন প্রার্থনা করছে মানুষের বোকামির জন্য।

আদর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিল ল্যাঙডন লোকটার চেহারায়। কেমন এক পবিত্রতা বিরাজ করছে সেখানে। তারপর বুজিয়ে দিল খুলে থাকা চোখদুটো। কাজটা করতে গিয়ে টের পেল সে, বুকের ভিতর থেকে দলা পাকানো কান্না উঠে আসছে।

বাঁধা দিল না সে। সব সময় আবেগকে দমিয়ে রাখতে নেই। এবং অনেক বছর পর, রবার্ট ল্যাঙডন কেন যেন বুক উজাড় করে কাঁদল।

এক অবাধ্য আবেগকে সরিয়ে দিয়ে আবার জলে ফিরে গেল সে। ডুবে গেল। ভিতরের কান্নাকে ঠেলে আরো একটা আবেগ উঠে আসছে। শক্ত হয়ে যাচ্ছে শরীরের সমস্ত পেশী। থরথর করে কাঁপছে জিঘাংসায়।

ইলুমিনেটি লেয়ার খুঁজে বের কর। উদ্ধার করে আন ভিট্টোরিয়াকে।

নেমে গিয়ে খুব সাবধানে চারধার দেখতে শুরু করল সে। জানে, এখানকার স্থাপত্যের কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে ইলুমিনেটি লেয়ারের সূত্র। কোন না কোন মূর্তি নির্দেশ করছে ইলুমিনেটি লেয়ারকে। যত এগিয়ে গেল সে সার্চ করতে করতে, তত শক্ত হয়ে গেল ভিতরটা।

লেট এ্যাঞ্জেলস গাইড ইউ অন ইউর লফটি কোয়েস্ট। এ এক পাগান স্ট্রাকচার। এখানে দেবদুতের চিহ্নটাও নেই!

হায়ারোগ্লিফিক লেখার ভিতর দিয়ে সে খোঁজার চেষ্টা করল সূত্র। মিশরিয় প্রতীকের ভিতর কিছু লুকিয়ে নেইতো! না, বার্নিনির আমলে হায়ারোগ্লিফিকের কোন মানে ছিল না। তখনো অর্থ আবিস্কৃত হয়নি। এই সবের ভিতরে কোথাও কি বার্নিনি কোন সূত্র রেখে যেতে পারে না?

কোন এ্যাঞ্জেল নেই কোথাও।

আরো দুবার চক্কর দিল সে। তাকাল চারধারে না। কোন সূত্র নেই। হাতের ঘড়িটাকে চেক করে নিল। সময় গুঁড়ি মেরে এগুচ্ছে নাকি উড়ে যাচ্ছে তা বোঝার কোন উপায় নেই। ভিট্টোরিয়া...

উপরের দিকে তাকাল সে। ওবেলিস্কের দিকে। এবং থমকে গেল। মনে করেছিল এটা কোন জীবিত প্রাণী। কিন্তু আসলে তা নয়। ওবেলিস্কের উপরদিকে যে পায়রাটা উড়ছিল সেটা আসলে উড়ন্ত কবুতরের মূর্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

একটা পায়রা।

না, এটা উড়ে যায়নি। উড়ে যায়নি যুদ্ধ চলার সময়। উদাস মনে পাখা বিস্তার করে তাকিয়ে আছে উপরের দিকে। তারার দিকে। পশ্চিমে ফিরানো তার মাথা।

হাত মুঠো করে সে তুলে আনল এতগুলো পয়সা। ছুড়ে দিল কয়েনগুলো উপরের দিকে। প্রথমবার লাগল না সেগুলো। এরপর আবার ছুড়ে দেয়ার পর একটা গিয়ে লাগল সেটার গায়ে।

ধাতুর সাথে ধাতুর সংঘর্ষের শব্দ।

এটা ব্রোঞ্জের তৈরি।

তুমি একটা এ্যাঞ্জেলের খোঁজ করছ। কোন পায়রা পাবার ইচ্ছা ছিল না তোমার। ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল।

কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। পুরোটা বুঝে যাচ্ছে ল্যাঙডন এক পলকে। বুঝতে পারছে, এটা মোটেও কবুতর নয়।

ঘুঘু।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সে সামনের দিকে। উঠে এল ওবেলিস্কের গোড়ায়। তাকাল উপরে। আরো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পাখিটার মুখ, মাথা।

কোন সন্দেহ নেই, এ এক ঘুঘু।

পাখিটার গা রোমের দূষিত বাতাসের সংস্পর্শে এসে এসে কালো হয়ে গেছে। আজ সে প্যান্থিয়নে একজোড়া ঘুঘু দেখেছিল সে। কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না। একটা, এখানে আছে মাত্র একটা।

একলা ঘুঘু পাগান ঐতিহ্যে শান্তিদূতের পক্ষে কাজ করে। শান্তির দুত।

বার্নিনি শেষ ধাপে এসে ভাল চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছেন। এখানেও এ্যাঞ্জেল পথ দেখাবে,

কিন্তু পাগান স্থাপত্যের এ্যাঞ্জেলও হবে পাগান। কোন সন্দেহ নেই।

পাখিটা তাকিয়ে আছে পশ্চিমে।

উঠে এল সে আরো উপরে। তারপর দেখার চেষ্টা করল পশ্চিমে। না। সামনে দৃষ্টির পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ ছোয়া অট্টালিকা।

সেন্ট গ্রেগরি অব নিসা একটা কথা বলেছিলেন, আত্মা যখন আলোকিত হয়ে ওঠে... সাথে সাথে তা আকার নেয়। আকার নেয় সুন্দর কোন ঘুঘুর।

আরো সামনে এসে সে ভিত্তিভূমিতে উঠল। আরো একটু উঁচু হল দৃষ্টি। কিন্তু এরচেয়ে উপরে ওঠা সম্ভব নয়। কারণ নিরেট ওবেলিস্কে ওঠা যাবে না। তার দৃষ্টি থেমে গেছে।

বামে সেন্ট পিটার্সের আলোকবর্তিকা, ডানে সান্তা মারিয়া ডেলা ভিট্টোরিয়া, তার সামনে পিয়াজ্জা ডেল প্রোপোললা, নিচে চতুর্থ এবং শেষ মার্কার। ওবেলিস্কে গড়া বিশাল এক ক্রস। রোম জুড়ে বানানো।

আরো একবার তাকাল সে উপরে, ঘুঘুর দিকে, তাকাল নিচে।

তারপর হঠাৎ করেই ধরে ফেলল ব্যাপারটাকে।

একেবারে নিশ্চিত। একেবারে স্পষ্ট। একেবারে সরল।

তাকিয়ে সে বুঝে উঠতে পারে না কী করে ইলুমিনেটি লেয়ার এত শতাব্দি ধরে গোপন আছে। নদীর অপর প্রান্তে, এক বিশাল পাথরের দিকে তাকিয়ে সে শিউরে ওঠে। ভ্যাটিকানের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভবনটা দাঁড়িয়ে আছে টাইবারের অপর প্রান্তে। ভবনের গাণিতিকতা একেবারে নিখুঁত। একটা গোলাকার দেয়াল চারধারে, দেয়ালের বাইরে, একটা পার্ক আছে। পেন্টাগ্রামের মত দেখতে পার্ক।

সামনের বিশাল দুর্গটা ফ্লাডলাইটের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। এর মাথায় বসানো এক ব্রোঞ্জের এ্যাঞ্জেল।

লেট এ্যাঞ্জেল...

দুর্গের একেবারে নিচের দিকে নির্দেশ করছে এ্যাঞ্জেল তার হাতের তলোয়ারটা দিয়ে।

আরো আছে, এখানেই, সামনে বার্নিনির একেবারে নিজের হাতে গড়া সেই বিখ্যাত শিল্পকর্ম। বারো দেবদুত। ব্রিজ অব এ্যাঞ্জেলস।

বার্নিনি কী নিখুঁতভাবেই না করেছিল কাজটা! ক্রুসের মূল দন্ডটা চলে গেছে দুর্গের সেতুর উপর দিয়ে। একেবারে নিখুঁত দুভাগে বিভক্ত করে রেখাটা।

উঠে এল ল্যাঙডন সাথে সাথে। হাতে নিল টুইড জ্যাকেটটাকে, ভিজা শরীর থেকে দূরে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল চুরি করা সেডানের উপরে। এ্যাক্সিলারেটর দাবিয়ে চলে এল কালিগোলা অন্ধকারের ভিতরে।

রাত এগারোটা সাত বাজে। লুছোটোভেরে টোর ভিনোনা ধরে রাতের রোমকে পেরিয়ে যাচ্ছিল সে। তার সামনে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই একলা অট্টালিকা।

ক্যাসেল সান্ট এ্যাঞ্জেলো। ক্যাসেল অব দ্য এ্যাঞ্জেল।

ব্রিজের কাছে এসে সে থমকে গেল। সেখানে ব্যারিকেড বসানো। কোনক্রমে চেপে ধরল ব্রেক।

ভুলেই গিয়েছিল ব্রিজ অব এ্যাঞ্জেলসকে রক্ষা করার জন্য চলাচল নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

থমকে গেল সে। শীতে এখনো কাঁপছে থরথর করে। পরে নিল টুইড স্যুট জ্যাকেটটা। ফোলিও ঠিক থাকবে। ভিজে যাবে না। তাকাল সে সামনে। কী করা যায়! কীভাবে বেরিয়ে এসেছিল লোকটা তাহলে?

তার দুপাশেই বার্নিনির গড়া এ্যাঞ্জেলদের মিছিল।

লেট এ্যাঞ্জেলস গাইড ইউ অন ইউর লফটি কোয়েস্ট...

সেটা যে এভাবে সত্যি হয়ে যাবে কল্পনাও করেনি সে। তার কাছে সামনের ক্যাসলটা এমনকি সেন্ট পিটার্সের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিল। এগিয়ে গেল। নেমে ছুটল সামনের দিকে। চক্কর দিল ভবনটাকে।

না। কেউ নেই, যদ্দূর মনে হয়।

ল্যাঙডন জানত এ জায়গাটা শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে ভ্যাটিকান ব্যবহার করে আসছে একটা টম্ব হিসাবে, একটা দুর্গ হিসাবে, পোপের লুকানোর জায়গা হিসাবে, চার্চের শত্রুদের আটকে রাখার কারাগার হিসাবে–তবু, এত শতাব্দি ধরে তারা টেরও পায়নি যে এটাই চার্চ অব ইলুমিনেশন।

এখানে অনেক গোলকধাঁধা আছে। আছে অনেক গোপন কুঠুরী, আছে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়ার মত এলাকা। ভালমত দেখল সে চারপাশটাকে। কোন সন্দেহ নেই, এটাও বার্নিনির কীর্তি।

দুর্গের দুই পাল্লার দরজার সামনে এসে ভাল করেই চাপ দিল ল্যাঙডন দরজাটায়। অবাক হবার কিছু নেই। অনড় রইল প্রবেশদ্বার।

একটু পিছিয়ে গেল সে। তাকাল উপরের দিকে। এ কেল্লা বর্বরদের, হিথেনদের, মুরদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। সে এক চেষ্টাতেই এখানে ঢুকে পড়বে সে আশা করা বোকামি।

ভিট্টোরিয়া! মনে মনে গুমরে মরল সে, তুমি কি এখানে?

দেয়ালের চারপাশে ঘুরে বেড়াল সে। আর কোন প্রবেশপথ আছেই আছে।

চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে আরো একটা দরজা পেল সে। এটাও বন্ধ। একেবারে সিল করে দেয়া। আবার ঘোরা শুরু করে ল্যাঙডন।

উপরে তাকাল এবার। আলো কি আছে আর কোথাও নেই। কোথাও নেই। শুধু একটা ফ্লাডলাইট আলো ছড়াচ্ছে বাইরের দিকে। পুরো দুর্গের সবগুলো জানালা কালো। মিশকালো। এখানে কারো থাকার কথা নয়।

আশা ছাড়ল না সে। চোখ তুলে তাকাল আরো আরো উপরে। একেবারে শেষ প্রান্তে, শত ফুট উপরে, এ্যাঞ্জেলের ঠিক নিচে, একটা ব্যালকনি দেখা যাচ্ছে। আলোকিত।

আলো আঁধারির খেলা দেখলে বোঝা যায় সেখানে মশাল জ্বালানো হয়েছে। একটা ছায়া কি দেখা যাচ্ছে সেখানে? ঠিক ঠিক...

ভিট্টোরিয়া! চিৎকার করল ল্যাঙডন গলা ফাটিয়ে।

কিন্তু পিছনের প্রমত্তা টাইবারের শব্দে হারিয়ে গেল তার আওয়াজ। ভেবে মরল সে কোথায় মরতে গেছে সুইস গার্ড! তারা কি ল্যাঙডনের সম্প্রচার শুনতে পায়নি?

দৌড়ে গেল সে। এগিয়ে গেল নদীর ওপারে পার্ক করা একটা মিডিয়া ট্রাকের দিকে। কানে হেডফোন জুড়ে দিয়ে একজন বসে আছে। এগিয়ে গেল তার দিকে।

কোন দুঃখে, বন্ধু? লোকটার কণ্ঠ অস্ট্রেলিয়। আপনার ফোনটা দরকার। বন্ধুসুলভ রাখার চেষ্টা করল কণ্ঠটাকে ল্যাঙডন।

শ্রাগ করল লোকটা। ডায়াল টোন নেই। সারাক্ষণ চেষ্টা করছি। সাকিট জ্যাম হয়ে আছে।

চিৎকার করল সে লোকটার দিকে। এখানে... ঐদিকে কোন গাড়ি কি যেতে দেখেছেন আপনি?।

আসলে, হ্যাঁ। সারাদিন একটা কালো ভ্যান আসা যাওয়া করছিল।

পেটে যেন একটা ইটের আঘাত লাগল ল্যাঙডনের।

লাকি বাস্টার্ড! বলল অসি, ব্যাটা সেখান থেকে ঠিক ঠিক ভাল ভিউ পাবে ভ্যাটিকানের। আমি শালা আশপাশে ঘেষতে না পেরে এখান থেকে সম্প্রচার করছি।

ল্যাঙডন শুনছিল না। আর কোন উপায় আছে কিনা সেটাই তার চিন্তা।

কী বলেন আপনি? ধরে বসল অসি, এই শেষ মুহূর্তের খেল কি সত্যি?

কী?

এখনো শোনেননি? সুইস গার্ডের ক্যাপ্টেন একটা ফোন পেয়েছে যে বলতে চায় যে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য তার কাছে আছে। সে এখন উড়াল দিয়েছে। আজকের দিনটা যদি ব্যাটা এসে ঠিক করে দিতে পারে...

একজন ভাল সামারিটান উড়ে আসছে সাহায্য করতে? সে কে? লোকটা কি কোন কারণে জানে কোথায় বসানো আছে ক্যানিস্টারটা? তাহলে তার আসার দরকার কী, স্বাভাবিক ভাবেই বলে দিলে চলত। কিন্তু এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই ল্যাঙডনের।

হেই! বলল অবশেষে লোকটা, আপনি কি সে জন নন যাকে টিভিতে দেখেছিলাম?

কোন জবাব দিল না ল্যাঙডন।

উপরের দিকে তার দৃষ্টি চলে গেছে। ভ্যানের ছাদে একটা কলাপসিবল ডিস বসানো। আবার তাকায় সে দুর্গের দিকে।

উপরে যাবার কোন উপায় নেই। কী করা যায়। দেয়াল ডিঙানোই অসম্ভব...

স্যাটেলাইট আর্মের দিকে নির্দেশ করে সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, কতদূর যায় এটা?

হাহ? লোকটা যেন অনেকটা বিভ্রান্ত হয়ে গেল, পনের মিটার। কেন?

ট্রাক মুভ করান। দেয়ালের পাশে পার্ক করান। আমার সাহায্য দরকার।

কী যা তা বলছেন?

ব্যাখ্যা করল ল্যাঙডন।

ছানাবড়া হয়ে গেল লোকটার চোখ। কী? এটা কোন মামুলী মই নয়। এটা দু লাখ ডলার দামের টেলিস্কোপিক এক্সটেনশন।

টাকার কথা বলছেন? আমি আপনাকে এত দিতে পারব যা নিয়ে আয়েশ করে কাটাতে পারবেন কয়েক বছর।

দুলাখ ডলারের চেয়েও বেশি দামি তথ্য?

তার সহায়তার বদলে কী হতে পারে তা ব্যাখ্য করল ল্যাঙযডন লোকটার কাছে।

নব্বই সেকেন্ড পরে, ল্যাঙডন এক্সটেনশন ধরে উপরে উঠে পড়ে। তারপর চলে আসে কেল্লার দেয়ালে।

এবার তোমার কথা রাখ। বলল সাংবাদিক, কোথায় সে?

কথাটা জানানোর গরজ ছিল না। কিন্তু কথা দিয়ে না রাখাটাও ঠিক নয়। হ্যাসাসিনও ডাকতে পারে মিডিয়াকে।

কার্ডিনাল পিয়াজ্জা নাড়োনা। সে ডুবে আছে ঝর্ণার নিচে।

সাথে সাথে নিচু করল লোকটা তার স্যাটেলাইট, তারপর ভাগ্যের খোঁজে হন্যে হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

নগরীর একেবারে উপরের দিকে, একটা পাথুরে চেম্বারে, হ্যাসাসিন তার পায়ের বুটগুলো

খুলে ফেলল। তারপর আবার ব্যান্ডেজ করল ক্ষতস্থান।

ব্যথা আছে, কিন্তু ততটা নয় যে সে সব উপভোগ ছেড়ে ছুঁড়ে দেবে।

উপহারের দিকে ফিরল সে।

একটা রুডিমেন্টারি ডিভানে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটা। হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। মুখও। তার দিকে এগিয়ে গেল হ্যাসাসিন। জেগে উঠেছে মেয়েটা। ব্যাপারটা তাকে স্বস্তি দিল। অবাক হলেও সত্যি কথা, চোখে ভয় নেই, আছে আগুন।

ভয় আসবে।

রবার্ট ল্যাঙডন দাঁড়িয়ে আছে বাইরের দেয়ালে। ফ্লাডলাইটের আলোয় ভালই লাগল তার। নিচের দৃশ্য আদ্যিকালের যুদ্ধ জাদুঘরের মত। সেখানে আছে কামান, মার্বেলের গোলা আরো নানাবিধ অস্ত্রপাতি।

ক্যাসেলের একাংশ ট্যুরিস্টদের জন্য খোলা থাকে। দিনের বেলায়। বাকি অংশে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আসল আকৃতি অবিকৃত রাখার জন্য।

উপরের ব্রোঞ্জের এ্যাঞ্জেল পর্যন্ত ভবনটা একশ সাত ফুট লম্বা। আবার চিৎকার করবে কিনা ভেবে নিয়ে তাকাল সে নিচে। না। তারচেয়ে বরং ভিতরটায় যাবার একটা পথ বের করতে পারলে ভাল হয়।

ঘড়িটা চেক করে নিল সে।

এগারোটা বারো।

নেমে এল নিচে। দৌড়ে গেল এধার থেকে সেধারে। কী করে লোকটা ভিতরে ঢুকল? কোন না কোন পথ বাকি আছেই। আবার ছায়ায় ছায়ায় প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেল।

পুরো ভবনটার চারধারে ঘোরা শেষ করার একটু আগে সে একটা ড্রাইভওয়ে দেখতে পেল সামনে। সেখানে শেষপ্রান্তে আছে একটা সুড়ঙ্গ।

এল ট্রাফোরো! ল্যাঙডন এই অট্টালিকার ট্রাফোরোর ব্যাপারে পড়েছে। এখানে একটা দানবীয় পথ আছে। পথটাকে প্রায় পুরো ক্যাসলের ভিতরে দেখা যাবে। আগেরদিনের অশ্বারোহীরা যেন দ্রুত বেরুতে পারে সেজন্য বানানো হয় এটাকে।

এ পথ ধরেই হ্যাসাসিন ভিতরদিকে ঢুকেছে! টের পায় সে।

টানেলের পথ খোলা। উচ্ছ্বসিত হয়ে এগিয়ে যায় সে। তারপর কর্পূরের মত উবে যায় তার আশা।

সুড়ঙ্গের প্রবেশপথ ঠিকই খোলা, কিন্তু সেটা নেমে গেছে নিচের দিকে।

এক অন্ধকার টানেলের মুখে এগিয়ে যেতে যেতে সে ঠিক করল উপরদিকে আবার তাকাবে। তাকায় ল্যাঙডন। এখনো সেখানে নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত নাও!

মরিয়া হয়ে ভাবে সে।

অনেক উপরে, খুনি তাকিয়ে আছে তার শিকারের দিকে। তার হাতের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিল একটা হাত। মেয়েটার চামড়া যেন মাখনের মত নরম! তার সারা গায়ে একটা ভ্রমণ শেষ করার কথা চিন্তা করতেই উত্তেজনায় চকচক করে ওঠে হ্যাসাসিনের চোখ। কীভাবে, কীভাবে সে মেয়েটাকে আতঙ্কিত করতে পারে? কত পথে?

হ্যাসাসিন জানে, এই মেয়েটাকে তার পাবার কথা। জ্যানাসের সব কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। এবার উপভোগের পালা। ভাবে সে। প্রথমে যা করার করবে। শেষ হলে ডিভান থেকে হেঁচড়ে নামাবে তাকে। বসাবে হাটু গেড়ে। আবার মেয়েটা তার সেবা করবে। তারপর নিজের আনন্দের চরম মুহূর্তটা কেটে গেলে সোজা গলায় হাত চালাবে সে। ভেঙে দেবে সেটাকে।

ঘায়ত আসাআদা, বলে তারা, চরম মুহূর্ত।

তারপর সে আয়েশ করে দাঁড়াবে বারান্দায়। তাকাবে বাইরে, সৌকর্যময় ভ্যাটিকানের দিকে তাকাবে। উপভোগ করবে এত মানুষের এত বছরের স্বপ্নটাকে সাকার হতে দেখে।

আরো নেমে যাচ্ছে ল্যাঙডন। আরো কালো হয়ে আসছে টানেল।

নিচে নামতে নামতে একবার টের পেল সে, সুড়ঙ্গটা আর নিচে নামছে না। এবার চলছে সোজা। বুঝতে পারে, পদধ্বণি শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। হাজির হল একটা কালো, বিশাল চেম্বারে। সামনে আলোর একটা ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট...

একটা যান। সামনে এগিয়ে গেল সে। দেখল, সত্যি সত্যি সেটা ভ্যান। স্লাইড ডোর

খুলল। উপরের ছোট বাতি জ্বলে উঠল সাথে সাথে।

দেখল, এটাই সেই ভ্যান। ঢুকল ভিতরে। কোন অস্ত্র নেই কাজে লাগানোর মত। একটা জিনিস আছে শুধু, একটা সেলফোন। ভিট্টোরিয়ার সেলফোন। কিন্তু সেটাকে কাজে লাগানোর কোন উপায় নেই।

দেরি হয়ে যায়নি তো! শিউরে ওঠে সে।

হেডলাইট জ্বালাল। আলোকিত হয়ে উঠল চেম্বারটা। এ ঘরেও কিছু নেই। নেই কোন দরজা। এখানে হয়ত ঘোড়া অথবা গোলাবারুদ থাকত।

পথ খুঁজে পাইনি আমি! মনে মনে বিষিয়ে ওঠে তার ভিতরটা।

এখানে আছেতো মেয়েটা?

সে চার্চ অব ইলুমিনেশনে অপেক্ষা করছে... অপেক্ষা করছে আমার ফিরে আসার জন্য। বলেছিল হ্যাসাসিন।

কাঁপছে তার গা। ঘৃণা আর আবেগে।

মেঝেতে রক্তের দাগ প্রথমবার দেখে ল্যাঙডন মনে করেছিল এটা ভিট্টোরিয়ার। তারপর দেখতে পায় রক্তাক্ত পদচিহ্ন। না, পা গুলো অনেকটা বড়। ভিট্টোরিয়ার নয়। শুধু বাম পা। হ্যাসাসিন!

পায়ের দাগটা সোজা চলে গেছে ঘরের কোণায়। চলে গেছে, আর ফিরে আসেনি। যেন হারিয়ে গেছে লোকটা দেয়ালের ওপাড়ে।

কাছে গিয়ে বিস্ফারিত নয়নে সে দেখল, একটা পেন্টাগ্রাম পাতলা পাথর পড়ে আছে। এগিয়ে যায় ল্যাঙডন, সরায় পাথুরে ঢাকনাটাকে। ভিতরে একটা প্যাসেজ আছে। আর আছে আলো। সামনে একটা কাঠের বাঁধা ছিল, সরিয়ে ফেলা হয়েছে সেটাকে।

এবার দৌড়াতে শুরু করল ল্যাঙডন। প্যাসেজটা উন্মুক্ত হয়েছে আরো বড় এক ঘরে। সেখানে টিমটিম করে জ্বলছে একটা মশাল! এখানে কোন বিদ্যুৎ নেই—এ এমন এক জায়গা যেখানে টুরিস্ট আসবে না কখনো। দিনের আলোয় জায়গাটাকে এত রহস্যময় দেখা যেত না। কিন্তু এখন রাত।

লা প্রিজিওনে।

ভিতরে এক ডজন ছোট ছোট জেল সেল। বেশিরভাগের লোহার বার সরিয়ে ফেলা হয়েছে। একটা বড় সেল এখনো অক্ষত। আর মেঝেতে এমন কিছু দেখতে পায় ল্যাঙডন যাতে চমকে ওঠে সে হঠাৎ করে। কালো রোব আর লাল শ্যাস পড়ে আছে। মেঝেতে। এখানেই কার্ডিনালদের আটকে রেখেছিল সে!

এগিয়ে গেল সে সামনে, একটা প্যাসেজ দেখে। দৌড়ে গেল, সময় হাতে কতটুকু আছে কে জানে! গিয়েই থমকে গেল, এখানে আসেনি রক্তের ধারা। প্যাসেজের সামনে লেখাঃ

এল প্যাসেট্টো।

স্তব্ধ হয়ে গেল সে। এ টানেলের কথা কম শোনেনি। কোথায় আছে তা জানা ছিল। এল পেসেট্টো—দ্য লিটল প্যাসেজ তৈরি হয়েছিল ভ্যাটিকান আর সেন্ট এ্যাঞ্জেলোর মধ্যে। ভ্যাটিকানে হানা পড়ার সময় অনেক পোপ এ পথে নিরাপদে বেরিয়ে এসেছে... এমনকি পূণ্যবান পোপদের অনেকেই এ পথে মিস্ট্রেসদের সাথে দেখা করার জন্য অথবা বন্দিদের অত্যাচার তদারকির কাজে এসেছে এখানে। বর্তমান কালে এই প্যাসেজের দুধারের দরজাই তালা মেরে দেয়া হয়েছে এবং চাবি রেখে দেয়া হয়েছে ভ্যাটিকানের কোন এক নিরাপদ ভল্টে। এবার চট করে সে বুঝে ফেলে কী করে ইলুমিনেটি ভ্যাটিকানের ভিতর থেকে বাইরে আর বাইরে থেকে ভিতরে যাতায়ত করত। ভেবে পায় না কে ভিতর থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। দিয়েছিল চাবিটা।

ওলিভেট্টি? সুইস গার্ডের অন্য কেউ?

যেই করে থাক, এখন আর তাতে কিছু এসে যায় না।

প্যাসেজের বিপরীতে চলে গেছে রক্তের দাগ। অনুসরণ করল সে। একটা শিকল

ঝোলানো দরজার পরে, প্যাচানো আদ্যিকালের সিঁড়ি ধরে উঠে এল। এখানেও একটা পেন্টাগ্রাম আছে।

বার্নিনি নিজের গরজে বানিয়েছিল এটা?

উঠে এল সে। দেখতে পেল, এখানেও রক্তের দাগ উঠে গেছে।

উপরে উঠে যাবার আগে ল্যাঙডন ঠিক ঠিক বুঝতে পারল তার একটা অস্ত্র দরকার।

কোন না কোন অস্ত্র প্রয়োজন, অবশ্যই প্রয়োজন। ইতিউতি তাকাতে চোখে পড়ল একটা লোহার রড। শেষপ্রান্ত খুব ধারালো। আশা করল সে, চমক আর সেই সাথে দুর্বলতার কারণে পিছিয়ে থাকবে খুনি।

উপরে উঠে চলল সে। আলো হারিয়ে গেল আস্তে আস্তে। শব্দের আশায় থামে ল্যাঙডন। কোন আওয়াজ নেই। মনে হয় তার, গ্যালিলিও আর বিজ্ঞানের অন্যান্য মহারথীর বিদেহী আত্মা তাকে অনুসরণ করছে। অনুসরণ করছে ধার্মিকদের ভূতও।

কী অবাক ব্যাপার, ভেবে বিস্ময় কাটে না তার। সারা রোমে, প্রতিথযশা বিজ্ঞানীদের বাড়িতে বাড়িতে যখন তল্লাশি চালাচ্ছিল ভ্যাটিকান, তখন ভ্যাটিকানেরই নাকের ডগায়, তার সবচেয়ে সুরক্ষিত এক ভবনে ঘাপটি মেরে ছিল সেসব বিজ্ঞানী। বার্নিনি আর কত চাতুরি করেছে আল্লা মালুম।

চার্চ অব ইলুমিনেশন আসছে...

এগিয়ে যায় সে আরো আরো। অন্ধকারের বুক চিরে। চারপাশের শ্যাফটটা আস্তে আস্তে সরু হয়ে আসে। দেখা যায় ক্ষীণ আলো।

জানে না ল্যাঙডন, দুর্গের কোথায় এখন সে আছে, এটুকুই শুধু জানে, অনেকদূর চলে এসেছে। চূড়ার কাছে।

মাথার উপর একটা এ্যাঞ্জেল আছে। তার উদ্দেশ্যে সে বলল, আমার উপর নজর রাখো, এ্যাঞ্জেল।

তারপর চলে গেল ঘরের দোরগোড়ায়। হাতে লোহার অস্ত্রটাকে শক্ত করে ধরে। প্রথমে জেগে উঠে ভিট্টোরিয়া মনে করেছিল তার হাতের বাঁধনটা আলগা করা যাবে। আস্তে আস্তে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এখল শক্তিমত্ত লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। খোলা বুকে। সেখানে শক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। খুব ধীরে হ্যাসাসিন তার ভারি বেল্টটা খুলে ফেলে। ফেলে দেয় সেটাকে মেঝেতে।

আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল ভিট্টোরিয়া। আবার যখন খুলল সে, আরো আতঙ্কিত হয়ে পড়ল খুনির হাতের ছুরি দেখে সেটা ধরে রাখা হয়েছে মুখের সামনে।

স্টিলের অস্ত্রটা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল মেয়েটা।

স্টিলের পাত ঠেকাল হ্যাসাসিন তার গালে, আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামিয়ে নিয়ে তার খোলা পেটে, তারপর সাবধানে শর্টসের উপর দিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে।

এই ব্লেডটাই তোমার বাবার চোখ উপড়ে নিয়েছে।

সেই মুহূর্তে ভিট্টোরিয়া বুঝতে পারল যে সে খুন করার যোগ্যতা রাখে।

খাকি শর্টসের উপর দিয়ে সে উপরনিচ করছিল ছুরিটাকে এমন সময় কেউ একজনের উপস্থিতি টের পাওয়া গেল ঘরে।

সরে যাও তার কাছ থেকে! চিৎকার করে উঠল একটা কণ্ঠ দরজা থেকে।

ভিট্টোরিয়া দেখতে পেল না কে বলছে কথা কিন্তু বুঝতে পারল মুহূর্তে।

রবার্ট! সে এখনো বেঁচে আছে!

চমকে উঠল খুনি, মিস্টার ল্যাঙডন, আপনার নিশ্চয়ই পথ দেখানোর একজন এ্যাঞ্জেল আছে।

এক মুহূর্তে ল্যাঙডন বুঝে নিল যে সে একটা গোপনীয় এলাকায় ঢুকে পড়েছে। নিরাপদ এবং গোপনীয়। চারপাশে হাজার সিম্বলজির খেলা। পেন্টাগ্রামের টাইল, গ্রহ-উপগ্রহের ফ্রেস্কো, ঘুঘু, পিরামিড।

দ্য চার্চ অব ইলুমিনেশন। সরল এবং খাঁটি। চলে এসেছে সে জায়গামত।

বরাবর সামনে একটা দরজা। সেখানে ব্যালকনি। ভিট্টোরিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে নগ্ন বুকের খুনি। এক মুহূর্তের জন্য তাদের চোখাচোখি হল।

তাহলে, আমরা আবার দেখা করছি! হাসল হ্যাসাসিন। আর এবার তুমি আমাকে মারার জন্য এটা নিয়ে এসেছ?

ওর বাঁধন খুলে দাও।

ভিট্টোরিয়ার গলায় চাকুটা বসিয়ে দিল খুনি, একটু চাপ দিল, বরং তাকে খুন করে ফেলি।

আমার মনে হয়... সে এটাকেই বেছে নেবে, পরিস্থিতির কারণে।

খুনি হাসল অপমানটা গায়ে না মেখে, ঠিকই বলেছ তুমি। তার দেয়ার মত অনেক কিছু আছে।

সামনে এগিয়ে গেল ল্যাঙডন। হাতে জড়িয়ে রেখেছে লোহার বারটাকে। যেতে দাও ওকে!

মনে হল একটা মুহূর্তে ব্যাপারটা ভাবল হ্যাসাসিন। হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে ঝুলিয়ে দিল কাঁধ। এমনভাবে হাতটাকে নামাল, যেন ফেলে দেবে ছুরি। তারপরই বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। কালো পেশীর একটা ঢেউ দেখতে পেল ল্যাঙডন। তারপর হাতটা উঠে এল উপরে। তারপর সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যে সেখানে ঝলকে উঠল ছুরিটা। ছুটে এল তার বুক বরাবর।

কিন্তু বড় বাঁচা বেঁচে গেল ল্যাঙডন। কানের পাশ দিয়ে শীষ কেটে বেরিয়ে গেল ছুরিটা। পড়ল গিয়ে মেঝেতে।

নিলডাউন হয়ে আছে ল্যাঙডন। হাতের রডটা শক্ত করে ধরা। ছেড়ে দিল হ্যাসাসিন ভিট্টোরিয়াকে। এগিয়ে এল সামনে। একটা সিংহ যেভাবে শিকারের কাছে এগিয়ে যায়, সেভাবে।

পা হঠাৎ করে নড়াচড়া বন্ধ করে দিল ল্যাঙডন। কেন যেন ভিজা কাপড় লেপ্টে আছে তার গায়ে। নিচু করে রাখা রডটাকে উঁচু করতে গিয়ে যেন ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে যাচ্ছে সে।

খুব দ্রুত, যেন হাওয়ায় ভর করে এগিয়ে আসছে খুনি। তার প্রতিটা পদক্ষেপে দৃঢ়তার পরিচয়, পায়ের ব্যাথার কথা একেবারে বেমালুম ভুলে গেছে সে। বোঝাই যায়, তার অভ্যাস আছে এমন সব ব্যাপারে।

জীবনে প্রথমবারের মত ল্যাঙডনের মনে হল, যদি একটা বিরাট আকারের গান থাকত হাতে!

চারপাশে ঘুরছে খুনি। এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে ছুরিটার দিকে। কিন্তু তাকে সরিয়ে দিল ল্যাঙডন। আবার এগুনোর চেষ্টা করল সে ভিট্টোরিয়ার দিকে। এবারো বাধা দিল সে। সাবধানে, দূরত্ব রেখে শিকারীর মত এগুচ্ছে হ্যাসাসিন।

এখনো সময় আছে। বলে দাও কোথায় আছে ক্যানিস্টারটা। ভ্যাটিকান তোমাকে ভাল পে করবে। ইলুমিনেটির চেয়ে অনেক বেশি।

তুমি একটা গাধা।

আবার আঘাত হানার চেষ্টা করল ল্যাঙডন। সরে গেল খুনি। তাকে কোণঠাসা করে ফেলার চেষ্টা করছে গোলাকার ঘরটায়। কিন্তু হতাশ হতে হল ল্যাঙডনকে।

এই মরার ঘরটায় কোন কোণা নেই!

অবাক হলেও সত্যি কথা, খুনির নড়াচড়ায় আঘাত হানার কোন মতলব নেই। সে যেন

খেলছে। যেন মজা পাচ্ছে। অপেক্ষা করছে সুযোগের জন্য।

কীসের জন্য অপেক্ষা করছে লোকটা?

অন্তহীন দাবাখেলার মত চলছে ধৈর্য পরীক্ষা। দুজনেই শান্ত। ধীর। স্থির।

টের পেল হঠাৎ ল্যাঙডন। ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে সে লোহার জিনিসটা ধরে রাখতে রাখতে। খুব বেশিক্ষণ সে কাজটা করতে পারবে না।

ল্যাঙডনের মনটা যেন পড়ে ফেলল খুনি। সে এগিয়ে যেতে শুরু করল ঘরের মাঝখানে। টেবিলের দিকে।

কোন অস্ত্র আছে কি সেখানে?

আবারো পড়ে ফেলল খুনি তার মনটাকে। একটা লম্বা দৃষ্টি হানল সে টেবিলের দিকে।

আর পারল না ল্যাঙডন। সেও তাকাল। একটা বড় পাঁচকোণা বাক্সে খোলা পড়ে আছে। সেটার ভিতরে পাঁচ বাহুতে পাঁচটা জিনিস।

কোন সন্দেহ নেই কী সেগুলো।

ইলুমমিনেটি, আর্থ, এয়ার, ফায়ার, ওয়াটার।

কিন্তু একটু পরই টের পেল সে, ভিতরে আরো বড় একটা কম্পার্টমেন্ট আছে। মাঝামাঝি। সেখানে একটা ফাঁকা, চতুষ্কোণ জায়গা। তার ভিতরে সবচেয়ে বড় কোন প্রতীক থাকার কথা।

মাই গড!

হঠাৎ করেই ধৈর্যের খেলা বন্ধ করল হ্যাসাসিন। যেন এবারো বুঝতে পারছে, কী ভাবে ল্যাঙডন। এগিয়ে এল সে বাজপাখির মত।

এবার লোহার দণ্ডটাকে ল্যাঙডনের মনে হল গাছের গুড়ির মত ভারি। সে কিছু করার আগেই এসে পড়ল খুনির শক্তিমদমত্ত হাত ধরে ফেলল বারটাকে। হাতের অমিত তেজ ঠিক ঠিক টের পাওয়া যায়। সেখানে যে একটা আঘাত আছে সেটা যেন ভুলেই গেছে হ্যাসাসিন।

দুজনে টানাটানি শুরু করায় বুঝতে পারে ল্যাঙডন, হেরে যাচ্ছে সে। লোকটার হাত থেকে ছোটানোর কোন উপায় নেই।

তারপর এল অন্ধকার। ছুটে গেল তার হাত থেকে রডটা। আক্রমণকারী হয়ে গেল কোণঠাসা। চোখে অন্ধকার দেখল আঘাত পেয়ে ল্যাঙডন।

যেন কোন ঝড় উঠে এসেছে তার কাছে।

তোমাদের আমেরিকান ছেলেখেলা পেয়েছ নাকি?

ইলুমিনেটির ষষ্ঠ ব্র্যান্ডের কথা আমি কখনো শুনিনি!

আমার মনে হয় তুমি শুনেছ। মুখ ভেঙচে হাসল হ্যাসাসিন।

প্রাচীণ বস্তুগুলোর এক অসাধারণ সম্মিলন। আমার ভয় হচ্ছে তুমি হয়ত তা আদৌ দেখতে পাবে না।

সময় ক্ষেপনের জন্য মরিয়া হয়ে কথা বাড়াচ্ছে ল্যাঙডন, আর তুমি এই ব্র্যান্ডটা দেখেছ?

হয়ত কোন একদিন তারা আমাকে সম্মান করবে, যেভাবে তাদের সেবা করেছি। আমি!

কোন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে খুনি তাকে দেয়ালের দিকে ঘেঁষে ঘেঁষে।

কোথায়?

ব্র্যান্ডটা? কোথায় সেটা?

এখানে নেই। জ্যানাস সেই ব্যক্তি যে সেটা ধারণ করে।

জ্যানাস?।

ইলুমিনেটির গুরু। আসছে সে অচিরেই।

ইলুমিনেটির নেতা এখানে আসছে?

শেষ ব্র্যান্ডিংটা পুরো করতে।

শেষ ভিকটিম কে? সে? নাকি শান্ত হয়ে শুয়ে থাকা ভিট্টোরিয়া?

এ কাজে, হাসল হ্যাসাসিন, তোমরা দুজন কিছুই না। তোমরা মারা যাচ্ছ, অবশ্যই, এ

কথাটা সত্যি। কিন্তু শেষ লক্ষ্য এমন একজন, যে সত্যি সত্যি বড় এক শত্রু।

কে?

মারা গেছে সব প্রেফারিতি। মারা গেছে পোপ। আর কে থাকতে পারে?

ক্যামারলেনগো।

এই এক রাতে দশ-বিশ বছরের জন্য ক্যামারলেনগো ডুবিয়ে দিয়েছে ইলুমিনেটিকে। মানুষের মনে তাদের জন্য যে অপার ঘৃণার জন্ম হয়েছে সেটা ইলুমিনেটির পথকে কণ্টকিত করবে।

তুমি কখনোই তার কাছে যেতে পারবে না। চ্যালেঞ্জ ছুড়ল ল্যাঙডন।

আমি না। ঐ সম্মান স্বয়ং জ্যানাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইলুমিনেটির নেতা স্বয়ং ক্যামারলেনগোর বুকে ব্র্যান্ড বসিয়ে দেবে?

ক্ষমতাবলে।

কিন্তু এখন কেউ ভ্যাটিকান সিটিতে যেতে পারবে না।

যে পর্যন্ত তার একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকছে সে পর্যন্ত।

একজন, মাত্র একজন এগিয়ে আসছে ভ্যাটিকানের দিকে। যাকে প্রেস ডাকছে ইলেভেন্থ আওয়ার সামারিটান নামে। রোচার বলেছিল এ লোকের কাছে তথ্য আছে

সাথে সাথে থেমে গেল ল্যাঙডনের চিন্তার ধারা। গুড গুড!

আমিও ভেবে পাচ্ছিলাম না জ্যানাস কীভাবে ঢুকবে। তারপর ভ্যানে আমি রেডিও শুনলাম। ইলেভেন্থ অওয়ার সামাটারিয়ান আসছে। ভ্যাটিকান খোলা হাতে জড়িয়ে। নেবে তাকে।

আৎকে উঠল ল্যাঙডন আবার, জানাসই ইলেভেন্থ আওয়ার সামাটারিয়ান!

কিন্তু কীভাবে রোচার তাকে স্বাগত জানাবে? নিয়ে যাবে ক্যামারলেনগোর চেম্বারে? নাকি সেও যুক্ত?

এবার একটা আঘাত হানল হ্যাসাসিন।

একপাশে একটু সরে গিয়ে জায়গা করে দিল আঘাতটাকে ল্যাঙডন।

জ্যানাস ভ্যাটিকান থেকে জ্যান্ত বেরুতে পারবে না।

শ্রাগ করল হ্যাসাসিন, কিছু কিছু ব্যাপার আছে, যার জন্য মরতেও আপত্তি নেই।

কিছু কিছু কাজের জন্য মারা পড়তেও গৌরব। কিন্তু জ্যানাস কি সুইসাইড মিশনে আসতে পারে? সাইকেল পূর্ণ হয়েছে। এও হয়ত এক প্রকার গর্ব।

হঠাৎ করে ল্যাঙডন টের পায়, তার পিছনের দেয়াল অদৃশ্য হয়ে গেছে। চলে এসেছে সে ব্যালকনিতে। ঠান্ডা বাতাসের ঝাঁপ্টা লাগছে গায়ে।

কোন সময় নষ্ট করল না খুনি। সোজা চালিয়ে দিল বর্শাটা। এড়িয়ে গেল ল্যাঙডন, লাগল শার্টে। আবার হামলা।

ধরে ফেলল এবার সে বর্শাটা। কিন্তু অনেক বেশি দক্ষ আর শক্তিমান খুনি। সে আবার হামলে পড়ল। টানাটানি শুরু করল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে।

শরীরটা নিচের দিকে এলিয়ে দিয়ে ল্যাঙডন চেষ্টা করল হ্যাসাসিনের পায়ে আঘাত হানার।

কিন্তু হ্যাসাসিন একজন প্রফেশনাল।

এই মাত্র টেক্কা ছুড়ল ল্যাঙডন। এবং সে জানে, এইদান হেরে ভূত হয়ে যাচ্ছে সে। সাথে সাথে উপরের দিকে হাত তুলল হ্যাসাসিন। বড়টার দেহ লাগল ল্যাঙডনের বুকে। আড়াআড়ি। সেভাবেই চেপে ধরল তাকে খুনি। সাথে সাথে বুঝতে পারল ল্যাঙডন, তার পিছনে শূণ্যতা।

মাআস সালামাহ্! বলল হ্যাসাসিন, গুডবাই!

একহাতে রেলিং ধরে রাখল সে। অন্যটা, বাহাত, পিছলে গেছে। একই সাথে বাঁচার তাগিদে এক পা উঠিয়ে দিল সে উপরে। শরীর ঝুলে গেছে পিছনে।

হঠাৎ পিছনে ঐশ্বরিক আলো এল এগিয়ে, কীভাবে যেন। আলোকিত হয়ে উঠল।

ফস্কে গেল বর্শাটা। পড়ে গেল অন্ধকারে। নিচে।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল হ্যাসাসিন।

উঠে এল ল্যাঙডন ভিট্টোরিয়ার পাশে। জ্বলছে মেয়েটার চোখজোড়া, ধ্বক ধ্বক করে।

কীভাবে মেয়েটা ছাড়া পেয়েছে জানে না, চেষ্টাও করে না জানার। এগিয়ে যায় সে ভিতরের দিকে।

হ্যাসাসিন হাত বাড়াল। ধরে ফেলল মশালটা। কিন্তু সময় নষ্ট করবে না ল্যাঙডন। এগিয়ে গেল সে ভিতরে। চলে এল। পুড়ে যাচ্ছে হাসাসিনের পিছনটা।

যেন এই চিৎকার আশপাশের নিরবতা ছেড়ে চলে গেল ভ্যাটিকানের দোরগোড়ায়।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে খুনি। একই সাথে তার মুখে চেপে ধরেছে ভিট্টোরিয়া মশালটা। আবার জান্তব চিৎকার বেরিয়ে এল খুনির মুখ থেকে। কণ্ঠ চিরে। পুড়ে যাচ্ছে তার মুখমন্ডল। পোড়া মাংসের হিসহিসে শব্দ উঠছে। হাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে।

চোখের বদলে চোখ। সাপের মত হিসহিস করল ভিট্টোরিয়া।

চেপে ধরল তাকে দুজনে পিছনদিকে। এলিয়ে পড়ল খুনি। তার বুক থেকে আর কোন যন্ত্রণার শব্দ উঠছে না। উঠছে বীভৎস এক গোঙানির আওয়াজ।

আরো বেশি চাপ দিল ভিট্টোরিয়া আর ল্যাঙডন।

আরো এলিয়ে পড়ল খুনি। রেলিঙে।

তারপর, একেবারে হঠাৎ করেই, সমস্ত ভর চলে গেল। পড়ে গেল হ্যাসাসিন। অনেক অনেক নিচের কামানের গোলার মধ্যে।

ফিরল ল্যাঙডন মেয়েটার দিকে। এত মমতা সে কোন মেয়ের জন্য পুষে রাখবে, কখনো কল্পনাও করেনি। তাকাল বিদ্ধস্ত মুখের দিকে।

মেয়েটার চোখ জ্বলছে দাউ দাউ করে একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের মত।

হাউডিনি যোগব্যায়াম জানত।

১০৯

অন্যদিকে, সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে, সুইস গার্ডের দেয়াল চেপে ধরছিল লোকজনকে। পিছনদিকে সরিয়ে নিচ্ছিল। একটা নিরাপদ দূরত্বে। কোন কাজ হল না। কান দিচ্ছে না লোকজন।

তাদের মনে নিজেদের নিরাপত্তার কথা একবারো উঁকি দিচ্ছে না। সমস্ত ধ্যান জ্ঞান ভ্যাটিকানের উপর।

ক্যামারলেনগোর কল্যাণে টিভি চ্যানেলগুলো সুইস গার্ডের কাছ থেকে পাওয়া ক্যানিস্টারের লাইভ টেলিকাস্ট করছে টিভি চ্যানেলগুলো।

মানুষ কেয়ার করছে না। তারা বিশ্বাস করতে পারছে না যে একটা মাত্র ফোঁটা মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলবে ঈশ্বরের মহানগরীকে। অথবা; যদি তা হয়ও, আরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি আছে।

ইলুমিনেটি নিশ্চয়ই আজ রাতে এমন কোন ঘোষণা আশা করেনি। তাই একদান এগিয়ে আছে কার্লো ভেন্ট্রেস্কা। ক্যামারলেনগো প্রমাণ করেছে, সেই-ই ভ্যাটিকানের কমান্ডে আছে এই মুহূর্তে।

সিস্টিন চ্যাপেলের ভিতরে, কার্ডিনাল মর্টাটি বসে আছে চুপচাপ। বেশ কয়েকজন কার্ডিনাল প্রার্থনায় রত। কেউ কেউ ফিসফিস করছে। বাকিরা ভিড় করেছে বাইরে বেরুনোর দরজার পাশে।

ধাক্কা দিচ্ছে দরজায় কেউ কেউ।

বাইরে, লেফটেন্যান্ট চার্ট্রান্ড একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। কী করবে ভেবে পাচ্ছে সে। ক্যাপ্টেন রোচার শক্ত আদেশ দিয়েছে, সে না বলা পর্যন্ত কোন কার্ডিনাল বেরিয়ে আসতে পারবে না।

ভেবে পায় না সে, কী করবে। আরো বাড়ছে দরজায় করাঘাত। ভুলে গেল নাতো ক্যাপ্টেন? রহস্যময় ফোনকল পাবার পর বিচিত্র আচরণ করছে ক্যাপ্টেন রোচার।

ওয়াকিটকি খুলল সে, ক্যাপ্টেন? দিস ইজ চার্ট্রান্ড। শুড আই ওপেন দ্য সিস্টিন? ইট ইজ টাইম।

দরজা বন্ধ থাকবে। মনে হয় আগেই আমি আদেশটা দিয়েছি তোমাকে।

ইয়েস, স্যার। আই জাস্ট–

আমাদের অতিথি চলে আসবেন যে কোন মুহূর্তে। অপেক্ষা কর। আর কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দাও পোপের অফিসের সামনে। ক্যামারলেনগো কোথাও যাচ্ছে না।

আই এ্যাম সরি, স্যার?

কোন ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না, লেফটেন্যান্ট?

কিছু না, স্যার। আমি কাজে নেমে পড়ছি।

আগুনের পাশে বসে ক্যামারলেনগো মেডিটেশন করছে। পোপের অফিসে। শক্তি দাও ঈশ্বর! শক্তি দাও আমাকে। একটা মিরাকল ঘটাও। আজ রাতটা বাঁচবে কিনা তা ভাবতে ভাবতে সে তাকাল আগুনের দিকে।

এগারোটা তেইশ।

ক্যাসল সেন্ট এ্যাঞ্জেলোর ব্যালকনিতে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে আছে ভিট্টোরিয়া।

পাগলের মত সে রবার্ট ল্যাঙডনকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। একই সাথে কোত্থেকে যেন অস্বস্তি এসে থামিয়ে দিচ্ছে তাকে।

পাশ থেকে তার কাঁধ ধরল ল্যাঙডন। সাথে সাথে ভেঙে গেল সব বাঁধ। প্রচণ্ড আবেগে ভিজে একসা হওয়া ল্যাঙডনের দিকে ফিরল সে। একটু দূরত্ব বজায় রেখে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ...

ফিসফিস করে।

চোখ মুছল ভিট্টোরিয়া। দুজনেই নিরবে দাঁড়িয়ে রইল। আরো অসীম সময় ধরে, অনন্তকাল তারা সেখানে সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত, কিন্তু হাতে সময় নেই।

এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। বলল ল্যাঙডন অবশেষে।

তাকাল তারা বিশ্বের সবচেয়ে ছোট দেশটার দিকে। মিডিয়া ভ্যানের আলোয় সেটা আলোকিত। আর চত্তর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে অযুত লোক। তাদের খুব একটা সরাতে পারেনি সুইস গার্ড।

আমি ভিতরে যাচ্ছি। বলল ল্যাঙডন।

ভ্যাটিকানের ভিতরে?

ইলেভেন্থ আওয়ার সামাটারিয়ান যে কে সেটা বলল ল্যাঙডন। বলল বাকি কথাগুলোও।

ভ্যাটিকান সিটির ভিতরে কেউ জানে না, অবশেষে বলল সে, তাদের সাথে যোগাযোগ করার কোন উপায় নেই আমার হাতে। আর লোকটা যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। ভিতরে তাকে ঢুকতে দেয়ার আগে গার্ডদের সতর্ক করতে হবে।

কিন্তু তুমি কখনোই এত মানুষের ভিড় ঠেলে ভিতরে যেতে পারবে না।

একটা পথ আছে। ট্রাস্ট মি।

আমিও আসছি।

না, শুধু শুধু দুজনের জীবন বিপন্ন করার কোন মানে হয় না।

আমাকে ঐ লোকগুলোকে সরাতে হবে। তারা খুব বড় একটা ঝুঁকির মধ্যে আছে—

সাথে সাথে এল একটা কম্পন। অবিশ্বাস্য শক্তিতে কেঁপে উঠল গোটা ক্যাসেল। কেমন একটা চোখ ধাঁধানো আলো এল ভ্যাটিকান থেকে।

মাই গড! এন্টিম্যাটার আগে আগেই বিস্ফোরিত হয়ে গেছে!

না, তেমন কিছু হয়নি। পুরো স্কোয়ারের লোকজন চিৎকার করে উঠল। মিডিয়া ভ্যানের সমস্ত আলো আলোকিত করে তুলল আকাশকে। সেই সব আলো এসে পড়ল দুর্গের উপর।

কেন!

তাকাল ল্যাঙডন সাথে সাথে, কোন নরকের...

মাথার উপরে আকাশ চিৎকার করে উঠল।

তারপরই দেখতে পেল তারা, পাপাল হেলিকপ্টার উঠে এসেছে তাদের মাথার উপরে। একেবারে নিচ দিয়ে সগর্জনে এগিয়ে গেল সেটা। মিডিয়ার সমস্ত আলো এসে পড়ছে সেটার উপর। এগিয়ে গেল চপারটা ক্যাসেলের উপর দিয়ে। ভ্যাটিকানের দিকে।

আবার অন্ধকার।

মানুষজন ছাড়া স্কোয়ারের যেটুকু জায়গা ফাঁকা ছিল সেটায় নামল সেটা।

কীভাবে ঢোকা যাবে, বলো। বলল অস্থির ভিট্টোরিয়া।

কিন্তু তাকিয়ে আছে তারা সামনের দিকে। ভ্যাটিকানের দিকে। বলল ল্যাঙডন, লাল গালিচা সংবর্ধনা। ঐতো, রোচার।

থামল তারা একটু। আবার বলল সে, কারো তাদের সতর্ক করে দিতেই হবে!

উদ্যত হল সে যেতে।

কিন্তু তাকে বাধা দিল ভিক্টোরিয়া, থাম!

তাকাল তারা আবার সেদিকে। খুলে গেছে দুয়ার। নেমে আসছে একজন। এমন একজন, যাকে এত দূরত্ব থেকেও সোজা দেখা যাবে। সে আর কেউ নয়, পঙ্গু একজন মানুষ।

ইলেক্ট্রিক সিংহাসনে বসা এক রাজা। ম্যাক্সিমিলিয়ান কোহলার।

কোহলার নামল। তাকে স্বাগত জানাল রোচার।

কোন এলিভেটর নেই? জিজ্ঞাসা করল কোহলার।

কোন বিদ্যুৎ নেই। সার্চের জন্য। সার্চের অংশ।

এমন এক অংশ যা কাজে লাগে না।

নড করল রোচার।

কোহলার সামনে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে তার মনে হল, এটাই শেষ যাওয়া।

পোপের অফিসে যাবার সাথে সাথে দৌড়ে এল এক গার্ড, ক্যাপ্টেন, এখানে আপনি কী করছেন? আমরা মনে করেছিলাম এ লোকের কাছে তথ্য আছে যে . . . .

তিনি শুধু ক্যামারলেনগোর সাথে কথা বলবেন।

সন্দেহের চোখে তাকাল গার্ডরা। তারা প্রশিক্ষিত, দক্ষ। বিপদের গন্ধ কী করে যেন টের পেয়ে যায়।

ক্যামারলেনগোকে বল যে সার্নের ডিরেক্টর জেনারেল, ম্যাক্সিমিলিয়ান কোহলার তার সাথে দেখা করতে এসেছেন।

ইয়েস, স্যার! দৌড়ে গেল একজন ভিতরে।

এক মুহূর্ত, ক্যাপ্টেন, আপনার অতিথির কথা আমরা বলছি।

কোহলার থামল না। সে চেয়ারটাকে ঘোরাল গার্ডদের দিকে। তাদের চারপাশে।

ফার্মালিটি! স্যার! স্টপ!

পৃথিবীর সবচেয়ে এলিট বাহিনীর কোন তোয়াক্কা করল না সে। যদি শক্ত সমর্থ আর একটু কম বয়েসি হত সে, তখন অন্যরকম ব্যবহার করত গার্ডরা।

কোন কেয়ার করে না সে আজ। জীবনের সমস্ত সাধনা ভেস্তে দিতে চলেছে লোকটা! ক্যামারলেনগোর মত লোকটা মারা গেলে যাবে সে, প্রাণত্যাগ কোন ব্যাপার না আজ।

সামনে এগিয়ে চলেছে সে। সোজা পোপের অফিসের দিকে।

সিনর? বলল এক প্রহরী, পোপের অফিস আড়াল করে তারা দাঁড়িয়েছে। আপনাকে থামতেই হবে!

একটা সাইড আর্ম বের করল একজন।

থামল কোহলার।

রোচার বলল তাকে, মিস্টার কোহলার, প্লিজ। এক মুহূর্ত লাগবে। অঘোষিতভাবে কেউ কখনো পোপের অফিসে প্রবেশ করে না।

তাকাল কোহলার তার চোখে চোখে। তারপর হাল ছেড়ে দিল।

ফাইন, অপেক্ষা করছি আমরা।

তাকাল কোহলার তাদের দিকে। এরা সেই লোকজন। এরাই তারা। এদের জন্য সে কখনো কোন মেয়েকে স্পর্শ করতে পারেনি... একটা এ্যাওয়ার্ড নেয়ার জন্য কোন সময় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কুঁকড়ে থেকেছে সর্বক্ষণ।

কী সত্য তারা বহন করে? কোন প্রমাণ? ড্যাম ইট! পুরনোদিনের ফেব্রিকে মোড় একটা বই? অলৌকিকের প্রত্যাশা? প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত, বিজ্ঞান অলৌকিক কাজ করে।

সামনে একটা আয়না আছে। সেদিকে তাকায় কোহলার। আবার তার নিজের কথা মনে পড়ে যায়। তাকায় সে নিজের পাথুরে চোখের দিকে। আজ রাতে আমি বলি হয়ে যেতে পারি ধর্মের হাতে। কিন্তু এমনটা এই প্রথম ঘটবে না।

ফ্রাঙ্কফুর্টে, তার বিছানার অসাধারণ চাদরে শুয়ে ছিল এগারো বছরের বালক, ম্যাক্স। ভিজে যাচ্ছিল চাদর। তিনজন ডাক্তার ছিল তার পাশে। আর একপাশে, বাবা মা হাঁটু গেড়ে বসে ছিল।

তাকান ছেলেটার দিকে! কী অবস্থা তার! আমাদের এখনি পদক্ষেপ নিতে হবে। বলেছিল এক ডাক্তার।

না। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করবেন। বলেছিল মা।

ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন! ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন!

একঘণ্টা পরে, ম্যাক্স টের পেল, তার সমস্ত শরীর যেন কোন গাড়ির তলায় চাপা পড়ে গেছে। কান্নার মত শক্তিও ছিল না অবশিষ্ট।

আপনার সন্তান অসম্ভব যন্ত্রণা পাচ্ছে বলেছিল আরেক ডাক্তার, আমার ব্যাগে একটা ইঞ্জেকশন আছে–

রুহে! বিটে! বন্ধ চোখেই ম্যাক্সের বাবা বলল। এখনো প্রার্থনা করছে।

বাবা, প্লিজ! অবশেষে মুখ খোলে ম্যাক্স, যন্ত্রণাটা কমাতে দাও!

এক ঘণ্টা পরে, ব্যথার অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে।

আপনার সন্তান প্যারালাইজড হয়ে পড়তে পারে। পারে মারা যেতে! আমাদের হাতে সাহায্যে লাগার মত ওষুধ আছে।

ফ্রাউ আর হের কোহলার বাধা দিল। তারা ওষুধে বিশ্বাস করে না। ঈশ্বরের মাস্টারপ্ল্যানে হাত ঢোকানোর কে তারা! আরো আরো প্রার্থনা করতে থাকে। অবশেষে ঈশ্বর তাদের হাতে এই সন্তানকে সমর্পণ করেছিলেন। কেন কেড়ে নেবেন?

ম্যাক্সের কানে কানে শোনায় মা, আরো শক্ত হতে হবে। ঈশ্বর তাকে পরীক্ষা করছেন... বাইবেলের আব্রাহামকে যেভাবে পরীক্ষা করেছিলেন... বিশ্বাসের পরীক্ষা।

বিশ্বাস রাখার চেষ্টা করল ছোট্ট ছেলে ম্যাক্স। কিন্তু ব্যাথাটা আরো আরো মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

এটা দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এক ডাক্তার চলে গেল ঘর ছেড়ে। ভোর পর্যন্ত প্রতিটা পেশীতে অসম্ভব বেদনা নিয়ে শুয়ে থাকল সে বিছানায়। কোথায় জিসাস? আমার ব্যাথা কি তিনি দেখতে পাচ্ছেন না?

তখনি, যখন মা ঘুমিয়ে পড়েছে বিছানার পাশে, প্রার্থনা করতে করতে, দেখতে পেল সে, শিয়রে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে।

এ্যাঞ্জেল?

না, এ্যাঞ্জেল নয়, একজন ডাক্তারের কণ্ঠ। দুদিন ধরে যে ডাক্তার তার পাশে বসে থেকে থেকে মা-বাবাকে অনুরোধ করছিল, ইংল্যান্ড থেকে আনা নতুন ওষুধটা দেয়ার জন্য।

আমি কখনো নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না যদি এ কাজটা না করি।

একটা সূচের ছোয়া পেল সে। কিন্তু ব্যাথার কাছে সেটা কিছু নয়।

তারপর গুছিয়ে নিল তার জিনিসপত্র। ব্যাগে ভরতে ভরতে কপালে হাত রেখে বলল, এটা তোমাকে রক্ষা করবে। ওষুধের উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল সে। এবং দিনে প্রথমবারের মত তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

জ্বর চলে যাবার সাথে সাথে বাবা-মা দাবি করল এই হল অলৌকিক। নিয়ে গেল তাকে গির্জায়।

সেখানে প্রিস্ট বলল, এ একমাত্র ঈশ্বরের খেলা যে, এই ছেলে বেঁচে গেছে।

শুধু শুনল ম্যাক্স। বলল না কিছুই।

কিন্তু আমাদের সন্তান হাঁটতে পারছে না। কাঁদছিল ফ্রাউ কোহলার।

হ্যাঁ। আমার মনে হয় ঈশ্বর তাকে পূর্ণ বিশ্বাস না রাখার জন্য শাস্তি দিয়েছেন।

মিস্টার কোহলার? বলল এক গার্ড, ক্যামারলেনগো বলছেন আপনার সাথে তিনি দেখা করবেন।

নড করল কোহলার এগিয়ে গেল হল ধরে।

আপনার আসার কথা শুনে তিনি অবাক হয়েছেন। বলল এক গার্ড।

আমি নিশ্চিত। তার সাথে একা দেখা করতে চাই।

অসম্ভব! বলল গার্ড, কেউ–

লেফটেন্যান্ট! ঘেউ ঘেউ করে উঠল রোচার, মিস্টার কোহলার যেভাবে যা চান তাই হবে।

চরম অবিশ্বাস নিয়ে সরে দাঁড়াল গার্ড।

দরজার বাইরে, সুইস গার্ড তাকে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চেক করল। কিন্তু কোহলার চারধারে গড়ে নিয়েছে একটা ধাতব বলয়। সেটাকে ভেদ করে কিছু বোঝা সম্ভব নয়।

যখন সে পোপের অফিসে ঢুকল, নিবু নিবু আগুনের আলোয় চোখ বন্ধ করে প্রার্থনায় রত ছিল ক্যামারলেনগো।

মিস্টার কোহলার, বলল সে, আপনি কি আমাকে শহীদ করার জন্য এসেছেন?

একই মুহূর্তে, ভ্যাটিকানের দিকে এগিয়ে আসছিল ভিট্রোরিয়া আর ল্যাঙডন। ল্যাঙডনের হাতে একটা মশাল। আলোকিত করে রাখছে সামনের কয়েক কদম। ছাদটা অনেক নিচু, বাতাসে হাল্কা গন্ধ। এটাই এল প্যাসেটো।

রোমান জলের আধারের মত একটা ঘরে এসে তারা প্রবেশ করল উপরের দিকে উঠতে উঠতে। সেখানে সমান হয়ে গেছে টানেলের পথ। উঁচু নিচু নয়।

এদিকে মনে পড়ছে সব ল্যাঙডনের - কোহলার, জ্যানাস, হ্যাসাসিন, নোচার...

ষষ্ঠ ব্র্যান্ড?

আমি নিশ্চিত, তুমি ষষ্ঠ ব্র্যান্ডের কথা শুনেছ। সবগুলোর চেয়ে মহিমান্বিত...

ঘোষণা করল ভিট্রোরিয়া, কোহলার জ্যানাস হতে পারে না! অসম্ভব! অসম্ভব এমন এক শব্দ যেটাকে আজ রাতে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় ল্যাঙডন।

আমি জানি না। কোহলারের ব্যক্তিত্বে অনেক শক্ত একটা চরিত্র আছে। আর আছে অসম্ভব প্রভাব।

এই ক্রাইসিসে সার্নকে একেবারে দানবের মত লাগছে। সার্নের সুনাম ক্ষুন্ন হবে এমন কিছু করবে না ম্যাক্স।

সার্নের সাথে ভ্যাটিকানের শত্রুতা আজকের নয়। ভ্যাটিকান সব সময় সার্নের সমালোচনা করে এসেছে। সার্নও আজ সবচেয়ে বেশি আলোচিত প্রতিষ্ঠান। একই সাথে এর নাম ছড়াচ্ছে। সার্ন যদি চায়, আজ রাতের মত ব্যাপার আর কখনো ঘটেনি....

প্রমোটার পি টি বার্নাম একটা কথা বলত, বলছে ল্যাঙডন, আমি কেয়ার করি না কী বল তোমরা আমার সম্পর্কে, শুধু আমার নামের বানানটা ঠিকমত কর। লোকে দেখবে না কী হল আজ রাতে। তারা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াবে সার্নকে। এন্টিম্যাটারের এই খেলা আজ রাতে দেখার পর তারা এটাকে রেজিস্টার করতে উঠেপড়ে লাগবে।

অযৌক্তিক। ধ্বংসের ক্ষমতা দেখানো তাদের কাজ নয়। প্রতিবস্তুর জন্য ব্যাপারটা ভাল হবে না। বিশ্বাস কর।

তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকমও হতে পারে। খ্রিস্টবাদের লবির জন্য এই প্রযুক্তিও অন্ধকারের পথে চলে যেতে পারত। আর এটাতো বস্তুর বিপরীত। তা সমর্থন করার কোন কারণ নেই চার্চের। অন্যদিকে ইলুমিনেটির প্রথম লক্ষ্য ভ্যাটিকান। এক ঢিলে দুই পাখি মেরে দেয়ার তাল ফাঁদছে তারা হয়ত।

চুপ করে থাকল ভিট্রোরিয়া।

ম্লান হয়ে এসেছে লণ্ঠনের আলো।

ইয়েস! কোহলার কখনোই তেতে উঠত না ক্যামারলেনগোর উপর। কিন্তু সে রীতি ভেঙেছে, মানুষের কাছে আরো খোলামেলা হয়েছে, চার্চকে আধুনিক রূপ দিয়েছে, কথা বলেছে তাদের ভাষায়, উন্মুক্ত, উদার কণ্ঠে। এটা মানুষের ভাল লেগে যাবে। তার উপর ব্যাপারটা নিয়ে আবারো ভাববে তারা। সাধারণ মানুষেরা। সে টিভির সামনে এন্টিম্যাটারটাকে উপস্থাপিত করে মানুষের ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দিয়েছে। মমতায় আর্দ্র হয়ে উঠবে সবার মন। এ এক অসাধারণ কাজ, বিশ্বাস কর আমাকে! ফলে পাশার দান উল্টে যাচ্ছে। ইলুমিনেটির উপর গিয়ে পড়ছে সমস্ত ঘৃণা। তাই হয়ত আসছে কোহলার তাকে সরিয়ে দিতে।

ম্যাক্স একটা বেজন্মা। কিন্তু সে খুনি নয়। আর আমার বাবার খুনের সাথে সে কখনোই যুক্ত থাকতে পারে না।

সার্নের অনেক শুদ্ধতাবাদীর কাছে লিওনার্দো এক হুমকি হয়ে ছিল। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মকে একত্র করে তালগোল পাকানোর মত ব্যাপার আর নেই।

হয়ত কোহলার আগেই এন্টিম্যাটার প্রজেক্টের ব্যাপারে জেনেছিল আর তাই সে চায়নি

বিজ্ঞানের সাথে ঈশ্বর এসে যোগ দিক।

আর তাই সে আমার বাবাকে খুন করবে? তাছাড়া, ম্যাক্স কোহলার কখনোই জানতে পারেনি আমাদের প্রজেক্টের ব্যাপারে।

তোমার যাবার পর হয়ত তোমার বাবা কোহলারের কাছে ধর্ণা দিয়েছিল সাজেশনের জন্য। এমন এক বিদ্ধংসী জিনিস আবিষ্কারের ব্যাপারে তিনি যে উদ্বিগ্ন ছিলেন সেটা তুমিই আমাকে বলেছ।

নৈতিকতার প্রশ্ন তোলা ম্যাক্স কোহলারের কাছে? আমার তা মনে হয় না।

যত দ্রুত তারা এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমে মোড় নেয়া সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে, তত ম্লান হয়ে আসছে হাতের মশালের আলো। আলোটা নিভে গেলে কী হবে তা সে ভেবে পায় না।

তাছাড়া, বলছে ভিট্টোরিয়া, কোন দুঃখে কোহলার তোমাকে এতদূর থেকে টেনে এনে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে? জড়াবে কেন?

আগেই ভেবে রেখেছে সে এর জবাব, কোহলার আমাকে ডেকে তার দিক থেকে পরিষ্কার থাকল। সে কখনোই আশা করেনি আমরা এতদূর যাব।

সেই বিবিস রিপোর্টার, বলল ল্যাঙডন, মনে করে যে সার্নই হল নতুন ইলুমিনেটি লেয়ার।

কী? সে একথা বলেছে?

খোলাখুলি। সে সার্নকে মেসনিক গ্রুপের সাথে থাকার কথা বলেছে শতকণ্ঠে।

মাই গড! এতো সার্নকে একেবারে ধূলার সাথে মিশিয়ে দেবে!

নিশ্চিত নয় ল্যাঙডন।

সার্ন পৃথিবীর বিজ্ঞানের স্বর্গ। তাবৎ বিজ্ঞানী এখানে বসত করে তাদের পিছনে অকল্পনীয় অর্থ ঢালে সার্ন আর এটার ডিরেক্টর হল ম্যাক্সিমিলিয়ান কোহলার।

কোহলারই জ্যানাস।

যদি কোহলার এর সাথে জড়িত নাই থাকে, এখানে আসার মানে কী?

পাগলামি বন্ধ করার চেষ্টা হতে পারে। সাপোর্ট দেয়ার জন্য। হয়ত সত্যি সত্যি সে ইলেভেন্থ আওয়ার সামাটারিয়ান। সে হয়ত জানে কে প্রতিবস্ত্র প্রজেক্টের ব্যাপারটা জানে। তা জানাতেই এসে থাকতে পারে।

খুনি বলেছিল যে সে ক্যামারলেনগোকে খুন করতে আসছে।

নিজের দিকে ধ্যান দাও। এ এক সুইসাইড মিশন। ম্যাক্স কখনোই জীবিত বেরুতে পারবে না।

কথাটাকে বিবেচনায় রাখে ল্যাঙডন, সম্ভবত এটাই আসল কথা।

একটা স্টিলের অতিকায় দরজার সামনে এসে থামল তারা। ধ্বক ধ্বক করছে তার বুক। তাকাল ল্যাঙডন, না, লকটা খোলাই আছে।

সম্প্রতি এই টানেল ব্যবহার করেছে কেউ। আজ রাতেই। কার্ডিনালদের যে এ পথে বাইরে আনা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঢুকে পড়ল তারা প্রাচীন নগরীতে। বাঁ থেকে একটা শব্দ আসছে। সেন্ট পিটার্স স্কোয়ার।

আরো একটা গেটের সম্মুখীন হল তারা। এটাও খোলা। কোথায় এটা উন্মুক্ত হবে? বাগানে? ব্যাসিলিকায় নাকি পাপাল রেসিডেন্সে?

হঠাৎ করেই ফুরিয়ে গেল টানেল।

সামনে একেবারে বিশাল এক দরজা। স্মুথ। নেই কোন হ্যান্ডেল, নব, চাবির ফুটো নেই, নেই কোন হিঞ্জ। ঢোকার কোন উপায় নেই।

একে বলা হয় সেঞ্জা চিভে –ওয়ান ওয়ে পোর্টাল। হাতের মশালের সাথে সাথে দমে যাচ্ছে ল্যাঙডনের মন।

হাতের ঘড়ির দিতে তাকাল সে। মিকি জ্বলছে।

এগারোটা উনত্রিশ।

হতাশার আওয়াজ তুলে ল্যাংডন লণ্ঠনটাকে এদিকে দিকে দৌলায়। আঘাত করে দরজায়।

কিছু একটা ঘটছে।

অমঙ্গলজনক কিছু।

বাইরে অধীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লেফটেন্যান্ট চার্ট্রান্ড। অধীর অন্য গার্ডরাও। এটা ভ্যাটিকানেরা করতে পারে। তাই বলে রোচার এত অদ্ভুত আচারণ করবে কেন?

অমঙ্গলজনক কিছু একটা সত্যি সত্যি ঘটছে।

গত এক ঘণ্টা ধরে রোচারের আচরণ একেবারে অন্যরকম। সে দাঁড়িয়ে আছে চাট্রান্ডের পাশে। চোখে তার পাথুরে দৃষ্টি।

কারো না কারো এই মিটিঙের সময় ভিতরে থাকার কথা।

আরো কিছু ব্যাপার ভোগাচ্ছে লেফটেন্যান্টকে। কার্ডিনালরা। তারা এখনো ভিতরে বদ্ধ থাকার কোন কারণ নেই।

ক্যামারলেনগো পনের মিনিট আগেই তাদের ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। সিদ্ধান্তের উপর ছুরি চালিয়েছে রোচার। জানায়নি তাকে। সুইস গার্ডের চেইন অব কমান্ড কখনোই ভাঙা হয়নি এবং রোচার এখন টপ ডগ।

আধঘণ্টা... রোচার ভাবল, তার সুইস ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, প্লিজ, তাড়াতাড়ি কর!

দরজার পাশে কী ঘটছে সেটা দেখার জন্য তড়পানো শুরু করল চার্ট্রান্ড। এই ক্রাইসিসের পুরোধায় ক্যামারলেনগো ছাড়া আর কেউ নেই। অনেকদিন পর লেফটেন্যান্টের ভিতরের ক্যাথলিক লোকটা জেগে উঠল। ইলুমিনেটি একটা ভুল করে বসেছে। ক্যামারলেনগো ভেন্ট্রেস্কাকে চ্যালেঞ্জ করা তাদের উচিৎ হয়নি।

নিচ থেকে কেমন যেন একটা ধাতব, ভোঁতা শব্দ উঠে এল। তাকাল রোচার তার দিকে। বুঝে নিল চার্ট্রান্ড। দৌড়ে নেমে গেল সে। ত্রিশ গজ নামার পর ধাঁধায় পড়ে গেল। দেয়ালের আশপাশ থেকে আসছে শব্দটা। দেয়ালের ওপাশে মাত্র একটা ঘর আছে। পোপের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি। হিজ হোলিনেসের লাইব্রেরি তার মৃত্যুর সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেছে। কারো সেখানে থাকার কথা নয়।

নেমে গেল চার্ট্রান্ড। বিনা দ্বিধায় আঘাত হানল হিজ হোলিনেসের লাইব্রেরিতে। প্রাইভেট লাইব্রেরির ভিতরে কখনো যায়নি সে। পোপ না থাকলে সাথে কেউ যেতে পারবে না ভিতরে।

হাত দিল নবে। ঠিক। বন্ধ। ভিতরে কেউ একজন জোরে জোরে আঘাত করছে। কান পাতাল। কথাও হচ্ছে সেখানে!

ভিতরে আর কিছু হোক না হোক আতঙ্ক যে আছে তা টের পায় সে। কেউ কি আটকে পড়েছে? ফিরে যাবে সে? রোচারের সাথে কথা বলবে? না।

চার্ট্রান্ড সিদ্ধান্ত নিতে জানে। সে কাজটাই এখন করবে। সাইড আর্ম বের করল সে। তারপর গুলি ছুড়ল। ছিটকে গেল ভিতরদিকে কাঠ। খুলে গেল দরজা।

চতুষ্কোণ ঘরটার অন্ধকার দূর করার জন্য সে নিজের স্পটলাইট জ্বালল। ওরিয়েন্টাল কার্পেট, একের বুকশেলফ, চামড়ার কাউচ, মার্বেলের ফায়ারপ্লেস। তিন হাজার পুরনো বইয়ের সাথে ঠাসা আছে আধুনিক কালের রাশি রাশি জার্নাল। হিজ হোলিনেসের যা প্রয়োজন পড়তে পারে তার সব।

বিজ্ঞানের পত্রিকা, রাজনীতির পত্রিকা।

শব্দ উঠছে। রেচার সেদিকে তার টর্চ তুলল। দূরে, বসার জায়গার পিছনে একটা বিশাল লোহার দরজা। ভল্টের মত, চারটে অতিকায় লক আছে এর গায়ে। এর গায়ে লেখা আছে একটা কথা যা ঘুম ছুটিয়ে করে দিল চাট্রান্ডের।

এল পাসেট্রো

তাকিয়ে থাকল চার্ট্রান্ড।

পোপের গোপন এস্কেপ রুট!

এর কথা সে ভালমতই শুনেছে। কিন্তু এ যে আর ব্যবহৃত হয় না সেটাও সে জানে।

অন্যপাশে কে থাকতে পারে?

কান পাতল সে এ দরজাতেও। ওপাশ থেকে শব্দ আসছে কোহলার... মিথ্যা... ক্যামারলেনগো...

হু ইজ দ্যাট? চিৎকার করল চার্ট্রান্ড।

...আর্ট ল্যাঙডন... ভিট্টোরিয়া ভে...

চার্ট্রান্ড আরো বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, আমি মনে করেছিলাম আপনারা অক্কা পেয়েছেন...

...দরজাটা! বলছে ভিতর থেকে এক কণ্ঠ, খুলুন...

চার্ট্রান্ড তাকাল দরজার দিকে। এটা উড়িয়ে দেয়ার জন্য ডায়নামাইট লাগবে। অসম্ভব! অত্যন্ত পুরু।

... মিটিং... থামান... লেনগো... বিপদে...

দ্রুত সে ছুটে যেতে চায় পোপের অফিসের দিকে। কিন্তু থেমে যায় দরজাটার দিকে তাকিয়ে। দরজার প্রত্যেক কি হোলে একটা করে চাবি লাগানো আছে।

তাকিয়ে থাকল চার্ট্রান্ড।

কত শতাব্দি ধরে এ প্যাসেজ ব্যবহার করা হচ্ছে না তার কোন ইয়ত্তা নেই! কী করে চাবি এল এখানে!

চাবি ঘোরাল চার্ট্রান্ড তার বাতিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে। তারপর পরেরটা। প্রতিটা। খুলল সে দরজা। তাকাল ভিতরে।

রবার্ট ল্যাঙডন আর ভিট্টোরিয়া ভেট্রা দুজনেই জীবিত, বিদ্ধস্ত, ক্লান্ত।

একী! চার্ট্রান্ড দাবি করল, কী চলছে এসব? কোত্থেকে এলেন আপনারা?

ম্যাক্স কোহলার কোথায়? পাল্টা দাবি করল ল্যাঙডন।

ক্যামারলেনগোর সাথে একটা প্রাইভেট–

তাকে পাশ কাটিয়ে দুজনেই ছোটা শুরু করল। পিছনে পিছনে গান উঁচু করে এগিয়ে গেল চার্ট্রান্ড। তারপর দেখতে পেল ল্যাঙডনরা, জায়গাটা পোপের অফিসের আশপাশে।

ক্যামারলেনগো বিপদে আছে! চিৎকার করল ল্যাঙডন, হাত উঁচু করে, দরজা খুলন! ম্যাক্স কোহলার খুন করে ফেলবে ক্যামারলেনগোকে!

রোচার রাগত চোখে তাকিয়ে আছে।

দরজা খুলুন! চিৎকার করল ভিট্টোরিয়াও, তাড়াতাড়ি!

কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে।

ভিতর থেকে একটা রক্ত হিম করা চিকার এল।

ক্যামারলেনগোর চিৎকার।

এক মুহূর্ত পরে, তখনো চিৎকার চলছিল।

ক্যাপ্টেন রোচারকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল চার্ট্রান্ড। তারপর জায়গা করে দিল ভিট্টোরিয়া আর ল্যাঙডনকে।

তাদের সামনের দৃশ্য হৃদস্পন্দন বন্ধ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

কোহলারের পায়ের কাছে পড়ে আছে ক্যামারলেনগো। তার দিকে একটা পিস্তল তাক করে রেখেছে কোহলার। চিৎকার আসছে ক্যামারলেনগোর মুখ থেকে। তার রোব খুলে ফেলা হয়েছে বুকের কাছে। সেখানে কালো দাগ। পাশে পড়ে আছে ব্র্যান্ডটা।

সাথে সাথে দুজন গার্ড বিনা দ্বিধায় গুলি করল কোহলারের বুকে। সে পড়ে গেল। রক্তাক্ত। হুইলচেয়ারের উপর।

দোরগোড়ায় স্থাণুর মত দাড়িয়ে আছে ল্যাঙডন।

একেবারে স্থবির হয়ে পড়েছে ভিট্টোরিয়াও, ম্যাক্স কোনক্রমে ফিসফিস করল ....

মেঝেতে তড়পাতে তড়পাতে কোনক্রমে ক্যামারলেনগো ফিরল রোচারের দিকে তারপর তর্জনী তুলে দেখাল রোচারকে, একটা মাত্র শব্দ বলল, ইলুমিনেটাস!

ইউ বাস্টার্ড! দৌড়ে গেল রোচার তার দিকে, ইউ–

এবার ত্বড়িৎগতিতে কাজ করল চার্ট্রান্ড। ক্যামারলেনগোর দেখানোর সাথে সাথে সে সাইডআর্ম আবার হাতে নিয়েছিল, বিনা দ্বিধায় গুলি করল সে তিনবার, রোচারের পিছনে। সাথে সাথে নিজের রক্তে ডুবে গেল রোচার। মৃত।

তার দিকে বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে এগিয়ে গেল চার্ট্রান্ড আর গার্ডরা। ক্যামারলেনগোর দিকে। সে এখনো জ্ঞান ধরে রেখেছে।

একজন এগিয়ে গেল ক্যামারলেনগোর দিকে, আরো একবার তাকাল তার বুকে আঁকা চিহ্নটার দিকে। অন্য একজন উল্টো করে ধরল সিলটা।

মরার চেয়ে বড় আরো কিছু ব্যাপার আছে...

বলেছিল হ্যাসাসিন। ঠিক ঠিক ম্যাক্স কোহলার এতদূরে উড়ে এসে চার্চের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তির বুকে একে দিল চিহ্নটা। নিজের প্রাণের বিনিময়ে।

যত্ন নেয়া হচ্ছে ক্যামারলেনগোর।

সিক্সথ ব্র্যান্ড!

এগিয়ে গেল ল্যাঙডন ধোঁয়া ওঠা চিহ্নটার দিকে। আর সবগুলোর চেয়ে অনন্য এক চিহ্ন। পুরোপুরি চতুষ্কোণ। আর সবগুলোর চেয়ে বড়।

ষষ্ঠ এবং চূড়ান্ত ব্র্যান্ড... বলেছিল খুনি, আর সবগুলোর চেয়ে অনন্য।

কাঠের হাতলওয়ালা চিহ্নটাকে তুলল সে। সিলটার লোহার অংশ এখনো আগুন ছড়াচ্ছে। জানে না সে কী দেখতে পাবে।



আর সব গার্ড এটাকে দেখে এমন বিস্ফারিত নয়নে কেন তাকিয়ে ছিল বুঝছে না ল্যাঙডন। চতুষ্কোণ। দেখতে জটিল। এম্বিগ্রাম। কিন্তু অর্থ কী এটার?

একটা হাত পড়ল তার কাঁধে।

ভিট্টোরিয়ার হাত মনে হল তার। কিন্তু ভাবনাটা ভুল। সেটা অন্য কারো। রক্তাক্ত। তাকাল মুখ ফিরিয়ে ল্যাঙডন। এবং শিউরে উঠল। কোহলার।

সে এখনো জীবিত!

তাকাল সে চোখ তুলে। সেই চোখ। প্রাণহীন চোখ। পাথুরে চোখ। যেমনটা প্রথম দেখতে পেয়েছিল ল্যাঙডন সার্নে। আজই।

হাত বাড়াল আবার মরতে থাকা ডিরেক্টর জেনারেল। তার অন্য হাতে একটা দেশলাই বাক্সের মত জিনিস।

প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে গেল সে। কোন অস্ত্র নয়ত! হতেই পারে, যে তোক এমন কাজ করতে পারে, সুইসাইড মিশনে আসতে পারে, সে একটা অল্ট্রা মডার্ন বোমাও বহন করতে পারে নিশ্চিন্তে। এখনো ঘরের সবাই ক্যামারলেনগোকে নিয়ে ব্যস্ত।

কিন্তু না, এগিয়ে দিল কোহলার জিনিসটাকে, তারপর বলল, গি-গিভ দিস... টু... মিডিয়া।

মারা যাচ্ছে কোহলার একটু একটু করে।

হাত বাড়াতে গিয়েও কী এক বাঁধা পাচ্ছিল ল্যাঙডন। তারপর সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সে হাত বাড়াল। মরতে থাকা একজন সেরা বিজ্ঞানীর শেষ মুহূর্তের ইচ্ছা পূরণ করা যায়।

তাকাল সে জিনিসটার গায়ের লেখার দিকে :

সোনি রুভি

ম্যাক্স কোহলার তাহলে ছোট ক্যামকর্ডার বয়ে আনছিল! তার শেষ আকুতিটুকু নিয়ে নিল ল্যাঙডন। তারপর ভরে দিল পকেটে।

ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙল ক্যামারলেনগো, কার্ডিনালরা!

এখনো সিস্টিন চ্যাপেলে। ক্যাপ্টেন রোচার আদেশ করেছিল...

ইভাকুয়েট... নাউ, এভরিওয়ান!

সাথে সাথে তাকাল চার্ট্রান্ড একজন গার্ডের দিকে।

বলল ক্যামারলেনগো, হেলিকপ্টার... বাইরে যেতে হবে... আমাকে একটা হাসপাতালে নিয়ে চল।

১১৫

এখনো বসে আছে পাইলট, সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে। তার রোটোরের ধীর গতির শব্দও ঢাকা পড়ে গেছে মানুষের চিৎকারে। এখনো কোন রায়ট যে বেঁধে যায়নি, শুরু হয়ে যায়নি দাঙ্গা এটা দেখেই সে তুষ্ট এবং বিস্মিত।

বাইরে বিচিত্র সব ব্যাপার হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে প্রার্থনাকারীর সংখ্যা। কেউ কেউ জোরে জোরে কাঁদছে। কেউ আউড়ে যাচ্ছে বাইবেলের পঙতি, বাকিরা সমস্বরে বলে যাচ্ছে যে এই চার্চের পাওনা।

হিমশিম খাচ্ছে সুইস গার্ড।

মিডিয়া লাইটগুলো ঝলসে দিচ্ছে পাইলটের চোখ।

সামনে কয়েকটা ব্যানার ঝুলছেঃ

এন্টিম্যাটার ইজ এন্টিক্রাইস্ট।
সায়েন্টিস্ট = স্যাটানিস্ট
কোথায় তোমাদের ঈশ্বর এখন?

সে অপেক্ষা করছে আমেরিকান লোকটা, চার্ট্রান্ড আর ভিট্টোরিয়ার জন্য। তারা বয়ে আনছে ক্যামারলেনগোকে।

রোচার পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছিল। সে বলেছিল, এই সে লোক। এখন পাইলটের নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে। সে এয়ারপোর্টেই লোকটার চোখে অন্য কিছু দেখতে পেয়েছিল। অমঙ্গলজনক কিছু।

সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের দিকে, সিস্টিন চ্যাপেল থেকে, কার্ডিনালদের একটা মিছিল বেরিয়ে আসছে।

মাথা দপদপ করছে পাইলটের। কী করবে সে? একটা এ্যাসপিরিন নেবে? নাকি তিনটা? আহত লোক বহন করতে ভাল লাগে না তার। কিন্তু এ লোক আর কেউ নয়, ক্যামারলেনগো। আজকের হিরো।

মাথাটা খুব বেশি যন্ত্রণা করছে। ফার্স্ট এইড বক্সের মত যে ড্রয়ারটা আছে সেটায় হাত রাখল সে। মনে মনে তড়পাচ্ছে, থাকবে কি কোন এ্যাসপিরিন? মাথাব্যথা নিয়ে উড়ে যাওয়া খুব ঝুঁকির ব্যাপার।

না, কপাল তার খারাপ। ড্রয়ারটা তালা দেয়া। চাবি নেই তার কাছে।

ক্যামারলেনগোকে বয়ে আনছে ভিট্টোরিয়া, ল্যাঙডন আর দুজন সুইস গার্ড। কোন খাটিয়া পাওয়া যায়নি, পাওয়া যায়নি কোন স্ট্রেচার। বাধ্য হয়ে তারা একটা টেবিলে বয়ে আনছে। অসাড়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ক্যামারলেনগো।

বয়ে যাচ্ছে সময়।

একদম সামনে চলে এসেছে তারা। স্কোয়ারের চারপাশ থেকে মিডিয়ার লাইটে ধাঁধিয়ে যাচ্ছে তাদের চোখ। মানুষজনের উপর দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে।

দূরে রোটরের শব্দ আসছে। দাঁড়ানো তারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাঁধানো মঞ্চে। সিঁড়ি বেয়ে নামবে এমন সময় সাবধান হতে বলল তাদের চার্ট্রান্ড।

খোলা চত্বরে আর কেউ ছিল না। কিন্তু কোত্থেকে যেন গন্ধ পেয়ে এগিয়ে আসছে ম্যাক্রি আর গ্লিক। ম্যাক্রির হাতে ক্যামেরা রোল করছে।

আল্ট! চিৎকার করল চার্ট্রান্ড, পিছিয়ে যান!

দমবার পাত্র নয় বিবিসির রিপোর্টাররা।

ভাবল ল্যাঙডন, আর সেকেন্ড ছয়েকের মধ্যে সারা দুনিয়ার তাবৎ সংবাদ সংস্থা এই লাইভ টেলিকাস্টে শামিল হবে। সব মিডিয়াভ্যানের ক্যামেরা নেমে গেল। তারা এরই মধ্যে পেয়ে গেছে বিবিসির ফুটেজ।

কাজটা ভাল হল না। ভাল হচ্ছে না!

ভাবল ল্যাঙডন। তার দৌড়ে গিয়ে রিপোর্টারদের বাধা দিতে ইচ্ছা হল। কিন্তু করার কোন উপায় নেই। আর তাতে লাভের লাভ কিছু হবে না।

হঠাৎ উঠে বসল ক্যামারলেনগো। তার চোখ খুলে গিয়েছিল। তারপর, কেউ টের পাবার আগেই নিচু হয়ে গেল টেবিলের সামনের দিক।

পড়ে গেল ক্যামারলেনগো। অবাক হলেও সত্যি, দাঁড়াতে পারল কোনক্রমে সে। পড়ল না। কেউ ধরার আগেই টলতে টলতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। এগিয়ে গেল ম্যাক্রির দিকে।

না? চিৎকার করল ল্যাঙডন।

চার্ট্রান্ড চেষ্টা করল তার পিছু ধাওয়া করার। সাথে সাথে তাকাল ক্যামারলেনগো রক্তলাল চোখে, লিভ মি!

পিছিয়ে এল চার্লাভ বাধ্য ছেলের মত।

এশিয়ে গেল ক্যামারলেনগো। তার বুকের দিকে ছেঁড়া রোব। পিছলে পড়ে গেল সেটা। এখনো টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে ক্যামারলেনগো। তার বুক থেকে সরে গেছে আকরণ নগ্ন বুকে ঝলসে আছে একটা প্রতীক।

সারা দুনিয়া হামলে পড়ল টিভি স্ক্রিনের সামনে। চোখ ধাঁধিয়ে দিল দৃশ্যটা।

ইলুমিনেটির চূড়ান্ত বিজয়...

এবার স্ক্রিনগুলোয় ফুটে উঠল একটা, মাত্র একটা দৃশ্য। এতোক্ষণ যে প্রতীকের কোন মানে ছিল না, সেটাই বিমূর্ত হল চোখের সামনে। মানে আছে এর। খুব ভাল মানেই আছে।

সত্যিটা একটা ট্রেনের মত আঘাত করল ল্যাঙডনের বুকে।

আয়রন ব্র্যান্ডের আসল অর্থই ধরতে পারেনি সে! সিম্বলজির প্রথম শর্তটাই ভুলে গেছে। যে কোন স্ট্যাম্পে লেখাটা কীভাবে থাকে! থাকে উল্টো। নেগেটিভ। কারণ এর ছাপ পড়বে সোজা। যদি সোজা লেখা থাকে, ছাপ পড়বে উল্টো।

বেড়ে গেল আওয়াজ। বেড়ে গেল উত্তেজনা। মুহূর্মুহু রব উঠল চারধার থেকে।

এর নতুন অর্থ দিবালোকের মত স্পষ্ট প্রতিভাত হল সবার সামনেঃ এক অকল্পনীয় ডায়মন্ড! প্রাচীণ পদার্থগুলোর মাধ্যমে এমনভাবে ফুটে উঠবে যে তাকিয়ে থাকবে সবাই সেই অবিশ্বাস্য সমতা আর সৌন্দর্যের দিকে।

এক মুহূর্তে জেনে গেল ল্যাঙডন, পুরাণগুলো ভুল নয়।

আর্থ, এয়ার, ফায়ার, ওয়াটার।

দ্য ইলুমিনেটি ডায়মন্ড!

রবার্ট ল্যাঙডন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল সামনে। জোয়ার উঠল চারধার থেকে। বাঁধভাঙা জোয়ার। দুহাজার বছরের মধ্যে এমন নাটকীয়তা আর হয়নি। যেমনটা–হচ্ছে এখন, সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে।

কোন যুদ্ধ নয়, নয় কুসিফিক্স করার চেষ্টা, তীর্থযাত্রিদের ভ্রমণ নয়...

ব্র্যান্ডেড ক্যামারলেনগো... যাচ্ছে এগিয়ে সারা পৃথিবীকে সত্য দেখাতে...

ইলুমিনেটি ডায়মন্ড উন্মোচিত হয়েছে... উন্মোচিত হয়েছে এর অসম্ভব মেধার ফুরন নিয়ে...

ভ্যাটিকান সিটির অন্তিম বিশ মিনিট ঘোষণা করছে কাউন্ট ডাউনের আওয়াজ...

নাটকটা, আসলে, শুরু হল মাত্র।

যেন কোমা থেকে মাত্র উঠল ব্র্যান্ডেড ক্যামারলেনগো। এক তরুণ যাজক, যে তার জীবনটাকে পবিত্র রেখেছে ঈশ্বরের জন্য, মানুষের জন্য, খ্রিস্টবাদের জন্য... টলতে টলতে, বিড়বিড় করে কোন এক অদৃশ্য অস্তিত্বের সাথে কথা বলতে বলতে, হাত উপরে উঠিয়ে, চোখ আকাশের কালো বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে, এগিয়ে যাচ্ছে সামনে।

বল! বলল ক্যামারলেনগো, উপরের দিকে তাকিয়ে, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি আমি তোমাকে!

সাথে সাথে বুঝতে পারল ল্যাঙডন। গভীর অচৈতন্যে পড়ে গেছে ক্যামারলেনগো।

ভয়ানক এই অবস্থা।

সে নিজেও জানে না কতটা অচেতন সে এ মুহূর্তে। কোথায় আছে তাও জানে না। জানে না কী করছে। দেখছে না কিছু।

সাদা, ফ্যাকাসে হয়ে গেল ভিট্টোরিয়ার চেহারা। সে-ও বুঝতে পারছে এখন ব্যাপারটা। শক পেয়েছে সে! হ্যালুসিলেশনে পড়ে গেছে! মনে করছে সে কথা বলছে ঈশ্বরের সাথে।

কারো এটা থামাতে হবে! ভাবল ল্যাঙডন, লজ্জাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে এরপর। হাসপাতালে নিতে হবে তাকে।

সরাসরি ভিডিও করছে চিনিতা ম্যাক্রি। পজিশন নিয়ে নিয়েছে। সবার আগে তাদের ভ্যানে দেখা গেল দৃশ্যটা। তারপর বাকিগুলোয়।

ছেঁড়া কাপড়, প্রশস্ত বুক, বুকে সুবিশাল পোড়া দাগ, নিস্পাপ মুখাবয়ব, হেলেদুলে এগোনো, হাত উপরে উঠিয়ে রাখা, বিড়বিড় করা, চোখ আধবোজা, মাথা উপরে তাক করা– সব যেন এক অনির্বচনীয় দৃশ্য তুলে দিল সবার সামনে। থমকে গেল পুরো পৃথিবী। অনেক অনেক কষ্টের পর কোন তুখোড় খেলুড়ে জিতে গেছে শেষ দান। তার প্রাণের বিনিময়ে।

টি সেন্টো ডিয়ো! আই হিয়ার ইউ, গড!

চেহারায় একটা অস্বস্তি নিয়ে পিছিয়ে এল চার্ট্রান্ড।

সারা পৃথিবী থেমে গেছে। আটকে গেছে সবার হৃদস্পন্দন। একদৃষ্টে চেয়ে আছে টিভি স্ক্রিনের দিকে।

থমকে গেল ক্যামারলেনগো। তাকাল বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে। উদাস ভঙ্গি তার। যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না। খালি পা। তার ভিতর দিয়ে যিশু খ্রিস্টকে দেখতে পেল সবাই।

আবার হাত তুলল সে আরো উপরে, আরো উপরে, ফিসফিস করে বলল, গ্রাজি! গ্রাজি, ডিও!

পুরো চত্বরে মানুষ থমকে আছে। কথা ফুটছে না কারো কণ্ঠে।

গ্রজি! ডিও! চিৎকার বের হল ক্যামারলেনগোর বুক চিরে, অপার্থিব সুরে, অনির্বচনীয় লহরীতে, যেন আকাশ থেকে ঝড় নামবে এখনি; তার সারা মুখে ছড়িয়ে আছে অপার স্নিগ্ধতা, গ্রাজি, ডিও!

থ্যাঙ্ক ইউ, গড? অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে ল্যাঙডন।

উপরের দিকে তাকিয়ে আছে সে এখনো। আরো আরো জোরে মাথা নাড়ছে। যেন শুনছে কথা, অপার্থিব কণ্ঠ থেকে।

আপন দিস রক, আই উইল বিল্ট মাই চার্চ!
একথা অপরিচিত নয় কারো কাছে। ল্যাঙডনের কাছেও অপরিচিত নয়।
তাকাল ক্যামারলেনগো তার ঘোর লাগা চোখে সামনের সম্মিলিত মানুষের দিকে।
আপন দিস রক, আই উইল বিল্ট মাই চার্চ!।
আবার তাকাল সে চারদিকে। তারপর তুলে দিল একটু নামানো হাত। হাসতে হাসতে।
গ্রাজি, ডিও! গ্রাজি!
মানুষটা একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে।
আর সারা পৃথিবী দেখছে অবাক বিস্ময়ে।
ফিরে তাকাল সে। তারপর ফিরে চলল সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার দিকে।

রাত এগারোটা বেয়াল্লিশ।
এক মুহূর্ত পরে ব্যাপারটা টের পেল ল্যাংডন।
সে এখানেই মারা যাবে। যাবে না কোথাও।
চিৎকার করল এবার ল্যাংডন, ক্যামারলেনগো! স্টপ!
দৌড়ে গেল সে। সামনে কালিগোলা অন্ধকার। সেখানে ঢুকল সে বিনা দ্বিধায়। তারপর দেখতে পেল না কিছুই। আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে আসায় তার চোখ সয়ে যেতে কয়েক সেকেন্ড সময় নেবে। মূল্যবান কয়েক সেকেন্ড। সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু শোনা যাচ্ছে একজনের পদশব্দ।
সাথে সাথেই চলে এল ভিট্টোরিয়া আর গার্ডরা। জ্বালল সব ফ্লাশলাইট। কিন্তু কোথাও দেখা গেল না ক্যামারলেনগোর চিহ্ন।
ক্যামারলেনগো! চিৎকার করল, নাকি কাঁদল বলতে পারবে না চার্ট্রান্ড, থামুন সিনর!
সামনের অন্ধকারে এগিয়ে গেল তারা। এগিয়ে গেল তার সন্ধানে। কিন্তু ফেউ পিছু ছাড়ছে না। এগিয়ে এল ম্যাক্রি আর গ্লিক।
হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে গ্লিক ম্যাক্রিকে আস্তে যেতে বলছে আর মাক্রির ক্যামেরার লাল বাতি দেখাচ্ছে যে ট্রান্সমিশন চলছে এখনো।
থামাতে হবে এই দুজনকে।
আউট! সত্যি সত্যি কাঁদছে চাট্রান্ড, তোমাদের চোখের জন্য নয়।
তোয়াক্কা না করে এগিয়ে আসছে ম্যাক্রি আর গ্লিক।
চিনিতা! অবশেষে কথা বলল গ্লিক, দিস ইজ সুইসাইড! আর আসছি না আমি!
তার কথাও কানে তুলল না ম্যাক্রি। সাথে সাথে সে একটা সুইচ টিপে দিল। সবাইকে অন্ধ করে দিয়ে এলো আলো।
চোখ বন্ধ করল ল্যাংডন। ড্যাম ইট!
যখন সে চোখ খুলল, দেখতে পেল, সামনের ত্রিশ গজ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।
এক মুহূর্ত পরে, দূরে কোথাও থেকে ক্যামারলেনগোর কণ্ঠ প্রতিধ্বন্ধিত হয়ে এগিয়ে এলো, আপন দিস রক, আই উইল বিল্ড মাই চার্চ . . . .
সাথে সাথে ম্যাক্রি তার ক্যামেরা ঘোরাল এবং দেখা গেল, দূরে, ছায়ার মত একটা অবয়ব এগিয়ে যাচ্ছে। ছুটে যাচ্ছে। ব্যাসিলিকার মূল পথ ধরে।
এক মুহূর্ত সবাই ইতস্তত করল, তারপর, বিনা দ্বিধায় ছুটে গেল চার্ট্রান্ড॥ জুটে গেল লাঙডন, তারপর ভিট্টোরিয়া, সবশেষে গার্ডরা।
পুরো দুনিয়ার কাছে এই পিছুধাওয়া পৌঁছে দিচ্ছে ম্যাক্রি। তার পিচ্ছনে পিছনে অনিচ্ছায় এগিয়ে যাচ্ছে গ্লিক, আস্তে করে একটা গাল ঝেড়ে, তারপর মন্তব্য করতে করতে।

পোপের অফিসে পাওয়া আঘাতে ক্যামারলেগো যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বসেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। ছুটছে তার পিছনে চার্ট্রান্ড। সে জানত, ব্যাসিলিকার মূল পাখের দৈর্ঘ একটা ফুটবল মাঠের চেয়েও বড়। কিন্তু এখন ছুটতে গিয়ে তার মনে হচ্ছে দূরত্বটা দ্বিগুণ।
বিবিসির স্পটলাইটের বাইরে কোথাও এখনো বেরিয়ে আসছে আওয়াজ, আপন দিস রক, আই উইল বিল্ড মাই চার্চ!
ক্যামারলেনগো পাগল হয়ে গেছে কি আসলেই? ভাবে চাট্রান্ড। মনে হয় না।
নিচে অব প্যালিয়ামসে দেখা গেল এক অকল্পনীয় অবয়ব, আরো একটু পরে। কোন সন্দেহ নেই, ক্যামারলেনগো। তার গা কালো, আর চারপাশ দিয়ে ঠিকরে বের হচ্ছে তিমির বিনাশী আভা।
এক মুহূর্তের জন্য সবাই তাকায় সেই গড়নের দিকে। আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসে সেটা। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না তারা।

গড়নটাকে ল্যাংডনও দেখেছে। এ এক অদৃষ্টপূর্ব অনুভূতি। তারপর যখন এগিয়ে গেল তারা, ভাঙল ভুল। এ জায়গার নাম নিচে অব প্যালিয়ামস। এখানে একটা ডুবো চেম্বারের ভিতরে নিরানব্বইটা আলোকিত বাতি জ্বলে। সেখান থেকে ঠিকরে আসছিল আলোর আভা। কোমল আভা। সেটার সামনে দাঁড়ানোয় ক্যামারলেনগোকে ভৌতিক দেখাচ্ছিল।

বিখ্যাত গোল্ডেন বক্স আছে যে চেম্বারটায়, সেটার কাছে এগিয়ে গেছে ক্যামারলেনগো। তাকিয়ে আছে সামনের দরজার দিকে। কাচের দরজার অন্য পাশেই সেই সোনালি বাক্স।

কী করছে সে! ভেবে পায় না ল্যাংডন। নিশ্চয়ই সে ভাবছে না যে সেই গোল্ডেন বক্সে–

কিন্তু না, থামল না ক্যামারলেনগো। এগিয়ে চলল সামনে। তারপর মেঝেতে পড়ে থাকা একটা লোহার ঢাকনা খুলল।

টের পেল অবশেষে ল্যাংডন, কী করতে যাচ্ছে ক্যামারলেনগো।

গুড গড! না!

ফাদার, ডোন্ট!

পিছন থেকে ক্যামারলেনগোর নগ্ন কাঁধ ধরল সে এগিয়ে গিয়ে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। কাঁধটা ঘামে ভেজা। কিন্তু ধরে রাখতে পারল সে। নেমে যাচ্ছিল ক্যামারলেনগো নিচে, অজানা সুড়ঙ্গে।

বিরক্ত হয়ে তাকাল ক্যামারলেনগো, কী করছেন আপনি?

চোখে চোখ মিলে যাবার সাথে সাথে অবাক হয়ে গেল ল্যাংডন। অস্থির মানুষের কোন ছাপ নেই তার চোখে। চোখ একেবারে সুস্থির, সেখানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

ফাদার, আপনি সেখানে নামতে পারবেন না। আমাদের জরুরি কাজ বাকি পড়ে আছে। বেরুতে হবে সবাইকে।

মাই সন, আমি এইমাত্র একটা মেসেজ পেয়েছি। আমি জানি–

ক্যামারলেনগো! ছুটতে ছুটতে চিৎকার করল চার্ট্রান্ড আর বাকিরা। পিছনে পিছনে ঠিক ঠিক আসছে ম্যাক্রি।

থমকে গেল চার্ট্রান্ড। তাকাল ফ্লোরের দিকে। ক্রস করল নিজেকে। তারপর ধন্যবাদের দৃষ্টি দিল ল্যাংডনের দিকে। এ দরজার নিচে কী আছে তা ল্যাংডনও জানে। এটা খ্রিস্টবাদের সবচেয়ে জটিল অংশের একটা।

টেরা সান্তা। পবিত্র ভূমি।

কেউ কেউ একে ন্যাক্রোপোলিস বলে। কেউ বলে ক্যাটাকম্বস। গত কয়েক দশকে যারা ন্যাক্রোপোলিসে গিয়েছে তাদের কথায় জানা যায়, এ এমন এক জায়গা যেখানে কোন লোক একবার দিক হারিয়ে ফেললে কখনো আর ফিরে আসতে পারবে না।

এমন জায়গায় ক্যামারলেনগোর পিছুধাওয়া করতে চাইবে না কেউই।

সিনর! অবশেষে পেয়ে বসল চার্ট্রান্ড, আপনি আঘাত পেয়েছেন। প্রচন্ড আঘাত। এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে আমাদের। নিচে যেতে পারেন না আপনি। এটা নির্জলা আত্মহত্যা।

চার্ট্রান্ডের কাধে হাত রাখল ক্যামারলেনগো, তোমার উদ্বেগ আর সেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ। বলে বোঝাতে পারব না তোমাকে, বোঝাতে পারব না কীভাবে বুঝছি আমি। কিন্তু একটা সূত্র পেয়েছি, সেটা নিয়েই হাঁটতে চাই। আমি জানি কোথায় আছে, এন্টিম্যাটারটা।

প্রত্যেকে স্থির হয়ে গেল।

তাকাল সবার দিকে সে, বলল, আপন দিস রক, আই উইল বিল্ড মাই চার্চ... এই ছিল মেসেজ। এর অর্থ একেবারে স্পষ্ট।

আপন দিস রক, আই উইল বিল্ড মাই চার্চ!

জিসাস যখন প্রথম পিটারকে তার শিষ্য হিসাবে নির্বাচিত করেন তখন এই কথা উঠেছিল। এর সাথে বর্তমানের মিল কোথায়?

ম্যাক্রি এগিয়ে এল আরো। গ্লিকের সারা শরীরে ভর করেছে স্থবিরতা।

কথা বলছে ক্যামারলেনগো, ইলুমিনেটি তাদের ধ্বংসের বীজ বুনে দিয়েছে এই সিটির

একেবারে ভিত্তিমূলে। সেই পাথরের উপর, যেখানে শুরু এ চার্চের। আর আমি জানি কোথায় সেটা।

কথাটা একটা রূপক, ফাদার। কোন পাথর নেই এখানে।

একটা পাথর আছে, মাই সন! পিয়েত্রো ইলা পিয়েত্রা!

থমকে গেল ল্যাঙডন। এক মুহূর্তে সব স্পষ্ট হয়ে গেল চোখের সামনে।

এখানে, নিচে কোথাও সত্যি সত্যি একটা পাথর লুকানো আছে। কোথায়, কে জানে, কিন্তু এখানেই কোথাও। নিশ্চিত। এও নিশ্চিত, পাথর কথাটা একটা রূপক। আর সেই রূপক যে এত শক্তিশালী সেটা তার চিন্তাতেও আসেনি।

পিয়েত্রো ইলা পিয়েত্রা।

পিটারই সেই প্রস্তর।

ঈশ্বরের উপর পিটারের বিশ্বাস এত বেশি ছিল যে যিশু পিটারকে পাথর হিসাবে অভিহিত করতেন।

সেই পিটারের উপর বিশ্বাস ছিল অতুল, সবার। তিনি ছিলেন এ মহানগরীর ভিত্তিমূল। এখানে, এই ভ্যাটিকান হিলে, পিটারকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। তারপর কবর দেয়া হয়। এখানটাতেই।

তার কবরের উপর একটা ছোট সমাধি মন্দির গড়ে নেয় প্রথম দিকের ক্রিশ্চিয়ানরা।

খ্রিস্টবাদ যত ছড়াতে থাকে, ততই বড় হতে থাকে সেই সমাধিমন্দির। একের উপর এক স্তর পড়তে থাকে। বড় হতে থাকে প্রতিষ্ঠান। দু হাজার বছর ধরে। আস্তে আস্তে পরিণত হয় সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায়। পরিণত হয় ভ্যাটিকান সিটিতে। সিটি অব গড-এ।

পুরো ক্যাথলিক বিশ্বাসের ভিত্তিমূল সেন্ট পিটার।

দ্য রক।

এন্টিম্যাটারটা সেন্ট পিটারের সমাধির উপরে। বলল ক্যামারলেনগো।

ইলুমিনেটি যে এখানেই এন্টিম্যাটারটা স্থাপন করবে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। খ্রিস্টবাদের ভিত্তিমূলে আঘাত করবে, সেটা শুধু রূপক কথা নয়, বাস্তবও।

আর আপনারা যদি প্রমাণ চান, বলছে ক্যামারলেনগো, আমি এর দরজাটার তালা খোলা অবস্থায় পেয়েছি। কেউ সম্প্রতি, অতি সম্প্রতি, সেখানে ঢুকেছিল।

গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকল প্রত্যেকে!

এক মুহূর্ত স্থির থেকে ক্যামারলেনগো ঘুরে দাঁড়াল। হাতে তুলে নিল একটা তেলের বাতি। তারপর নেমে যেতে শুরু করল ভিতরদিকে।

এক অন্ধকার পথে ডুবে গেছে ধাপগুলো।

একে একে অন্য সবাই এগোতে শুরু করল। চেপে ধরল ল্যাংডনকে চার্ট্রান্ড। এই কমবয়েসি গার্ড কী করে যেন বিশ্বাস করে বসেছে ক্যামারলেনগোকে।

পিছু ছাড়েনি বিবিসির ছারপোকারা। তারাও আসতে শুরু করেছে গুঁড়ি মেরে। সারা পৃথিবী এখন দেখছে তাদের, বিশ্বাস হয় না।

মরার ক্যামেরাটা বন্ধ কর?

একই সাথে আরো একটা ব্যাপার মনে পড়ল ভিট্টোরিয়ার, এই আলোটা অনেক সহায়তা করবে।

কী করবে ক্যামারলেনগো? যদি এন্টিম্যাটারটা পায়, তাতে কাজের কাজ কি কিছু হবে? হবে না। সময় নেই।

তিনতলা মাটির নিচে বসানো অনেক বিজ্ঞোচিত। উপরে বসানো থাকলে সেটা চারপাশে ছড়িয়ে দিত অনেক টুকরা, বিদ্ধস্ত করে দিতে আশপাশকে। ক্ষতি করত রোমের। কিন্তু এখন, তিনতলা মাটির নিচে গেঁথে দেয়ায় পুরো ভূমি কেঁপে উঠবে, তৈরি হবে একটা বিশাল গর্ত, উড়ে যাবে ব্যাসিলিকা, ধ্বংস হয়ে যাবে পুরো ভ্যাটিকান, কিন্তু আশপাশের কারো তেমন ক্ষতি হবে না।

কোহলার এত চিন্তা করে কি কাজটা করেছে? সে কি চায়নি মানুষের কোন ক্ষতি হোক? ধর্মের প্রতি অগাধ ঘৃণা থাকতে পারে তার ভিতরে, তাই বলে কি সে তার বাবাকে মারার প্ল্যান করবে? খুন করবে পোপ, চার কার্ডিনালকে? অসম্ভব নয়, যে ক্যামারলেনগোর বুকে চিহ্নটা এঁকে দেয়ার জন্য প্রাণ দিতে পারে, তার পক্ষে সব সম্ভব।

রোচার ছিল তার ভিতরের সঙ্গী। তার কাছে সব জায়গার চাবি ছিল। সব জায়গায় ছিল নির্দোষ বিচরণ। প্রথমে এন্টিম্যাটারকে এই অচিন্তনীয় জায়গায় বসিয়ে দিয়ে তারপর লোকজনকে বলেছে যেন সার্চ করে পাবলিক প্লেসগুলো।

ঠিক ঠিক জানত সে, কেউ খুঁজে পাবে না।

কিন্তু রোচার কখনো ক্যামারলেনগোর উপর থেকে পাওয়া ইশারার কথা জানত না।

এই মেসেজটা আবার ভিট্টোরিয়াকে ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনতে চায়। অস্বীকার করেনি সে কখনো। কিন্তু ঈশ্বর কি সত্যি সত্যি তাকে খবর পাঠিয়েছে?

অসম্ভব নয়। প্রকৃতিবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা এখন আর অস্বীকার করে না। করতে পারে না। দুটো কাছিমের ডিম হাজার হাজার মাইল দূরে একই মুহূর্তে ফুটছে... একরের পর একর জুড়ে জেলিফিস এমন ছন্দে দোলে, যেন তারা এক মনের অধিকারী।

চারপাশে যোগাযোগের অচিন্তনীয় পথ খোলা!

তাই বলে মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে?

ভিট্টোরিয়ার মনে পড়ে যায় বাবার কথা, তিনি থাকলে বিশ্বাসের একটা দেয়াল হয়ে দাঁড়াতেন।

বাবা, সব সময়, বিজ্ঞানের রসে বিশ্বাসকে জারিত করে তার সামনে উপস্থাপন করতেন।

বাবা, তুমি কেন শুধু শুধু প্রার্থনা কর? ঈশ্বর তোমার কোন কথারই জবাব দেবেন না।

আমার সন্দেহপ্রবণ মেয়ে, তার মানে তোমার মনে হয় ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বলেন না? তোমার ভাষায় ব্যাপারটা বলতে দাও। তুমি ভাল করেই জান ভিট্টোরিয়া, মানুষ তার ব্রেনের খুব কম অংশই ব্যবহার করে। ব্রেনের ক্ষমতার কিয়দংশও ব্যবহার করে কিনা সন্দেহ। তুমি যদি সেগুলোকে আবেগিকভাবে তাড়িত কর—শারীরিক ট্রমার মত, অকল্পনীয় আনন্দ বা কষ্টের সময়টায় কিম্বা গভীর ধ্যানের মুহূর্তে—এক মুহূর্তে তাদের সমস্ত নিউরন এক তালে বেজে ওঠে।

তো? এ কথার সাথে—

আহা! মনের এমন মুহূর্তগুলোয় অচিন্তনীয় সব ব্যাপার ঘটে। এটাকেই গুরুরা হায়ার

কনশাসনেস বলে। অতি সচেতনতা। আর খ্রিস্টানরা বলে, জবাব পাওয়া। প্রার্থনা। হাসে ভেট্রা, নির্মল হাসি, মাঝে মাঝে এর অন্য একটা মানে আসে। তোমার মনকে সেভাবে প্রস্তুত করা যা এরই মধ্যে তোমার হৃদয় জানে।

এখন তার মনে হয় বাবার কথাই ঠিক।

ক্যামারলেনগোর ট্রমা এত উত্তেজিত করেছে তার মনকে যে সে এক মুহূর্তে বুঝে উঠেছে কোথায় এন্টিম্যাটারটা থাকার কথা।

অসম্ভব কিছু নয়।

আমাদের সবাই এক একজন ঈশ্বর... বলেছিলেন বুদ্ধ, আমাদের সবার সব জানা। শুধু প্রয়োজন আমাদের মনকে খুলে দেয়ার। সেখানে আমাদের নিজেদের জ্ঞান দেখে হতবাক হয়ে যাবার কথা।

এ কি তেমন কোন মুহূর্ত?

এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারল সে, বাধা দিতে হবে।

ক্যামারলেনগো, না! আপনি যদি এন্টিম্যাটারটা উপরে তুলে আনেন তাহলে সবাই মারা পড়বে।

এবার এগিয়ে গেল ল্যাঙডনও, ক্যামারলেনগো, আপনাকে এখানেই রেখে দিতে হবে এন্টিম্যাটারটাকে। আর কোন উপায় নেই।

এখন বাইরের মানুষকে বাঁচাতে হলে এন্টিম্যাটারটাকে ভিতরেই বিদ্ধস্ত করতে হবে। ধ্বংস করতে হবে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান প্রতিষ্ঠানকে।

চার্চ বাচবে, নয়ত মানুষ।

ভিতরে কোথাও ন্যাক্রোপোলিস আছে। সেন্ট পিটার সহ প্রাচীণকালের অনেক অনেক খ্রিস্টানের কবর।

হঠাৎ করে থেমে গেল ক্যামারলেগো। তার সাথে সাথে থামল বাকিরাও।

রট আয়রনের একটা দরজা আছে সেখানে। ক্যামারলেনগো সেটা বিনা দ্বিধায় খুলে ফেলল।

পিছনে এগিয়ে আসছে সবাই। ভীতি তাদের মনোভাবে।

বিবিসির ক্যামেরার আলোয় আরো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে সবাইকে। বিশেষ করে গ্লিক প্রতি পদক্ষেপে আরো আরো মিইয়ে পড়ছে।

খপ করে লাঙডনের হাত ধরল চার্ট্রান্ড। ক্যামারলেনগোকে যেতে দিন!

না! চিৎকার করে উঠল ভিট্টোরিয়া, আমাদের এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে হবে। এখান থেকে প্রতিবস্তুটা বের করে নিতে পারি না। যদি তা করি, বাইরের সবাই মারা পড়বে।

শুনুন সবাই... আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। হাতে সময় খুব কম।

বুঝছেন না আপনি, বলছে ভিট্টোরিয়া, নিচে, এখানে বিস্ফোরণ হলে যতটা ক্ষতি হবে, তারচেয়ে হাজার গুণ বেশি হবে উপরে।

চোখ তুলে তাকাল ক্যামারলেনগো, তার সবুজ চোখে সেই আগের দীপ্তি, কে বললো, যে গাউন্ড লেভেলে বিস্ফোরণ হবে।

তাকিয়ে থাকল ভিট্টোরিয়া, আপনি এটাকে এখানে ফেলে যাবেন?

আজ রাতে আর কোন প্রাণ যাবে না।

ফাদার, কিন্তু—

প্লিজ... একটু বিশাস! আমার সাথে যোগ দিতে বলব না কাউকে। আপনারা সবাই চলে যেতে পারেন। আমি শুধু একটা কথা বলব, তার উপরে যেন কোন কথা না তোলেন আপনারা। তাই করতে দিন আমাকে, যে জন্য প্রেরিত হয়েছি। আমাকে এ চার্চ রক্ষা করতে হবে। আর আমি তাই করব, বিশ্বাস করুন।

বজ্রাহতের মত শুনল তার কথাগুলো।

এগারোটা একান্ন।

ন্যাক্রোপোলিস শব্দটার মানে মৃতদের নগরী।

একটা ছোট গুহার ভিতরে খুপরি থাকলে ব্যাপারটা যেমন দেখায়, তেমনি দেখতে। সরু পায়চলা পথ। বিছানো আছে কিছু জিনিস, তার বেশিরভাগই মার্বেলের মোড়ক দেয়া ভাঙা ইট। আকাশের গায়ে পৌঁছে গেছে অনেকগুলো পিলার।

সিটি অব ডেড, আমি কি কোন ভুল সিদ্ধান্ত নিলাম। যেতে যেতে ভাবল ল্যাঙডন।

ক্যামারলেনগোর জাদুতে পড়ে গেছে চার্ট্রান্ড। ভিট্টোরিয়াও তেমন ভীত নয়। ভয় করছে ল্যাঙডনের। কাবু হয়ে গেছে গ্লিক। ম্যাক্রির চোখেমুখে ভয়ের লেশমাত্র নেই।

একটা কথা ভাবছে এবার ল্যাঙডন। তাকাল সে অন্যদের দিকেও। তারাও কি তাই ভাবছে...

ভ্যাটিকান সিটি থেকে বেরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে যাবার জন্য ন মিনিট কোন সময় নয়!

ভ্যাটিকানের স্কলাররা মাঝে মাঝে দাবি করত, ভ্যাটিকানের পাহাড়টা এখনো আছে। আর সেটার ঠিক চূড়ায় অবস্থিত সেন্ট পিটারের কবরখানা।

কীভাবে জানত তারা?

জানত। এখন জানতে পারছে ল্যাঙডনও।

প্রথমে একটা ছোট ক্রুশ বিদ্ধ করে মারা হয়েছিল তাকে। তারপর একেবারে সাধারণ কবর দেয়া হয়। পরে গড়ে ওঠে সমাধি। সময় যায়। সেখানে আরো পরত পড়ে। গড়ে ওঠে মাইকেলেঞ্জেলোর গম্বুজ। সেটার ঠিক নিচে, এক ইঞ্চিও এদিক সেদিকে নয়, শুয়ে আছেন সেন্ট পিটার।

সাবধান! বলল গ্লিক, নিচে সাপের গর্ত আছে।

তাকাল ল্যাঙডন, সারি সারি ছোট গর্ত। লাফ দিল ল্যাঙডন। পায়ের শব্দের কম্পনে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা সাপগুলোকে।

লাফ দিল ভিট্টোরিয়াও, আতঙ্কে। সাপের গর্ত?

স্ন্যাক হোল, স্নেক হোল নয়। বলল ল্যাঙডন অবশেষে। মনে পড়েছে তার।

আগেরদিনের খ্রিস্টানরা মনে করত তাদের মৃত প্রিয়জন আবার জীবিত হবে ভিতরে। তখন যেন খাবার কোন সমস্যা না হয় সেজন্য দুধ আর মধু ঢালার পথ খোলা রেখেছিল।

দুর্বল লাগছে ক্যামারলেনগোর।

অনেকটা অবসন্ন লাগছে। না, বেশি সময় হাতে নেই। সামনেই মূল্যবান মুহূর্ত।

আমি আপনাদের চার্চ রক্ষা করব, বিশ্বাস করুন।

বিবিসির আলো থাকা সত্ত্বেও মাথার উপর বাতিটা তুলল ক্যামারলেনগো। আর তারপরই মনে হল, তেল পড়ে ঝলসে যেতে পারে শরীর। এক সন্ধ্যায় দুবার এই যন্ত্রণা সহ্য করার কোন মানে হয় না।

সামনে এগিয়ে গেল তারা। দেখতে পেল মাটির দেয়াল। সেখানেই একটা লেখা দেখা গেল।

মৌসোলিয়াম এস
লা দুম্বা ভিসেন পিয়েত্রো।

থামল কামারলেনগে। হাঁটু গেড়ে বসল। প্রার্থনায়।

ধন্যবাদ, ঈশ্বর, কাজটা শেষ প্রায়।

মর্টাটি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আর সব কার্ডিনালের সাথে। তাকিয়ে আছে টিভি স্ক্রিনের দিকে। তারা যা শুনেছে তাই কি শুনতে পেয়েছে পুরো দুনিয়া? সত্যি সত্যি।

ক্যামারলেনগো তাই শুনেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে?

তাকাল তারা সবাই। তাকাল ক্যামারলেনগোর দিকে। সে প্রার্থনায় রত। প্রার্থনা করছে

খ্রিস্টবাদের সবচেয়ে গোপনীয় এক এলাকায়।

জীবনে একবার মাটি গেছে সেখানে। তবু, চিনতে ভুল হল না।

স্যান পিয়েত্রো!

চারপাশে যে শব্দ উঠছে, উঠছে যে রোল, সেটা আর কিছুর নয়। খ্রিস্টবাদের সবচেয়ে গুরুত্ত্বপূর্ণ স্থান দেখতে পেয়েছে জনতা। দেখতে পেয়েছে সারা পৃথিবী।

টম্বের উপরে একটা জিনিস আছে।

এন্টিম্যাটার ক্যানিস্টার! এটা সেখানে লুকানো। ক্যামারলেনগোর কথাই সত্যি।

আর পাঁচ মিনিট। সারা দুনিয়া দেখছে, কমে আসছে এল-ই-ডির সময়। ফুরিয়ে আসছে ভ্যাটিকানের প্রাণ। একটা বিন্দু ঝুলছে ক্যানিস্টারের ভিতরে।

সুইস গার্ডের ক্যামেরাটাও আছে সেখানে।

ক্রস করল মর্টাটি নিজেকে।

তাকাল ক্যামারলেনগো সবার দিকে, ক্যামারলেনগোর হাতে ক্যানিস্টার। নেমে আসতে শুরু করুল তারা ভ্যাটিকান হিল থেকে।

ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ভিট্টোরিয়ার চেহারা, কোথায় যাচ্ছেন আপনি ক্যামারলেনগো? আপনি না বললেন. . . .

বিশ্বাস রাখুন। দৌড়াতে দৌড়াতে বলল ক্যামারলেনগো।

ল্যাঙডনের দিকে তাকাল ভিট্টোরিয়া, কী করব আমরা?

থামানোর চেষ্টা করেও পারল না তারা কিছু করতে।

এখন বিবিসির ক্যামেরা যেন কোন রোলার কোস্টারে চড়ে গেল। হেলছে, দুলছে।

চিৎকার করল ম্যাক্রি। কোথায় যাচ্ছে লোকটা?

আজ রাতে আর কোন প্রাণ যাবে না!

কী ভুল ছিল কথাটায়!

ঠিক এগারোটা ছাপ্পান্নতে ক্যামারলেনগো বের হয়ে এল। বের হয়ে এল সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায়।

চারধারে শোরগোল পড়ে গেল। এতক্ষণে যেন বুঝতে পারছে লোকজন, কী হবে এরপর। কেউ চিৎকার করছে, করছে প্রার্থনা, ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে চারপাশ।

অকল্যানের হাত থেকে রক্ষা কর আমাদের। রক্ষা কর ডেভিলের হাত থেকে। ফিসফিস করল সে।

দৌড়ে যাচ্ছে ক্যামারলেনগো হাতে মহামূল্যবান ক্যানিস্টার নিয়ে। তার ছবি দেখা যাচ্ছে সব মিডিয়া ভ্যানের দরজায়। স্ক্রিনে।

তাকাল ক্যামারলেনগো ক্যানিস্টারের ভিতরে। সেখানে ফুটে আছে তার ছবি। অর্ধনগ্ন বুক, বিদ্ধস্ত।

ঈশ্বর রহস্যময় পথে কাজ করেন।

এগিয়ে গেল ক্যামারলেনগো। সবাইকে চমকে দিয়ে।

এখনো একটা কাজ বাকি।

গডস্পীড! ভাবছে সে, গডস্পীড।

চার মিনিট...

এগিয়ে যাচ্ছে ক্যামারলেনগো। সরাসরি নেমে যাচ্ছে ব্যাসিলিকার সামনের মঞ্চে ধাপগুলো পেরিয়ে। বলছে সবাইকে, বিশ্বাস রাখুন, বিশ্বাস রাখুন।

নামছে সে মানুষের দিকে।

ল্যাঙডন ভেবে পায় না। কী করছে লোকটা। সবাইকে মেরে ফেলবে নাকি!

শয়তানের ষড়যন্ত্রের, বলছে ক্যামারলেনগো, কোন স্থান নেই স্রষ্টার ঘরে।

ফাদার! চিৎকার করল ল্যাঙডন, কোথাও যাবার নেই।

স্বর্গের দিকে চোখ দিন! আমরা স্বর্গের দিকে চোখ রাখতে ভুলে গেছি।

তারপর হঠাৎ করে সব পরিষ্কার হয়ে গেল চোখের সামনে।

তারকা ভরা ইতালির আকাশ, তাবল সে, চলে যাবার একমাত্র পথ।

সামনে যে হেলিকপ্টারটা আছে, সেটায় করে বেরিয়ে যাবার কথা ছিল তার। যাবার কথা ছিল হাসপাতালে। সেটা যে কোথায় যাবে তা ঠিক ঠিক বুঝে গেল ল্যাঙডন।

সমুদ্রে মেডিটারিয়ান সিতে? সেটা ট্রেনে কয়েক মিনিটের পথ। দুশ মাইল গতিতে সেখানে যেতে কতক্ষণ লাগবে নাকি সিটির তিন মাইল বাইরের লা কাভা রোমানায়? সেটা কত বড় দুই বর্গমাইল? সেখানে, রোমের পাথুরে এলাকাটায় পৌঁছতে পৌঁছতে সমস্যা হবার কথা নয়।

সরে যান সবাই! ঘোষণা করল ক্যামারলেনগো, সরে যান! এক্ষুনি!

কপ্টারের চারধারের সুইস গার্ডরা বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে ক্যামারলেনগোকে আসতে দেখে।

ব্যাক! বলল যাজক।

পিছনে সরে গেল গার্ডরা।

সারা দুনিয়াকে দেখতে দিয়ে এগিয়ে গেল ক্যামারলেনগো চপারের পাইলট ডোরে।

আউট! সন! নাউ।

সাথে সাথে ছিটকে বেরিয়ে পড়ল গার্ড।

ওঠার জন্য তার দুহাতই দরকার দেখে ধরিয়ে দিল সে ক্যানিস্টারটাকে পাইলটের হাতে। তারপর বলল, ধর। ভিতরে ঢুকলে ফিরিয়ে দিও আমার কাছে।

উঠে দেখল সে, ল্যাঙডন তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে।

এবার তুমি বুঝতে পারছ। এবার ফিরে এসেছে বিশ্বাস।

তাকাল ক্যামারলেনগো পরিচিত যন্ত্রগুলোর দিকে। তারপর বাড়িয়ে দিল হাত।

কিন্তু যে গার্ডের হাতে সে জিনিসটাকে দিয়েছিল সে বলল, সে নিয়ে নিয়েছে সেটাকে।

কে?

দেখাল গার্ড, সে।

উঠে এল পিছন থেকে ল্যাঙডন। তার হাতে ক্যানিস্টারটা।

ফ্লাই, ফাদার!

কী করছেন আপনি?

আপনি উড়িয়ে নেবেন, নিক্ষেপ করব আমি। সময় নেই! শুধু আশীর্বাদপ্রাপ্ত চপারটাকে উড়িয়ে নিন!

মেঘের আঁধার ঘনিয়ে এল ক্যামারলেনগোর মুখে, আমি একাই কাজটা করতে পারি। আমার একার করার কথা।

তিন মিনিট, ফাদার! তিন মিনিট!

আর দেরি করল না ক্যামারলেনগো। সোজা চালিয়ে দিল চপারকে। উঠে আসার আগে গর্জন করল সেটা।

দৌড়ে আসছিল ভিট্টোরিয়াও। তাদের চোখে চোখে দেখা হল। তারপর একটা পাথরের টুকরার মত ডুবে গেল সে।

চপারের ভিতরে, ক্যামারলেনগোর পিছনে বসে তাকিয়ে আছে রবার্ট ল্যাঙডন নিচের দিকে। সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের দিকে। নিচটা যেন আলোর সমুদ্র।

এন্টিম্যাটার ক্যানিস্টারটা একেবারে ভারি ঠেকল তার হাতে।

দু মিনিট।

উপরে উঠে এসে মোহময় লাগছিল শহরটাকে। আলোয় আলোয় ভরা। যত কাছে মনে করছিল সমুদ্রকে, বাস্তবে সেটা তত কাছে নয়।

উঠে গেল চপার আরো আরো। তারপর সেটা এগিয়ে গেল রোমের সীমানা পেরিয়ে। সেদিকে শুধুই পাহাড় আর পর্বত।

লা কাভা রোমানা!

সেদিকেই যাচ্ছে তাহলে চপারটা সামনে দেখা যাচ্ছে সে জায়গাটাকে। পরিত্যক্ত। কিন্তু কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটছে এখানে। এগুচ্ছে না তারা সামনে।

ল্যাঙডন তাকাল নিচে। সেখানে আলোর খেলা। মিডিয়া ভ্যানের আলো।

তারা এখনো ভ্যাটিকানের উপরেই আছে!

ক্যামারলেনগো! সামনে চলুন! অনেক অনেক উপরে উঠে গেছি আমরা। সামনে যেতেই হবে। আমরা ক্যানিস্টারটাকে ভ্যাটিকানের উপর ফেলে দিতে পারি না!

কোন জবাব দিল না ক্যামারলেনগো।

হাতে দু মিনিটের চেয়েও অনেক কম সময় আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি না কাভা রোমানা। মাত্র দু মাইল দূরে। উত্তরে। আমাদের হাতে একদম-

না। একাজটা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। আমি দুঃখিত। হাসল কামারলেনগো তার দিকে তাকিয়ে। আমি আশা করেছিলাম আপনি আসবেন না, মাই ফ্রেন্ড! কিন্তু যা করার করে ফেলেছেন আপনি। চূড়ান্ত আত্মত্যাগ।

তাকাল ক্যামারলেনগোর চোখে চোখে ল্যাঙডন। পড়ে ফেলল তার মনের কথা। তাহলে এমন কোন জায়গাই কি নেই যেখানে আমরা যেতে পারি?

উপরে। আরো আরো উপরে। এটাই একমাত্র নিশ্চয়তা।

বুঝতে পারল সে। লুক এ্যাট দ্য হেভেন্স!

আরো আরো উপরে উঠছে তারা। মানুষের থেকে অনেক অনেক দূরে।

যাত্রা একমুখী যাত্রা।

একই মুহূর্তে উপরের দিকে তাকিয়ে ছিল ভিট্টোরিয়া। দেখছে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হয়ে আসছে হেলিকপ্টারটা। এমনকি এর গর্জনও হয়ে এসেছে ম্লান। সারা পৃথিবী, সারা দুনিয়ার সমস্ত হৃদয় এক হয়ে বাজছে।

তাকিয়ে আছে সে উপরে। কী ভাবছে ল্যাঙডন? সে কি বুঝতে পারেনি এখনো?

উপরে তাকিয়ে আছে জনসমুদ্র। চেয়ে আছে চপারটার দিকে। তারা রোমান আকাশে হারিয়ে যাচ্ছে সেটা, আরো আরো উপরে। হঠাৎ টের পায় ভিট্টোরিয়া। বাঁধ ভেঙে আসছে কান্না।

তার পিছনে, একশ একষট্টিজন কার্ডিনাল তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ। তাদের হাত জোড়া করা। প্রার্থনা করছে অনেকেই। কাঁদছে কেউ কেউ, আবেগ গোপন করার চেষ্টা না করে।

বসতবাড়িগুলোয়, বারে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, এয়ারপোর্টে, হাসপাতালে, সারা দুনিয়া জুড়ে সমস্ত আত্মা আজ, এ মুহূর্তে চেয়ে আছে অনিমেষ। হাত জোড়া করে রেখেছে কেউ কেউ, কেউ আকড়ে ধরে আছে প্রিয় সন্তানকে।

তারপর, নিষ্ঠুরভাবে, সেন্ট পিটার্সের ঘণ্টা বাজতে শুরু করল।

আর কান্নাকে বাধা দিতে পারল না ভিট্টোরিয়া।

তারপর... সারা দুনিয়ার চোখের সামনে... বয়ে গেল সময়।

মৃত্যুময় নিরবতা আর সবকিছুর চেয়ে নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দিল।

ভ্যাটিকান সিটির উপরে, একটা আলোর বিন্দু দেখা দিল। দেখা দিল একটা ছোট্ট রেখা। একেবারে খাঁটি সাদা আলো।

তারপর ঘটল ব্যাপারটা।

একটা আলোর ঝলক। তীব্র। সুতীব্র। অন্ধ করে দেয়া আলোর এক বিশাল গোলক দেখা দিল আকাশের বুকে। দূর করে দিল অন্ধকার, তিমির বিনাশী আলো দখল করে নিল আকাশের বুক। গতি বাড়িয়ে বাড়িয়ে সেটা এগিয়ে আসতে শুরু করল নিচের দিকে। অকল্পনীয় গতিতে।

তারপর নিচের সম্মিলিত মানুষ হিম শীতল আতঙ্কে শিউরে উঠল। ঢাকল তাদের মুখাবয়ব। বন্ধ করল চোখ।

তারপর, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আলোটা এগিয়ে এসে হঠাৎ কাঁচের গোলার মত স্থির হয়ে গেল। একপলের জন। থেমে গেল। গেল থমকে।

সাথে সাথে সেটার ধাক্কা অনুভব করল নিচের মানুষ।

কিন্তু এটুকুই।

আবার আলোটা ফিরে যেতে শুরু করল কেন্দ্রের দিকে।

এরপর এল আসল ধাক্কা। তাপের একটা দেয়াল। বাতাসের দুর্ধর্ষ আঘাত। নিচু হয়ে গেল সবাই, শিউরে উঠল। ঠিক ঠিক অনুভব করল তার ক্ষমতা, শক্তিমত্তা।

যেন খুলে গেছে নরকের অভিশপ্ত দুয়ার। তারই আঁচ এসে লাগছে সবার গায়ে। আলোকিত হয়ে আছে রোমের আকাশ, এখনো।

ফিরে যাচ্ছে আলোটা। হার মেনে নিয়ে। একেবারে যে বিন্দু থেকে এসেছিল, সে বিন্দুতে।

তার সমস্ত ক্ষমতাকে সরিয়ে নিয়ে, হার মেনে, ফিরে গেল আলো আর তাপের নিষ্ঠুর বলয়।

এর আগে এত মানুষ এত নিরব ছিল না কখনোই।

থমকে গেল সবাই। উপর থেকে সব শেষ হয়ে যেতে দেখে শিউরে উঠে তাকাল মর্টাটির দিকে। সামলে নেয়ার চেষ্টা করল অপ্রত্যাশিত ধাক্কাটা।

যেন পুরো পৃথিবীর সমস্ত মানুষ শ্রদ্ধায় মোয়াল মাথা।

হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় রত হল কার্ডিনাল মর্টাটি। তার সাথে যোগ দিল বাকি সব কার্ডিনাল। সুইস গার্ড নিচু করল তাদের লম্বাটে তলোয়ারের ফলা। থমকে থাকল স্থাণুর মত।

কারো মুখে কোন কথা ফুটছে না।

নড়ছে না কেউ।

সবখানে, সব মানুষ, নতুন, আনকোরা নূতন ক্ষমতার প্রথম ঝলক দেখে পাথর হয়ে গেল। আবেগ। ভয়। বিশ্বাস। বিস্ময়।

কাঁপছে ভিট্টোরিয়া। ভিতর থেকে অসহায় কান্না দমকে দমকে উঠে আসছে। সব, সব ব্যাপার ছাড়িয়ে একটা কথাই বারবার তার ভিতরে দোলা দিয়ে যাচ্ছে।

রবার্ট!

তাকে বাঁচানোর জন্য সে এসেছিল সেন্ট এ্যাঞ্জেলোর দুর্গে।

রক্ষা করেছিল তাকে।

আর তারপর, তারই সৃষ্টির কারণে শেষ হয়ে গেল সে।

প্রার্থনা করতে করতে মর্টাটির মনে একটা কথাই খেলে গেল বারবার, কামারলেনগোর মত সৌভাগ্যবান যদি সে হতে পারত! যদি ঈশ্বর তার সাথেও কথা বলতেন! যদি সেও জীবন দিয়ে দিতে পারত মানুষের কল্যাণে!

মর্টাটি পুরনো বিশ্বাসের উপর দাঁড়ানো এক আধুনিক মানুষ। অলৌকিকে তার পূর্ণ আস্থা কোনকালেই ছিল না।

এখন আছে।

ঈশ্বরের ঈশ্বর হয়ে লাভটা কী, যদি তিনি সৃষ্টির সাথে চরম মুহূর্তে যোগাযোগ না করেন!

হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করল সে তরুণ ক্যামারলেনগোর জন্য, যে তার ছোট জীবন দিয়ে অমর হয়ে রইল শেষ দিন পর্যন্ত। যে এক মুহূর্তে সব অবিশ্বাসের ভিত্তিমূল ধ্বসিয়ে গেল।

একপল পরেই, ভ্যাটিকানের আশপাশে একটু মৃদু গুঞ্জন উঠল। গুঞ্জন পরিণত হল কলরবে। কলরব চিৎকারে।

চোখ খুলে তাকাল মর্টাটি।

দেখ! দেখ!

সবাই তার পিছনে আঙুল তাক করে ছিল। সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার দিকে।

সাদা হয়ে গেছে তাদের মুখমন্ডল। কেউ বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, কেউ উন্মাদের মত চিৎকার করল। বাকিরা অপ্রতিরোধ্য ফোঁপানিতে আক্রান্ত হল।

দেখ! দেখ!

সবার বাড়ানো হাতের দিকে তাকাল মর্টাটি। ব্যাসিলিকার সবচেয়ে উপরের লেভেলের দিকে তাক করে ছিল লোকজন তাদের হাত।

সেখানে, দাঁড়িয়ে আছেন যিশু খ্রিস্ট।

দাঁড়িয়ে আছে তার বিশাল মূর্তি।

প্রথমে বুঝতে পারল না মর্টাটি, তারপর যখন দেখতে পেল, ক্রস করল নিজেকে। যিশুর মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্যামারলেনগো কার্লো ভেন্ট্রেস্কা।

আর পারছে না রবার্ট ল্যাঙডন।

আর কোন ভয় নেই। নেই বেদনা। এমনকি দুরন্ত বাতাসের ঝাপ্টাও নেই। শুধু জলের কুলকুল শব্দ। যেন সে শুয়ে আছে কোন এক অচেনা, অনিন্দসুন্দর সাগরতীরে।

সাথে সাথে বুঝতে পারল ল্যাঙডন, এরই নাম মৃত্যু।

আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে থাকা অসাড়তাকে বাধা দিল না সে। চায়ও না বাঁধা দিতে। চলে যাচ্ছে সে সেখানে, অনন্ত সুখের জগতে।

নিয়ে চল আমাকে, দয়া করে নিয়ে চল...

শান্তির এক নির্ঝর বয়ে চলেছে তার ভিতরে ভিতরে। কে যেন তার স্বপ্নটা ভেঙেচুরে দেয়ার চেষ্টা করছে।

না! আমাকে হতে দাও!

জাগতে চায় না সে। তার সচেতনতার চারপাশে ভর করেছে ডেমনস। অকল্যানের দূতেরা। কাছে ঘেঁষতে পারছে না তারা। চোখের সামনে ঝাপসা আলো বয়ে যাচ্ছে। ভেসে আসছে আওয়াজ, যেন সমুদ্রের অন্য প্রান্ত থেকে, অচেনা কোন দেশ থেকে।

না, প্লিজ!

তারপর, হঠাৎ করে, সে সব বুঝে উঠতে শিখল...

একেবারে উপরে চলে গিয়েছিল হেলিকপ্টার। বাতাস যেখানে অনেক হাল্কা। ভিতরে ফেঁসে গিয়েছিল। তার আত্মরক্ষার তাগিদ বারবার বলছিল, ফেলে দাও, ফেলে দাও ক্যানিস্টারটা।

কিন্তু, জিনিসটা বিশ সেকেন্ডেরও কম সময় পার করে নেমে আসবে একেবারে নিচে। মানুষের মহানগরীর বুকে।

উপরে, আরো আরো উপরে!

একটা ছোট প্লেন যেতে পারে চার মাইল উপর পর্যন্ত। হেলিকপ্টার নির্ভর করে বাতাসের ঘনত্বের উপর। তার আছে রোটর। সেটাতে বাতাস লাগতে হবে।

কত উপরে তারা? দু মাইল? তিন মাইল?

যদি ঠিক ঠিক হিসাব কষে ফেলতে পারে ক্যানিস্টারটা, তাদের নিচে এবং পৃথিবীর উপরে একটা নিরাপদ জায়গায় বিস্ফোরিত হবে সেটা।

একচুল এদিক সেদিক হতে পারবে না।

আর আপনি যদি ভুল হিসাব করেন? জিজ্ঞেস করেছিল ক্যামারলেনগো।

সে এখন আর কন্ট্রোল ধরে নেই। কপ্টারটা কি অটো পাইলটে চলছে?

উপরে হাত দিল ক্যামারলেনগো, বের করে আনল কালো একটা লাইলনের ব্যাগ।

ক্যানিস্টারটা আমার হাতে দিন। বলল ক্যামারলেনগো, তার কণ্ঠে কর্তৃত্ব।

কী করবে ভেবে পেল না ল্যাঙডন। এগিয়ে দিল ক্যানিস্টার, নব্বই সেকেন্ড।

ক্যামারলেনগোর কাজ দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল ল্যাঙডনের। সে ক্যানিস্টারটাকে সেই কার্গো বক্সে ভরে দিল। তারপর লক করে দিল সেটাকে।

কী করছেন আপনি!

চিন্তার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করছি। ছুড়ে দিল সে চাবিটা। জানলা দিয়ে, বাইরে।

যেন ল্যাঙডনের আত্মাও বেরিয়ে পড়ল চাবিটার সাথে সাথে।

ক্যামারলেনগো কালো প্যাকটা স্কুলের ব্যাগের মত করে জড়িয়ে নিল তার গায়ে, পিঠের সাথে আটকে নিল।

আই এ্যাম স্যরি, বলল ক্যামারলেনগো, ব্যাপারটা এমন হবার কথা ছিল না।

তারপর সে খুলল দরজা, নেমে গেল খোলা আকাশে।

ল্যাঙডন যেন জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থান করছে। যেন দুঃস্বপ্ন আর মরণের মধ্যে

খেলা করছে। ভেবে পায় না সে কী করবে। তারপর সিদ্ধান্ত নিল। কিছু একটা করতেই হবে।

প্রতিবস্তুর ক্যানিস্টারটা নাগালের বাইরে।

উপরের দিকে গুলির মত উঠে যাচ্ছে চপার প্রতিনিয়ত।

পঞ্চাশ সেকেন্ড। উপরে, আরো উপরে। কেবিনের ভিতরে পাগলের মত হাতড়ে গেল ল্যাংডন। পয়তাল্লিশ সেকেন্ড। আরেকটা প্যারাস্যুটের আশায় হাতড়াল সে। যেখানে যেখানে সম্ভব। চল্লিশ সেকেন্ড। আর কোর প্যারাস্যুট নেই। পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড। এগিয়ে গেল সে দরজার দিকে। তাকাল নিচে, খোলা বাতাসের সাথে যুঝতে বুঝতে। নিচে কালো পৃথিবীর বুকে আলোকিত রোম। বত্রিশ সেকেন্ড।

এবং সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিল সে।

অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্ত...

কোন প্যারাস্যুট ছাড়াই খোলা দরজা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রবার্ট ল্যাংডন। কালো রাত তার দেহকে নিয়ে নিল দখলে।

এবার সে কোন পুলের উপরে লাফ দিয়ে পড়ছে না, পড়ছে না কোন জলের আধারের উপর। নিচে ইট আর কংক্রিটের বিশাল মহানগরী।

অসম্ভব দ্রুতিতে নেমে আসছে সে। নেমে আসছে নিচে। প্রতি মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছে অবিশ্বাস্য গতি।

সাথে সাথে তার মনে পড়ে গেল সার্নে শোনা কথাটা।

এক স্কোয়ার ফুটের ড্রাগ একটা পড়ন্ত বস্তুর গতি রোধ করবে বিশভাগ।

সাথে করে নিয়ে এসেছিল সে উইন্ড শিল্ডের একটা কভার। অনেকটা গ্লাইডারের মত। উপরদিকে উঁচু হয়ে আছে তার হাত, পা নিচের দিকে।

নামছে সে তীব্রগতিতে।

তারপর, মাথার উপরে কোথাও এক সুতীব্র বিস্ফোরণের আওয়াজ পেল ল্যাংডন।

প্রচন্ড শকওয়েভের পুরোটাই টের পায় সে। টের পায়, ওঠে কেঁপে। অবিশ্বাস্য শকওয়েভের ধাক্কা সামলে নিয়েছে তার মাথার উপরের শিল্ড।

সাথে সাথে তাপের এক অপ্রতিরোধ্য দেয়াল এগিয়ে আসে। আশপাশের তাপমাত্রা বেড়ে যায় অসম্ভব।

ঝাঁকি খায় সে। মনে হয় কোন গরম চুল্লির ভিতরে বসে আছে। কিন্তু হাল ছাড়ে না। ফস্কাতে দেয় না হাতের অবলম্বনটাকে।

এরপর চোখ খুলে দেখল সে আলোর অনির্বচনীয় ফুলঝুরি। আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল ভয়ে।

তারপর, যেমন হঠাৎ করে ধাক্কাটা এসেছিল, চলেও গেল তেমন করে।

কালো আকাশের বুকে নেমে এল সে আগের মত।

গাণিতিক হিসাবে জান খারাপ করে দিচ্ছে সে।এক স্কোয়ার ফুটের ড্রাগ তার পড়ার গতিকে নামিয়ে আনবে বিশভাগ।

এটা এক স্কোয়ার ফুন্টর চেয়ে বেশ বড়।

কিন্তু গতি বাড়ছেই প্রতি মুহূর্তে।

নিচে, কালো আকাশের বুকে নক্ষত্রলোকের মত, আস্তে আস্তে প্রসারিত হল আলোয় আলোয় ছাওয়া রোম। ইট পাথরের মহানগরী।

মাঝে মাঝে আলোতে বিরতি যে নেই তা নয়। কালো একটা সাপ একেবেকে চলে গেছে নিচের মহানগরীর বুক চিরে।

হঠাৎ তালুতে অনুভব করল সে একটা ব্যথা। আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। অন্য হাতটা টেনে নিচে নামাল সে, দুহাত দিয়ে দু কোণার হ্যান্ডেল ধরে ছিল, ব্যাখ্যাটা কমে গেল একটু।

সাথে সাথে আরো একটা ব্যাপার বুঝতে পারল, তার গতি বেঁকে যাচ্ছে ডানে।

আশার ক্ষীণ একটা রেখা দেখা দিল সাথে সাথে। খুব অল্প, কিন্তু বেঁকে যাচ্ছে গতিপথ।

বিপরীত হাত নিচু করল সে এবার। আবার বিপরীত দিকে বেঁকে যাচ্ছে গতি।

মনোনেবেশ করল সে সাথে সাথে, কাজের প্রতি। নিচের কালো সাপটাই এখন ভরসা। সেটা ডানে, কিন্তু ভরসাও আছে। অনেক উপরে ল্যাঙডন এখন। মরিয়া হয়ে সেদিকে ঘুরিয়ে নিল ডানাটাকে।

বাকিটা ঈশ্বরের হাতে।

খুব বেশি বেঁকে যাচ্ছে না। এটা কোন সত্যিকার গ্লাইডার নয় যে যেদিকে খুশি ঘোরানো যাবে বিমানের মত।

এবার, জীবনে প্রথমবারের মত একটা মিরাকলের জন্য প্রার্থনা করল সে উপায়ান্তর না দেখে।

নিচ থেকে উঠে আসছে অন্ধকার... নড়াল সে শরীর, বাঁকিয়ে দিল গোটা দেহটা একদিকে... কাজ হচ্ছে, অনেক বেঁকে যাচ্ছে সে... অনেক... উঠে আসছে স্রোতস্বিনী সাইবার... তারপর, আঘাত হানল সে।

গূঢ় আঁধার গিলে নিল অবশেষে।

টাইবারের বুকে একটা হাসপাতাল আছে, আইসোলা টাইবেরিনার উপরে।

হাসপাতালটায় যোলশ পঁয়ষট্টির প্লেগের অনেক প্রভাব ছিল। তখন থেকেই এখানে মানুষ দেখতে আসে হাসপাতালটাকে। দেখতে আসে সুন্দর দ্বীপটাকে।

তারা তুলল একটা শরীর জল থেকে। কে দেখেছিল প্রথম, বলতে পারবে না। কিন্তু তুলল।

এখনো সচল আছে হৃদপিন্ড।

কয়েক মিনিট ধরে চেষ্টা চালাল তারা। তারপর, হাল ছেড়ে দিল।

কিন্তু না, সবাইকে অবাক করে দিয়ে কেশে উঠল মরণাপন্ন লোকটা।

আবার বিশ্বাস ফিরে এল তাদের বুকে, টাইবেরিনা দ্বীপে অলৌকিক কিছু একটা আছেই।

কার্ডিনাল মর্টাটি এমন সুন্দর নিরবতার কোরাস কখনো শোনেনি। সিস্টিন থেকে যেন অনিন্দ্যসুন্দর সুর লহরী বেরিয়ে আসছে।

ক্যামারলেনগো ভেন্ট্রেস্কার দিকে যখন তাকাল সে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সবাই সব দেখেছে। দেখেছে, কী করে সে হেলিকপ্টার নিয়ে উড়ে গেল আকাশে, কীভাবে আলোর পিন্ড বিস্ফোরিত হল, কী করে ধাক্কা এল সবার কাছে।

আর এখন দাঁড়িয়ে আছে ক্যামারলেনগো। তাদের সবার মাথার উপরে। সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার চূড়ায়।

একেই কি বলে ঈশ্বরের মদদ? এ্যাঞ্জেলদের সহায়তা?

অসম্ভব....

এ যে ক্যামারলেনগো তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এক অচিন্তনীয় সৌকর্য ভর করেছে তার উপর আজকে।

সারা চত্বর ভরে গেল শত কণ্ঠের কাকলিতে। একদল সন্যাসিনী হাঁটু গেড়ে বসল। আস্তে আস্তে একটা রব উঠল চারধার থেকে। যেভাবে ঝড় শুরু হয়, প্রথমে একটু শব্দ, তারপর সেটার সাথে একটা লয় যুক্ত হয়, যুক্ত হয় আরো আরো শব্দ। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক লয়ে।

তেমন করেই সারা স্কোয়ারের মানুষ জয়ধ্বণি দিল শুধু মাত্র ক্যামারলেনগোর নাম ধরে।

অবাক বিস্ময়ে দেখল মর্টাটি, চারপাশের কার্ডিনালরাও যোগ দিল তাদের সাথে।

সত্যি সত্যি কি এমনটাই হচ্ছে?

ভেবে পায় না কার্লো ভেন্ট্রেস্কা, সে, নাকি তার আত্মা, নেমে এল স্বর্গ থেকে? ভেবে পায় না কী করে তার প্যারাস্যুট আর সব জায়গা থাকতে নামল ভ্যাটিকানের এক কোমল বাগানে। কী করে সে এতগুলো ধাপ বেয়ে উঠে এল। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার চূড়ায়, সেটা তার শরীর, নাকি আত্মা!

অনুভূতি তার একটা ভৌতিক আত্মার মত।

হালকা।

সে ভেবে পায় না আসলে লোকগুলো তার নাম ধরে চিৎকার করছে, নাকি ঈশ্বরের নাম ধরে? সেই একই আনন্দ, যেটা সে পেয়ে এসেছে প্রতিদিন প্রার্থনার সময়....

সারাটা জীবন এ মুহূর্তের জন্যই সে প্রার্থনা করে এসেছে। চার্চের কাজে যেন লাগা যায়।

আপনাদের ঈশ্বর জীবিত, বলতে ইচ্ছা করছে তার চিৎকার করে, চারপাশের অলৌকিকের দিকে একটু নজর দিন।

তারপর, যখন সেই স্পিরিট তাকে নাড়ালেন, নড়ল সে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ছাদের উপর।

শুরু করল প্রার্থনা।

একটু পরে, শুয়ে আছে ল্যাঙডন একটা বিছানায়। দেখতে পাচ্ছে না কিছু, কারণ,

চোখ বন্ধ। সামনের দৃশ্যগুলো এমনি এমনি সরে গেল। জলের সেই অনুভূতি এখনো কাজ করছে ভিতরে।

তাকাল সে কোনক্রমে চোখ মেলে। চারধারে সাদা পোশাক পরা অবয়ব। কেন তারা সাদা? নাকি ভুল দেখছে সে? কোথায়? স্বর্গে?

বমি করা শেষ করেছে, বলল এক লোক ইতালিয়তে, ঘুরিয়ে দাও এবার।

লোকটার কণ্ঠে পেশাদারীত্ব।

কেউ একজন তাকে উল্টে দিচ্ছে... বসার চেষ্টা করল ল্যাঙডন। কোমল হাতে সরিয়ে দেয়া হল চেষ্টাটাকে। পকেট হাতড়াচ্ছে অন্য কেউ। ভিতর থেকে সব বের করে আনছে।

তারপর, সে হারিয়ে গেল অন্য কোন জগতে।

ডক্টর জ্যাকোবাস মোটেও ধর্মভীরু নয়, ওষুধ তাকে অনেক আগেই সেখান থেকে সরিয়ে এনেছে। আজ রাতের ঘটনা দেখেছে সে ঠিক ঠিক।

তারপর আকাশ থেকে মানুষ পড়া শুরু হল?

ডক্টর জ্যাকোবাস আর তার কর্মচারীরা তাকিয়ে ছিল ভ্যাটিকানের দিকে। তারপরই, আকাশ থেকে এই আত্মা পড়ল। পড়ল জলে। পড়ার সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে যায় আঘাতে। ডুবে যায়।

ঈশ্বর নিজহাতে তাকে এখানে ন্যস্ত করেছেন।

নাহলে কী করে তারা শুনতে পেল শব্দটা! কী করে সে আর পুরো নদী বাদ দিয়ে পড়ল হাসপাতালের দ্বীপে!

ই আমেরিকানো, বলল এক নার্স, ওয়ালেট থেকে একটা কাগজ বের করে।

আমেরিকান? ইতালিয়রা আমেরিকা সম্পর্কে একটা কৌতুক করে। আমেরিকানরা ইতালিতে, রোমে এত বেশি বিচরণ করে যে এক সময় ইতালির জাতীয় খাদ্য হয়ে যাবে হ্যাম বার্গার।

কিন্তু আমেরিকানরা আকাশ থেকে পড়তে শিখল কবে থেকে?

স্যার, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কী? কোথায় আপনি, জানেন?

আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে লোকটা।

অবাক হবার কিছু নেই। সি পি আর করার পর লোকটা হড়হড় করে অনেক জল বের করে দিয়েছে বুক থেকে, পেট থেকে।

ড্রাইভিং লাইসেন্স পড়ছে নার্স। সি চিয়ামা রবার্ট ল্যাঙডন।

অসম্ভব!

ডক্টর জ্যাকোবাস তাকে হেলিকপ্টারে উঠে অনেক অনেক উপরে চলে যেতে দেখেছে। তারপর ঘটেছে বিস্ফোরণ। সেই লোকটাই হয় কী করে!

এই সে লোকটা আমার মনে আছে। পরনে এখনো টুইড জ্যাকেট! বলল নার্স এমন সময়ে চিৎকার করল এক রোগিনী, হাতের রেডিও উঁচু করে।

এইমাত্র ক্যামারলেনগো নেমে এসেছে সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার উপরে।

সিদ্ধান্ত নিল ডক্টর জ্যাকোবাস, সকাল আটটা পর্যন্ত ডিউটি শেষ করে সে গির্জায় যাবে।

আবার জ্ঞান ফিরল রবার্ট ল্যাঙডনের। সে একটা এক্সামিনেশন টেবিলে শুয়ে আছে। চারপাশে নানা জিনিস। কেউ একজন একটা ইঞ্জেকশন নিয়ে এগিয়ে এল।

স্বর্গ? অবশ্যই নয়।

এলিয়েন? হতে পারে।

সে শুনেছিল এমন অনেক কথা। মানুষকে অনেক বিপদের হাত থেকে তারা উদ্ধার করে। তারপর নিয়োজিত হয় সেবায়।

তোমাদের জীবনের মত নয় আমাদের... উঠে বসল আতঙ্কিত হয়ে ল্যাঙডন।

মিস্টার ল্যাঙডন, প্লিজ! দৌড়ে এল ডক্টর জ্যাকোবাস।

তাকাল ল্যাঙডন স্থির দৃষ্টিতে। এখনো সে কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। আমি... মনে করেছিলাম...

ইজি। মিস্টার ল্যাঙডন। আপনি একটা হসপিটালে আছেন।

হাসপাতাল দু চোখে দেখতে পারে না ল্যাঙডন। কিন্তু তার পরও, হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে। এলিয়েনদের হাতে পড়ার চেয়ে, ভিনগ্রহের অষুধ খাবার চেয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকা অনেক ভাল।

আমার নাম ডক্টর জ্যাকোবাস, আপনি যে বেঁচে আছেন... জোর বরাত বলতে হয়।

আমার পোশাক আশাক কোথায়?

একটা পেপার রোব পরে আছে সে।

সেগুলো ভিজে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে আমরা কেটে ফেলি।

আপনার পকেটে আঠালো কী যেন পাওয়া গেছে। বলল নার্স।

হায় হায়! গ্যালিলিও ডায়াগ্রামা! পৃথিবীতে একমাত্র কপি!

আপনার ব্যক্তিগত জিনিসগুলো আমরা আলাদা করে রেখেছি। বলল সে একটা প্লাস্টিক বিন দেখিয়ে, ওয়ালেট, ক্যামকর্ডার, একটা কলম।

আমার কোন ক্যামকর্ডার নেই।

তাকাল সে। সোনি রুবি ক্যামকর্ডার। মনে পড়ে গেল সাথে সাথে। কিং কোহলারের শেষ আকুতি।

এগুলো আপনার পকেটেই পাওয়া গেছে। ক্যামকর্ডারটায় কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। নতুন একটা কিনতে হতে পারে। আপনার ভিউয়ার ভেঙে গেছে। আওয়াজ অবশ্য আসছে এখনো। বারবার প্লে হচ্ছে সেটা। দুজন লোক বচসা করছে যেন।

একবার কানে নিয়ে ঠেকাল সে ক্যামকর্ডারটা। তারপরই চিনতে পারল কোন দুজন কথা বলছে।

উঠে বসতে চাইল সে উত্তেজনায়।

মাই গড।

আবার শুরু থেকে কথাগুলো চলল। কানের কাছে নিয়ে এল সে ক্যামকর্ডারটাকে।

সব পরিষ্কার হয়ে আসছে... এন্টিম্যাটার... হেলিকপ্টার...

কিন্তু এর মানে...

আবার বমি পেল! কাঁপতে কাঁপতে উঠে এল সে টেবিল থেকে। দাঁড়াল কম্পমান পায়ের উপর।

মিস্টার ল্যাঙডন! ডক্টর জ্যাকোবাস এগিয়ে এল সাথে সাথে।

আমার কিছু জামা কাপড় প্রয়োজন।

প্রয়োজন বিশ্রামও।

আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। চেক আউট করছি। এখনি। কিছু পোশাক দরকার।

কিন্তু স্যার আপনি! ডক্টর জ্যাকোবাস বাক বিতন্ডা করার চেষ্টা করল।

এখনি!

আমাদের হাতে কোন পোশাক নেই। হয়ত কাল আপনার কোন বন্ধু কোন কাপড়চোপড় আনতে পারে।

ডক্টর জ্যাকোবাস, আমি এক্ষুনি আপনার দুয়ার পেরিয়ে যাচ্ছি। পোশাক প্রয়োজন। আমি যাচ্ছি ভ্যাটিকান সিটিতে। কেউ নাঙা গায়ে ভ্যাটিকানে যেতে পারে না। আমার কথা কি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন আপনি?

কোনক্রমে হজম করল কথাগুলো ডক্টর জ্যাকোবাস, এই লোকটাকে পরার মত কিছু দাও।

হসপিটাল টাইবেরিনা থেকে বেরিয়ে এল ল্যাঙডন প্যারামেডিকের পোশাকে।

একই পোশাক পরা মহিলা ডাক্তার বলেছে, তাকে ভ্যাটিকানে পৌঁছে দেবে স্বল্পতম সময়ে।

মল্টো ট্রাফিকো, বলল সে। ভ্যাটিকানের চারপাশের এলাকা যানবাহনে ছয়লাপ।

কন্ডো কন্ডাসেন্ডে ভি এম্বুলেঞ্জে।

এম্বুলেঞ্জে?

এরো এম্বুলেঞ্জে।

মাথা নাড়ল সে।

হাসল মহিলা, ফ্লাই ভ্যাটিকান সিটি। ভেরি ফাস্ট!

একটা জীবন পার করে, উন আশি বছর বয়সে, এই অলৌকিক দেখা খুব জরুরি ছিল, জানে মর্টাটি।

সিনর মর্টাটি! এক সুইস গার্ড চিৎকার করল, আপনার কথামত আমরা ছাদে গিয়েছিলাম। ক্যামারলেনগো রক্ত মাংসের মানুষ। একেবারে আমাদের চেনা ক্যামারলেনগো। স্পিরিট নন।

তোমাদের সাথে কি কথা বলেছেন?

নিল ডাউন হয়ে প্রার্থনায় রত। তাকে ছোয়ার সাহস হয়নি আমাদের।

মর্টাটি একটু চিন্তা করলেন, বল তাকে, তার কার্ডিনালরা অপেক্ষা করছে।

সিনর, যেহেতু তিনি একজন মানুষ... ইতস্তত করছে গার্ড।

কী?

তার বুক... পোড়া। ক্ষতস্থান বেঁধে দেব কি? তিনি নিশ্চয়ই ব্যাথায় আছেন।

তিনি একজন মানুষ। সুতরাং মানুষের মতই তার সেবা করবে। স্নান করাও। ভাল করে ঢেকে দাও ক্ষতস্থান ওষুধ সহ। পরিষ্কার রোবে ঢেকে দাও। সিস্টিন চ্যাপেলে তার জন্য অপেক্ষা করব আমরা।

দৌড়ে গেল গার্ডরা।

রাজকীয় ধাপে বসে আছে ভিট্টোরিয়া। বিদ্ধস্ত। এগিয়ে গেল কার্ডিনালরা। যাচ্ছে তারা সিস্টিন চ্যাপেলে।

তাকাল মর্টাটি। তার করার মত আরো অনেক কাজ আছে।

ঢুকে গেল চ্যাপেলে। তারপর লাগিয়ে দিল দরজা।

গড হেল্প মি!

হসপিটাল টাইবেরিনার দু রোটরের এ্যারো এম্বুলেঞ্জে ভ্যাটিকান সিটির পিছন দিয়ে ঢুকল। আর মনে মনে আশা করল ল্যাঙডন, এটাই যেন তার জীবনের শেষ হেলিকপ্টার ভ্রমণ হয়।

ভ্যাটিকানে নামতে কোন অসুবিধা নেই বোঝানোর পর সেটাকে ল্যান্ড করাতে পারল তারা ভিতরে।

গ্রাজি। বলল সে। নামল নিচে।

মহিলা পাইলট তার দিকে একটা উড়ো চুমু ছুড়ে দিয়ে চলে গেল সাথে সাথে।

মাথাটাকে পরিষ্কার করে নেয়ার চেষ্টা করল সে। চেষ্টা করল ভাবতে, যা সে ভাবছে।

কী করবে, ঠিক করা আছে সব।

এগিয়ে গেল সে সামনের দিকে। হাতের ক্যামকর্ডারে দৃষ্টি রাখল, যেন কেউ দেখতে না পায়।

কার্ডিনাল মর্টাটি তাকিয়ে আছে সিস্টিন চ্যাপেলের ঘড়ির দিকে। বিশাল পেন্ডুলামের দিকে।

ইট ওয়াজ এ মিরাকল! বলল এক কার্ডিনাল, দ্য ওয়ার্ক অব গড!

ঠিক! বলল আরেকজন, ঈশ্বর তার ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছেন।

ক্যামারলেনগো আমাদের পোপ হবেন, চিৎকার করল অন্য কার্ডিনাল, তিনি কোন কার্ডিনাল নন, কিন্তু তাকে স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন।

ঠিক তাই! দেরি করল না আরেক কার্ডিনাল, কনক্লেভের নিয়ম মানুষের গড়া। আমাদের উপরে মূল্য দিতে হবে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে! আমি ব্যালটিংয়ের জন্য অত্যন্ত দ্রুত অনুরোধ করছি।

একটা ব্যালটিং? বলল কার্ডিনাল মর্টাটি, আমার মনে হয় সে দায়িত্বটা বর্তেছে আমারই কাঁধে।

প্রত্যেকে ঘুরল তার দিকে।

মর্টাটির ভিতরে কী এক অব্যক্ত ব্যাথা কেঁদে মরছে।

প্রিয় বন্ধুবর্গ! বলল সে অবশেষে, আমি মনে করি বাকি জীবনের কটা দিন আমার কাটবে আজকের দেখা দৃশ্যের ব্যাখ্যা নিয়ে। আর এখনো, আপনারা যে কথা বলছেন ক্যামারলেনগোর ব্যাপারে... এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, সম্ভবত।

নিরব হয়ে গেল পুরো ঘর।

কীভাবে আপনি সে কথা বলেন? ক্যামারলেনগো পুরো ক্যাথলিক চার্চকে রক্ষা করেছেন। ঈশ্বর সরাসরি কথা বলেছেন তার সাথে। স্বয়ং যমদূতের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছেন তিনি। আর কোন চিহ্ন দেখতে হবে আমাদের? তাছাড়াও, তার বক্তব্য, তার আধুনিকতা, তার তেজস্বীতা, দূরদৃষ্টি এবং নিবেদিতপ্রাণ মনোভাব এবং তারুণ্য ক্যাথলিক চার্চকে এক অবিশ্বাস্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ক্যামারলেনগো আমাদের কাছে আসছেন এখনি। বলল মর্টাটি, অপেক্ষা করা যাক। ব্যালটিংয়ের আগে তার কথা শোনা যাক। কোন না কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে তখনি।

ব্যাখ্যা?

আপনাদের গ্রেট ইলেক্টর হিসাবে কনক্লেভের নিয়ম রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। নিয়ম অনুযায়ী, আপনারা জানেন, একজন ক্যামারলেনগো কখনোই পোপ হিসাবে নির্বাচিত হতে পারেন না। তিনি কোন কার্ডিনাল নন। একজন প্রিস্ট... একজন চ্যাম্বারেলইন। এমনকি তার অপ্রতুল বয়সের কথাও বিবেচনায় রাখতে হবে। যদি ব্যালটিংয়ে তাকে স্থান দেয়াও হয়, আমি আশা করব আপনারা এমন একজনকে ঠিক করবেন যিনি ভ্যাটিকান ল এর ভিতরে পড়েন।

কিন্তু আজ রাতে যা যা হয়েছে এখানে, তাতে অবশ্যই ভ্যাটিকানের আইন পাল্টে রাখা যায় কিছুক্ষণের জন্য! বলল নাছোড়বান্দা আরেক কার্ডিনাল।

তাই কি? ঈশ্বর কি চান আমরা ভ্যাটিকানের নিয়ম ভাঙি?

আপনি কি দেখেননি যা দেখলাম আমরা সবাই? কী করে আপনি সেই ক্ষমতার উপরে কথা বলছেন?

আমি ঈশ্বরের ক্ষমতার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তুলছি না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আমরা এখনো বেঁচে আছি। তাঁর ইচ্ছাতেই এখনো কনক্লেভ নষ্ট হয়ে যায়নি।

সিস্টিন চ্যাপেলের হলওয়েতে বসে থেকে অবাক হয়ে তাকাল ভিট্টোরিয়া ভেট্রা। সারা গায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা, মেডিক্যাল রোবে আবৃত যে লোকটা আসছে সে কি আরেক আত্মা?

উঠে দাঁড়াল সে, অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠে বলল, র... বার্ট!

কথা বলল না লোকটা কোন।

জাপ্টে ধরল ভিট্টোরিয়াকে। সমস্ত শক্তি দিয়ে। মিশিয়ে ফেলতে চাইল তার সাথে। তারপর, খুঁজে পেল তার ঠোঁট।

ওহ্ গড! ওহ্... থ্যাঙ্ক, গড!

আবার চুমু খেল ল্যাঙডন তাকে।

সরে যাবার চেষ্টা করল ভিট্টোরিয়া। কিন্তু পারল না। থাকল ল্যাঙডনের হাতের ভিতরেই। যেন কত বছর ধরে পরস্পরকে তারা চেনে।

এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা! বেছে নেয়া জন ছাড়া কে এমন বিস্ফোরণের মুখে বেঁচে আসতে পারে? বলছে কেউ একজন।

আমি। বলল ল্যাঙডন।

সাথে সাথে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল মর্টাটি। মিস্টার... ল্যাঙডন?

কোন বাক্যব্যয় না করে এগিয়ে গেল সে সিস্টিন চ্যাপেলের সামনের দিকে। সাথে সাথে এল দুজন গার্ড। একটা কার্টে করে নিয়ে আসছে এক টিভি সেট।

তারা সেটটায় কারেন্ট দিল। তারপর ল্যাঙডনের ইশারায় বেরিয়ে গেল বাইরে।

এখন এখানে শুধু ল্যাঙডন, ভিট্টোরিয়া আর কার্ডিনালরা। টেলিভিশনে সোনি রুবির আউটপুট দিল সাথে সাথে। চাপ দিল প্লে।

জ্যান্ত হয়ে উঠল টেলিভিশন।

দেখা গেল পোপের অফিস। সেখানে পিছন দিয়ে ক্যামারলেনগো বসে আছে আগুনের সামনে। উঠছে, কথা বলছে কারো সাথে।

বোঝাই যায় ছবিগুলো তোলা হয়েছে হিডেন ক্যামেরায়।

বলল ল্যাঙডন, এ ছবি ঘণ্টাখানেক আগের। সার্নের ডিরেক্টর ম্যাক্সিমিলিয়ান কোহলার তুলেছিল নিহত হবার আগে।

আর রিওয়াইন্ড করল না সে। যা দেখতে হবে তা সামনেই আছে। আসছে। লিওনার্দো ভেট্রা ডায়েরি রাখত? বলছে ক্যামারলেনগো, মনে হয় খবরটা সার্নের জন্য ভাল। এন্টিম্যাটার রাখার প্রসেস সম্পর্কে যদি সেখানে কিছু লেখা থাকে, তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু জানানো থাকে–

নেই, বলল কোহলার, আপনি জেনে খুশি হবেন যে সেই প্রক্রিয়াগুলো চলে গেছে লিওনার্দো ভেট্রার সাথে সাথে। অবশ্য তার ডাইরিগুলোয় অন্য কোন ব্যাপারে কথা আছে। আপনার ব্যাপারে।

যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ক্যামারলেনগো, বুঝলাম না।

সেখানে লেখা আছে, গত মাসে লিওনার্দো একটা মিটিং করেছিল। গত মাসে। আপনার সাথে।

ইতস্তত করল ক্যামারলেনগো। তাকাল দরজার দিকে, রোচারের উচিৎ হয়নি একা আপনাকে এখানে পাঠানো। আমার সাথে কথা না বলে কী করে আপনি এখানে এলেন?

রোচার সত্যিটা জানে। আমি আগেই কল করেছি। বলেছি তাকে, কী করেছেন, আপনি।

কী করেছি আমি! যে কাহিনীই আপনি তাকে বলে থাকুন না কেন, রোচার একজন সুইস গার্ড এবং এই গির্জার উপর তার বিশ্বাসের অন্ত নেই। একজন পাগলাটে বিজ্ঞানীর চেয়ে তার ক্যামারলেনগোর উপর বিশ্বাস আছে তার।

আসলে, সে এত বেশি বিশ্বস্ত, যে বিশ্বাস করছিল না। সে এত বেশি বিশ্বাসী, যে তার

অনুগত একজন গার্ড ষড়যন্ত্র করছে জেনেও সে কথাটা বিশ্বাস করেনি। সারাদিন ধরে সে অন্য একটা ব্যাখ্যার খোঁজ করছিল।

তারপর আপনি তাকে দিলেন?

খবরটা। আঘাত হয়ে এসেছিল তার কাছে।

রোচার আপনার কথা বিশ্বাস করলে আমাকে এ্যারেস্ট করত।

না। কাজটা করতে দিতাম না আমি। আমি তাকে এ মিটিং পর্যন্ত চুপ থাকতে বলেছি।

একটা বিচিত্র হাসি দিল ক্যামারলেনগো, আপনি গির্জাকে এমন এক তথ্য দিয়ে ব্লাকমেইল করতে চাইছেন যা কেউ বিশ্বাস করবে না!

আমার ব্ল্যাকমেইল করার কোন দরকার নেই। আমি শুধু আপনার কণ্ঠ থেকে সত্যিটা জানতে চাই। লিওনার্দো ভেট্রা আমার বন্ধু ছিল।

কিছু বলল না ক্যামারলেনগো। সোজা তাকিয়ে থাকল কোহলারের দিকে।

এটা বোঝার চেষ্টা করুন, বলল কোহলার, প্রায় এক মাস আগে, লিওনার্দো ভেট্রা আপনার সাথে যোগাযোগ করে, পোপের সাথে একটা জরুরি মিটিংয়ে বসতে হবে তার। আপনি জানতেন, পোপ পছন্দ করতেন লিওনার্দোকে, তার কাজের জন্য। বলেছিল লিওনার্দো। জরুরি প্রয়োজন।

আগুনের দিকে ফিরল ক্যামারলেনগো। বলল না কিছুই।

অত্যন্ত গোপনে ভ্যাটিকানে এসেছিল লিওনার্দো। এখানে এসে তার মেয়ের বিশ্বাস নষ্ট করেছিল। ব্যাপারটা তাকে অনেক যন্ত্রণা দেয়। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। তার আবিষ্কার তাকে গভীর দ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল। ভ্যাটিকানে এসেছিল সে পোপের কাছ থেকে পরামর্শ পাবার জন্য। একটা গোপন মিটিং, বলেছিল সে আপনাকে। এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাপারে। প্রমাণ করেছিল সে, জেনেসিস করা সম্ভব। আর সেই অসীম ক্ষমতার উৎস- যাকে ভেট্রা বলে ঈশ্বর- তৈরি করতে পারে সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত।

নিরবতা।

সব দেখে শুনে পোপ স্থবির হয়ে যান, বলছে কোহলার, তিনি চাইলেন লিওনার্দো প্রকাশ্যে আসুক। হিজ হেলিনেস মনে করলেন, এই আবিষ্কার বিজ্ঞান আর ধর্মের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করবে। পোপের সারা জীবনের স্বপ্নগুলোর একটা। তারপর লিওনার্দো আপনাকে জানাল সব কথা, নিচে নেমে। কেন সে চার্চের গাইডেন্স চায়। আপনাদের বাইবেল যেমন বলে, সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। বিপরীত। আলো এবং আঁধার। ভেট্রা জানাল যে সে বস্তু তৈরি করতে পারে। পারে প্রতিবস্তু বানাতে। আমি কি বলে যাব?

নিরব হয়ে আছে ক্যামারলেনগো। সে কয়লার দিকে তাকিয়ে আছে চুপচাপ।

লিওনার্দো ভেট্রা এখানে আসার পর, বলছে কোহলার, আপনি সার্নে গিয়ে তার কাজ দেখে এসেছিলেন। লিওনার্দোর ডায়েরিতে লেখা আছে, ব্যক্তিগতভাবে আপনি সেখানে, তার ল্যাবে, একটা ভ্রমণ শেষ করেছিলেন।

চোখ তুলে তাকাল ক্যামারলেনগো।

বলে গেল কোহলার, মিডিয়ার মনোযোগ না কেড়ে পোপ কোনো ভ্রমণ করতে পারতেন না। তাই তিনি আপনাকেই পাঠালেন। লিওনার্দো আপনাকে তার ল্যাবে একটা গোপনীয় অভিযানে নিয়ে যায়। সে একটা এন্টিম্যাটার এ্যানিহিলেশন দেখায়। বিগ ব্যাঙ- সৃষ্টির ক্ষমতা। সে আপনাকে আরো কিছু দেখায়। দেখায় এক বিশাল পরিমানের স্পেসিমেন। সে যে প্রতিবস্তু বানাতে জানে তার নিদর্শনস্বরূপ। আপনি বিস্মিত হয়ে পড়েন। ফিরে আসেন ভ্যাটিকানে। পোপকে জানানোর জন্য।

ছোট্ট করে শ্বাস ফেলল ক্যামারলেনগো, আর তাতে আপনার ঘাবড়ানোর কী হল? যে আজ রাতে আমি সারা দুনিয়ার সামনে বলে দিই লিওনার্দোর কথা এবং বলে দিই যে এন্টিম্যাটার সম্পর্কে কিছুই জানি না?

না! ব্যাপারটা আমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছে যে। লিওনার্দো ভেট্রা প্রায় প্রমাণ করে ফেলেছে, যে আপনাদের ঈশ্বর বলে কেউ আসলেই আছে। আর আপনি তাকে খুন করে বসেন!

ঘুরল এবার ক্যামারলেনগো। কোন শব্দ নেই। শুধু আগুনের পোড়া আওয়াজ।

হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেল কোহলারের ক্যামেরা। ঝাঁকি খেল সারা ফ্রেম। তারপর একটা হাত বেরিয়ে এল বাইরে। সেখানে পিস্তল ধরা।

আপনার সমস্ত পাপের স্বীকারোক্তি দিন, ফাদার!

অবাক হয়ে তাকাল ক্যামারলেনগো, আপনি কখনো এখান থেকে জীবিত বের হতে পারবেন না।

মরলে আমার জন্য ভাল হয়। আমি সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাই যেটা আমাকে একেবারে বাল্যকাল থেকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আপনাদের বিশ্বাসের অভিশাপ। এবার দু হাতে বাড়িয়ে ধরল সে গানটাকে, একটা সুযোগ দিচ্ছি আপনাকে। পাপের স্বীকারোক্তি করুন... অথবা মারা পড়ুন এই মুহূর্তে।

দরজার দিকে তাকাল ক্যামারলেনগো।

বাইরে আছে রোচার। সেও আপনাকে শেষ করে দিতে প্রস্তুত।

রোচার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতিরক্ষক—

রোচার আমাকে এখানে ঢুকতে দিয়েছে, সশস্ত্র অবস্থায়। তোমার মিথ্যাগুলো ঠিক ঠিক ধরে ফেলেছে সে। তোমার মাত্র একটা অপশন আছে। সত্যি কথা বল আমার সামনে। তোমার নিজের ঠোঁটে শুনতে চাই আমি কথাগুলো।

অস্বস্তিতে ভুগছে ক্যামারলেনগো।

গান কক করল কোহলার সাথে সাথে, তোমার কি কোন দ্বিধা আছে যে, খুন করে ফেলব এখনি?

কোন ব্যাপার না তোমার মত লোকের কাছে, বলায় বা না বলায়। তোমার মত মানুষ বুঝতে পারবে না কখনো।

চেষ্টা কর।

উঠে বসল ক্যামারলেনগো। আগুনে একটা স্লেট আছে, সেদিকে ফিরল। তারপর বলতে লাগল, সময়ের শুরু থেকে এই চার্চ ঈশ্বরের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করেছে। কখনো কথা দিয়ে, কখনো তরবারি দিয়ে। আর সব সময় টিকে গেছি আমরা।

কথা টেনে নিচ্ছে ক্যামারলেনগো।

কিন্তু আগের দিনের ডেমনরা ছিল আগুনের। তারা এমন শত্রু যাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারি আমরা। কিন্তু স্বয়ং শয়তান ভিন্নরূপী। যত সময় যায়, ততই সে রূপ পাল্টায়। হঠাৎ তেতে উঠল ক্যামারলেনগো, আমাকে বলুন, মিস্টার কোহলার, চার্চ কী করে ব্যাখ্যা করবে আমাদের মনের কোন ব্যাপারটা ঠিক, আর কোনটা ভুল? আমরা কী করে মেনে নেই সে ভিত্তিটা যার উপর দাঁড়িয়ে আছি সবাই?

যতবার চার্চ তার কণ্ঠ উঁচু করে, ততবার আপনারা পাল্টা চিৎকার করেন। আমাদের অবহেলা করতেন। বলতেন পশ্চাতমুখী। আর এভাবেই আপনাদের ভিতরের অকল্যাণটা উঠে আসে। আত্মকেন্দ্রীক ব্যাপারগুলো আরো বেড়ে যায়। ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়ছে ক্যান্সারের মত।

আজ আর মানুষ ঐশ্বরিক মিরাকলে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে বৈজ্ঞানিক মিরাকলে। বিজ্ঞান এসেছে আমাদের খাদ্যাভাব, দারিদ্র আর রোগ-শোককে মুছিয়ে দেয়ার জন্য। বিজ্ঞান- অশেষ মিরাকলের নতুন ঈশ্বর মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আমি শয়তানের কাজ দেখেছি। দেখেছি আরো অনেক কিছু...

কীসব আজেবাজে কথা বকছ! ভেট্রার আবিষ্কার তোমাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বই প্রমাণ করেছে। সে তোমাদের পক্ষের লোক।

আমাদের পক্ষের? বিজ্ঞান আর ধর্ম কখনোই এক দল হয়ে যেতে পারবে না! আমরা একই ঈশ্বরকে খুজি না, আপনি আর আমি, খুজি না! আপনার ঈশ্বর কে? প্রোটন, ভর আর পার্টিকেলের চার্জ? কী করে আপনার ঈশ্বর উৎসাহ দেয়? কী করে আপনার স্রষ্টা মানুষের মনের ভিতরে ঢুকে যায় এবং প্রমাণ করে যে সেই সর্বশক্তিমান?

ভেট্রা ছিল পথভ্রষ্ট! তার কাজ রিলিজিয়াস ছিল না, ছিল স্যাকরিলিজিয়াস! মানুষ কিছুতেই একটা টেস্ট টিউবে গডের সৃষ্টি তুলে আনতে পারে না। তারপর সে টেস্ট টিউব দুলিয়ে সবাইকে বলতে পারে না যে গড আছেন। তাহলে সেই টেস্ট টিউবের কর্তা আর ঈশ্বরের মধ্যে ফারাকটা কোথায়? এতে ঈশ্বরের মহিমা বাড়ে না, ছোট করে দেখানো হয় তাকে।

ক্যামারলেনগোর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে সবদিকে।

আর তাই তুমি খুন করে ফেললে লিওনার্দো ভেট্রাকে?

চার্চের খাতিরে! সমস্ত মানবজাতির খাতিরে। এই কাজের পাগলামি থামিয়ে দেয়ার জন্য। মানুষ সৃষ্টির ক্ষমতা তার কবলে নেয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। একটা টেস্ট টিউবের ভিতর স্রষ্টা? একটা ফোঁটা যা পুরো মহানগরীকে বাষ্প করে দিতে পারে? তাকে থামানো প্রয়োজন ছিল!

থামল ক্যামারলেনগো। তাকাল হঠাৎ আগুনের দিকে। সে হয়ত তার অপশনগুলো মনে মনে ঝালিয়ে নিচ্ছে।

স্বীকার করে ফেলেছ। তোমার আর কোন গতি নেই।

বিষণ্ণভাবে হাসল ক্যামারলেনগো, দেখতে পাচ্ছেন না আপনি আপনার পাপ থেকে স্বীকারোক্তি করে নেয়াই আপনার শেষ পরিণতির জন্য ভাল হয়। যখন আপনার মত লোকের পাশে ঈশ্বর থাকেন, তখন অনেক অপশন থাকে হাতে। কিন্তু এখন তিনি আপনার সমর্থনে নেই।

হঠাৎ ঝাঁকি খেল ক্যামারলেনগো। তারপর খুলে ফেলল তার বুকের কাপড়। সরিয়ে ফেলল।

থাম! বলল কোহলার, কী করছ!

যখন ক্যামারলেনগো ফিরল, তার হাতে ছিল একটা লাল গনগনে সিল। দ্য ইলুমিনেটি ডায়মন্ড। হঠাৎ লোকটার চোখের দৃষ্টি পাগলের মত হয়ে গেল। আমি কাজটা নিজে নিজে করার কথা ভাবছিলাম! বলল সে, কিন্তু আপনি এসে গেলেন, একটা পথ বেরিয়ে গেল আমার জন্য।

তাকাল সে একবার পাগলের দৃষ্টিতে। তারপর চোখ বন্ধ করল, ফিসফিস করে বলল, মাতা মেরি! আশীর্বাদ কর মা... তোমার সন্তানকে ধরে রাখ!

তারপর, আর কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে ডায়মন্ড সিলটা বসিয়ে দিল নিজের বুকে। চিৎকার করে উঠল।

আর কোহলার, অবাক নিজের অবশ পায়ের উপর ভর করেই উঠে দাঁড়াল। কাঁপছে হাতের পিস্তলটা এলোমেলোভাবে।

আরো আরো জোরে চিৎকার করে উঠল ক্যামারলেনগো। আঘাতে আঘাতে হতবিহ্বল হয়ে। তারপর সে সিলটাকে ছুড়ে ফেলে দিল কোহলারের পায়ের দিকে। পড়ে গেল মেঝেতে, যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ।

এরপর কী হল তা বোঝা যায় সহজেই।

গুলি ছোঁড়া হল কোহলারের বুক লক্ষ্য করে। পড়ে গেল সে হুইলচেয়ারের উপর।

না! বাধা দেয়ার চেষ্টা করল রোচার।

এখনো মেঝেতে পড়ে আছে ক্যামারলেনগো, গোঙ্গাচ্ছে, আঙুল তুলল সে রোচারের দিকে, ইলুমিনেটাস!

ইউ বাস্টার্ড! এগিয়ে গেল রোচার রোষে ক্যামারলেনগোর দিকে, ইউ।

তিনটা বুলেট দিয়ে চাট্রান্ড তাকে ফেলে দিল। সাথে সাথে মারা গেল রোচার।

এরপর কী ঘটেছে সবাই মোটামুটি জানে। সুইস গার্ডের জবানিতে এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে সেটা বারবার প্রচার করা হয়েছে।

সবশেষে, হাত বাড়িয়ে দিল কোহলার, ল্যাঙডনের দিকে, দা... দাও এটা মিডিয়ার হাতে!

এরপরই, কালো হয়ে গেল স্ক্রিন।

একটু একটু করে সচেতন হয়ে আসছে ক্যামারলেনগো। তাকে সুইস গার্ড এগিয়ে আনছে সিস্টিন চ্যাপেলের রাজকীয় স্টেয়ারকেসের দিকে। গান ভেসে আসছে সেন্ট পিটার্স স্কোয়ার থেকে।

গ্রাজি ডিও।

শক্তির জন্য সে প্রার্থনা করেছে। ঈশ্বর তাকে শক্তি দিয়েছেন। তার দুর্বল মুহূর্তে কথা বলেছেন তিনি।

তোমার অভিযানটা পবিত্র, বলেছেন ঈশ্বর, আমি তোমাকে শক্তি দেব।

এমনকি ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি থাকার পরও একটু একটু দুর্বল লাগছে তার।

যদি তোমাকে না হয়ে থাকে, ঈশ্বর চ্যালেঞ্জ করেছেন কাকে?

যদি এখন না হয়, তাহলে কখন?

যদি এ পথে না হয়, তাহলে কীভাবে?

জিসাস, ঈশ্বর মনে করিয়ে দেন তাকে, রক্ষা করেছেন সবাইকে... তাদের পথের জন্যই রক্ষা করেছেন। দুটো যুক্তি দিয়ে যিশু খুলে দিয়েছেন পথ। আতঙ্ক এবং আশা। তিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন সমস্ত বিশ্ব চরাচরকে।

কিন্তু তা সহস্র বছর আগের কথা। মানুষ মিরাকলের কথা ভুলে গেছে। তারা হয়ে উঠেছে অবিশ্বাসী।

অন্তরাত্মার মিরাকল কি হারিয়ে যাবে?

সব সময় সে ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানিয়েছে একটা সুযোগের জন্য একটা মাত্র সুযোগ। আর সে জানিয়ে দেবে সবাইকে, বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু নিরব ছিলেন তিনি। তারপর সুযোগ এল। সে রাতের সুযোগ।

সে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে দেখেছিল, যে লোকটাকে সে সব সময় সঙ্গ দিয়ে এসেছে। পবিত্র ভেবে এসেছে, পোপত্বের সময়টাতেও আগলে রেখেছে, সে লোক এত বড় ভন্ড!

আপনি ভঙ্গ করলেন! চিৎকার করেছিল সে, আর সবাইকে বাদ দিয়ে আপনি তুবড়ে দিলেন পবিত্রতা!

পোপ নিজের কাজের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুই শুনতে চায়নি ক্যামারলেনগো। দৌড়ে চলে এসেছিল সে, বমি করতে করতে, নিজের রক্তে নেয়ে উঠতে উঠতে, নিজেকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে দেখতে।

নেমে এসেছিল সে সেন্ট পিটারের সমাধিতে।

মাদার মেরি, কী করব আমি?

ন্যাক্রোপোলিসে বসে বসে কান্নাকাটি করতে করতে ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করে এ দুনিয়া থেকে তুলে নেয়ার কথা বলার সময় কথা বলে ওঠেন তিনি।

পরমপিতা!

তার মাথায় কথাগুলো বজ্রপাত ঘটায়, তোমার ঈশ্বরের সেবা করতে তুমি কি চাও না?

চাই! কেঁদে উঠেছিল ক্যামারলেনগো।

তোমার ঈশ্বরের জন্য কি জীবন দিয়ে দিতে পারবে?

পারব। এখুনি তুলে নিন আমাকে।

তোমার চার্চের জন্য কি মরতে পারবে?

পারব। দয়া করে আমাকে সে শক্তি দিন!

কিন্তু... তুমি কি মানবজাতির জন্য প্রাণপাত করতে পারবে?

থমকে গেল ক্যামারলেনগো। পারবে। সে পারবে।

পারব। আমি মানুষের জন্য প্রাণত্যাগ করতে পারব। আপনার পুত্রের মত।

আরো কয়েক ঘণ্টা পর, সেখানে, শুয়ে থেকে থেকে তার মায়ের দেখা পেল ক্যামারলেনগো।

তোমাকে নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা আছে...

আরো উন্মাদনার মধ্যে ডুবে যায় ক্যামারলেনগো। তারপর আবার সাড়া দিয়ে ওঠেন ঈশ্বর। কথা বলেন না, আওয়াজ করেন না। কিন্তু সে বুঝতে পারে।

তাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আন।

আমি যদি না করি... তাহলে কে?

এখন যদি না করি... কখন?

গার্ডরা চ্যাপেলের দরজা খোলার সময় আবার কথা বলে ওঠে তার ভিতর। ঈশ্বর তাকে বেছে নিয়েছেন। সেই বাল্যকাল থেকেই। অনাদিকাল থেকে।

তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

একটা নতুন রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে তার ভিতরে ভিতরে। সাদা রোবে আবৃত করেছে তাকে সুইস গার্ড। তার আগে স্নান করিয়েছে, তার আগে পরিষ্কার করে দিয়েছে ক্ষতস্থান, জড়িয়ে দিয়েছে কাপড়ে। ব্যথা কমানোর জন্য মরফিনের একটা ইঞ্জেকশনও দিয়েছে সেইসাথে। তার আশা ছিল তারা কোন পেইন কিলার দেবে না।

যিশু উপরে চলে যাবার আগে তিনদিন যন্ত্রণাকাতর হয়েছিলেন।

সে ঠিকই টের পাচ্ছে, ড্রাগের প্রভাবে তার জ্ঞান লোপ পাচ্ছে একটু একটু করে। তন্দ্রা চলে আসছে।

যখন সে চ্যাপেলে ঢুকল, কার্ডিনালরা যে তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তা দেখে মোটেও অবাক হল না।

তারা আমার প্রতি বিস্ময়াভিভূত নয়। তারা ঈশ্বরের প্রতি বিস্ময়াভিভূত। ঈশ্বর আমার ভিতর দিয়ে কাজ করেছেন।

যত সে এগিয়ে যাচ্ছিল, ততই টের পাচ্ছিল, আরো কিছু আছে তাদের চোখে।

কী?

তাদের চোখে তাকায় ক্যামারলেনগো, কিন্তু কোন আবেগ দেখতে পায় না।

তখনি ক্যামারলেনগো তাকাল অল্টারের দিকে। দেখতে পেল রবার্ট ল্যাঙডনকে।

ক্যামারলেনগো কার্লো ভেন্ট্রেস্কা সিস্টিন চ্যাপেলের পথে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা টিভি সেট আছে। সেখানে সম্প্রচারিত হচ্ছে এমন এক দৃশ্য যা আসার কথা নয় এখানে। তাকাল সে ভিট্টোরিয়া ভেট্রার দিকে। অধোমুখে বসে আছে মেয়েটা।

চোখ বন্ধ করল ক্যামারলেনগো। হয়ত মরফিনের প্রভাবে হ্যালুসিলেশন হচ্ছে। আবার খুলল সে চোখ। ব্যাপারটা এমন নয়।

তারা সব জানে।

হঠাৎ করেই, কোন ভয় কাজ করল না তার ভিতরে।

পথ দেখাও, পরমপিতা! এমন কিছু দেখাও যাতে আমি তাদের বিশ্বাস করাতে পারি।

কোন জবাব শুনতে পায় না ক্যামারলেনগো।

পরমপিতা! আমরা এতদূরে এসেছি ব্যর্থ হবার জন্য?

নিরবতা।

আমরা কী করেছি তা তারা বুঝতে পারবে না।

জানে না ক্যামারলেনগো, কার কথা শুনতে পাচ্ছে সে নিজের ভিতরে। কিন্তু একেবারে হতবাক হয়ে যায় সে।

আর সত্যিই তোমাকে মুক্ত করবে...

তাই সিস্টিন চ্যাপেলের কাছে এগিয়ে যেতে যেতে ক্যামারলেনগো কার্লো ভেন্ট্রেস্কা মাথা উঁচু করে রাখে। তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকা কার্ডিনালদের চোখে বিন্দুমাত্র নম্রতা নেই।

ব্যাখ্যা কর নিজের কাজ, চোখগুলো বলছে, এ কাজের একটা কারণ দাড়া করাও। জানাও, আমাদের ভয় অমূলক।

ভাবছে ক্যামারলেনগো, সত্যি! এ দেয়ালের পিছনে, সামনে অনেক সত্যি গুমরে মরছে। আর এমন এক সত্যির মুখোমুখি হয়েছিলাম আমি যে তাতে আঁধার এগিয়ে আসে। সে আঁধারেই আমি সন্ধান পাই আলোকের।

আপনারা যদি আপনাদের আত্মা দিয়ে লাখ লাখ প্রাণ বাঁচাতে পারেন, করতেন কি তেমন কাজ?

পুরো চ্যাপেল চুপ থেকে তার কথা শুনে গেল।

এগিয়ে গেল সে উন্মত্তের মত, কার্ডিনালদের সামনে, বড় পাপ কোনটা? শত্রুকে খতম করা? নাকি আসল ভালবাসাকে বিকিয়ে যেতে দেখেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা?

সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে সবাই গাচ্ছে গান!

সিস্টিনের ছাদের দিতে তাকিয়ে থাকল ক্যামারলেনগো। অন্ধকার ভল্ট থেকে তাকিয়ে আছে মাইকেলেঞ্জেলোর ঈশ্বর... দেখতে তৃপ্ত।

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না... বলল সে।

সবাই এখনো মরা চোখে তাকিয়ে আছে। কোন আবেগ নেই সেখানে। তারা কি প্রয়োজনটা দেখতে পাচ্ছে না?

ব্যাপারটা একেবারে খাঁটি।

ইলুমিনেটি। বিজ্ঞান আর শয়তান এক মঞ্চে।

পুরনো ভয়কে সংশোধিত কর। তারপর ফেল ভেঙে।

ভয় আর আশা। তাদের বিশ্বাস করাও।

আজ রাতে ইলুমিনেটির ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে। সারা রোম জুড়ে আতঙ্কের লহর বয়ে গেছে। তারপর মানুষ দেখেছে ঈশ্বরের মহিমা।

ঈশ্বরের কণ্ঠ যেন এখনো শুনতে পাচ্ছে সে। ওহ্! এই বিশ্বাসহীন পৃথিবী! কারো কারো তাদের কাছে পৌঁছতে হবে। তুমি। তুমি না হলে কে? তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে একটা

উদ্দেশ্য সামনে রেখে। তাদের সামনে উন্মোচিত কর অকল্যাণকে। তাদের ভয়ের কথা নতুন করে জানিয়ে দাও। নিরবতা মৃত্যুর সমতুল্য। অন্ধকার না থাকলে আলোর কোন মূল্য নেই। খারাপ না থাকলে ভালর কোন মর্যাদা নেই। তাদের। সামনে তুলে দাও বিচারের ভার। ভাল অথবা মন্দ। ভয় কোথায় গেল? কোথায় গেল বীরেরা? এখন না হলে কখন?

সবাই দাঁড়িয়ে আছে। পথে বিছানো আছে কার্পেট। তার মনে হল সে মোজেস। সাগর দ্বিখণ্ডিত করে এগিয়ে যাওয়া মূসা।

এইযে রবার্ট ল্যাঙডন বেঁচে আছে, সেটাও ঈশ্বরের মর্জি। তিনি তাকে রক্ষা করেছেন। ভেবে পায় না ক্যামারলেনগো, কেন।

একটা কণ্ঠ চিরে দিল সিস্টিন চ্যাপেলের বুক, তুমি আমার বাবাকে হত্যা করেছ।

তাকাল সে ভিট্টোরিয়া ভেট্রার চোখের দিকে। সেখানে ভয় নেই। আছে কষ্ট। এবং ঘৃণা। তাকে বুঝতে হবে, তার বাবার ক্ষমতা অকল্যাণের পথে চলে যাচ্ছিল। মানুষের কল্যানেই করা হয়েছে, যা করা হয়েছে।

তিনি ঈশ্বরের কাজ করছিলেন! এখনো চিৎকার করছে ভিট্টোরিয়া ভেট্রা।

ঈশ্বরের কাজ ল্যাবে করা যায় না। করতে হয় হৃদয়ে।

আমার বাবার হৃদয় ছিল পবিত্র! আর তার রিসার্চ প্রমাণ করেছিল–

তার রিসার্চ প্রমাণ করেছিল মানুষের মস্তিষ্ক, তার আত্মার চেয়ে বেশি গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। যদি তোমার বাবার মত একটা লোক আজ রাতে দেখা অস্ত্রের মত বিধ্বংসী কোন কিছু তৈরি করে, তাহলে কল্পনা কর সাধারণ মানুষ সেটাকে কীভাবে ব্যবহার করবে!

তোমার মত মানুষ?

একটা লম্বা শ্বাস নিল ক্যামারলেনগো। সে কি দেখতে পায়নি?

মানুষের নৈতিকতা বিজ্ঞানের সাথে সমান তালে এগুচ্ছে না। আমরা এখনো এমন কোন অস্ত্র তৈরি করিনি যেটার ব্যবহার হয়নি কখনো। মানুষ অনেক আগে থেকেই হত্যা করতে শিখেছে। আর তার মায়ের রক্ত গিয়েছে সে কারণেই।

শতাব্দিকাল ধরে, বলছে ক্যামারলেনগো, বিজ্ঞান যখনি অতিরিক্ত বাড় বেড়ে যায়, তখনি সেখানে একটা যতি চিহ্ন একে দেয় চার্চ। কৃত্রিম মিরাকল। হৃদয়কে আত্মা থেকে দূরে সরিয়ে আনার চেষ্টা। তারা ঈশ্বরকে হ্যালুসিলেশন হিসাবে আখ্যায়িত করে। প্রমাণ চায় তারা। প্রমাণ করে, তিনি নেই।

প্রমাণ? তার আগে বল, তোমরা কেন মেনে নিতে পার না যে তোমাদের ক্ষমতার বাইরে কোন একটা শক্তি আছে? যেদিন মানুষ ঈশ্বরকে তৈরি করবে একটা ল্যাবে, বুঝতে হবে সেদিন মানুষের মনে নতুন করে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, যেকোন মূল্যে।

তুমি বলতে চাও সেদিনের কথা, যেদিন মানুষের কাছে চার্চের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, বলল ভিট্টোরিয়া, ক্যামারলেনগার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, সন্দেহকে তুমি কাজে লাগিয়েছ। চার্চই কি পৃথিবীর বুকে একমাত্র আলোকিত প্রতিষ্ঠান? শুধু এখানেই : কি ঈশ্বরের আরাধনা করা হয়? খোঁজা হয় তাকে?

সব মানুষ, নানা পথে, তাকেই খুঁজে ফেরে। ঈশ্বর কি নিজের অসাধারণত্ব এই চার দেয়ালের বাইরে কোথাও দেখাতে পারেন না? পারেন না তিনি তার ক্ষমতাকে একটা ল্যাবে প্রকাশ করতে? তিনি কি এতই নাক উঁচু? এতই পক্ষপাতিত্ব তার সব সৃষ্টির উপর? ধর্ম জন্ম নিয়েছে বিশ্বাসের খোঁজে। সেই বিশ্বাসটাই অর্জনের চেষ্টা করেছিল আমার বাবা। সমান্তরাল পথে। কেন ব্যাপারটা তোমার চোখে পড়ল না? ঈশ্বর উপর থেকে তাকিয়ে থাকা কোন কুটিল, কুচক্রি অস্তিত্ব নন যিনি সারাক্ষণ উপর থেকে আমাদের দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে থেকে আমাদের নরকের শেষ কুন্ডে ফেলে দেয়ার পায়তাড়া ভাঁজবেন। তিনি সবখানে আছেন। সর্বত্র। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় শক্তি যা পরিবাহিত হয় সকল জগতে, জীবে, জড়তে, শূণ্যতায়। তোমার রক্তে রক্তে, আমার হৃদয়ে, একটা শক্ত পাথরের মধ্যেও।

বিজ্ঞান ছাড়া। বলল সতেজে ক্যামারলেনগো, বিজ্ঞান, সায়েন্স, সংজ্ঞামতে, আত্মাহীন।

এখানে কোন নীতি নেই। নেই কোন দিকনির্দেশনা। একটা কিছু আবিষ্কার করলেই হল। যে প্রতিবস্তু ঈশ্বর তৈরি করে আমাদের জগৎ থেকে অনেক অনেক অকল্পনীয় দূরত্বে রেখেছেন, সেটাকে তোমাদের নগ্ন বিজ্ঞান টেনে আনে এখানেই। ঈশ্বরহীন পথে চলে বিজ্ঞান। এই কি আলোকিত পথ? এমন সব প্রশ্নের জবাব খোঁজা যার আদৌ জবাব না থাকাই সুন্দর?

নাড়ল মাথা ক্যামারলেনগো, না!

হঠাৎ ক্লান্ত বোধ করে ক্যামারলেনগো। ভিট্টোরিয়ার কঠিন দৃষ্টির সামনে, নিরবতার সামনে নুয়ে পড়ে দুর্বল, নেশাচ্ছন্ন ক্যামারলেনগো। এটা কি ঈশ্বরের শেষ পরীক্ষা?

এবার নিরবতা ভাঙল মর্টাটি। প্রেফারিতি... ব্যাজ্জিয়া আর অন্য তিন কার্ডিনাল... বলো না যে তুমি তাদেরও শেষ করে দিয়েছ!

অবশ্যই! তাকায় ক্যামারলেনগো। এখন প্রতিদিন মিরাকল ঘটায় বিজ্ঞান। আর ধর্ম? কত যুগ ধরে, কত শতাব্দি ধরে নিশ্চুপ আছে? ধর্মের দরকার ছিল একটা উজ্জীবনী শক্তির। অবিশ্বাসী পৃথিবীর সামনে একটা প্রমাণের প্রয়োজন ছিল খুব।

প্রেফারিতিরা সেই একই কাজ করত যা করে এসেছে তাদের পূর্বপুরুষরা। পুরনো, জং ধরা পদ্ধতি। পৃথিবীর নতুন একজন নেতা খুব দরকার। তরুণ। ক্ষমতাবান। অলৌকিকতায় ভরা।

ভয় আর আশা।

আত্মবলিদান কর লাখো মানুষকে বাঁচাতে।

কত হাজার হাজার মানুষ তাদের প্রাণ দিয়েছে চার্চের জন্য? আর তারা মাত্র চারজন। বেঁচে থাকলে কোন কাজেই লাগত না। মারা যাওয়ায় হয়ে থাকবে প্রাতঃস্মরণীয়।

প্রেফারিতি! বলল আবার মর্টাটি।

আমি তাদের বেদনা ধারণ করেছি আমার শরীরেও। আর আমিও মারা যেতাম ঈশ্বরের জন্য। কিন্তু আমার কাজ মাত্র শুরু হতে যাচ্ছিল। তারা বসে আছে সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে!

এমনভাবে মর্টাটি তাকিয়ে আছে তার দিকে যেন সে নিজহাতে খুন করেছে কার্ডিনালদের।

প্রয়োজনে তাও করতাম আমি!

আমি জ্যানাস! প্রয়োজনে আমি আমার ক্ষমতা দেখাতে পারি!

গানের দিকে মন দিন! বলল ক্যামারলেনগো, হাসতে হাসতে, তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে আছে তৃপ্তিতে, অকল্যানের উপস্থিতি ছাড়া কিছুই হৃদয়গুলোকে একত্র করতে পারত না। একটা চার্চ জ্বালিয়ে দিন, তারপর দেখুন মানুষ কীভাবে একত্র হয়। কী করে প্রতিরোধ করে। ফিরে আসে বিশ্বাসে।

আজ রাতে হাজির হওয়া প্রতিটা মানুষের দিকে দৃকপাত করুন। ভয় তাদের একত্র করেছে। ভালর জন্য...

কথা বন্ধ করে দিল সে। তারপর আবার ভাবা শুরু করল। মর্ফিনের প্রভাবে। ইলুমিনেটি উঠে আসেনি। ইলুমিনেটি বলে কিছু নেই। অনেক অনেক আগেই তারা বিলীন হয়ে গেছে আড়ালে। শুধু তাদের মিথ বেঁচে আছে। যারা জানত, শিউরে উঠেছে, যারা জানত না, নিজের অজ্ঞতা দেখে লজ্জা পেয়েছে।

তাহলে ব্র্যান্ডগুলো? মর্টাটির কণ্ঠে বিস্ময়।

জবাব দিল না ক্যামারলেনগো।

বর্গিয়া এ্যাপার্টমেন্টের ভিতরে, তালাবদ্ধ অবস্থায়, লুকিয়ে ছিল সিলগুলো। ধূলি মলিন। এগুলো এক ভয়ানক, যে পোপের চোখ ছাড়া আর কোথাও পড়বে না।

কেন তারা সে জিনিসগুলো লুকিয়ে রেখেছিল যা ভয় তুলে আনে? ভয়ইতো একত্র করে মানুষকে ঈশ্বরের দিকে।

পোপ থেকে পোপে স্থানান্তরিত হয় চাবিগুলো। সেখানে লুকিয়ে আছে রাজ্যের বিস্ময়।

বাইবেলের চৌদ্দটা আসল কপি। ফাতিমার তৃতীয় প্রফেসি। প্রথম দুটো সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে। আর তৃতীয়টা এমন ভয়ানক যে চার্চ ভুলেও হাত দেয়নি। রোম থেকে ইলুমিনেটিতে বিতাড়িত করে দেয়ার সময় চার্চ যে সিলমোহরগুলো উদ্ধার করে, তার আসল নমুনা ছিল সেখানে... ছিল পাথ অব ইলুমিনেশনের বর্ননা, ইউরোপের ডাকসাইটে বিজ্ঞানীরা বাসা বেঁধেছিল ভ্যাটিকানেরই নিজস্ব দুর্গে। কতক্ষণ তারা গোপন থাকতে পারবে?

কিন্তু এন্টিম্যাটার? ইতস্তত করছে ভিট্টোরিয়া, তুমি ভ্যাটিকানকে ধ্বসিয়ে দেয়ার ঝুঁকি নিয়েছিলে?

ঈশ্বর যে পর্যন্ত তোমার পাশে আছেন, কোন ঝুঁকি নেই।

তুমি বিভ্রান্ত, উন্মাদ!

লাখ লাখ মানুষ রক্ষা পেয়েছে।

মানুষ নিহত হচ্ছিল।

রক্ষা পাচ্ছিল আত্মা!

কথাটা আমার বাবা আর ম্যাক্স কোহলারকে বল!

সার্নের কাজকর্ম নতুন করে খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। সেখানে এমন একটা ফোঁটা তৈরি করা হয় যা বাষ্প করে দেয় আধ মাইল এলাকা! আর তুমি পাগল বলছ আমাকে? যারা বিশ্বাস করে, পরিচালিত হয় ঈশ্বরের কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। আব্রাহামকে ঈশ্বর আপন পুত্র বলিদান করতে বলেছিলেন। ইব্রাহিম, উদ্যত হয়েছিলেন তা করতে। ক্রুশবিদ্ধ হতে বলেছিলেন ঈশ্বর স্বয়ং যিশুকে। আমরা তাই ক্রুশকে আমাদের সামনে ঝুলিয়ে রাখি। তার যন্ত্রণা বোঝার চেষ্টা করি। চেষ্টা করি অকল্যানের স্বরূপ দেখার। অকল্যাণ আছে, কিন্তু ঈশ্বর আছেন তার উপরে।

তার ক্ষ্যাপাটে কথা প্রতিদ্ধণিত হয় দেয়ালে দেয়ালে। মাইকেলেঞ্জেলোর লাস্ট জাজমেন্ট জ্বলজ্বল করছে তার পিছনে।

আর কী করেছ তুমি, কার্লো? শিউরে ওঠে মর্টাটি, হিজ হোলিনেস...

একটা প্রয়োজনীয় কাজ...

কী বলছ! তিনি ভালবাসতেন তোমাকে!

আর আমি তাকে!

উহ্! কী ভালবাসতাম আমি তাকে! আর তিনি কিনা নিয়ম ভাঙলেন! ভাঙলেন ঈশ্বরের কঠিনতম নিয়ম!

জানে ক্যামারলেনগো, তারা এখন বুঝতে পারবে না। কিন্তু পারবে, একটু পরে। যখন বলবে সে, দেখতে পাবে তারা।

সে রাতে ক্যামারলেনগো আসছিল সার্ন থেকে বিজ্ঞানের ধৃষ্টতা দেখে। আশা করেছিল তিনি দেখতে পাবেন খারাপ দিকটা। কিন্তু তিনি শুধু ভাল দিকটা দেখতে পেলেন। এমনকি ভ্যাটিকানের তরফ থেকে ফান্ড দেয়ার কথাও বললেন।

পাগলামি! এমন একটা কাজে চার্চ ফান্ডিং করবে যেটা পুরো বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দেয়! এমন কাজ, যা মানুষের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় ধ্বংসের বীজ। ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তার মা এমন মানুষদের কারণেই...

কিন্তু... আপনি পারেননা! বলেছিল ক্যামারলেনগো।

বিজ্ঞানের কাছে আমার বড় একটা ঋণ আছে। এমন একটা কিছু যা আমি সারাটা জীবন ধরে লুকিয়ে রেখেছি। তরুণ বয়সে বিজ্ঞান আমাকে একটা উপহার দিয়েছিল। এমন এক উপহার যার কথা আমি কখনো ভুলতে পারিনি।

আমি বুঝলাম না। বিজ্ঞান ধার্মিক মানুষকে কী দিতে পারে?

ব্যাপারটা জটিল, বলেছিলেন পোপ, ব্যাখ্যা করতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু প্রথমেই, আমার সম্পর্কে একটা সাধারণ তথ্য আছে যা তোমার জানা দরকার। সারটা জীবন আমি তথ্যটা লুকিয়ে রেখেছি। মনে হয় তোমাকে বলার মত সময় এসেছে।

তারপর পোপ তাকে সেই বিস্ময়কর কথাটা বললেন।

ক্যামারলেনগো রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে ন্যাক্রোপোলিসে। কেউ তাকে এখানে খুঁজে পাবে না।

ব্যাপারটা জটিল, পোপের কণ্ঠ ধ্বণিত প্রতিধ্বণিত হচ্ছিল তার মাথায়, বোঝানোর জন্য একটু সময় দরকার...

কিন্তু ক্যামারলেনগোর জানা ছিল যত বেশি সময়ই লাগুক, সে বুঝবে না।

মিথ্যুক! বিশ্বাস করেছিলাম তোমার উপর। ঈশ্বর বিশ্বাস করেছিলেন তোমার উপর।

একটা মাত্র সরল বাক্যে পোপ ক্যামারলেনগোর সারাটা জগৎ দুমড়ে মুচড়ে দেন। সত্যিটা এত বড় আঘাত হয়ে আসে তার কাছে যে সে বেরিয়ে এসে বমি করে দেয় হলওয়েতে।

থাম! পিছনে পিছনে ছুটে আসেন বয়েসি পোপ, ব্যাখ্যা করতে দাও আমাকে!

কিন্তু দৌড়ে চলে যায় ক্যামারলেনগো। আর কী দরকার তার? পোপের পবিত্রতার কি কোনই মানদন্ড নেই?

পাগলামি এল দ্রুত। চিৎকার করছে তার মাথার ভিতরে। সেন্ট পিটারের সমাধির কাছে সে সজ্ঞান হয়। এমন সময় এসেছিলেন ঈশ্বর।

তোমার জন্য ক্ষমতাবান স্রষ্টা!

দুজনে মিলে তাদের পরিকল্পনা ঠিক করে। দুজনে মিলেই রক্ষা করতে পারবে গির্জাকে। দুজনে মিলে ফিরিয়ে আনতে পারবে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসহীন দুনিয়ায়। সর্বত্র অকল্যাণ। আর এখনো পৃথিবী স্থবির! দুজনে মিলে কালোকে প্রকাশিত করবে তারা। জিতবে ঈশ্বর। ভয় আর আশা! তখনি বিশ্বাস করবে পৃথিবী।

এগিয়ে গেল সে, পরিকল্পনা সাকার করবে।

পোপের কাছে এগিয়ে গেল সে। তারপর করল যা করার।

পোপের চোখ কিছু একটা বলতে চাইছে।

কিন্তু যথেষ্ট বলেছে এরই মধ্যে।

পোপ এক সন্তানের পিতা!

যা বলল ক্যামারলেনগো, তার প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করল সিস্টিন চ্যাপেলের ভিতরে। চারটে শব্দ! থমকে গেল সবাই। স্থবির হয়ে গেল। যেন সকলে মিলে প্রার্থনা করছে ক্যামারলেনগোর কথা যেন সত্যি না হয়।

পোপ এক সন্তানের পিতা!

শকওয়েভ ধাক্কা দিল ল্যাঙডনকেও। স্থাণুর মত তাকিয়ে থাকল ভিট্টোরিয়াও।

আশা করছে ল্যাঙডন, দুঃস্বপ্ন দেখছে ক্যামারলেনগো।

অসম্ভব! মিথ্যা কথা! বলল এক কার্ডিনাল অবশেষে।

আমিও বিশ্বাস করব না! গর্জে উঠল আরেকজন, পোপ সারা জীবন সৎ ছিলেন!

এবার কথা বলে উঠল মর্টাটি, বন্ধুগণ! যা বলছে ক্যামারলেনগো তার সবই সত্যি। পোপ সত্যি সত্যি এক সন্তানের পিতা!

ভয়ে বিমূঢ় হয়ে গেল কার্ডিনালরা।

অবাক হয়েছে ক্যামারলেনগোও, আপনি জানতেন! কিন্তু কী করে?

হিজ হোলিনেস যখন ইলেক্টেড হন... আমিই ছিলাম শয়তানির সাক্ষী!

কী! রা ফুটল না কারো কণ্ঠে।

ডেভিলস এভোকেট ছিলাম আমি!

এ শব্দটা পরিচিত সবার কাছে। একজন একলা কার্ডিনালকে দায়িত্ব দেয়া হয় পোপের কীর্তি দেখার জন্য, নির্বাচনের আগেই। পোপের সব কথা জানার কথা তার। পরেও। এবং, কখনোই তার পরিচয় পেশ করা চলবে না সবার সামনে। কখনো না।

আমি ছিলাম ডেভিলস এভোকেট, এভাবেই জানতে পারি আমি।

ঝুলে পড়ল অনেকের চোয়াল। হয়ত আজ এমন এক রাত, যখন সব সত্য মিথ্যার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়।

ক্যামারলেনগোর বিমূঢ়তাও কাটেনি, আর আপনি কাউকে বললেন না সেকথা?

আমি হিজ হোলিনেসের পাপের সাক্ষ্যী নই। আর তিনি স্বীকারোক্তি করেছেন আমার কাছে। তিনি সমস্ত খুলে বলেন আমার কাছে। তারপর সিদ্ধান্ত নিই আমি, কী করব আর কী করব না।

আর আপনার হৃদয় তথ্যটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে বলল?

পাপাসির জন্য তিনি ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য। মানুষ ভালবাসত তাকে। স্ক্যান্ডালটা চার্চকে গভীর আঘাত দিত।

কিন্তু তিনি ছিলেন এক সন্তানের পিতা! তিনি ভঙ্গ করেছেন প্রথম শর্ত। এবার গর্জন বেরুচ্ছে ক্যামারলেনগোর কণ্ঠ চিরে।

ঈশ্বরের কাছে দেয়া কথা সবচেয়ে বড় কথা... কখনো তাঁকে দেয়া কথা ভঙ্গ করোনা...

বলছে ক্যামারলেনগো, পোপ তার শর্ত ভেঙেছিলেন!

কার্লো, তার ভালবাসা... ছিল মহান। কোন শর্ত তিনি ভাঙেননি। ব্যাখ্যা করেননি তোমার কাছে?

ব্যাখ্যা করবেন কী? ক্যামারলেনগোর মনে গুমরে মরল কণ্ঠটা, ব্যাখ্যা করতে দাও...

আস্তে আস্তে সবটা বলে গেল মর্টাটি। অনেক বছর আগে, যখন তিনি প্রিস্ট ছিলেন, এক তরুণী নানের প্রেমে পড়ে যান। তারা দুজনেই প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হন এবং ঈশ্বরের কাছে দেয়া প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যান। কিন্তু তারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেননি। করেননি কোন পাপ। বিজ্ঞান তখন একটা নতুন আবিষ্কারে আলোকিত। শারীরিক সম্পর্ক ছাড়াই একটা সন্তান চেয়েছিল সেই নান। আর তা তাকে দেন হিজ হোলিনেস।

একথা... সত্যি হতে পারে না! বলল ক্যামারলেনগো।

এটাই সত্যি।

সে সন্তানের স্থান হবে কোথায়?

আর যেখানেই হোক, নরকে নয়।

সে কি এগিয়ে আসবে না?

এরই মধ্যে এসেছে, ইতস্তত করল কার্ডিনাল, সে... আর কেউ নয়, কার্লো... সে সন্তান তুমিই।

উঠে দাঁড়াল কার্লো ভেন্ট্রেস্কা। কাঁপতে কাঁপতে। তাকাল মাইকেলেঞ্জেলোর শিল্পকর্মের দিকে। লাস্ট জাজমেন্ট।

দেখল সে স্বচক্ষে। দেখল নরকের বিনাশী আগুন।

দেখতে পাচ্ছ না কি তুমি? বলছে মর্টাটি, তিনি পালার্মোর সেই হাসপাতালে গিয়েছিলেন। তুমি তখন ছোট এক বালক। এজন্যেই তিনি তোমাকে তুলে আনেন। করেন প্রতিপালিত। সেই নানের নাম মারিয়া... তোমার মা। সে সন্যাসব্রত ত্যাগ করেছিল তোমাকে জন্ম দেয়ার জন্য। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে দেয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করেই। যখন তিনি জানতে পারলেন যে তুমি, তার সন্তান, সেখান থেকেই বেঁচে উঠে এসেছ... আর কখনো হাতছাড়া করবেন না বলে নিয়ে এলেন তোমাকে। তুমি এখনো একা, কার্লো। তোমার বাবা মা দুজনেই ছিলেন খাঁটি। কৌমার্য বিসর্জন দেননি কেউই। তার পরও, তাদের ভালবাসাকে একটা আকার দেয়ার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন তোমাকে পৃথিবীতে আনার। বিজ্ঞানের মাধ্যমে। কার্লো ভেন্ট্রেস্কা, সত্যি বলতে গেলে, তুমি আর কেউ নও, যাকে সবচেয়ে বড় শত্রু ভাবছ তারই সন্তান। সেই বিজ্ঞানের সন্তান।

কান দুহাতে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে সে। পারছে না। শব্দগুলোকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। পারছে না। শক্ত মাটি খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে। পারছে না।

পড়ে গেল ক্যামারলেনগো কার্লো ভেন্ট্রেস্কা।

সেকেন্ড। মিনিট। ঘণ্টা।

চ্যাপেলের ভিতরে বয়ে গেল সময়।

আস্তে আস্তে অসাড়ত্ব কমে এল ভিট্টোরিয়ার। ছেড়ে দিল ল্যাঙডনের হাত। তারপর কার্ডিনালদের ভিতর দিয়ে পথ করে নিল সামনে। যেন জলের নিচে চলছে সে... ধীর, বাধাপ্রাপ্ত।

যখন সে এগিয়ে যাচ্ছিল রোবগুলোর মাঝ দিয়ে, যেন আস্তে আস্তে সচকিত হয়ে উঠছিল তারা। কাঁদছে কেউ কেউ। কেউ কেউ চোখ বন্ধ করে প্রার্থনায় রত। মেয়েটা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নির্নিমেষ চোখে দেখছে কেউ কেউ। বোধ-বুদ্ধি হারিয়ে গেছে সব। একেবারে শেষ বিন্দুতে চলে যাবার পর একটা হাত তার বাহু আকড়ে ধরল। একজন কার্ডিনাল। তাকাল সে। কার্ডিনালের চোখ ভয়ে হতবিহ্বল।

না বলল কার্ডিনাল। আপনি পারেন না।

অনিমেষ তাকিয়ে থাকল ভিট্টোরিয়া তার দিকে।

এবার তার পাশে আরেক কার্ডিনাল চলে এল। কোন কাজ করে বসার আগে আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে।

এবং আরো একজন। ব্যাথাটা... এটা যে কোন...

ঘিরে ধরল তাকে কার্ডিনালরা। কিন্তু এই সত্যি, আজকের এই সত্যি... পৃথিবীর জানতে হবে।

আমার হৃদয়ও সমর্থন দেয়, বলল হাত ধরে রাখা কার্ডিনাল, কিন্তু এ এমন এক পথ যেখান থেকে কোন ফেরা নেই। ফিকে হয়ে আসা আশার দিকে তাকাতে হবে আমাদের। কী করে মানুষ আর কখনো বিশ্বাস করবে?

আস্তে আস্তে কালো রোব আগলে রাখল তার পথ।

মানুষগুলোর কথা শুনুন। শুনুন তাদের হৃদস্পন্দন! তাদের ভিতরে কী প্রতিক্রিয়া হবে?

আমাদের ভাবার জন্য এবং প্রার্থনা করার জন্য সময় প্রয়োজন। বলল আরেকজন, দূরদৃষ্টি নিয়ে তাকাতে হবে আমাদের। এসব কথা...

কিন্তু সে তার নিজের জনককে হত্যা করেছে। খুন করেছে আমার বাবাকে।

আমি নিশ্চিত, এ পাপের ফল সে ভোগ করবে। বলল আরেকজন।

কিন্তু হাল ছেড়ে দিতে চায় না ভিট্টোরিয়া। এগিয়ে যায় দরজার কাছে। আরো ঘনিয়ে আসে কালো রোব। চোখে তাদের আতঙ্ক।

কী করবেন আপনারা? চিৎকার করল এবার মেয়েটা, খুন করবেন আমাকে?

সরে গেল বৃদ্ধ লোকগুলো। আর সাথে সাথে কথাটার জন্য অনুশোচনা হল ভিট্টোরিয়ার। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে, এই লোকগুলো বিশুদ্ধ আত্মার মানুষ। আজ রাতে অনেক ধ্বংস দেখেছে তারা।

আমি করতে চাই... বলল হাত ধরে রাখা কার্ডিনাল, ... তাই, যা করা উচিৎ।

তাহলে আপনারা তাকে যেতে দেবেন। একটা গভীর কণ্ঠ বলল পিছন থেকে। আমি আর মিস ভেট্রা এ চ্যাপেল ছেড়ে যাচ্ছি এখনি।

একটু দ্বিধা করে সরে দাঁড়াল কার্ডিনালরা।

থামুন! এবার বলল মর্টাটি, এগিয়ে আসছে সে তাদের কাছে, অন্য প্রান্তে হেরে যাওয়া ক্যামারলেনগোর অবয়ব রেখে। এগিয়ে এল বেদনায় ক্লান্ত হয়ে যাওয়া মর্টাটি। একটা হাত রাখল সে ল্যাঙডনের কাধে, আরেকটা ভিট্টোরিয়ার। তার চোখ এখন আরো বেশি অশ্রু সজল।

অবশ্যই আপনারা মুক্ত, যেতে পারেন এখনি, বলল মর্টাটি, অবশ্যই, কথা বলতে পারছে না লোকটা, আমি শুধু এটুকু বলব... ল্যাঙডন আর ভিট্টোরিয়ার পায়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, কাজটা আমাকে করতে দিন। আমি এখনি স্কোয়ারে যাব এবং একটা পথ বের করব। আমি বলব তাদের... জানি না কী করে, বলব একটা পথ বের করে। চার্চের স্বীকারোক্তি ভিতর থেকেই আসা উচিৎ। আমাদের ব্যর্থতার কথা আমাদের ভিতর থেকেই আসা উচিৎ।

পিছনে ফিরল সে, কার্লো, তুমি এ হাল করেছ চার্চের...

কিন্তু সেখানে একটা রেখা দেখা গেল সাদা রোবের... বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ক্যামারলেনগো নেই।

সিস্টিন চ্যাপেল থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে ক্যামারলেনগো কার্লো ভেন্ট্রেস্কা, তার সাদা রোব উড়ছিল।

অবাক হয়ে তাকাল সুইস গার্ডরা। সে বলল, একটা মুহূর্ত একা থাকতে হবে তাকে।

মানল গার্ডরা।

এগিয়ে যাচ্ছে ঘোরলাগা ক্যামারলেনগো। তার মাথায় একটা কথাই ঘুরছে। সে সেই লোকটাকে বিষ দিয়েছে যাকে ডাকত হোলি ফাদার নামে। সব সময় যে তাকে মাই সন বলে ডাকত। তা যে আক্ষরিক অর্থে সত্যি কে ভাবতে পারে! সব সময় ক্যামারলেনগো মনে করত ফাদার আর সন ধর্মীয় বাতাবরন।

কয়েক সপ্তাহ আগের রাতের মত, এবারও অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দৌড়ে চলে গেল সে।

সেদিন সকালে বৃষ্টি হচ্ছিল ভ্যাটিকানে। লোকজন ক্যামারলেনগোর দরজায় টোকা দেয়। পোপ তার দরজা খুলছেন না।

ঢুকল ক্যামারলেনগো পোপের অফিসে। গতরাতে যেমন ছিলেন পোপ, এখনো তেমনি। বাঁকা হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। মুখটা যেন শয়তানের। জিহ্বা মৃত্যুর মত কালো। পোপের বিছানায় শুয়ে আছে স্বয়ং ডেভিল।

এক বিন্দু অনুশোচনা হচ্ছে না তার।

ঘোষণা করল সে, পোপ মারা গেছেন স্ট্রোকে। তারপর প্রস্তুতি নিল কনক্লেভের জন্য।

মা মারিয়ার কণ্ঠ প্রতিধ্বণিত হচ্ছে তার ভিতরে, কখনো ঈশ্বরের কাছে দেয়া প্রতিজ্ঞা ভাঙবে না।

আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি, মা, এ পৃথিবী বিশ্বাসহীন। তাদের আবার বিশ্বাসের পথে আনতে হবে। আতঙ্ক এবং প্রত্যাশা। এই একমাত্র পথ।

হ্যাঁ। বলেছিল মা, তুমি না হলে আর কে? কে গির্জাকে অন্ধকার থেকে আলোয় তুলে আনবে?

প্রেফারিতিরা? দুর্বল। ভঙ্গুর। প্রাচীণপন্থী।

তারা শুধু মৃত পোপের পতাকা বহন করবে। সারা দুনিয়া ছুটে চলেছে অসম্ভব গতিতে। সেখানে স্থবির হয়ে থাকবে চার্চ এটাই নিয়ম। কিন্তু এ পৃথিবীর নিয়ম বদলে দিতে হবে। সচল করতে হবে না চার্চকে। ভাঙতে হবে মাত্র কয়েকটা নিয়ম। পাপাসির জন্য নতুন, পরিষ্কার রক্ত চাই।

চার্চে নতুন, তরুণ, উজ্জীবিত করা, মিরাকল দেখানো রক্ত চাই।

চা উপভোগ করুন। বলল ক্যামারলেনগো প্রেফারিতিদের, কনক্লেভের আগে, পোপের লাইব্রেরিতে। এখানে আপনাদের গাইড দ্রুত চলে আসবে।

প্রেফারিতিরা তাকে ধন্যবাদ জানাল। তাদের সেই বিখ্যাত প্যাসেট্টোতে যাবার সুযোগ দিয়েছে ক্যামারলেনগো। অপ্রত্যাশিত।

একজন বিদেশি প্রিস্ট তাদের নিতে এল প্যাসেট্টোতে। বিনা দ্বিধায় তারা চলে গেল।

তারা হবে ভীতি, আমি হব প্রত্যাশা।

না... আমিই ভীতি...

বিধ্বস্ত ক্যামারলেনগো এগিয়ে যাচ্ছে নানা ভীতি সাথে নিয়ে। তার সাথে আছে নানা চিন্তা। যুক্তির বাঁধভাঙা জোয়ার। সেইসাথে এই সমাপ্তির ব্যাপারে আক্ষেপ।

ঈশ্বর কি এভাবে সবটাকে শেষ করে দেয়ার জন্য ল্যাঙডনকে বাঁচিয়ে রেখেছেন?

না। তার অন্য কোন পরিকল্পনা আছে।

দৌড়ে যাচ্ছে ক্যামারলেনগো আরো আরো কালিগোলা অন্ধকারে।

সিস্টিন চ্যাপেল থেকে সুইস গার্ডদের নানা আদেশ নির্দেশ দিতে শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে হুঙ্কার।

এখন কোন ব্যাপরকেই পরোয়া করে না ক্যামারলেনগো ভেন্ট্রেস্কা। সে এগিয়ে যায় সোজা।

চোখের সামনে প্রতিভাত হয় ক্রুসিফিক্স। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর অবয়ব।

ঈশ্বর বেছে নেয়া মানুষদের জন্য কঠিন পরীক্ষা রাখেন। রাখেন কঠিন যন্ত্রণা।

তাকে কেন বেছে নেয়া হল তাহলে? এই ক্যাথলিক চার্চের করুণ স্ক্যান্ডাল দেখার জন্য?

এগিয়ে গেল ক্যামারলেনগো। আরো। আরো। উপনীত হল নিচে অব প্যালিয়ামসে। যেখানে নিরানব্বইটা বাতি অহর্নিশি জ্বলছে। তাকাল সে সেদিকে। তারপর গভীর একটা শ্বাস নিয়ে নেমে গেল নিচে। আবার কালিগোলা অন্ধকার গ্রাস করে নিল ক্যামারলেনগোর অবয়ব।

নিচে অনেক গোলকধাঁধা। কেউ পাবে না খুঁজে তাকে। পাবার দরকারও নেই। চলে এল সে সেন্ট পিটারের সমাধির আশপাশ জুড়ে গড়ে ওঠা মৃতদের নগরীতে।

ন্যাক্রোপোলিস!

এরপর শুনতে পেল মায়ের আর্তি, কার্লো, ঈশ্বরের তোমাকে নিয়ে বড় পরিকল্পনা আছে। আছে মহা পরিকল্পনা।

বিস্ফারিত নয়নে এগিয়ে চলল ক্যামারলেনগো।

এরপর, হাজির হলেন ঈশ্বর।

ক্যামারলেনগো থামল তাকিয়ে থেকে। তাকাল সামনে। নিরানব্বইটা বাতির আলোয় আলোকিত চারপাশ। মোহনীয় ছায়া পড়ছে তার। তাকাল সে মার্বেলের মেঝের দিকে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা একেবারে স্পষ্ট।

তিন মিনিট হয়ে গেছে উধাও হয়েছে ক্যামারলেনগো। চারদিকে তাকে খোঁজার জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেল। একটা ফুল স্কেল সার্চ করবে কিনা তা ভাবছিল মর্টাটি। এমন সময় সেন্ট পিটার্স স্কোয়ার থেকে মুহূর্মুহু মানুষের হর্ষধ্বণি উঠল।

চোখ বন্ধ করল মর্টাটি।

ঈশ্বর রক্ষা করুন আমাদের!

বেরিয়ে পড়েছে কনক্লেভের সমস্ত কার্ডিনাল। বেরিয়ে এসেছে ল্যাঙডন আর ভিট্টোরিয়াও। তারা অবাক হয়ে দেখছে, সমস্ত মিডিয়া ভ্যানের আলো গিয়ে পড়েছে ব্যাসিলিকার উপরে। সেখানে, পাপাল ব্যালকনির উপরে পড়ছে সবার নজর।

তাকাল ল্যাঙডন। তাকিয়েই জমে গেল।

আগে থেকেই ক্যামারলেনগোর পরনে ছিল শ্বেতশুভ্র রোব। পোপের মত।

পাপাল ব্যালকনি থেকে সেই রোব পরা অবস্থায় দু হাত উপরে তুলে প্রার্থনা করছে ক্যামারলেনগো কার্লো ভেন্ট্রেস্কা। আলোয় ভেসে যাচ্ছে সে।

এবার হঠাৎ করে জোয়ার উঠল।

বাঁধভাঙা জোয়ার।

ব্যালকনিতে ক্যামারলেনগোর শরীর দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ছিল মানুষ প্রথম মুহূর্তে। তারপর তারা চিৎকার জুড়ে দেয়। অবশেষে সুইস গার্ডের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তারা ভেঙে পড়ে ভিতরে। প্রতি মুহূর্তে মানুষের কল্লোল বাড়ছে।

কাঁদছে কেউ কেউ চিৎকার করে।

কেউ কেউ হাত তুলে রেখেছে ক্যামারলেনগোর দিকে।

এবং দৌড়ে আসছে সবাই। এগিয়ে গেল ক্যামেরাম্যানরা, ভিডিওগ্রাফাররা, রিপোর্টাররা। প্রতি মুহূর্তে ঝলক খেলে যাচ্ছে ক্যামেরার ফ্ল্যাশগানে। আলোয় আলোকিত হয়ে অপার্থিব দেখাচ্ছে কার্লো ভেন্ট্রেস্কাকে। এই উচ্ছ্বাস থামানোর উপায় নেই কোন।

এরপর একটা কিছু হল। থমকে গেল গোটা চত্বর।

অনেক উঁচুতে, হাতের একটু ইশারা দিল ক্যামারলেনগো।

তারপর মাথা নোয়াল। তারপর বসল প্রার্থনায়। অবনত মস্তকে।

একে একে, ডজনে ডজনে, শত শত, হাজার হাজার মানুষ তৎক্ষণাৎ নিচু হয়ে গেল। বসে পড়ল প্রার্থনায়। ক্যামারলেনগোর মত করে।

ক্যামারলেনগোর মনে, ঝড়ের মত, প্রার্থনা এল একই সাথে পাপের চিন্তায়, উচ্ছাসে, আবেগে।

... ক্ষমা কর আমাকে... বাবা... মা... দয়াময়... তোমরাই গির্জা... আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে তোমাদের একমাত্র সন্তানের এই আত্মদানটাকে।

ওহ্! আমার যিশু... আমাদেরকে নরকের অগ্নিকুন্ডের হাত থেকে রক্ষা করুন... সব আত্মাকে নিয়ে চলুন স্বর্গে... বিশেষত তাদের, যাদের ক্ষমার প্রয়োজন...

ক্যামারলেনগো চোখ খোলেনি নিচের দৃশ্য দেখার জন্য। নিচে শত শত ক্যামেরা দিয়ে সারা পৃথিবী এই দৃশ্য দেখছে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে করে, স্যাটেলাইটে করে, সাবমেরিন ক্যাবলে করে, টেলিফোনের লাইনে, সবভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে দৃশ্যটা। সারা পৃথিবীর শত শত দেশে, শত শত ভাষায়, কোটি কোটি মানুষ যোগ দিয়েছে তার সাথে। তাদের অজান্তে, তার প্রার্থনায়।

সময় চলে এসেছে এবার।

পবিত্রতম ট্রিনিটি, ত্রিত্ব... আমি সবচেয়ে দামি তিনটে বিষয় উৎসর্গ করছি... মাংস... রক্ত... আত্মা...

ক্যামারলেনগো টের পেল, তার শারিরীক বেদনা বাড়ছে। বাড়ছে যন্ত্রণা। মরফিনের প্রভাব কমে আসছে।

ভুলে যেওনা যিশু কী যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন...

প্লেগের মত ছড়িয়ে পড়ছে ব্যাথা।

এখানে আমার কাজ শেষ হয়েছে।

আতঙ্ক তার। আশা তাদের।

ন্যাক্রোপোলিসে সেই তেল ঢেলে দিয়েছে সে নিজের শরীরে। পদার্থটা তাকে জাপ্টে ধরেছে মায়ের মমতায়।

পকেটে হাত দিল সে। বের করল একটা ছোট গোল্ডেন লাইটার। সাথে করে নিয়ে এসেছিল।

কোন দুর্নামের সাথে বেঁচে থাকতে চায় না কার্লো ভেন্ট্রেস্কা।

একটা ছত্র মনে পড়ে গেল তার।

যখন শিখা স্পর্শ করবে স্বর্গকে, তাঁর এ্যাঞ্জেলরা নেমে আসবে অগ্নিশিখার মধ্যে...

সে ঠিক করল বুড়ো আঙুল।

তারা, গান গাইছিল সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে...

এমন এক দৃশ্য দেখল সারা পৃথিবী যার কথা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারবে না।

ভ্যাটিকান সিটির পোপের ব্যালকনিতে, একটা অগ্নিশিখা উঠে এল। তারপর সেটা দাউদাউ করে জ্বালিয়ে দিল তাকে। সে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করল না। করল না নড়াচড়া। শুধু তুলে রাখল হাত উপরের দিকে। তুলে দিল মুখাবয়বও। স্বর্গের দিকে। আলো আরো আরো তীব্র হচ্ছে। হচ্ছে আরো সুতীব্র। সারা পৃথিবী আবারো অবাক বিস্ময়ে দেখছে অবিশ্বাস্য দৃশ্য। শ্বাস বন্ধ করে। তারপর আস্তে আস্তে শিখার উজ্জ্বলতা কমে আসে। চলে গেছে ক্যামারলেনগো। সে পড়ে গেছে, নাকি উবে গেছে, বলা কঠিন। শুধু ধোঁয়ার এক রেখা উঠে যাচ্ছে আরো আরো উপরে। ভ্যাটিকান সিটির সবচেয়ে মূল্যবান ভবনটাকে পিছনে রেখে।

রোমের প্রভাত দেরিতে এল।

বৃষ্টি আর ঝড়ের দাপটে সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের সব মানুষ চলে গেছে আগেই। কিন্তু মিডিয়া নাছোড়বান্দা। তারা হাতে ছাতা নিয়ে গত রাতের কথা সবিস্তারে বলে যাচ্ছে। সারা দুনিয়ার সমস্ত গির্জা ভরে গেছে কানায় কানায়। কথা চলছে সব ধর্মের স্থাপনাগুলোয়।

উঠছে প্রশ্ন। আর উত্তরের ফলে আরো গভীর প্রশ্নের উদয় হচ্ছে।

এ পর্যন্ত ভ্যাটিকান একেবারে নিশ্চুপ থাকল। কোন প্রকারের শব্দ করল না।

ভ্যাটিকানের কোন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন কুঠুরিতে নুয়ে পড়ে কার্ডিনাল মর্টাটি পোপের মুখের হা বন্ধ করে দিল। এখন শান্তিময় দেখাচ্ছে হিজ হোলিনেসকে। অনেক বেশি স্থির।

মর্টাটি একটু ছাই তুলে এনেছিল সোনালি বাক্সে করে। সেটা তুলে ধরল সে হিজ হোলিনেসের সামনে।

ক্ষমা করে দেয়ার একটা সুযোগ, কোন ভালবাসাই, সন্তানের জন্য পিতার ভালবাসার চেয়ে বড় নয়।

সিনর? চার্ট্রান্ড এগিয়ে এল সামনে, তিনজন সুইস গার্ডকে সাথে করে। তারা আপনার জন্য কনক্লেভে অপেক্ষা করছে।

এক মুহূর্ত! বলল সে, এখন হিজ হোলিনেসের সেই শান্তি প্রাপ্য হয়েছে যা তার জন্য নির্ধারিত ছিল।

সাথে সাথে সুইস গার্ডরা পোপের মরদেহ সহ কফিনটাকে জায়গামত বসিয়ে দিল শব্দ করে।

মর্টাটি একা একা বর্গিয়া কান্ট্রিইয়ার্ড পেরিয়ে যাচ্ছিল সিস্টিন চ্যাপেলের দিকে। একটা উদাস বাতাস খেলে গেল তার গায়ে। একজন কার্ডিনাল বেরিয়ে এল এ্যাপোস্টোলিক প্যালেস থেকে, যোগ দিল তার সাথে।

আপনাকে কনক্লেভ পর্যন্ত নিয়ে যাবার সম্মান কি আমি পেতে পারি, সিনর?

সম্মানটা আমার প্রাপ্য।

সিনর, বলল ইতস্তত করে কার্ডিনাল, কাল রাতের ঘটনার জন্য কলেজ আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

প্লিজ। আমাদের মন মাঝে মাঝে দেখতে পায়, তাই যা আমাদের মন দেখতে চায়।

একটা দীর্ঘ সময় ধরে চুপ করে থাকল কার্ডিনাল। তারপর সে বলল। আপনাকে কি জানানো হয়েছে? আপনি আর আমাদের গ্রেট ইলেক্টর নন।

জানি। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই ছোট ছোট আশীর্বাদগুলোর জন্য।

কলেজ চায় আপনি এগিয়ে থাকুন।

মনে হয় চার্চ থেকে এখনো চাওয়া উবে যায়নি।

আপনি বিজ্ঞ। আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারবেন।

আমি বয়োবৃদ্ধ। আপনাদের খুব বেশি সময় ধরে পথ দেখাতে পারব না।

তাদের দুজনেই হেসে উঠল।

বর্গিয়া কান্ট্রিইয়ার্ডের শেষপ্রান্তে এসে ইতস্তত করল কার্ডিনাল। তারপর একটু থেমে বলল, আপনি কি জানেন? ব্যালকনিতে আমরা কোন দেহাবশেষ পাইনি।

মৃদু হাসি ঝুলে রইল মর্টাটির ঠোঁটে।

কে হয়ত বৃষ্টির জল সেগুলোকে ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে।

লোকটা তাকাল ঝড়-ঝঞ্ঝাময় স্বর্গের দিকে।

হ্যাঁ, হয়ত...

মধ্য সকালের আলোয়, সিস্টিন চ্যাপেলের চিমনি দিয়ে সাদা ধোঁয়ার একটা হাল্কা ভাপ উঠে এল।
রিপোর্টার গুন্থার গ্লিক সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে দেখল সেটা। আসল ধাপ... চিনিতা ম্যাক্রি তার পাশে এসে দাঁড়াল। সময় চলে এসেছে...
নড করল গ্লিক। চুল ঠিক করতে করতে ভিডিওগ্রাফারের দিকে তাকাল। আমার শেষ ট্রান্সমিশন...
ম্যাক্রি বড় করে একটা শ্বাস নিল, ষাট সেকেন্ডের মধ্যে সরাসরি সম্প্রচার।
লোকজনের একটা ছোট ঝাঁক ঘিরে ধরল তাদের।
তুমি কি ধোয়াটাকে নিতে পারবে? তাকাল গ্লিক।
সাথে সাথে নড করল ম্যাক্রি। আমি জানি কী করে একটা শট ফ্রেমবন্দি করতে হয়, গুন্থার।
একটু তিতকুটে স্বাদ পেল গ্লিক। তাইতো! ম্যাক্রি জানে কী করে একটা শট ফ্রেমবন্দি করতে হয়। গত রাতে মাক্রির ক্যামেরার কারসাজি সম্ভবত তাকে একটা পুলিৎজার তুলে এনে দেবে।
অন্যদিকে তার পারফর্ম্যান্স... সে আর ভাবতে চায় না।
কোন সন্দেহ নেই বিবিসি তাকে পাকড়াও করবে। সার্ন আর জর্জ বুশের কাছ থেকেও পেতে হবে অনেক উত্তম মাধ্যম, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।
ম্যাক্রি তাকাল তার দিকে, দেখতে ভালই লাগছে তোমাকে। আমি যদি একটু কিছু অফার করি...
কোন উপদেশ?
আরো ভাল কিছু দৃশ্য?

ক্যামেরার ভিতর দিয়ে তাকাল চিনিতা ম্যাক্রি।
কাজ শুরু হতে যাচ্ছে... পাঁচ... চার... তিন...
লাইভ ফ্রম ভ্যাটিকান সিটি, বলছে গ্লিক হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে, দিস ইজ গুন্থার গ্লিক রিপোর্টিং। লেডিজ এ্যান্ড জেন্টলম্যান, দিস ইজ নাউ অফিসিয়াল। কার্ডিনাল স্যাভেরো মর্টাটি, উনআশি বছর বয়সের এক প্রগতিবাদী, এইমাত্র ভ্যাটিকান সিটির পরবর্তী পোপ নির্বাচিত হলেন। এই নির্বাচনে একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে। কার্ডিনাল মর্টাটি ভ্যাটিকান সিটির একচ্ছত্র ভোট পেয়েছেন।
অবিশ্বাস নিয়ে তার দিকে তাকাল ম্যাক্রি। গ্লিককে অনেক বেশি প্রফেশনাল মনে হচ্ছে। তার সেই জড়তা নেই। একেবারে নিখুঁত পেশাদার রিপোর্টার।
আগেই আমরা রিপোর্ট করেছি যে, বলছে গ্লিক এখনো, ভ্যাটিকান গত রাতের অলৌকিক ঘটনার কোন না কোন বাখ্যা দেবে।
গুড! ভাবছে চিনিতা মাক্রি। সো ফার, সো গুড!
এবার গ্লিকের কণ্ঠে যেন ভর করে রাজ্যের দুঃখ, এবং গতরাতের ঘটনাটা খুবই দুঃখজনক, এ ছিল এক ট্রাজেডির রাত। বিষাদের রাত। গতকালের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় চার কার্ডিনাল মারা পড়েছেন। নিহত হয়েছেন সুইস গার্ডের কমান্ডার ওলিভেট্টি আর ক্যাপ্টেন রোচার। একই সাথে নিহত হয়েছেন লিওনার্দো ভেট্রা, এন্টিম্যাটার টেকনোলজির পথপ্রদর্শক, সার্নের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তিনি ভ্যাটিকানেও এসেছিলেন করণীয় ঠিক করার কাজে, কিন্তু প্রাণ হারান তিনি। মিস্টার কোহলার সার্নের ডিরেক্টর জেনারেল। তার মৃত্যুর ব্যাপারে এখনো কোন অফিসিয়াল এ্যানাউন্সমেন্ট আসেনি।
নড করল মাক্রি। রিপোর্ট তাদের কথামতই চলছে।
আর গতরাতে ভ্যাটিকানের উপরে এন্টিম্যাটারের ক্যানিস্টার বিস্ফোরিত হবার পর

থেকেই সারা পৃথিবীতে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এটা; বিশেষত বিজ্ঞানী মহলে।

সার্ন থেকে কোহলারের ব্যক্তিগত সহকারি সিলভিয়া বোডেলক জানিয়েছেন যে এন্টিম্যাটার টেকনোলজিকে আরো নিশ্চয়তাময় করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন এবং তা রেজিস্টার করার কাজও চলছে।

অসাধারণ! ভাবল ম্যাক্রি।

আমাদের স্ক্রিন থেকে দূরে দেখা যাচ্ছে, বলছে গ্লিক, রবার্ট ল্যাঙডনকে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সিম্বলজির অধ্যাপক রবার্ট ল্যাঙডন গত রাতের ইলুমিনেটি ক্রাইসিসের সময় এখানে উপস্থিত ছিলেন। যদিও আমরা প্রথমে জানতে পারি এন্টিম্যাটার বিস্ফোরণের সময় তিনি হেলিকপ্টারে ছিলেন, পরে তাকে দেখা গেছে ভ্যাটিকানে। একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী একথা জানিয়েছেন। কীভাবে তিনি বেঁচেছেন তা কেউ বলতে না পারলেও হসপিটাল টাইবেরিনার বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে তিনি টাইবার নদীতে বিস্ফোরণের পর পরই পতিত হন এবং সেখানে চিকিৎসা নিয়ে চলে আসেন ভ্যাটিকানে। থামল গ্লিক, নাটকীয়ভাবে, তারপর বলল, যদি কথাটা সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে এটা সত্যি সত্যি এক মিরাকলের রাত।

পারফেক্ট এন্ডিং! তাধৈ তাধৈ নাচতে ইচ্ছা করছে ম্যাক্রির। অসাধারণ। এবার বাছা বন্ধ কর!

কিন্তু সাইন অফ করল না গ্লিক। থেমে যাবার আগেই বলল সে, আমরা সাইন অফ করার আগে...

না!

বিশেষ এক অতিথির দ্বারস্থ হচ্ছি।

সাথে সাথে জমে গেল ম্যাক্রি। আবার গড়বড় লাগাতে চাইছে নাকি লোকটা। অতিথি? কোন নরকের অতিথি? লোকটা সাইন অফ করছে না কেন?

যে লোকটাকে আমি পরিচিত করিয়ে দিতে চাইছি, তিনি একজন আমেরিকান স্কলার। সুপরিচিত।

এগিয়ে গেল গ্লিক।

আমাকে আবার বলো না যে রবার্ট ল্যাঙডনকে পেয়ে গেছ! ভাবছে ম্যাক্রি।

যে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল গ্লিক, সে আর যেই হোক, রবার্ট ল্যাঙডন নয়। নীল জিন্স আর ফ্লানেলের শার্ট পরা লোকটার চোখে পুরু কাঁচের চশমা।

আমি পরিচিত করিয়ে দিচ্ছি...

দম বন্ধ হয়ে আসছে ম্যাক্রির।

শিকাগোর ডি পল ইউনিভার্সিটির বিশ্বখ্যাত ভ্যাটিকান স্কলার ডক্টর জোসেফ ভ্যানেকের সাথে।

তাকাল ম্যাক্রি। এখানে আবার নতুন করে কোন নাটক হবে নাতো!

ডক্টর ভ্যানেক, কাল রাতের কনক্লেভের ব্যাপারে আপনার আমাদের সাথে কিছু ব্যাপারে আলোচনা করার থাকতে পারে।

অবশ্যই আছে। এত সারপ্রাইজে ভরা রাতের পরে কল্পনা করা কঠিন যে আর কোন চমক বাকি থাকতে পারে... অথচ এখনো... থামল ডক্টর ভ্যানেক।

মুখ প্রসারিত করে হাসল গ্লিকও, এমনকি এখনো, এখানে একটা চমক বাকি রয়ে গেছে। রয়ে গেছে মোড়।

নড করল ভ্যানেক, এই সপ্তাহান্তে, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি কলেজ অব কার্ডিনালস নিজেদের অজান্তেই দুজন পেপ নির্বাচিত করে ফেলেছেন।

আর একটু হলেই পড়ে যেত ম্যাক্রির ক্যামেরা।

আরো প্রসারিত হাসি বের হল গ্রিকের মুখের ভিতর থেকে, দুজন পোপ, আপনি বলছেন?

নড করল স্কলার, তাই। আমি আগেই বলে নিচ্ছি, পাপাল ইলেকশনের উপর আমি সারা

জীবন ধরে রিসার্চ করেছি। কনক্লেভের নিয়মকানুন খুব প্যাচানো এবং আজকাল তার বেশিরভাগই অচল হয়ে পড়েছে। এমনকি গ্রেট ইলেক্টরও সম্ভবত জানেন না কী বলতে যাচ্ছি আমি। পোপ নির্বাচনের জন্য যে ভোট দেয়াই একমাত্র পথ নয়, তা লেখা আছে রোমানো পন্টিফিসি এলিগেন্ডা, নিউমেরো সিক্সটি থ্রি তে। পোপ আরো একভাবে নির্বাচিত হতে পারেন। একে বলা হয় এ্যাক্লেমেশন বাই এ্যাডোরেশন। থামল স্কলার, এবং এটাই ঘটেছে গত রাতে।

প্লিজ, বলে যান।

আপনার কি মনে আছে, গত রাতে যখন ক্যামারলেনগো কার্লো ভেন্ট্রেস্কা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আছেন তখন তাকে সব কার্ডিনাল জোরে জোরে আহ্বান করছিলেন, ডাকছিলেন নাম ধরে?

মনে আছে।

সেই দৃশ্যের কথা ভাবতে ভাবতে আমাকে প্রাচীণ নিয়মের কথা মনে করতে দিন, পকেট থেকে কিছু পেপার বের করল লোকটা, গলা পরিষ্কার করে নিল, তারপর শুরু করল পড়া, ইলেকশন বাই এডোরেশন ঘটে যখন... সব কার্ডিনাল, পবিত্র স্পিরিটের তাড়নায়, মুক্ত ও স্বতস্ফূর্তভাবে, এক কণ্ঠে এবং জোরে জোরে, ঘোষণা করে কোন ব্যক্তির নাম।

আবার আকর্ণবিস্তৃত হাসি দেয় গ্লিক, তার মানে আপনি বলতে চান, যে, কাল রাতে যখন সব কার্ডিনাল মিলে ক্যামারলেনগো কার্লো ভেন্ট্রেস্কাকে ডাকছিলেন, তখনি পোপ হিসাবে নির্বাচিত হয়ে গেছেন তিনি?

হ্যাঁ। এমনকি সেখানে আরো লেখা আছে যে সবাই মিলে ডাকার ফলে সে লোক যেমন যাজকই হোক না কেন, প্রিস্ট, বিশপ বা কার্ডিনাল, নির্বাচিত হয়ে যাবে। তাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যামারলেনগো কার্লো ভেন্ট্রেস্কা আসলে পোপ হিসাবে নির্বাচিত হয়ে গেছেন। তার শাসনকাল মাত্র সতের মিনিটের কিছু বেশি। আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, তিনি একটা আগুনের শিখায় পরিণত হন। তিনি নিশ্চয়ই ভ্যাটিকানের গোট্টোতে শায়িত আছেন আর সব পোপের সাথে।

থ্যাঙ্ক ইউ, ডক্টর! বলল গ্লিক, তাকাল ম্যাক্রির দিকে, সবচেয়ে বড় কথা...

রোমান কলোসিয়ামের উপরের ধাপে উঠে গিয়ে এক তরুণী মেয়ে, ভিট্টোরিয়া ভেট্রা তাকে ডাকে, নিচের দিকে তাকিয়ে। তাড়াতাড়ি কর, রবার্ট! আমি জানতাম, আরো কম বয়েসি কাউকে বিয়ে করা উচিৎ ছিল। হাসিতে তার জাদু ঝরে।

শ্রাগ করে সে, গতি বাড়াতে চায়। কিন্তু পা যেন গেঁথে গেছে পাথরের মত। সবুর কর! বলে সে, মিনতি করে, প্লিজ...

একটা ধাক্কার মত লাগে তার বুকে।

জেগে ওঠে রবার্ট ল্যাংডন একটা ধাক্কা অনুভব করে সে ভিতের ভিতরে।

অন্ধকার।

বিছানা আরামদয়ক। ভিনদেশি। এক চমৎকার বাতাস আসছে বাইরে থেকে। আসছে সুবাস। কোথায় সে? ভেবে পায় না।

একজন এ্যাঞ্জেল তাকে তাড়া করে ফেরে... রাতের আঁধারে এগিয়ে আসে সেই দেবদূত... হাত আকড়ে ধরে তার... নিয়ে চলে পথ দেখিয়ে...

উঠে বসল সে। পাশে আরও একটা বিছানা। সেটার চাদর একেবারে গোছানো নয়। একটু আগোছালো। বাথরুম থেকে জলের শব্দ উঠছে।

ভিট্টোরিয়ার বিছানার দিকে তাকিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যায় সে। সেখানে একটা বাক্সে লেখা আছেঃ হোটেল বার্নিনি।

রোমে এরচেয়ে আরামদায়ক হোটেল আর নেই।

কোন শব্দে জেগে উঠেছে সে বুঝতে পারল। দরজায় তীব্র করাঘাত করছে কেউ একজন।

কেউ জানে না আমরা এখানে!

নেমে গেল সে একটা হোটেল বার্নিনি রোব গায়ে চাপিয়ে। ভারি, ওকের দরজার সামনে থামে একটু। তারপর খুলে ফেলে।

একজন কিম্ভুত পোশাক পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

আমি লেফটেন্যান্ট চার্ট্রান্ড। সুইস গার্ড।

কীভাবে... কীভাবে আপনারা আমাদের পেলেন?

গতরাতে আপনাকে স্কোয়ার ছেড়ে যেতে দেখেছিলাম। ফলো করেছিলাম সাথে সাথে। মনে হল এখনো থাকতে পারেন।

ভেবে পায় না সে, কার্ডিনালরা তাদের দুজনকে ভ্যাটিকানে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য লোক পাঠায়নিতো! কলেজ অব কার্ডিনালসের বাইরে শুধু তারাই জানে সত্যিটা।

হিজ হোলিনেস এই চিঠিটা দিয়েছেন। একটা চিরকুট তুলে দেয় চার্ট্রান্ড।

মিস্টার ল্যাংডন ও মিস ভেট্রা,

যদিও গত চব্বিশ ঘণ্টায় আপনাদের অবদানের কারণে আমার পক্ষে আপনাদের কাছ থেকে এরচেয়ে বেশি কিছু চাওয়ার নেই তবু আমার দ্বার আপনাদের জন্য সব সময় খোলা। কিছু কিছু সময় প্রশ্নের চেয়ে উত্তরগুলো বেশি জটিল হয়ে পড়ে।

হিজ হোলিনেস, স্যাভেরিও মর্টাটি

কোন সন্দেহ নেই, কলেজ অব কার্ডিনালস একজন মহান লোককে নির্বাচিত করেছে।

আর কিছু বলার আগে চার্ট্রান্ড একটা রাপিং করা প্যাকেজ বের করল, এ টোকেন অব থ্যাঙ্কস ফ্রম হিজ হোলিনেস।

ল্যাংডন নিল প্যাকেজটা। ভারি।

তার মতে, এই আর্টিফ্যাক্টটা আপনার প্রাপ্য। সব সময়।

খুলল ল্যাংডন। খুলেই হতবাক হয়ে গেল। সেই ব্র্যান্ড! ইলুমিনেটি ডায়মন্ড।

হাসল চাট্রান্ড, শান্তি আপনার সাথে থাকুক। ঘুরল সে।

থ্যাঙ্ক ইউ...
মিস্টার ল্যাংডন, আপনাকে কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?
অবশ্যই!
আমার সাথের গার্ডরা সহ আমিও খুব জানতে চাই। শেষ মিনিটগুলোয় কী ঘটেছিল হেলিকপ্টারে?
একটু ধাক্কা অনুভব করল ল্যাংডন। তারা জানত, এ মুহূর্ত আসছে। গতরাতে সত্যির মুহূর্তে কী করবে সে বিষয়ে সলা-পরমর্শও করেছে।
সারা দুনিয়ার মানুষ জাদুমন্ত্রে মুগ্ধ। কতক্ষণ থাকবে এ ঘোর বলা যায় না। কাল রাতে... হয়ত, হয়ত তার বেঁচে যাওয়াটা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল।
মিস্টার ল্যাংডন? আমি হেলিকপ্টারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছিলাম।
হ্যাঁ, আমি জানি... হয়ত এটা, পতনের আঘাত... কিন্তু আমার স্মৃতি, যতদূর মনে হচ্ছে একেবারে অস্পষ্ট...
আপনার কিছুই মনে নেই?
আমার ভয় হয়, এর রহস্যটা চিরদিন বন্ধই থাকবে।
বার্নিনির ট্রাইটন ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে ব্যালকনিতে, ভিট্টোরিয়ার পিছনে। ঝর্ণার উপর একটা হাল্কা মেঘের দল ভেসে যায়। উপরে পূর্ণ আলোকিত চাঁদ। মোহময়ী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা তাকে রোমান দেবীর মত মনে হচ্ছে সাদা টেরিক্লথের রোবে।
কোন কথা না বলে ল্যাংডন বুঝতে পারে, ডুবে গেছে সে মেয়েটার ভিতরে। এগিয়ে যায় ইলুমিনেটি ডায়মন্ডটাকে নামিয়ে রেখে। পরে সব ব্যাখ্যা করা যাবে।
জেগেছ তাহলে... বলছে ভিট্টোরিয়া, অবশেষে!
লম্বা দিনের পর।
আর এখন, আমার মনে হয় তুমি পুরস্কার চাইবে।
আই এ্যাম স্যরি?
আমরা পরিণত, রবার্ট। ভাল করেই জান তুমি। আমি তোমার চোখে পিপাসা দেখতে পাচ্ছি। অনুভব করছি আমার ভিতরেও...

ফ্রিসে, ট্রাফলস আর রিসেট্টো দিয়ে করা খানাপিনাটা জম্পেশ হল চাঁদের আলোয় বিধৌত ব্যালকনিতে।
ভিট্টোরিয়া কী বোঝাচ্ছে তা বোঝার জন্য সিম্বলজিস্ট হতে হয় না। টেবিলের নিচ দিয়ে মেয়েটা একটা অবাক করা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বোঝাই যায়, সে চাইছে তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হোক ভিতরে।
কিন্তু মজা করার জন্য কিছুই করল না ল্যাংডন।
আরো থেমে থাকল সে। তারপর একে একে সব খাবার গলাধঃকরণ করল। ঠান্ডা মাথায় আলোচনা করতে শুরু করল ইলুমিনেটি ডায়মন্ডটা নিয়ে। একটা অভিমানের অশ্রুতে ভরে গেল মেয়েটার চোখ।
এই এ্যাম্বিগ্রামটায় তুমি অসম্ভব আনন্দ খুঁজে পাও, তাই না? বলল সে কর্কষ কণ্ঠে।
অকল্পনীয়।
তুমি কি বলতে চাও যে এ ঘরে এটাই সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক জিনিস?
যাক, আরো একটা ব্যাপার আছে যা আমাকে আকৃষ্ট করে।
সেটা হচ্ছে?
কী করে তুমি টুনা মাছের উপর কাজ করে আইনস্টাইন থিওরির বারোটা বাজালে!
ডিও মিও! টুনা ফিস নিয়ে অনেক কচকচি হয়েছে! আমাকে নিয়ে খেল না। ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।
হয়ত তোমার পরের অভিযানে তুমি অন্য কোন মাছ... যেমন কাঁচকির উপর পরীক্ষা

নীরিক্ষা করে প্রমাণ করে ছাড়বে যে পৃথিবীটা আসলে চ্যাপ্টা।

ফর ইউর ইনফরমেশন, প্রফেসর, আমার পরবর্তী পরীক্ষা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা মাইল ফলক হয়ে থাকবে। আমি প্রমাণ করতে যাচ্ছি যে নিউট্রিনোর ভর আছে।

কী! জিজ্ঞেস করল ল্যাঙডন, আমিতো জানতামই না যে তারা ক্যাথলিক।

আশা করি তুমি মরণের পরের জীবনে বিশ্বাস কর, রবার্ট ল্যাঙডন!

আসলে... এ দুনিয়ার বাইরে কোন কিছু কল্পনা করতে গেলেই আমি ভীষণভাবে বিষম খাই।

তাই? তার মানে কখনো তোমার ধার্মিক অভিজ্ঞতা হয়নি? আনন্দময় একটা পরিপূর্ণ মুহূর্ত?

না। আর আমি এমন এক লোক যে ধর্মীয় বাতাবরণে আনন্দ পেতে চায় না।

রোব ফেলে দিল ভিট্টোরিয়া সাথে সাথে, চোখে মোহময় দৃষ্টি, তুমি কখনোই একজন যোগ গুরুর সাথে বিছানায় যাওনি, মিস্টার ল্যাঙডন . . . . . .

***

এক প্রাচীণ, গোপন ভ্রাতৃসংঘ
ধ্বংসের এক আনকোরা নূতন অস্ত্র
এক অচিন্তনীয় লক্ষ্য

খুন হয়ে যাওয়া এক বিজ্ঞানীর বুকে পোড়া ছাপের পাঠোদ্ধার করতে বিশ্বখ্যাত সিম্বলজিস্ট, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রবার্ট ল্যাংডন পৃথিবীর সবচে বড় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে এসে পড়ে। থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়লে সবাই অবাক হয়ে পড়ে: ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে বিষবাষ্প তুলছে এক শতাব্দি-পুরনো ভ্রাতৃসংঘ- দ্য ইলুমিনেটি। স্মরণকালের সবচে ভয়াবহ অস্ত্রের হাত থেকে পোপ ভ্যাটিকান সিটিকে রক্ষার জন্য ল্যাংডন ঝাঁপিয়ে পড়ে রোমের উপর: সাথে সুন্দরী, রহস্যময়ী পদার্থবিদ ভিট্টোরিয়া ভেট্রা। তারা দুজনে চষে বেড়ায় রোমের অস্পৃশ্য সব এলাকা- পরিত্যক্ত ক্যাথেড্রাল, বদ্ধ কবরখানা, বিশাল বিশাল গির্জা, তারপর পৌঁছে পৃথিবীর সবচে গোপন ভল্টে... অনেকদিন ধরে ভুলে যাওয়া চার্চ অব ইলুমিনেটি।

উপন্যাসটায় লেখক খ্রিস্টবাদ এবং এর ইতিহাস ও বর্তমান নিয়ে নির্ভয়ে অনেক গোমর ফাঁস করে দিয়েছেন, একই সাথে রেখেছেন দমহীন টানটান উত্তেজনা।

'শ্বাসরুদ্ধকর রিয়েল টাইম এ্যাডভেঞ্চার...
দুর্দর্ষ, দ্রুতগতির, সাথে আছে অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধির উপস্থিতি।'

-সান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকলস

'ড্যান ব্রাউন অবশ্যই সবচে সেরাদের মধ্যে একজন, স্মার্টদের মধ্যে একজন, সবচে পরিপূর্ণ লেখকদের একজন।'

- নেলসন ডি মিলে

ISBN 984-32-2505-7
Bdt : 290.00 Tk. Only

Email: annesha_prokashon@yahoo.com

স় জ ন শী ল তা র স ন্ধা নে

বিতর্কঃ-

ড্যান ব্রাউনের কিছু ভুল: এঞ্জেলস অ্যান্ড ডিমন্স